তুলসীদাস

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩২৮ সাল
১৮ই পৌষ

মূল্য ৩৲ তিন টাকা

Published by
Norendra kumar Seal.
CROWN LIBRARY.
178, Nimoo Gossain's Lane,
Calcutta.

Printed by S. K. SEAL.
SEAL-PRESS.
333, Upper Chitpur Road.
CALCUTTA.

পাতা মুড়িবেন না।

ভূমিকা

ভারত এত বড় কিসে—কিসে ভারতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি—যাহা আবহমানকাল জগতের মধ্যে এত প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, ভারত বড় হইয়াছিল কিসে?

ইহার উত্তর দিতে হইলেই বলিতে হইবে—ভারত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চরম উন্নতি করিয়াছে বলিয়াই—তাহার গৌরব-সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে! যাহার সম্মোহন-সৌগন্ধ্যে পৃথিবী ভোরপুর! অদ্যাবধি জগতে এমন কোন দেশ নাই—যাহা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে।

"জড়বিজ্ঞান" আজ ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে; বাহ্যিক কে বিষয়ের অভাব হইলেই জড়ের সাহায্য লইতে হয়; দৈনন্দিন অভাব অভিযোগেরই জড়ের সাহায্যে প্রতিবিধান আবশ্যক কিন্তু যাহাদের বাহ্যিক কোন বিষয়ের অভাব নাই, সাংসারিক অভাব-অভিযোগ যাহাদিগকে কোনকালে কষ্ট দিতে পারে নাই—এমন কি সংসার-চিন্তা যাহারা ভুলেও ভাবিত না; জন্মভূমি মা যাহাদের—সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা—তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কখন কোন অভাব হয় নাই বলিয়া—দেশবাসী বাহির ছাড়িয়া ভিতরে আধ্যাত্ম উন্নতির প্রতি অগ্রসর হইয়াছিল এবং সেই উন্নতিবলে ভারত আজ সকল দেশের মুকুটমণি, দেবগণ ইহার আশ্রয়লাভে সতত লালায়িত।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উন্নতি ভারতে যত হইয়াছিল—এত আর কোথাও হয় নাই—ভারতের পবিত্র তপোবন একদিন প্রণব ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া, ঋষি-তপস্বিগণের সামগানে মুখরিত হইয়াছিল, ইহার গগন-পবন, বন-উপবন সম্মোহিত করিয়া বাঞ্ছিতের চরণ স্পর্শ করিয়াছিল। কত সাধক, কত ভক্ত, কত যতি-সন্ন্যাসী যে এই মাতৃক্রোড় সমলঙ্কৃত করিয়া একদিন ইহার রেণুকে স্বর্ণ রেণু অপেক্ষাও গরীয়সী করিয়াছিল—তাহার ইয়ত্তা কে করে?

ভগবদ্ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসিগণের জন্ম এক ভারত ভিন্ন আর কোথাও হয় নাই—আর কোন দেশ ইহার জন্য আপনাকে অধিকতর সৌভাগ্যশালী মনে করিতে পারিবে না—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। অসংখ্য ভক্ত সাধকগণের উজ্জ্বল তপজ্যোতি বিভূষিত হইয়া একদিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কুটীর-প্রাঙ্গণ পবিত্র করিয়াছিলেন—ভক্তকবি—সাধকাগ্রগণ্য মহাত্মা "তুলসীদাস" বান্দা-জেলার পবিত্র ব্রাহ্মণকুল সমুদ্ভাষিত করিয়া একদিন "রামনাম" মহামন্ত্রের মেঘমন্দ্র গর্জ্জনে দেশকে অনুপ্রাণিত ও কীর্ত্তিমণ্ডিত করিয়া জগতে রামনামের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সামান্য কুটীরবাসী দরিদ্র, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তপঃপ্রভাবে দিল্লীশ্বরের আসন পর্য্যন্ত টলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তারপর যোগবলে কত অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন—তাহা সংখ্যা করা দুঃসাধ্য।

আজ আমরা তাঁহারই পবিত্র জীবন-কাহিনী উপন্যাসাকারে গ্রথিত করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি; মহাত্মা জীবনের অলৌকিক সমগ্র ঘটনা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করা অসম্ভব তবে যতদূর সম্ভব—এই গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে ক্রটী করি নাই। ভগবান রামচন্দ্র যে মহাত্মার জীবনজলধির কর্ণধার—যাঁহার পাদপদ্মে অচলা ভক্তি রাখিয়া তুলসীদাস ভারতে সাধক-শিরোমণি—তাঁহার জীবনচরিত বোধ হয় ভক্ত পাঠকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে। এক্ষণে পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া যদি কথঞ্চিৎ তৃপ্তি অনুভব করেন—তাহার কৃতিত্ব আমার মত ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের কিছুই নাই—যাহা কিছু সমস্তই সেই রামগতপ্রাণ সাধকের। আমার পূর্ব্ব বিরচিত ত্রিশ চল্লিশখানি গ্রন্থ সাধারণের বড়ই প্রিয় হইয়াছে—তাহার কারণ সেগুলি ধর্ম্মমূলক উপন্যাস। এখানিও জীবনীমূলক সাধকচরিত্র; এইজন্য আশা করা যায়—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের নিকট ইহা অনাদৃত হইবে না।

বিনীত—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাতা মুড়িবেন না।

তুলসীদাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম-কথা

বান্দাজেলার অন্তর্গত যমুনাতীরবর্ত্তী রাজাপুর গ্রামে বহুদিন পূর্ব্বে একঘর ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নীর বয়স কিছু বেশী হইলেও তখন তাঁহারা জরা-বার্দ্ধক্যের কবলস্থ হন নাই; অথবা জরা-বার্দ্ধক্য তখন সহজে কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারিত না। এখন যেমন স্ত্রীলোক কুড়ি বৎসর হইলেই বুড়ি, আর পুরুষ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর যাইতে না যাইতেই নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত হইয়া রুগ্ন হইয়া পড়ে, কিছুদিন ঐরূপ পীড়া ভোগ করিতে করিতেই বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন তাহা হইত না। তাহার কারণ, তখন দেশে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না, অতি অল্প বয়স হইতেই মানুষকে সংসার চিন্তায় এত অস্থির হইয়া পড়িতে হইত না। ভারতের কোথাও ভাত-কাপড়ের-কষ্ট কাহাকেও ভোগ করিতে হইত না; সংসার কেমন করিয়া চলিবে ভাবিয়া কাহাকেও এখনকার মত এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। আর তখন ব্রহ্মচর্য্যও মানুষকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া রাখিত।

এখন সংসারের চিন্তা অত্যধিক বাড়িয়াছে বলিয়াই মানুষকে এমন কাবু করিয়া ফেলিয়াছে; দুর্ব্বিসহ চিন্তায় জর জর হইয়া

মানুষ অস্থিচর্ম্মসার হইতেছে, অকালবার্দ্ধক্য তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যও একপ্রকার অনভ্যস্থ হইয়া পড়ায়, চিন্তা ও ব্যাধি তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বান্দাজেলা হিন্দুস্থানী প্রধান দেশ। আমরা যে ব্রাহ্মণদম্পতীর কথা বলিতেছি, তাঁহারা সরোজপারী পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। ব্রাহ্মণের নাম আত্মারাম দ্বিবেদী এবং ব্রাহ্মণীর নাম ছিল—হুলসী দেবী। এতাধিক বয়স হইলেও, তখন তাহাদের কোনও পুত্রাদি হয় নাই। সংসারে পুত্রকন্যা না থাকিলে তাহার কিছুমাত্র শোভা হয় না; সে সংসারে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই উপভোগ করিতে হয়। আত্মারাম ও হুলসী দেবী ধর্ম্মোপার্জ্জনে পরম আনন্দলাভ করিলেও পুত্রকন্যা বিহনে—সময়ে সময়ে বড়ই বিমনা হইয়া থাকিতেন। সংসারে অনটন কিছু নাই; ধর্ম্মকর্ম্মেও তাঁহারা কিছুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু তাহার মধ্যে আনন্দের দুলাল দুই একটি-পুত্রকন্যা খেলা করিয়া বেড়াইলে অতীব শোভার আস্পদ হইত; সংসারে তাঁহাদের এইটিরই অভাব ছিল। এবং এই অভাবই সদানন্দময় পতি-পত্নীকে সময়ে সময়ে ম্রিয়মান করিয়া রাখিত। পুত্রকন্যা হইবার বয়স প্রায় অতীত হইল, তথাপি সংসারের সাররত্ন উঁহারা লাভ করিতে পারিলেন না; শ্রীরামজী বোধ হয়,—এ জন্মে তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন না। এই দুঃখই তাঁহাদের প্রাণে অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিত, তাহা ছাড়া পতিব্রতা হুলসী দেবীকে ও শ্রীরামগত প্রাণ আত্মারামকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিত না। তাঁহাদের উভয়কে দেখিলে আনন্দের পূর্ণমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত। স্বধর্ম্মনিরত ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণদম্পতী সমস্ত

দিবস ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিয়া অপরাহ্ণে আহারাদি করিতেন—অহো-রাত্র রাম-গুণ-গান করিয়া তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইত, বৃথা কাজে তাঁহারা কখনও ব্যাপৃত থাকিতেন না। এই আদর্শ ব্রাহ্মণ-দম্পতীকে রাজাপুর গ্রামের সকলেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, সকলেই তাঁহাদের অনুজ্ঞা সসম্ভ্রমে প্রতিপালন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত।

ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকিলে, ঈশ্বরচিন্তায় সর্ব্বদা মতি রাখিতে পারিলে, তাঁহাদের দৈহিক জ্যোতিঃ ও মানসিক স্ফূর্ত্তি যেরূপ লাভ হয়, রাজ-ভাণ্ডারের অতুল ধনসম্পদেও তাহার কণিকামাত্র পাওয়া যায় না। রাজার আনন্দ—ভোগমূলক, আর ধার্ম্মিকের আনন্দ—ত্যাগমূলক অতএব পার্থক্য অনেক। আত্মারাম ও হুলসী দেবীকে দেখিলে, তাঁহাদের সেই তেজোময় তপঃক্লিষ্ট দেহের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে, সাক্ষাৎ দেবদম্পতি বলিয়া অনুমিত হইত, হঠাৎ দর্শন করিলে তাঁহাদের পদে স্বতঃই মস্তক নত হইয়া পড়িত, জোর করিয়া কিছু করিতে হইত না। ধর্ম্মের এমনি প্রভাব, ধার্ম্মিকের এমনি আকর্ষণী-শক্তি।

তাঁহাদের কিছুরই অভাব ছিল না। অদৃষ্ট মন্দ হইলেও, কর্ম্মফলে তাহার মন্দ গঠন হইলেও, সাধক উৎকট তপস্যায় তাহা খণ্ডন করিতে পারেন। সকলেই মনে করিয়াছিল;—পুত্রমুখ-নিরীক্ষণ এ দেব-দম্পতির ভাগ্যে বুঝি নাই। ইহাদের অবর্ত্তমানে বুঝি—ভগবান এ পবিত্র বংশের বিলোপ সাধনই করিবেন। কিন্তু সাধকের সাধনার ফল কি ব্যর্থ হইতে পারে? আত্মারাম ও হুলসী দেবীর মনোবাসনা অপূর্ণ রহিল না; সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা পুত্রধনে ধনী হইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভগবান এতদিনে তাঁহাদের সে সাধ পূর্ণ করিলেন।

তুলসী দেবী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটি ভক্তচূড়ামণি তাঁহার গর্ভকোষে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই স্বপ্নদর্শনের পর একদা তিনি শুভ মুহূর্ত্তে গর্ভধারণ করিলেন, দেখিয়া রাজাপুর গ্রামের সকলেই খুসী হইল। দ্বিবেদীর বংশরক্ষা হইলে, গ্রামের অনেক উপকার হইবে। এমন ধার্ম্মিক দম্পতির পুত্র হইলে সে নিশ্চয়ই ধার্ম্মিক হইবে, উত্তরকালে এ গ্রামে ধর্ম্ম-শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত হইবে না, বলিয়া সকলেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। নিজে ভাল হইলে, তাহার দুঃখে বা সুখে সকলেই এইরূপ অংশভাগী হইয়া থাকে।

কিন্তু জানি না, ভগবান কি অভিপ্রায়ে এ বৃদ্ধবয়সে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াও কেন এরূপ অকৃপা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পরীক্ষা যে পদে পদে; সাধককে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি যে পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া ফেলেন। দৃঢ়ব্রত না হইলে কি তাঁহার এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়? আত্মারাম পত্নীকে গর্ভবতী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণে কি জানি কি ভাবিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ নিরানন্দ-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আত্মারাম তাহা প্রকাশ করিলেন না। নানাপ্রকার ধর্ম্ম-ভাবে পত্নীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। আত্মারামের গুরুদেব নৃসিংহদাস গোস্বামী জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনিও শিষ্যের এবম্বিধ সৌভাগ্যে আনন্দিত হইলেন, প্রত্যহ যাতায়াত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। গুরুই ত জীবের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, গুরুই ত পরমপদ, তখন ত প্রত্যেক হিন্দুগৃহে এইরূপ পরম দেবতার আবির্ভাব হইয়া হিন্দুসংসার উজ্জ্বল করিত, জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি এইরূপ দেবকল্প, ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণই তখন সংসারকে

স্বর্গে পরিণত করিত, ইহপরকালের কর্ত্তা, ভবার্ণবের নাবিক হইত। হায়! এখন তাহার স্থানে ভোগের প্রতিমূর্ত্তি রাক্ষস সকল তাণ্ডব-নৃত্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; হিন্দু-সংসারকে স্বর্গের পরিবর্ত্তে নরকে পরিণত করিতেছে।

একদিন শুভ মুহূর্ত্তে হুলসী দেবী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। রাজাপুর গ্রামে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। নৃসিংহদাস আসিয়া পঞ্জিকা দৃষ্টে গণনা করিলেন, মূলা নক্ষত্রের প্রথম চরণে পুত্রের জন্ম হইয়াছে বলিয়া উহা পিতামাতার প্রতিপাল্য নহে, শাস্ত্রানুসারে উহাকে ত্যাগ করাই ধর্ম্মসঙ্গত। গুরুদেবের মুখে এই নির্ঘাতবাক্য শুনিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। আত্মারাম পরম ধার্ম্মিক, ধর্ম্মের জন্য তিনি নিজপ্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, এ সদ্যোজাত শিশু ত কোন ছার! আত্মারাম গুরুর আদেশে পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাকে একেবারে নয়নের অন্তরালে বিসর্জ্জন করিতে হইল না। শিশুর পিতা-মাতার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়াই নিষেধ; এই জন্য ভক্তদম্পতিকে নৈরাশ্য-সাগরে নিমজ্জিত না করিয়া গুরুদেব বলিলেন—"বৎস! পুত্রটিকে একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে না, আমি উহাকে লইয়া প্রতিপালন করিতেছি; তোমরা ছয়মাস পরে উহাকে দর্শন করিয়া নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিও, তাহা হইলে আর প্রাণে কোন প্রকার অসন্তোষ আসিতে পারিবে না—অনায়াসে একনিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিবে, মন আর চঞ্চল হইবে না।" ধর্ম্মপ্রাণ আত্মারাম তাহাতে কোন দ্বিধাবোধ করিলেন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে গুরুবাক্যে অনুমোদন করিলেন।

হুলসী দেবী এতক্ষণ গুরুদেবের মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া বড়ই কাতরা হইয়াছিলেন; হায়! দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া, এই

বৃদ্ধবয়সে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অবশেষে পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাকে লালন-পালন করিতে পাইব না; তাহাকে ছয়মাসকাল দেখিতে পাইব না, প্রাণের শিশুকে এতদিন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে হইবে? কোন্ রমণী এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, না হয়, প্রাণ যাইবে—তাহাতে ক্ষতি কি? শিশুকে ত্যাগ করিতে হইবে, আর দেখিতে পাইব না, শুনিয়া তাঁহার প্রাণ ছটফট্ করিতে ছিল। সোনার শিশুটিকে কোলে করিয়া এতক্ষণ তিনি মর্ম্মন্তুদ রোদনে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে ছিলেন; মনে করিতেছিলেন—এখন শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি; ধর্ম্ম-ত্যাগ করি, কি পুত্রকে ত্যাগ করি? আবার মনে মনে ভাবিতেছিলেন—আমার না হয়, যাহা হইবার হইবে, কিন্তু ইহাতে আমার স্বামী-দেবতার যদি কোন অমঙ্গল হয়; এই ভাগ্যহীন শিশুকে লইয়া যদি তাঁহার কোনও অনিষ্ট হইয়া পড়ে, হুলসী দেবী প্রাণের আবেগে কাঁদিতেছিলেন। এমন সময়ে নৃসিংহদাসের শ্রীমুখে উক্ত প্রকার আদেশ শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে না, আবার ছয়মাস পরে গুরুগৃহ হইতে পুত্রকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন, ভাবিয়া মন আশান্বিত হইল। আত্মারাম যখন গুরুসহ আসিয়া পুত্রকে প্রার্থনা করিলেন এবং সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন, তখন তিনি দুঃখে ও আনন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামিহস্তে প্রাণের পুত্রকে প্রদান করিলেন।

নৃসিংহদাস শিষ্যের মনস্তুষ্টির জন্য সদ্যোজাত শিশুটিকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। পুত্রটি গুরুদেবের যত্নে শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পুত্রটি যখন পঞ্চমমাসে পদার্পণ করিল, নৃসিংহদাস তখন তাহার অন্নপ্রাশন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া নাম রক্ষা করিলেন—তুলসীদাস। * এই বালক কালে শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত

* জন্ম ১৫৮৯ সংবৎ।

হইয়াছিলেন, মহাকবিরূপে সাধনার উচ্চস্তরে সমারোহণ করতঃ হিন্দুজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

বালক তুলসীদাস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পিতামাতার ইচ্ছাক্রমে গুরুদেব তাহাকে বর্ণমালা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পিতা-মাতা যদিও তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেন না, তথাপি নৃসিংহদাস তুলসীদাসের প্রাণগতিক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন সময়ে আত্মারাম ও হুলসী দেবীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পাছে তাঁহারা কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কোন বিষয় পাছে তাঁহাদের মনোমত না হয়, এই জন্য তিনি সকল বিষয়েই শিষ্য দম্পতির মতামত না লইয়া কোন কার্য্য করিতেন না। আত্মারাম বলিতেন—প্রভূ! তুলসীদাসের উন্নতি-অবনতির ভার সমস্ত আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন—তাহাই করিবেন। আমরা যখন আপনার পদানত দাস, আমাদের ইহপরকালের যাবতীয় ভার যখন আপনার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে; তখন আমাদের পুত্রের জীবনো-পায় আপনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইলে ভাল ব্যতীত মন্দ হইবে না। সে বিষয়ে আমাদের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া আপনার যাহা অভিপ্রেত হইবে—তাহাই করিবেন। নৃসিংহদাস কিন্তু তাহা শুনিতেন না, তিনি বালকের সকল কার্য্যেই তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন।

তুলসীদাস পিতামাতার ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেনই। গুরুরও সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নৃসিংহদাস মুক্তপুরুষ হইয়াও অব-শেষে এই বালকের মায়ায় এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিলার্দ্ধ না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না, মায়ামুক্ত নৃসিংহ ক্রমশঃ বালকের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যোগ-তপস্যা সমস্ত একবারে বিস্মৃত হইয়া অনন্য

চিন্তায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস কোনও দোষ করিলে তিনি শাস্তি দিতেন না, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইলেও সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিয়া যাইতেন। তুলসীদাসের সেই নধর অধরের কমনীয় বচন সুধা পান করিয়া ও তাঁহার সেই নরদুর্লভ সুন্দর কান্তি দেখিয়া পথের পথিক যখন তাঁহাকে কোলে না করিয়া থাকিতে পারিত না, তখন পিতামাতা বা গুরুদেবের কথা কি বলা যাইবে? এইরূপ অত্যাধিক স্নেহে তুলসীদাসের প্রথম বয়সে বিদ্যাশিক্ষা কিছুই হইল না; তবে ধার্ম্মিক পিতামাতার গুণে এবং পরম ভক্ত নৃসিংহদাসের শিক্ষায় বালক ধর্ম্ম-পথভ্রষ্ট হইল না। নৃসিংহ যখন দেবারাধনা করিতেন, বালক তুলসীদাসও সে সময় গুরুদেবের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ধ্যান-ধারণার অনুকরণ করিতেন, ঠাকুর-দেবতার পুজাদি কেমন করিয়া করিতে হয়—তাহা শিক্ষা করিতেন।

তুলসীদাস এই বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মকর্ম্মে মতিমান হইলেও বড় একগুঁয়ে বালক ছিলেন, যাহা ধরিতেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না, ইহাতে তাঁহার প্রাণ যাক্ আর থাক্। তুলসীদাস বড় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন। কোনও সুন্দর বস্তু দেখিলে, তিনি তাহাতে এমন ভাবে মজিয়া যাইতেন যে, তাঁহাকে সে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। গুরুদেব এই জন্য তাঁহাকে বড় কাহারও সহিত মিশিতে দিতেন না, তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বে দীনদয়াল তেওয়ারীর পুত্র দুঃখী তেওয়ারীর সহিত তুলসীদাসের অত্যন্ত সদ্ভাব হইয়া ছিল, দীনদয়াল তুলসীদাসের পিতার নিকট আত্মীয় বলিয়া দুঃখীর সহিত খেলা করিতে কেহ নিষেধ করিত না। দুঃখী তুলসীদাসের সমবয়স্ক—খুব ভাল ছেলে।

একটু জ্ঞানবান হইলে নৃসিংহদাস নবমবর্ষে তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তুলসীদাসের ধর্ম্মকর্ম্মে প্রগাঢ় আসক্তি দেখিয়া গুরুদেব তাঁহাকে সেইপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তুলসীদাসও মনের আনন্দে সেই সকল উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। বালক অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, কোন বিষয় একবার শিখাইলে আর দ্বিতীয়বার তাহা শিক্ষা দিতে হইত না। ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত হইতে পারিলে মানবের সকল অভাব দূরীভূত হইয়া থাকে; তুলসীদাস বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষায় কিছু অমনোযোগী থাকিলেও, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছু কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার সে অভাব দুরীভূত হইতে লাগিল। এখন আর তাঁহাকে সহজে কেহ মূর্খ বলিয়া ধরিতে পারিত না. যাহার জন্য বিদ্যাশিক্ষা, সেই বস্তুই যদি লাভ হয়, তবে আর বিদ্যাহীনতা-দোষদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিতৃবিয়োগ

দেখিতে দেখিতে বাল্য উত্তীর্ণ হইয়া তুলসীদাস যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইল, অপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পূর্ণতা লাভ করিল। এখন তুলসীদাস একজন সুপুরুষ, তাহার উপর তাঁহার সেই ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার ও বেশভূষা তাঁহাকে অতীব সৌন্দর্য্যশালী করিয়া তুলিয়াছিল। যুবক যখন বন্ধু দুঃখীরামের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া

বেড়াইতেন, নদীতীরে স্নান করিতে যাইতেন, তখন সকলে তাঁহার সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তুলসীর নম্রতা ও কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ, যাহাতে মানবজীবন ধন্য করে, যাহাতে সে লোকসমাজে আদরণীয় হইতে পারে, গুরুদেব তাহার জন্য নানা প্রকার সৎ-শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল—যদি পুত্র লেখাপড়া শিক্ষায় পারদর্শী হইতে না পারিত, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে যদি বিদ্যার্জ্জনে বালক ক্ষমতাবান না হইত, তাহা হইলে পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তাহাকে সৎস্বভাব-সম্পন্ন করিয়া সামাজিক বিষয়ে সুনিপুণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বিশিষ্টভাবে সামাজিক ভাবাপন্ন হওয়াও তখন একটা মহৎ গুণ বলিয়া পরিগণিত হইত; ধর্ম্মভাবের ভাবুক হইয়া সামাজিকতায় পটু হইলেও তখন সংসার পরিচালনের ভাবনা থাকিত না—লেখাপড়া যত হউক আর নাই হউক। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে এ সকল গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক হইত, নতুবা অন্যান্য জাতিসকলের নিকট তাঁহার মান-মর্য্যাদা, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বজায় থাকিত না, এইজন্য তাঁহার স্বভাব অভিযোগেও কোনপ্রকার সাহায্য পাওয়া মহাদায় হইত। নৃসিংহদাস যখন দেখিলেন—বালকের লেখাপড়ায় তত মতি নাই; তখন যাহাতে সে উত্তরকালে জীবন-সংগ্রামে কোনপ্রকার কষ্ট না পায়, যাহাতে তাহার সংসারযাত্রা ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্য দিয়া একপ্রকার সুখে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, সেইরূপ দশকর্ম্মান্বিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল না, যৌবন-কালেই, তুলসীদাসের বালকত্ব ঘুচিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দশকর্ম্মে বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্ম একপ্রকার "চলন-সই" রকমে সমাধা করিতে বেশ পারক হইয়া উঠিলে, নৃসিংহদাস

তাহাকে শিষ্য-যজমানের গৃহে সময়ে সময়ে কার্য্য করিতে পাঠাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, যুবকও অতিশয় ভক্তির সহিত তাহাদের কাজকর্ম্মে পৌরোহিত্য করিয়া বেশ সুনাম অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পুত্র কাজের লোক হইলে, সে শিষ্যশাবক রক্ষায় পারদর্শী হইলে পিতা আত্মারাম দ্বিবেদীও নিজের শিষ্য-যজমানের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন।

তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন নিশ্চিন্ত মনে পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, নিজের নিতান্ত আপনার জন রাম রঘুনন্দন ইষ্টদেবের পদে মতি স্থির করিতে, পঞ্চাশ বৎসরের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া সংসারের যাবতীয় জঞ্জালজাল কাটাইতে চেষ্টা করিলেন। জননী হুলসী দেবী বড়ই পতি-পরায়ণা ছিলেন, স্বামীকে সংসারে বীতস্পৃহ দেখিয়া তিনি অনন্যমনে তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে, পরকাল চিন্তার পথে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

পতির ধর্ম্মকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্যই স্ত্রী চিরকাল সহধর্ম্মিণী-নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। হুলসী দেবী এখনকার স্ত্রীলোকের মত সে নামে অপযশ ঘোষণা না করিয়া যথার্থ ধর্ম্মপত্নীরূপে আত্মারামের মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন।

স্বামীর যাবতীয় অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া যেটুকু সময় পাইতেন; সেইটুকু সময় সন্তানবৎসলা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য দেবদেবীগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া কাটাইতেন। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুলসীদাস জানিতে পারিলেন কেন, তিনি জনক-জননীর দ্বারা প্রতিপালিত না হইয়া তাঁহাদের কুলগুরু নৃসিংহদাসের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন। পিতা-মাতার কি কর্ম্মভোগ, গ্রহ-বৈগুণ্যে

তাঁহাদের কি মনঃকষ্ট বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মভীরু বালক সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ দূরীকরণের জন্য শরীরের যাবতীয় শক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদের তুষ্টি-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি নৃসিংহদাস কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলেও পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের ক্রটী করিতেন না। পিতামাতা ও নৃসিংহদাস যুবকের সুললিত স্বভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। বালক লেখাপড়া শিখিল না—হয়ত কুচরিত্র হইবে, পিতামাতা ও পালনকর্ত্তার নামে কলঙ্ককালিমা মাখাইবে, এই ভয়ে তাঁহারা বড়ই ভীত হইয়াছিলেন কিন্তু হৃদয়দেবতা ভগবান রামচন্দ্র তাঁহাদের সে ভাবনা দূর করিয়াছেন। বালককে সৎপথগামী করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? সৎস্বভাব-সম্পন্ন ধার্ম্মিক পুত্রের পিতা হইতে পারা যে দেবতার অতুলনীয় আশীর্ব্বাদ, তাহা কে না স্বীকার করিবে, কয়জনের ভাগ্যে আজকাল এ সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে?

তুলসীদাস যাহার তাহার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন না, প্রতিবেশীমণ্ডলে কোন বালকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য না থাকিলেও দুঃখারামের সহিত তাঁহার যেরূপ প্রাণের মিল ছিল, এমন আর কাহারও সহিত ছিল না। একত্র আহার, একত্র ভ্রমণ, একত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যসম্পাদনে দুইটি যুবক যেন এক হইয়া গিয়াছিল, একটীর অদর্শনে আর একটী যারপর নাই কষ্ট অনুভব করিত। আজীবন সংসর্গের পর মানব এইরূপেই আপনার হইয়া যায়, ইহাকেই আমরা বন্ধুত্বের আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করি।

প্রতিদিন স্নানের পর তুলসীদাস পিতামাতা ও গুরুদেবের চরণবন্দনা করিয়া তবে অন্য কাজে বাহির হইতেন। শিষ্য-যজমানের

বাটী পূজা করিতে যাইবার সময় তুলসীদাস সকলের অগ্রে এই কাজ সমাধা করিয়া হৃদয় আনন্দ-আপ্লুত করতঃ তবে অন্য কার্য্যে গমন করিতেন, ইহাতে তাঁহার দেবার্চ্চনায় বেশ মন লাগিত, হৃদয় ভক্তি-রসে ভরিয়া যাইত। যজমানের বাড়ীতে বেশী কাজকর্ম্ম পড়িলে তুলসীদাস বন্ধু দুঃখীরামকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং উভয়ে মিলিয়া কাজ সুসম্পন্ন করিতেন। তুলসীদাস কেবল স্বার্থসিদ্ধির দিক দিয়া পূজা করিয়া চালকলা আহরণ, দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না, সাত্ত্বিক ভাব তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, সেই ভাবেই তিনি পূজা করিতেন, তাই শিষ্য যজমানেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, তাঁহাকে পূজা করিতে আসিতে দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইত। দুই একটী ঘরের পূজা ভিন্ন যুবক তুলসীদাস দক্ষিণা লাভের জন্য বহু ঘরের পূজায় ব্রতী হইতেন না। পূজা ত আর বালকের ক্রীড়া নহে, যে মন্ত্রহীন পূজা করিয়া যজমানের অমঙ্গল করিবেন? এইজন্যই সময়ে সময়ে তাঁহার প্রিয়বন্ধু দুঃখীকে সঙ্গে লইতে হইত।

আত্মারামের বয়স হইয়াছে, ক্রমশঃ শরীর ভগ্ন হইতেছে; জরা-ব্যাধি ক্রমশঃ বার্দ্ধক্যের বিধানানুসারে তাঁহার দেহপিঞ্জর অধিকার করিতেছে; আর বেশীদিন জীবিত থাকিবার আশা নাই। আত্মারাম পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া তাহার শারীরিক অবস্থার কথা বলিলেন, গুরুদেব তুলসীকে সে বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিলেন; হুলসী দেবী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যখন পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে, আর গুরুদেব নিকটে রহিয়াছেন, তখন তাঁহার চিন্তার কারণ কি? এ পাঞ্চভৌতিক দেহ ত একদিন না একদিন কালের কোলে মিশিয়া যাইবে, তথাপি স্ত্রী হইয়া, অর্দ্ধাঙ্গিনী সতী হইয়া কে কবে স্বামীর দেহত্যাগ কল্পনা করিয়া সুস্থির থাকিতে পারিয়াছে?

হুলসী দেবী স্বামীকে জরামৃত্যুর কবলস্থ দেখিয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিলেন। তুলসীদাস পিতার অন্তিম-সময় উপস্থিত দেখিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন, গৃহস্থের নিয়মানুসারে চিকিৎসাও করাইলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, দুরন্ত কাল কোন বাধাই মানিল না। একদিন শীতের অপরাহ্নে, সূর্য্যোদেব যখন পাটে বসিতেছেন, দক্ষিণায়ণ উত্তীর্ণ হইয়া যখন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তে আত্মারাম আত্মজনে ফাঁকি দিয়া, হৃদয় মধ্যে আত্মারামে আত্মসমর্পণ করিয়া, পার্থিব পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করতঃ শ্রীরামের পদতলে বিলীন হইলেন।

নৃসিংহদাস প্রিয় শিষ্য আত্মারামের মৃত্যুতে বড়ই কাতর হইয়াছিলেন কিন্তু তুলসী ও হুলসীর মুখ চাহিয়া তিনি শোক সম্বরণ করিলেন। প্রিয় শিষ্যের ঔর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শবদেহ তুলসীতলায় রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে রামনাম অঙ্কিত করিয়া দিয়া "রাম নাম সত্য" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন।

অনেকে বলেন—তখনকার নিয়মানুসারে হুলসী দেবী হাসিতে হাসিতে স্বামীর শবদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া সহমৃতা হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও পুস্তকে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এজন্য হুলসী দেবী যে একমাত্র পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া এবং স্বামীর অনুমতি "তুমি তুলসীকে সংসারী করিয়া তবে আমার নিকট আসিও" এই বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্য আরও কিছুদিন জীবিতা ছিলেন—আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলাম। শব যথাবিধি সৎকার করিয়া সকলে বাড়ী ফিরিলেন। নৃসিংহদাস নিজের অবস্থানুসারে পালকপুত্র তুলসীদাসকে অশৌচ মুক্ত করাইলেন।

স্বামী স্বর্গগত হইলে হিন্দুস্ত্রী আর তাঁহার জীবনে তত আস্থা স্থাপন করেন না। যাঁহার জন্য এ নারীজন্ম, তিনিই যখন চলিয়া গেলেন, তখন আর জীবনে সুখ কি? তবে থাকিতে হয় তাই থাকে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বিনী হইয়া যতদিন না দেহের অবসান হয়, ততদিন ত থাকিতেই হইবে, তাই জীবন্মৃত হইয়া পুত্রকন্যা প্রতিপালন করিবার জন্য এক প্রকার জীবন ধারণ করে। হুলসী দেবীও সেইরূপ মন-মরা হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এখন ত আর তাঁহার মরণে ভয় নাই, তাই গুরুদেবের আদেশে পুত্রকে নিকটেই রাখিলেন। কিছুদিন পরে জননীর বাৎসল্যে, গুরুদেবের যত্নে, বন্ধুবর্গের সান্ত্বনাবচনে তুলসী পিতার দুর্ব্বিসহ শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু সংসারবিরাগী, শোক-দুঃখ মোহের অতীত, নৃসিংহদাস [illegible] পুত্রসম শিষ্য আত্মারামের শোকে দিন দিন বড়ই কাতর, বড়ই মুহ্যমান হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি ত্যাগী হইয়াও আত্মারামের ন্যায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি শিষ্যের জন্য ভোগী-সংসারী হইয়া, এতদিন বান্দাজেলার এই নিভৃত পল্লীতে বাস করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রিয় শিষ্যের অভাবে তাঁহার এ আবাস যেন কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে আত্মারামের সেই সৌম্যমূর্ত্তি মনে পড়িয়া নৃসিংহের ন্যায় সংযমী মহাপুরুষের হৃদয়ও চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি এইবার মহাপ্রস্থান করিয়া আত্মারামের নিকট উপস্থিত হইবার প্রয়াস পাইলেন, হিমালয়ের পাদদেশে তাঁহার চিরশান্তিময় আশ্রমে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। প্রিয় শিষ্য আত্মারাম ছাড়া নৃসিংহ কখনই এ অন্ধকার পুরে থাকিতে পারিবেন না; এই জন্য কাহাকেও কোন কথা প্রকাশ না করিয়া, অন্তরের ইচ্ছা অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়া নৃসিংহদাস

যুবক তুলসীদাস ও তুলসী দেবীকে সংসারের পথে পাকা করিয়া দিবার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস চিরকালই আমোদপ্রিয়, জননী ও গুরুদেবের আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইয়া বন্ধু দুঃখী তেওয়ারীর সহিত বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুত্রকে নিকটে পাইয়া, আত্মকে আত্মারামের দর্শনলালসা মিটাইয়া, তাঁহার স্মৃতির পূজা করিয়া সতীও একপ্রকার দুঃখ কষ্টে কাল কাটাইয়া দিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ

উপযুক্ত শিষ্য—পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়। নৃসিংহদাস ত্যাগী, ভক্ত, উন্নতমনা, সাধনমার্গে উচ্চাসনপ্রাপ্ত প্রিয় শিষ্য আত্মারামের বিরহে বড়ই কাতর হইলেন। কাহারও কাছে কোন কথা প্রকাশ না করিলেও কার্য্যগুণে মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত। যাহাকে লইয়া এতদিন তিনি সংসারবিরাগী হইয়াও গৃহস্থের আচারব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপে পুনরায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ তাঁহার বিহনে আবার সমস্তই শিথিলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

স্বামীশোকাতুরা জনননীর মলিন বদন এবং মায়ামোহের অতীত, পরম জ্ঞানী উদাসীন শ্রীগুরু নৃসিংহদাসের শিষ্য বিয়োগে সকল বিষয়ে মায়াহীনতা, কাতরতা, তুলসীদাসকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিত। যতক্ষণ বাহিরে বাহিরে দুঃখীর সহবাসে কাল কাটাইতেন, ততক্ষণ শোকের দারুণ বহ্নি তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতে পারিত না। কিন্তু

যখনই গৃহে আসিয়া তাঁহাদের শোকের অবস্থা সন্দর্শন করিতেন, তখনই যেন সেই দেবোপম পিতৃমূর্ত্তি তাঁহার নয়নের সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইত। পিতার বিরহ শোক নবীভূত হইয়া, অন্তর কন্দরে দারুণ বৃশ্চিক দংশনের যাতনা আনিয়া তাঁহার ধীর প্রকৃতিকে বিষম বিচঞ্চল করিয়া ফেলিত। তুলসীদাস তখন আর বাটীতে অবস্থান করিতে পারিতেন না, গৃহত্যাগ করিয়া বন্ধুর সহবাস-সুখ উপভোগ করিতে পুনরায় দুঃখীর বাড়ী দৌড়িয়া যাইতেন।

দুঃখীর বাটীতে কেহ ছিল না; অতি শৈশবে পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর এক দূর সম্পর্কীয়া মাতুলানী আসিয়া তাহার প্রতিপালনের ভার লইয়াছিল; দীনদয়াল ও তদীয় পত্নীর মৃত্যুর পর দুঃখী ইঁহারই দ্বারা প্রতিপালিত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তখন ভারতবর্ষে সংসার পরিচালনের জন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইত না। দীনদয়ালের যে যৎসামান্য জমীজমা ছিল, তাহারই আয়ে মাতুলানীও ভাগিনেয়ের ভরণ-পোষণ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চালাইয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। তারপর দুঃখী বড় হইলে, তাহার উপনয়ন ক্রিয়া সমাধা হইলে সে তুলসীদাসের সহিত যাজ্য ক্রিয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সহায়তা করিত। এইরূপে সুখে দুঃখে, দুঃখীর সংসার একপ্রকার হাসি খেলায় চলিয়া যাইত।

তুলসীদাস ও দুঃখী তেওয়ারীতে এক প্রাণ, এক আত্মা। প্রকৃত বন্ধুত্ব হইলে যেরূপভাবে দুইটি আত্মা একত্র বদ্ধমূল হয়; উভয়ে সুখ—দুঃখ, আপদ—বিপদ অনুভব করে, এই দুইটি যুবকের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ প্রাণের প্রণয়ভাব উদ্দীপিত হইয়া উভয়কে এই দারুণ দুঃখের মধ্যে আনন্দের আসন প্রদান করিয়াছিল। তুলসীদাস জননীর করুণ আর্ত্তনাদে গৃহে তিষ্ঠিতে না পারিলেই

দুঃখীর ভবনে পলায়ন করিতেন; এমন কি, দুই একদিন তথায় রাত্রিবাসও করিতেন। পতি-বিরহ-বিধুরা জননী, রাত্রে পুত্রকে কাছে না দেখিয়া সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিতেন, কিছুতেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে অঞ্চলের ধন তুলসী গৃহে আসিলে আবার তবে আহারাদির উদ্যোগ করিতেন। তাহার আসিতে বিলম্ব হইলে, জননী গুরুগৃহে দৌড়িয়া যাইতেন এবং "তুলসী কোথায়" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

নৃসিংহদাস তুলসীর ভাবগতিক দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন, এ সময় যদি সে বিগড়াইয়া যায়, যদি গৃহত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি হুলসীকে লইয়া মহা বিব্রতে পড়িবেন, তাঁহার মনের অভি-লাষ পূর্ণ হইবে না। তাহাদের মায়ায় পুনরায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। আত্মারাম যেরূপে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, হুলসী দেবীও বুঝি তাহাকে সেই-রূপ বাঁধিয়া রাখে! অতএব তুলসী যাহাতে আর গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র রজনী যাপন না করে—মায়ের অঞ্চলের নিধি, তাঁহার অঞ্চল ধারণ করিয়া, তাঁহার অনুগত হইয়া যাহাতে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করে. সে বিষয়ে আর উদাস থাকিলে চলিবে না। দুঃখিনী হুলসী দেবী যে বজ্রসম শোক পাইয়াছে, তাহার উপর পুত্রের অদর্শন তাহার অসহ্য হইলে, কি জানি অভাগিনী কি করিতে কি করিয়া ফেলিবে। এই সময় তুলসী যাহাতে গৃহে স্থায়ী হয়, সংসারী হইয়া জননীর সেবা করে—তাহার উপায় করিতে হইবে। নৃসিংহদাস এরূপ উপায় চিন্তা করিয়া গোপনে তুলসীদাসের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিলেন। শিষ্যানী হুলসীর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে তিনি অতি সন্তুষ্ট চিত্তে সে বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন

করিলেন। পুত্র সংসারী হইবে—একটি সুন্দরী নববধূ আসিয়া তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণ আলোকিত করিবে, ইহাতে কোন জননী অনভিমত প্রকাশ করেন?

তুলসীদাসের বংশ খুব সম্ভ্রান্ত এবং সে সময়ের হিসাবে সম্পত্তিশালীও কম নহে। গুরুদেবের শিষ্য-যজমানের পাওনা-গণ্ডা তাহার সমস্ত হইয়াছে, আর পিতার ত আছেই, এ অবস্থায় তাঁহাদের সংসার খুব স্বচ্ছলে চলিয়া যায়। তুলসী দশ কর্ম্মেও বেশ সুপণ্ডিত এবং সুকর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় তাঁহাকে কন্যাদান করিতে, এরূপ সর্ব্বগুণযুক্ত পাত্রকে জামাতা করিতে কার না ইচ্ছা হইবে? নৃসিংহদাস গোস্বামী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি অনেক স্থানে তুলসীদাসের জন্য অনেকগুলি কন্যা দেখিলেন কিন্তু কোনটিই তাঁহার মনোমত হইল না, শেষে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ দুঃস্থ শিষ্য দীনবন্ধু পাঠকের রূপবতী কন্যার সন্ধান পাইলেন, দীনবন্ধু দরিদ্রতা প্রযুক্ত কন্যাদায়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কন্যা রত্নাবলী অত্যন্ত বয়স্থা হইয়া পড়িয়াছে, আর বিবাহ না দিলে চলে না কিন্তু দীনবন্ধু কোথায় কি পাইবে, কন্যাদায়ে সামান্য অর্থও ত আবশ্যক? ব্রাহ্মণ আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন, এমন সময় নৃসিংহদাস তাঁহাকে ডাকিয়া তুলসীর সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তুলসীদাসের ন্যায় সৎপাত্রে যে তাহার কন্যাদান ঘটিবে—ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; এজন্য পুলকিত চিত্তে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া পাঠক মহাশয় গুরুদেবের কথায় স্বীকৃত হইয়া বলিলেন—প্রভু! আমার ত কিছুই সংস্থান নাই, তুলসীদাসের জননীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারিব কেন?

নৃসিংহদাস কন্যাদায়গ্রস্ত শিষ্যকে অভয় দিয়া বলিলেন—আগামী শুভলগ্নে বিবাহের আয়োজন কর, হুলসী দেবীকে সম্মত করা আমার ভার রহিল।

রত্নাবলীর রূপ কাঁচাসোনার মত, দরিদ্রের কন্যা বলিয়া তাহার গুণও যথেষ্ট ছিল।

নৃসিংহদাস গণনা করিয়া দেখিয়াছেন—রাজযোটক মিলন হইয়াছে, উত্তরকালে পতিপত্নী ধর্ম্ম-ধনে বিশেষরূপে ধনী হইবে, তবে আর কালবিলম্ব কেন? গুরুদেব হুলসীদেবীকে সমস্ত কথা বলিলে—তিনি আর তাঁহার কথায় দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না।

হুলসী দেবীও পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে একটি নববধূ আসিয়া তাঁহার ঘর আলো করিবে, সুখে দুঃখে তাঁহার সহায় হইবে, সেবা শুশ্রূষা করিবে, পাত্রী রূপসী হইলে তাঁহার তুলসীও গৃহবাসী হইবে—সে যে বড় সৌন্দর্য্য প্রিয়। কোন বস্তু সুন্দর দেখিলে সে যে একেবারে মোহিত হইয়া পড়ে; স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, কোন সুন্দর মুখ দেখিলে সে যে সহজেই তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে, প্রিয় বন্ধু দুঃখীর সুন্দর মুখ দেখিয়াই ত তুলসী তাহার সহিত এরূপ বন্ধুত্ব করিয়া মজিয়া গিয়াছে। গুরুদেব বলিয়াছেন—পাত্রীর রূপ কাঁচাসোনার মত, সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্না, অঙ্গ সৌষ্ঠব ও নিখুঁত, তবে পাত্রীর পিতা অতি দরিদ্র, কিছু দিতে পারিবে না। নাই বা দিতে পারিল, যাহার অর্থ নাই, তাহার কি কন্যার বিবাহ হইবে না? জননী গুরুদেবের কথায় তুলসীদাসকে বিবাহবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। তুলসীদাস জানিতেন—সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে সহধর্ম্মিণীর সাহায্য আবশ্যক। এখন

না হয় জননী আছেন কিন্তু পিতার ন্যায় তিনিও যখন ইহসংসার ত্যাগ করিবেন, তখন ত সাহায্যকারিণী একজন পাকা গৃহিণী ত এই সংসার-তরণীর দাঁড় ধরিবার জন্য আবশ্যক হইবে? যে গৃহে গৃহিণীর শীতল হস্তের স্পর্শ নাই, সে গৃহ ত শ্রীহীন, শোভা সৌন্দর্য্য তাহার কোথায়!

যখন সাক্ষাৎ দেবীসমা জননী ও পরম পূজনীয় পালনকর্ত্তা গুরুদেব এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেছেন, তখন আর ভিন্ন মত করা উচিত নহে। দুঃখীরামও এ সময় আসিয়া যোগ দিল, সেও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বলিল—ভাই তুলসী! ইহাঁদের কথা অবহেলা করিও না। তুলসীদাস আর কোন কথা কহিলেন না।

একদিন শুভক্ষণে শুভলগ্নে দীনবন্ধু পাঠকের রূপবতী কন্যা রত্নাবলীর সহিত তুলসীদাসের শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পুত্র বধুর অলোক সামান্য রূপ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, পুত্রের ভাবী সংসার-অনাশক্তির মুলচ্ছেদ হইল ভাবিয়া হুলসী দেবী মনে মনে সুখী হইলেন। রূপের মোহে এ জগতে মুগ্ধ নয় কে? আজন্ম রূপ-সৌন্দর্য্যের ভিখারী তুলসীদাস সুখী হইলেন, বয়স্থা রূপসী অর্দ্ধাঙ্গিণী লাভ করিয়া তিনি পূর্ণমাত্রায় সংসারী হইয়া পড়িলেন। এইবার পুত্রের সংসার ত্যাগের ভাবী আশঙ্কা মায়ের মন হইতে বিদূরিত হইল। হুলসী দেবী আবার সকল উৎকণ্ঠা দূরে ফেলিয়া পুত্র ও পুত্রবধু সহ পূর্ব্বের ন্যায় সংসার করিতে লাগিলেন।

নৃসিংহদাস হুলসী দেবীর ভাব দেখিয়া এবং তিনি পুত্র ও পুত্রবধু পাইয়া স্বামী শোক অনেকাংশে ভুলিতে পারিয়াছেন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি দ্বিবেদীর বংশপরম্পরাগত গুরু, আত্মারাম সস্ত্রীক তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুলসী ও

রত্নাবলীকে দীক্ষিত করিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন, এ মায়াময় সংসারে আর থাকিবেন না। যাহার মায়ায় মোহিত হইয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী সাজিয়াছেন; যাহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য তিনি ত্যাগী হইয়াও ভোগ-বিলাসে এত-কাল কাটাইয়াছেন, এখন সেই প্রিয়শিষ্য আত্মারাম ত আর নাই, তবে আর কাহার জন্য এ বন্ধন। এক্ষণে স্বর্গগত আত্মারামের পুত্র ও পুত্রবধূকে দীক্ষিত করা তাঁহার কর্ত্তব্য, কারণ তাহা না হইলে তুলসীর চিত্তস্থির হইবে না; তাহার ভবিষ্যজ্জীবন যে খুব সমুজ্জল, নৃসিংহদাস তাহা পূর্ব্ব হইতে জ্যোতিষের দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন।

রত্নাবলী বয়স্থা হইয়াই বিবাহিতা হইয়াছে, তারপর একবৎসর হইল—তাহার কন্যাকালও উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব এই সময়ে তাহা-কেও তুলসীর সহিত দীক্ষিতা করিতে পারা যায়, এইরূপ স্থির করিয়া নৃসিংহদাস তুলসীর নিকট তাহাদের দীক্ষাদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। নৃসিংহদাস তাহাদের সকল বিষয়ের কর্ত্তা, তাঁহার কথার অন্যথা করা কাহার সাধ্য নহে। ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয় তিনি যাহা বলিবেন—তাহার উপর আর কথা কি? হুলসী দেবী অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহা শিরোধার্য্য করিলেন।

তুলসীদাস বহুদিন হইতেই অন্তরে মন্ত্র গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পরিপোষণ করিতেছিলেন কিন্তু নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হওয়ায় এতদিন তাহা গুরুর নিকট প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সস্ত্রীক দীক্ষিত হইবেন—গুরুদেব ও জননী আদেশ করিয়া-ছেন শুনিয়া তুলসীদাস বড়ই পুলকিত হইলেন।

শুভদিন স্থির হইলে নৃসিংহদাস তুলসী ও রত্নাবলীর ক

তাঁহাদের কুলমন্ত্র "রাম নাম" প্রদান করিলেন। তুলসীদাসের কর্ণের মধ্য দিয়া যখন সেই স্বর্গীয় সুধার আধার কুলমন্ত্র মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল, ভক্তিবান তুলসীদাস তখন পুলকিত চিত্তে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সিদ্ধ সাধক নৃসিংহদাসের ন্যায় গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া, সেই দ্বিঅক্ষরযুক্ত সিদ্ধ রামমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তুলসীদাসের দেহ অনবরত ভক্তিরসে কণ্টকিত হইতে লাগিল, ভক্তির অত্যধিক আবেগে তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইবার উপক্রম করিলেন, গুরুদেব যুবকের ভক্তি-ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইল, কালে এ বীজ হইতে যে ফলবান বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে, এক সময়ে তাহার দ্বারা পৃথিবীর মহৎ উপকার সাধিত হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। সতী রত্নাবলীও গুরুমন্ত্র লাভ করিয়া প্রাণপণে ভক্তিভরে সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু পাঠক কন্যা—জামাতার দীক্ষার দিন উপস্থিত ছিলেন, তিনিও উভয়ের ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ই পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। হুলসী দেবীর মনও সে আনন্দে নাচিয়া উঠিল, পুত্র-কন্যা সৎপথগামী হইলে পিতামাতার মন স্বভাবতই এইরূপ হইয়া থাকে।

এইবার নৃসিংহদাসের সকল দিক মুক্ত হইল, তাঁহার সকল কর্ত্তব্য শেষ হইল দেখিয়া কয়েক মাস পরে তিনি তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চিরকাল একস্থানে বসিয়া কাটাইলে আমার পারত্রিক কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে; তোমরা আর আমাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিও না; আমি এইবার এ স্থান ত্যাগ করিব। বান্দাবাসী সকলেই তাঁহার শিষ্য না হইলেও এই যোগীবরকে সকলেই মান্য করিত, তাঁহার স্থান ত্যাগের কথা

শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইল। হুলসী, তুলসী ও রত্নাবলী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, দীনবন্ধু পাঠক তাহার গতি কি হইবে ভাবিয়া, গুরুদেবের পদে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—চিন্তা করিও না, ধর্ম্মপথে থাকিলে ভগবান রাম-চন্দ্র তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করিবেন। যে মন্ত্র তোমাদের প্রদান করিয়াছি, নিষ্ঠাভরে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাহা জপ করিলে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। "রাম নামে" জীবের সকল আপদ-বিপদ বিদূরিত হয়।

নৃসিংহদাস এইরূপে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, আগত-অভ্যাগত সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়া একদিন প্রাতঃকালে রাজা-পুর গ্রাম ত্যাগ করিলেন। পাখী মায়ার শিকল কাটিয়া উড়িয়া গেল, পুনরায় ধরা দিবার আশা দিয়া গিয়াছে কিন্তু প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে মায়া-শিকল কাটিয়া পাখী উড়িলে কি আর স্বইচ্ছায় ধরা দেয়, মায়ামুক্ত সাধু পুরুষ একবার পলাইতে পারিলে আবার কি ফিরিয়া আসিবেন? ইহাই তাঁহার শেষ দর্শন ভাবিয়া সকলে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রণয় সঞ্চার

"বিয়ে করলে ঘর চলে না" এই প্রবাদ-বাক্যটী সকল দেশেই সমানভাবে প্রচলিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যখন সংসারে বেশী লোকজন থাকে না—কাজকর্ম্মের জন্য লোকের অত্যন্ত অভাব হয়—তখন গৃহিণী বা কর্ত্রী হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর দ্বারা সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখেন—পুত্র পরিজনের সেবা শুশ্রূষায় দেহপাত করেন কিন্তু যখনই একটী হাত নুড়কুৎ ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়—অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদির বিবাহ হইয়া একটী বধূ ঘরে আসে, তখন আর তিনি একাকিনী থাকিতে চাহেন না—সেই সাহায্য-কারিণী রমণীটী কাছে না থাকিলে—তাহার সংসার-কার্য্য যেন আর ভাল লাগে না। সে সাহায্যকারিণীটী যদি আবার বয়স্থা বা উপযুক্তা হন—তাহা হইলে ত কথাই নাই; তাহাকে ছাড়িয়া থাকা যেন তখন দায় হইয়া উঠে।

সৌভাগ্যক্রমে তুলসী দেবী বয়স্থা একটী বধূ পাইয়াছেন—এতদিন পরে তাঁর প্রাণের তুলসীর বিবাহ হইয়াছে। বধুটী সুরূপা এবং কর্ম্মিষ্ঠা, রূপের কাঙ্গাল তুলসী বধুটীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, সে এতদিন গৃহবাসী হইবে না—সংসার করিবে না বলিয়া একপ্রকার ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, বিবাহের পর যখন সে বধুর রূপগুণে মোহিত হইয়াআবার সংসার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে, তখন আর কেন বধুটীকে বাপের বাটী ফেলিয়া রাখা উচিত নয়?

তুলসী দেবী একটী শুভদিন দেখিয়া বধূটীকে ঘরে আনিলেন। তাঁহার ত বয়স হইয়াছে—কোন্‌দিন শমন দূত আসিয়া তাঁহার মহা প্রস্থানের হুকুম জারি করে—এই সময় বধূটীকে সংসারকার্য্যে সুনিপুনা করিয়া যাইতে পারিলে, ছেলেটার পক্ষে অনেক ভাল হয়, বধূটী দুঃখের সংসার সুখে চালাইতে পারিলে ভবিষ্যতে তুলসীকে আর সংসার-সংগ্রামে হাবড়াইয়া পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হইবে না। স্ত্রীলোকই ত সংসারের সার—তাহার হাতেই ত ইহার উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিতেছে? পুরুষ যতই অবুঝ হউক, স্ত্রী সুবুদ্ধি সম্পন্না, পাকা হইলে সংসারের সকল কষ্ট নষ্ট হইবে; তিনিও ত অতি অল্প বয়সে স্বামীর ভাঙ্গা সংসারে ঢুকিয়া কেমন সুন্দরভাবে তাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—কালে তাহাকে কেমন সুখের আস্পদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সকল চিন্তা করিয়া তুলসী দেবী রত্নাবলীকে হাতে ধরিয়া সমস্ত গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তুলসী চিরকালই সৌন্দর্য্য প্রিয়, ভাল চেহারার লোক দেখিলে সে আগেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া বসে—কাছে কাছে থাকিয়া তাহার সহিত সদ্ভাবের আদান প্রদানে আত্মীয়তা করিয়া ফেলে। সে নিজে বড় রূপবান - তাই রূপের সহিত মাখামাখি করা তাহার অত্যন্ত অভ্যাস—এই রূপের জন্যই দুঃখীরামের সহিত তাহার এত সৌহৃদ্য।

যেদিন হইতে রত্নাবলী গৃহে আসিয়াছেন, সেইদিন হইতে তুলসী আর বাড়ী ছাড়া হন না—রাত্রে পরের বাড়ী শুইতে যান না। অনবরত ঘরেই থাকেন, ঘরের কাজকর্ম্ম করেন, বাজারে যাওয়া—জিনিষপত্রাদি খরিদ করা, মজুর লইয়া বাগানের আওলাৎপত্র দেখা

প্রভৃতিতে মন দিয়াছেন, যজমান বাড়ী কাজকর্ম্ম পড়িলে বন্ধু দুঃখীরামের সহিত তাহা আগ্রহের সহিত সম্পাদন করিতেছেন। অর্থের আবশ্যক হইয়াছে—এখন ত আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না? তবে যজমান বাড়ীর পাওনা-গণ্ডা তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধু দুঃখীরামকে কিছু কিছু দিতেন—যাহাতে তাহার সংসার চলে। তুলসী-দাস সে বিষয়ে একদিনও কৃপণতা বা টানাটানি করেন না। পরোপকার যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম—তাহা তিনি বিশেষ করিয়া গুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন। চরিত্রই মানবের অমূল্য সম্পত্তি—ইহার অপব্যবহারে মানুষ যে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়—নৃসিংহদাস তাহা তাহাকে প্রাণপণে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—তাঁহারই শিক্ষাগুণে তুলসীর চরিত্র চিরদিন নির্ম্মল—খাঁটী সোনা।

পুত্রকে সংসার কার্য্যে এরূপভাবে মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া জননীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। দুঃখীও তাহার মাতুলানী তুলসীদাসকে সংসার কার্য্যে মত্ত হইতে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। তুলসীদাসের খাইয়াই যে তাহারা মানুষ; কোন কিছু ভাল দ্রব্য পাইলে তিনি যে তাহাদের না দিয়া খান না—এ হেন পরমোপকারী সংসারবিরাগী বন্ধুকে বিশেষভাবে সংসার কার্য্যে মত্ত হইতে দেখিলে কার না আনন্দ হয়?

যাজ্যক্রিয়াই তুলসীদাসের উপজীবিকা—রাজাপুর গ্রামের অধি-কাংশ ব্রাহ্মণই তাঁহার যজমান—কাজেই ইহাদের পৌরহিত্য করিয়া তুলসীদাসের সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত; সঙ্গে সাথে থাকিয়া দুঃখীরামেরও কোন অভাব হইত না। প্রতিদিনই যজমান বাড়ী দুই একটী কাজকর্ম্ম ত থাকিতই; পূজা পার্ব্বণে তাহা এত বেশী হইত যে দুইজনে সমস্তদিন যজমান বাড়ী ঘুরিলেও

ফুরাইত না—দুই একজন নূতন লোকও নিযুক্ত করিতে হইত।

এইসকল কাজকর্ম্ম সারিয়াও তুলসীদাস প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন—শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, দেবদেবীর বিষয়ে জ্ঞানলাভ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। নূতন নূতন শাস্ত্রপাঠে তাঁহার আনুরক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তখনকার দিনে যেখানে যত নূতন পুঁথি পাওয়া যাইত—তুলসীদাস তাহা সংগ্রহ করিতে ছাড়িতেন না। অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন—তারপর ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া আহারাদি করিতেন।

বধূমাতা উপযুক্ত হওয়ায় হুলসী দেবী সংসার কার্য্যে একটু আসান পাইয়াছেন। এখন আর তাঁহাকে তত খাটিতে হয় না—সমস্তই রত্নাবলী অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়া শাশুড়ীর প্রীতি সম্পাদন করেন। এই সামান্য দিনের মধ্যে রত্নাবলী সংসারকার্য্যে বেশ সুনিপুণা হইয়াছেন। পাড়ার অপরাপর স্ত্রীলোকেরা তাহা দেখিয়া খুব তারিফ করে—শিক্ষয়িত্রীর বাহাদুরী দেয়। পাকা হাতের প্রাণখোলা শিক্ষা না পাইলে কি একজন নূতন লোক এই সামান্য দিনের মধ্যে এমন কর্ম্মকুশলা হইতে পারে?

পুত্রবধূর প্রশংসা শুনিয়া শাশুড়ীর প্রাণ পুলকিত হইত। এবার থেকে বৌমা যে নিজে সংসার করিতে পারিবে—করণীয় অকরণীয় বুঝিয়া লইতে পারিবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই; কাজেই তিনি এখন একটু অবসর লইয়া আপনার পরকাল চিন্তায় মন দিয়াছেন, প্রাণারাম রামনাম জপে এখন দিবসের অধিকাংশ সময় যাপন করিতেছেন।

সংসারের রন্ধন—স্বামীর পরিবেশন, তিনি কিসে সুখী হন, কিসে না হন, প্রভৃতি দর্শন, এখন রত্নাবলীরই কার্য্য হইয়াছে। বধূ উপযুক্তা হইলে শাশুড়ী আর সংসার কার্য্যে তত অগ্রসর হন না। রত্নাবলী একে স্বরূপা-সুন্দরী—তাহাতে নূতন যৌবনের প্রবল তরঙ্গে আবার সে রূপের সৌন্দর্য্য এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে দেখিলে নয়ন ফিরান যায় না—কামভাবে দেখিলে—ইহা প্রখর অগ্নিশিখার ন্যায়; আর জননী ভাবে দেখিলে—ইহা অতি রমণীয়, কমণীয়—বাৎসল্য ভাববিশিষ্ট। রত্নাবলীর রূপের ঔজ্জ্বল্য আছে—কিন্তু তীব্রতা নাই; সে বঙ্কিম নয়নে কাম কটাক্ষ নাই, অতি মধুর স্নিগ্ধোজ্জল—শান্তভাব, দেখিলে কামের বদলে প্রীতি-ভক্তির উদ্রেক হয়।

রূপের পাগল তুলসীদাস প্রণয়িণীর এই রূপ দেখিয়া—তাহার রমণীয় বরাঙ্গে যৌবন ভাতি বিভাসিত দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এত রূপ—এত গুণ, তথাপি অহঙ্কার নাই—তাঁহার এই বৃহৎ সংসারে আসিয়া—সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া রত্নাবলী একদিনের জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেন না—একদিনের জন্য কোনপ্রকার অভাব অভিযোগ তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না; দরিদ্র পিতার ঘরে প্রতিপালিতা সতী, স্বামীর স্বচ্ছল সংসারে আসিয়া স্বভাবের কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য করেন নাই—যা পান তাই খান—যা পান তাই পরেন; মরি মরি—এমন স্ত্রী না হইলে কি তাহার দ্বারা সংসার উজ্জ্বল হয়; এমন কর্ম্মকুশলা পত্নী না হলে কি হিন্দুর সংসার লক্ষ্মীর আবাস ভূমি হইয়া চিরশান্তির আগার হইয়া উঠে?

তুলসীদাসও যেমনি স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ; রত্নাবলীও তেমনি স্বামীর অতুলনীয় রূপ-জ্যোতি, সেই বরাঙ্গে ধর্ম্মের পবিত্র ভাতি দেখিয়া

আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহার ন্যায় দরিদ্রের কন্যা যে এমন মহদ্বংশে—এমন সুশিক্ষিত সুন্দর স্বভাব সম্পন্ন স্বামীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিবে, তাহা স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই; গুরুদেবের অশেষ কৃপায়ই তাঁহার এইরূপ সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে। শাশুড়ীর অকৃত্রিম আদর যত্নে এবং স্বামীর অতুলনায় ভালবাসায় রত্নাবলী যারপর নাই সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। একজন আর একজনকে না দেখিলে থাকিতে পারে না,—বিশেষতঃ তুলসী-দাস রত্নাবলীকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। ইহাতে সকলে তাঁহাকে স্ত্রীর একান্ত বশংবদ, স্ত্রৈণ বলিয়া অসাক্ষাতে কত নিন্দা করিত; দুঃখীও সময়ে সময়ে তামাসা করিয়া বলিত—ভাই! এত ভাল নয়! রূপ যৌবন নিশার স্বপন।

তুলসী সে কথায় হাসিয়া বলিত—কি জানি ভাই! এরূপে কিরূপ একটা মাদকতা আছে—যেন নেশার বশীভূত হয়ে পড়েছি—না দেখ্‌লে থাকতে পারি না।

দুঃখী বন্ধুর ভাব দেখিয়া কোনপ্রকার নিরুৎসাহিত করিত না—একেত ভাঙ্গা মন যোড়া লাগিয়াছে। তুলসীর ত সংসার করিবার কোন আশাই ছিল না; যখন হয়েছে—তখন একটু ভাল করেই হউক, সে বলিত—ভাই! প্রথম প্রথম ও রকম হয়েই থাকে—আমি তামাসা করে বল্‌ছি বলে কিছু মনে করো না—বৌদির কাছে প্রকাশ করে যেন আমায় গালাগালি খাইও না!

তুলসীর এইরূপ অতিরিক্ত পত্নীপ্রেম দেখিয়া পাড়ার সকলে যাহাই বলুক—জননী বা দুঃখীর মাতুলানী কিছু বলিত না,—তুলসী যে এমন হয়েছে— এই তাঁহারা ভাগ্য বলিয়া মনে করেন—নতুবা

বিগ্‌ড়াইয়াইত গিয়াছিল—সাধু সাজিয়া সংসার ত্যাগের উপক্রম করিতেছিল। বন্ধুবর দুঃখীরাম কেবল সময়ে সময়ে হাসি তামাসা করিয়া, কত পরিহাস রসিকতা করিয়া তাঁহাদের প্রণয় বন্ধন আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য প্রয়াস পাইত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পতিপত্নী

দ্বিরাগমনের পর দুই তিন বৎসর হইল—বধূ শশুরালয়ে আসিয়াছে—আর পাঠাইবার নাম নাই। কন্যার জননী কত কান্নাকাটী করিতেছেন—দীনবন্ধু কত পত্র লিখিতেছেন কিন্তু তুলসীদাস তাহা গ্রাহ্য করেন না। আপনার দোষ ঢাকাইয়া—স্ত্রীকে ছাড়িয়া, তাহার বিরহ সহ্য করিয়া যে তিনি থাকিতে পারিবেন না—সে কথা না বলিয়া বলিতেন—মা, অত্যন্ত বৃদ্ধা হয়েছেন—তাঁর কষ্ট হয়—সেবাশুশ্রূষা হয় না—এইজন্য কেমন করিয়া পাঠাই বলুন; বিয়ে ত তাঁর জন্যই করা! নতুবা আমি ত সংসার কর্ব্বো না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কেবল তাঁর চক্ষের জল দেখেই ত আমাকে বাঁধা পড়তে হলো।

এ কথা সকলেই জানে যে তুলসীদাস চিরকাল সংসারে বিতৃষ্ণ—কেবল গুরুর আদেশে এবং জননীর কষ্টের জন্য তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তথাপি দীনবন্ধু গৃহিনীর অনুরোধ জানাইয়া বাবা। দুই তিন দিনের জন্য পাঠাইয়া দাও, বলিয়া কত অনুরোধ করিতেন, লোক পাঠাইতেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা, তুলসীদাস তাহা

শুনিতেন না। রত্নাবলীও দুই একদিনের জন্য স্বামী-সোহাগে বঞ্চিতা হইয়া পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া আসিবেন বলিয়া, যাইবার জন্য কত জিদ করিতেন। তুলসীদাস কিন্তু সে কথা কানে করিতেন না, দুই একটী মিষ্ট কথা বলিয়া, দুই একটী সোহাগের, আদরের আভাস দিয়া সে কথা উড়াইয়া দিতেন। এরূপ আদরে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন্ হিন্দু স্ত্রী আর রত্নাবলী আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইলেও সময়ে সময়ে পিতামাতার জন্য মরমে মরিয়া থাকিতেন—কিন্তু পাছে স্বামীর কোনপ্রকার মনোকষ্টের কারণ হইতে হয় বলিয়া—তাহা প্রকাশ করিতেন না।

পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তুলসীর কাণ্ড কারখানা দেখিয়া—নব বধুটার প্রতি অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া বলিত—হারে তুলসী! বিয়ে করলে কি আর ঘর চলে না, এতদিন কি করে চল্‌তো বাবা, তেমনি করে না হয় দুই চারদিন চালা না—আহা! ছুঁড়ীটা মা-বাপকে দেখ্‌তে না পেয়ে যেন মুস্‌ড়ে গেছে—দুই তিন বছর পরে কার না জন্মভূমি দেখ্‌তে, বাপমাকে দেখ্‌তে সাধ হয়—এত আর খতেপত্রে লিখে দেওয়া নয়—যে জান্ বিক্রী কর্ত্তে হয়েছে?

তুলসীদাস সে কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিতেন না—আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। তুলসীদাসের ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই ধিক্কার দিয়া বলিত—এমন মাগ্‌মুখো পুরুষও ত দেখিনি বাবা। বিয়ে আর কারু কখন হয়নি—না অমন সুন্দরী মাগ কেউ কখন পায়নি—ছোঁড়াটার সবই অনাসৃষ্টে একগুয়েমী, মা ত অমন নয়—সে ত পাঠাতে রাজী আছে।

ছোঁড়াই যত নষ্টের গোড়া। আমাদের অমন ভাতার হলে একবার দেখে নিতুম। রত্নাবলী মুখচোরা হাবাগবা মেয়ে, তাই অত সহ্যি করে। আমরা হলে অমন ভাতারের ভাত খেতুম না! ওমা, কেন দাস খৎ লিখে দিইনি ত?

অনেকদিন আসিয়াছে একবার না পাঠালে ভাল দেখায় না; চিঠির উপর চিঠি আসিতেছে—বউও মুখ ভার করে রয়েছে। সত্যি ত তারা মেয়ে বেচে খায়নি! কিন্তু তুলসী যে একগুঁয়ে ছেলে, নিজের মতে পাঠালে কি জানি কি করে বসবে। হুলসীদেবী নিজেও কিছু করিতে পারেন না। পুত্রকে কত বুঝাইতেছেন বলিতেছেন—বাবা! তুই একদিনের জন্য একবার পাঠিয়ে দে, তারপর না হয় নিয়ে আসিস্, আহা, বাপমায়ের প্রাণ ত, এতদিন না দেখে অস্থির হয়েছে?

তুলসীদাস তাহার উত্তরে বলেন—মা! জরু, গরু, ধান—তিন রাখবে আপন বিদ্যমান—এই তিন দ্রব্যকে আপনার সম্মুখেই রাখতে হয়। বউত তোমার এখন ছেলে মানুষ নয় যে বাপেরবাড়ী গিয়ে বসে থাকবে। আর বাপ মা মেয়ের বিয়ে দেন কেন—নিজে সাবধানে রাখতে পারবে না বলেই ত? লোকে যা বলে বলুক—তাদের কথা তুমি শুনো না!

হুলসী। লোকের কথা কি বাবা! তোর শশুরের বড় অসুখ, এ সময় না পাঠালেই নয়?

তুলসী। এ কথা তোমায় কে বল্লে?

হুলসী। ঐ দেখনা—আজ আবার একখানা পত্তর এসেছে আর ওপাড়ার কলমী দিদি কার মুখে শুনে এসে আমায় বল্‌ছিল, বউয়ের বাপের বড় বেয়ারাম—এ সময় না পাঠালে কি ভাল দেখায় বাবা! তারা দুই চারদিনের মধ্যে পাল্কী নিয়ে আস্‌বে!

তুলসী। সে তখন দেখা যাবে—তুমি কারু কথায় কাণ দিও না।—বলিয়া তিনি দুঃখীরামের সহিত বেড়াইতে গেল।

রত্নাবলী এখনকার মেয়ের মত মুখরা মেয়ে নহে। সে প্রাণ থাকিতে স্বামীর মুখের উপর কথা কহিতে পারবে না—তাহার অমতে কোন কাজ কর্ত্তে পারবে না। স্বামী সাক্ষাৎ দেবতা—তাঁহার উপর কি কোন কথা চলে! কোন প্রকার শক্ত কথা কয়ে তাঁহার প্রাণে কষ্ট দিলে যে তার পাপ হবে? এ কাজ সতী রত্নাবলী প্রাণ থাকিতে করিতে পারেন না।

রাজাপুর গ্রামে কোন হাট-বাজার ছিল না। বান্দা জিলার নদী তীরে সপ্তাহান্তে হাট বসিত। গ্রামবাসিগণ সপ্তাহের মত সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি ঐ হাট হইতে কিনিয়া আনিত। আগামী কল্য হাটের দিন। তুলসীদাস কি কি দ্রব্য দরকার স্ত্রীর নিকট একটা ফর্দ্দ লইয়া দুঃখীর বাড়ী গিয়াছেন—সে কাল হাটে যাইবে কি না? কিন্তু মা বলিলেন—হাটে কাল যাইতেই হইবে—বউমার কাপড় নাই, কিন্তু দুইজনেই যাইলে চলিবে না। রহিমপুরের রামচন্দ্র দুবে বাপের শ্রাদ্ধ করিবে—তাহার বাটীতে একজনকে যাইতে হইবে।

তুলসী বাটী আসিয়া মার মুখে ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন—তবে দুঃখীই শ্রাদ্ধ করাইতে যাইবে। আমি হাটে যাইব—কাপড় চোপড় কিন্‌তে হলে সে ত পারবে না!

বউয়ের কাপড় নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিবে; অন্য কেহ কি মনের মত কাপড় কিনিতে পারিবে? তুলসীর নিজের একটু পছন্দ ছিল—নিতান্ত হিন্দুস্থানীর মত থাকিত না। পয়সা আছে, নিতান্ত গরীবয়ানা চালে তিনি চালিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন "যা দিবে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে"—অর্থের সদ্ব্যবহার করা, ভাল

করিয়া খাওয়া-পরা করাই তিনি ভাল বুঝিতেন—যক্ষের মত অর্থ সঞ্চয় করিয়া নিজেদের আত্মারামকে কষ্ট দেওয়া তিনি মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। কেবল যে নিজের জন্য ঐরূপ করিতেন তাহা নহে—অধীনস্থ জনগণের জন্যও তাঁহার ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। তুলসীদাস অভাবে দান করিতেন—কেহ কষ্ট পাইলে তাহার প্রতিকার জন্য প্রাণপণ করিতেন কিন্তু বাহাদুরী লইবার জন্য লোক জানা-জানি হইতে দিতেন না। সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা দান ও দরিদ্র সেবা যে শ্রেষ্ঠ তুলসীদাস তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেন। তাঁহার জীবনে এইটী প্রধান গুণ ছিল। কলমী আসিয়া পিতার পীড়ার সংবাদ দিয়াছে—তাহার অবস্থা খারাপ; উঠিতে বসিতে পারেন না, তাই একবার রত্নাবলীকে দেখিতে চাহিয়াছেন। কি জানি যদি ভাল মন্দ হয়—তাহা হইলে ত পিতার সহিত এ জন্মে আর দেখা হইবে না। কথা শুনিয়া অবধি রত্নাবলীর প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়াছে; পিতার এমন নিদান অবস্থা শুনিয়া কাহার না মন খারাপ হয়? তাই তিনি রাত্রিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিরসবদনে ঘরে একধারে বসিয়া ভাবিতেছেন। স্বামী ঘরে না আসিলে, তাঁহার পদসেবা না করিয়া ত শুইতে পারেন না?

রামচন্দ্র দুবের পিতৃশ্রাদ্ধে দুঃখীকে নিযুক্ত করিয়া তুলসীদাস অনেক রাত্রে বাড়ী আসিলেন।—রত্নাবলীকে অমন বিরসবদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। পত্নীর শুষ্ক মুখ তুলসীদাস প্রাণান্তেও দেখিতে পারিতেন না। গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—রত্ন! অমন করে বসে রয়েছ, এ কি কাঁদছো নাকি?

রত্নাবলী আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—কই না, তবে মনটা বড়

খারাপ হয়েছে; বাবা কেমন আছেন, সংবাদ না পেলে সুস্থির হতে পারছি না? তুমি না হয় দুই একদিনের জন্য পাঠিয়ে দাও আমি কি আর বেশী দিন থাক্‌বো?

তুলসীদাস বলিলেন—রত্ন! তাতো জানি; কিন্তু আমি দুই একদিন ছেড়ে দিতেও পারি না—কেন যে এমন হয়—তাত বলতে পারি না, আরও ত অনেকের বউ আছে, কই তারা ত এমন করে না! হিন্দুস্থানীর মত স্বামী এক দিকে স্ত্রী এক দিকে কত দিনধরে পড়ে রয়েছে খোঁজ খবর নাই। রত্ন! গুরুদেব যে আমাকে কি রত্ন দিয়ে গিয়েছেন তা বুঝতে পারি না! এত লোক-লজ্জা পেয়ে ও আমার কিছু লজ্জা হয় না!"

রত্নাবলী স্বামীর অকৃত্রিম ভালবাসা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তুলসীদাস যে তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে—তিনি রত্নাবলীর প্রণয়-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন—তাহা রত্নাবলীর জানিতে বাকী নাই। এইজন্য রত্নাবলীও নিজের অস্তিত্ব কিছুমাত্র রাখেন না—তিনিও স্বামী-সাগরে একেবারে আত্মহারা—একেবারে তন্ময়! কিন্তু কি করিবেন—যাহার জন্য তাহার এত সুখ—এত শান্তি—সেই পিতামাতাকে একবার চক্ষের দেখা না দেখিলে যে পতিত হইতে হইবে! কাজেই আর দুঃখ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া একবার পিতৃভবনে যাইবার প্রার্থনা করিলেন।

তুলসীদাস বলিলেন—"আচ্ছা! কাল হাট্ থেকে এসে আমি একবার নিজেই যাইব। তাঁহার অবস্থা যদি একান্তই শোচনীয় হয়ে থাকে—তা হলে বাড়ীতে আসিয়া তোমায় রাখিয়া আসিব। যথার্থ হলে পাঠাতে হবে বৈকি!

স্বামীর মন নরম হইয়াছে দেখিয়া রত্নাবলী আর কিছু বলি-

লেন না—অতীব আগ্রহের সহিত পদসেবা করিতে লাগিলেন। সে কমনীয় স্পর্শ সুখে সত্বরই নিদ্রা আকর্ষণ হইল। তুলসীদাস নিদ্রিত হইলে সতী পতি-পদতলে শয়ন করিয়া দিবসের শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অদর্শনে

প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই তুলসীদাস হাটে চলিয়া গেলেন। কারণ সকাল সকাল ফিরিয়া আহারাদির পর আবার ধরমপুরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে—তথাকার সঠিক সংবাদ না দিলে রত্নাবলী যে আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। স্ত্রীর প্রাণে আনন্দদান করা যে তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুঃখীরামও যজমান বাড়ী শ্রাদ্ধ করিতে গিয়াছে। অনেকদূর—প্রাতে বাহির না হইলে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

রত্নাবলী প্রাতের কাজকর্ম্ম সারিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিবেন, এমন সময় ধরমপুর হইতে একজন লোক আসিয়া ডাকিল—"বাড়ীতে কে গা, আমি ধরমপুর থেকে আস্‌ছি।" পরিচিত স্বর শুনিয়া রত্নাবলী একটু অগ্রসর হইয়া দরজার নিকট গমন করতঃ বলিলেন—"কেও বলদেও কাকা! এস, এস!"

বলদেও বাটীতে প্রবেশ করিয়া বলিল—"রতন! তোর শাশুড়ী কোথায়? তাঁকে একবার ডাক্‌, তোকে এখনি যেতে হবে, তোর বাবার বড় ব্যায়রাম—দেরী করলে আর দেখা হবে না।"

তুলসীদেবী বাটীর মধ্যে গো-গৃহে গো-সেবা করিতেছিলেন। পর পুরুষের কথা শুনিয়া এবং বউ-মা তার সহিত কথা কহিতেছে দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন—বলদেও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"মা! আমি তোমার বেইবাড়ী থেকে আস্‌ছি; তোমার বেইাইয়ের বড় শক্ত ব্যায়রাম। মেয়েকে একবার তিনি শেষ—দেখা দেখ্‌তে চান—দেরী করে গেলে বোধ হয়—আর দেখা হবে না।"

হাজার হউক স্ত্রীলোকের প্রাণ, বেহাইয়ের অবস্থা শুনিয়া তুলসীদেবী ছল ছল নেত্রে বলিলেন—"তাইত বাবা! তা তুলসী ত বাড়ী নাই, সে সকালে হাটে গিয়াছে! এখন উপায়?"

রত্নাবলী পিতার সাংঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া ঘরের কোণে বসিয়া মৃদু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তুলসীর বাড়ীতে কুটুম্ব আসিয়াছে শুনিয়া দুঃখীর মামীও আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দীনবন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত শুনিয়া দুঃখ করিতে লাগিল।

বলদেও সমস্ত কথা শুনাইয়া বলিলেন—"আপনি এখনি একবার রতনকে পাঠিয়ে দিন, আমি পাল্কী নিয়ে এসেছি।

তুলসীদেবী বলিলেন—"তুমি যেরূপ অবস্থা বল্‌ছো তাতে ত পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, আমার আদৌ অনিচ্ছা নাই। কিন্তু ছেলে যে গোঁয়ার গোবিন্দ বাবা, সে কারু কথা শুনে না; বউ অন্ত তার প্রাণ, যেমন বিয়ে কর্ব্বে না কর্ব্বে না করেছিল, স্ত্রীলোকের নাম শুনলে জ্বলে উঠ্‌তো, এখন তেমনি হয়েছে। এসে যদি বৌকে দেখ্‌তে না পায়—তা হলে একটা অনর্থ বাধিয়া বস্‌বে,—ভাত তো খাবেই না, হাঁড়ী-টাড়ী ভেঙ্গে একেকার করবে। এখন আমি কি করি বাবা বল?"

দুঃখীর মামীও দুঃখ করিতে করিতে বলিল—"দিদি, এ অবস্থা

শুনে না পাঠালেও ভাল দেখায় না; তুমি আর অমত করো না, সে যা করে তা কর্ব্বে, এখন কুটুম্বের মান রাখ।"

কথাটা অপর একজন সমর্থন করিল দেখিয়া বলদেও বলিল—"আমি এত করে অনুরোধ কর্ত্তেম না, তবে নাকি ফুলো কাঁপা, জর, তার উপর পেট ছেড়ে দিয়েছে—কাকার নিদান অবস্থা—এ যাত্রায় রক্ষা পান—এমন বোধ হয় না—এইজন্য এত অনুরোধ, নতুবা সোমত্ত মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থাক্‌বে—এর আর আশ্চর্য্য কি! আর তাকে নিয়ে যাবার জন্যই বা এত জোর জবরদস্তি কেন? এক-মাত্র মেয়ে, মৃত্যুকালে দেখা না হলে চিরকালের জন্য একটা দুঃখু রয়ে যাবে।"

রত্নাবলী আর থাকিতে পারিলেন না—প্রাণ ফাটা দুঃখে কাতর হইয়া শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া বলিল—"মা! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও, একটীবার বাবাকে দেখে আসি, যদি তিনি একটু ভাল হন—তাহা হইলে আমি দু'চার দিনের মধ্যে চলে আস্‌বো, তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলো।"

হুলসী।—আমি কি অমত কচ্ছি মা, কি খুনে ছেলে তাত জান—এসে দেখ্‌তে না পেলে—যেরূপ বদরাগী, বিষম কাণ্ড একটা না করে ছাড়বে না।

রত্নাবলী তথাপি পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুঃখীর মামীও বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিল—"দিদি, কপালে যা থাকে তাই হবে। তুমি কুটুম্বের ছেলের অপমান করো না—কপাল ঠুকে পাঠিয়ে দাও।"

এদিকে বাহিরে পাল্কীর বেহারাগণ হাঁকাহাকী করিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—বাবু! এক রাত্তির পথ যেতে

হবে, আর দেরি করলে হবে না—আমরা নাইবার বেলার ভিতর পৌঁছে দিয়ে অন্য কাজে যাব, এই কাজটী নিয়ে সমস্তদিন থাক্‌লে ত আর চলবে না? হাঁকাহাঁকী শুনিয়া আশে পাশের আরও দুই এক-জন বয়স্থা স্ত্রীলোক আসিয়া জমায়েৎ হইয়া বলিল—"কিগো খুড়ি, আজ যে দোরের গোড়ায় পাল্কী খাড়া দেখ্‌ছি—বৌমাকে নিতে এসেছে বুঝি? আহা বেশ বেশ, অনেকদিন এসেছে, একবার পাঠিয়ে দাও, বাপমারও ত চক্ষের দেখার সাধ আছে।

বলদেও বলিল—"তার জন্যে নয় গো, রতুর বাপের বড় ব্যায়-রাম, এখন যায়—তখন যায় হয়ে রয়েছেন, বুঝি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই প্রাণটি এখনও ধড়ে রয়েছে। তা যেরকম দেরী হচ্ছে বোধ হয়—আর দেখা হয় না।"

"এঁ্যা বল কি" বলিয়া স্ত্রীলোকটি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"খুড়িমা, এতে বাপু তুমি বৌমাকে না পাঠালে অধর্ম্ম হবে, সত্যিই তো আর বেচে থায়নি, এ বিপদ শুনে কি রাখ্‌তে আছে? আমাদের ঘরেও ত বৌ ঝি আছে, কই মা এমন অল-ক্ষণে কাণ্ড ত কখন দেখিনি, তারা তো বছরে দুই একবার যাওয়া আসা করেই। এমন না হইলে কি কুটুম্বিতা থাকে? তার-পর এই বিপদের সময়—তুমি কেমন করে চুপ করে রয়েছো গো খুড়িমা!"

হুলসী বলিলেন—"তোমাদের সঙ্গে আমাদের লক্ষ বাড়ী তফাৎ, তোমাদের ছেলে বাপমার কথা শুনে—আমার ছেলে কি তেমন, কিরকম মেজাজ তাতো জান?"

প্রতিবাসী।—হাজার মেজাজ হউক, এ বিপদ শুনে কেউ চুপ করে থাক্‌তে পারে না খুড়ী! আহা! দেখ না, ছুঁড়ীটা শুনে

অবধি আধখানি হয়ে গেছে, কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্চে—তোর প্রাণেও কি একটু দয়ামায়া নেই ?

তুলসী।—আমার মতে কাজ হলে, আমি বৌমাকে এতদিন দুই তিনবার পাঠিয়ে দিতাম—কুটুম্বের সঙ্গে মনান্তর করা কি কারো সাধ ?

প্রতিবাসী।—তা যাই হোক খুড়ি, এখন তুমি পাঠিয়ে দাও—না হয় তুলসীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলো—সেও না হয় দুই চারদিন থেকে, শ্বশুর একটু ভাল হলে আবার সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বে।

দুঃখীর মামী।—হাঁ দিদি, সে যুক্তি মন্দ নয়—তুলসী ত অনেকক্ষণ গেছে এই আসে বলে, তাই না হয় মত করো—আহা! বউটার অবস্থা দেখে বড় দুঃখ হয়।

বলদেত্ত মনে মনে ভাবিল—এমন স্ত্রৈণ পুরুষ ত কখনও দেখিনি! মাগ ছেড়ে একদণ্ড থাক্‌তে পারে না—অপর সময় হলে দু'চার কথা শুনাইয়া দিয়া তিনি পাল্কী লইয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু এ-ত আর সে সময় নয়—ঝগড়া করে শুধু ফিরে গেলে ত চল্‌বে না, মেয়েকে নিয়ে যেতেই হবে। তজ্জন্য মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বলিলেন—"দেখুন, সে কথাও মন্দ নয়ঃ তাতে এক কাজে দুই কাজ হবে—মেয়ে জামাই দুইজনকে দেখ্‌লে তাঁর খুব আনন্দই হবে!

তুলসী।—সে কথাও আমি তাকে অনেকবার বলেছি—তাতেও সে রাজী নয়—বলে আমি কি ছোটলোকের ছেলে যে বউকে সঙ্গে করে শ্বশুরবাড়ী যাব। আজ সে হাটে গেছে—কখন যে আস্‌বে তারও তো ঠিক নাই!

বেহারাগণ অসহ্য তাড়া করিতে লাগিল, তারা বলিতে লাগিল—বাবু! যাওয়া হয় ত বলুন—নইলে আমরা ফিরে যাই। ত্রিবেদী মহাশয়ের অসুখ, তাঁর কন্যাকে নিয়ে যাওয়া দরকার, তাই এতদূর এসেছি,—আমরা এতক্ষণ কাছাকাছি শোয়ারী বইলে এর চেয়ে ঢের বেশী পেতাম।

এত চেঁচামেচি, এত উপরোধ-অনুরোধ, বউমার এত কান্না—হুলসীদেবীর প্রাণে আর সহ্য হইল না; তিনি বলিলেন—কপালে যা থাকে তাই হবে—বউমা, তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু জল টল খেয়ে নাও, কুটুম্বের ছেলেটীকেও কিছু দাও, বেহারারা চীৎকার কচ্ছে, ওদেরও কিছু জলপান দিয়া ঠাণ্ডা কর। তারপরও সে যদি এসে না পড়ে—দুর্গা বলে চলে যাও, আমার কপালে যা থাকে তাই হবে; এ বিপদ শুনে আর চুপ করে থাকা যায় না।

হুলসীদেবীর কথা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল। রত্নাবলী, বলদেও ও বেহারাদের কিছু কিছু চিড়া গুড় দিলেন। নিজের প্রাণের ভিতর ধড় ফড় করিতেছে—বাপের অবস্থা না দেখলে কি আর মুখে কিছু রুচে, তথাপি শাশুড়ীর সন্তোষের জন্য তিনি মুখ হাত ধুইয়া একটু মিষ্ট মুখে দিলেন এবং একটা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

তুলসীর এখনও দেখা নাই, কাজেই হুলসীদেবী আর কাল বিলম্ব না করিয়া বলদেওকে অনুমতি দিলেন। রত্নাবলী শাশুড়ীর পদধূলি লইয়া বলিলেন—মা! তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলো, বাবাকে ভাল দেখলে আমি দুই চারদিন থেকেই চলে আস্‌বো, তারপর অপর বয়োজ্যেষ্ঠাগণের পদধূলি লইয়া তিনি যানারোহন করিলেন।

বেহারাগণ তৎক্ষণাৎ পাল্কী স্কন্ধে করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক সুর তুলিয়া ছুটিতে লাগিল। বলদেও সকলকে অভিবাদন করিয়া পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখনও পাকাদি কিছুই হয় নাই। হুলসীদেবী বধূমাতাকে পাঠাইয়া দিয়া কাপড়-চোপড় কাঁচিয়া চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া হাঁড়ী চাপাইয়া দিলেন। একেত বউ চলিয়া গিয়াছে, তার উপর আসিয়া ভাত না পাইলে তুলসী কি আর রক্ষা রাখিবে, এত রাস্তা কষ্ট করে আসছে? জননী তাড়াতাড়ি পাকাদি করিলেন— অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ পাকাদির প্রকার কিছু বেশী হইল, কি জানি যদি দুই এক তরকারীতে ছেলের মন না উঠে। ঘরে আসিয়া বউকে না দেখিলেইত তাহার মুণ্ডু ঘুরে যাবে, খাওয়া-দাওয়া কোথায় থাকবে—তথাপি মায়ের প্রাণ,—পুত্র যা ভালবাসে আজ সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া খিড়কীর পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে গেলেন।

বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে—তখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত সময়ে তুলসীদাস হাটবাজার করিয়া মনোমত একজোড়া কাপড় কিনিয়া শ্রান্ত কলেবরে বাটী আসিলেন। নিজের ঘরে গিয়া দেখিলেন—বউ নাই; এ ঘর সে ঘর খুঁজিলেন—তারপর বলিলেন—তাই ত এরা সব গেলো কোথা, ঘরের ভিতর কাপড় চোপড় গুলো ছড়ান রয়েছে— জিনিষপত্র গুলো সব এলোমেলো ভাবে চারদিকে ছড়ান দেখছি, ব্যাপার কি? বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—মা, মা, মা, ওমা। পুত্রের গলার জোর আওয়াজ শুনিয়া হুলসীদেবী পুকুর হইতে উচ্চৈঃস্বরে সাড়া দিয়া বলিলেন—এই যে বাবা যাচ্চি।

অন্যদিন তুলসীর গলার স্বর শুনিলে রত্নাবলী দৌড়িয়া আসে,

কই আজও সে আস্‌ছে না ; শ্বশুরের পীড়ার কথা বলে কেবলই পত্র আস্‌ছিল, আজ কি তবে তারা নিয়ে গেল নাকি ?" তুলসীদাস অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পুনরায় ডাকিলেন—মা, মা, ওমা ! তোমারও পুকুরে যাবার কি আর সময় নেই বাছা ?

হুলসীদেবী দুঃখীরামের মামীকে সঙ্গে করিয়া গৃহ প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—এই যে বাবা ! আমি এসেছি ? তুলসীদাস সাতিশয় বিরক্তিসহকারে বলিলেন—তোমাদের ত সময় অসময় নেই, যখন তখনই পুকুরঘাটে, বলি—এ কোথা গেল !

দুঃখীর মামী। হাঁ বাবা ! কার কথা বল্‌ছো !

স্ত্রীকে না দেখিয়া তুলসীদাসের মাথা গরম হইয়া গিয়াছে, তিনি চারিদিক শূন্য দেখিতেছেন—প্রাণ একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে ; অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—তোমরা আবার এখন কেন বাপু, তিতিবিরক্তের সময় ?

তুলসীর ভাব দেখিয়া কোন একটা অনর্থপাত হবে ভাবিয়া—দুঃখীর মামীকে সরাইয়া দিয়া জননী বলিলেন—কি বলছিস্‌ বাবা ! বউমার কথা জিজ্ঞাসা করছিস্‌ !

তুলসী রাগত স্বরে হাঁ হাঁ—তা নয়ত আর কি, ঘরের মধ্যে আর কয়জন লোক ?

সংবাদ ত দিতেই হইবে—হুলসীদেবী ভয়ে দু একটা ঢোক গিলিয়া সাহসে ভর করিয়া বলিলেন—এই বাবা ! তোমার শ্বশুরের বড় ব্যায়রাম, এখন তখন হয়ে রয়েছেন, বাঁচবার আশা নেই ; এতক্ষণ বেঁচে আছেন কি না—সন্দেহ ; সেইজন্য পাল্কী নিয়ে লোক এসেছিল ; পাঠিয়ে না দিয়ে কি করি, তবু আমি তোমার অপেক্ষায় থাকতে বলে ছিলাম—সে বল্‌লে—তাহলে দেখা হবে না ; তখন আর কি করি

বাবা! বউয়ের কান্না দেখে আর থাকৃতে পারলাম না; পাঠাতেই হ্লো।

তুলসীদাস কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে আমাকে না বলিয়া গেল কি করে। আমি যে তাহাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসী—এত ভালবাসা, এত আদর যত্ন যে আমি জীবনে কাহাকেও করি নাই। বাপের ব্যায়রাম বলে কি একদণ্ড দেরী সইলো না? তার সেই কমনীয় কান্তি, নধর অধরের সেই মৃদু হাসি না দেখ্লে যে আমার মন অস্থির হয়—সে মুখচন্দ্রমা তিলেক না দেখলে যে আমার কিছুই ভাল লাগে না; জগতে এত জিনিস থাকৃতেও যে সমস্ত অন্ধকার বলে বোধ হয়—হায়! আমি এখন কি করি? সতী ছাড়া শিব থাকৃতে পারেন, নারায়ণ লক্ষ্মী ছাড়া হ্তে পারেন কিন্তু রত্ন ছাড়া তুলসী কেমন করে হবে? আজ চার বৎসর যে শশাঙ্ক লাঞ্ছিত বদন আমি সর্ব্বদা নয়ন-গগনে ভাসিয়ে রাখতাম, একদিনও যাহার সুধাপানে আমার বিরক্তি হয় নাই; সেই সুধামুখীর সুধাময়বদন এ দুই তিন দিন না দেখে কেমন করে থাকবো! উঃ তা তো পারবো না! যদি শশুরের মৃত্যু হয়, তাহলে ত দশ পনর দিন—না না এতদিন তাকে ছেড়ে তুলসীর প্রাণ থাকবে না; আমি আজই ধরমপুর চলে যাব।

তুলসীদাস উঠিলেন—কষ্টে স্বষ্টে কাপড় চোপড় ছাড়িয়া পূজায় বসিলেন কিন্তু মন কোথায়? সে যে অনেকক্ষণ রত্নাবলীর পাছু পাছু দৌড়িয়াছে! পূজা ঠিক হইল না, নামমাত্র নিত্য কর্ম্ম সারিয়া তুলসীদাস জননীর অনুরোধে চারিটী ভাত চোকে মুখে পুরিয়া উঠিয়া পড়িলেন। প্রাণ উদাস হইয়াছে, তাঁহাতে আর তিনি নাই, তাই উদাস ভাবে বাটীর বাহির হইয়া রাগে গর গর করিতে করিতে বলিলেন—

মা, এই জন্মের মত চলিলাম! জননী বুঝিলেন—তুলসী কাহাকেও না বলিয়া শ্বশুরবাটী যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা ত হয় হয়—আজ থাকিয়া গেলে ভাল হয়—জন্মের মত যাই, বলে গেলো যে, না জানি কি অনর্থপাতই করে, দেখি দুঃখী যদি বারণ কর্ত্তে পারে, এইজন্য তাহাকে ডাকিতে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মায়ের প্রাণ

অপরাহ্নে তুলসী ধরমপুরাভিমুখে ছুটীল, স্ত্রীর অদর্শন সে এক-দণ্ডও সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু বেলা ত বেশী নাই, ধরমপুর যাইতে রাত্রি অনেক হইবে, রাস্তা জঙ্গলে পূর্ণ; বাছার আমার বড়ই কষ্ট হইবে—আজ না যাইয়া কাল সকালে আহারাদির পর যাইলে দিনে দিনেই পৌছিতে পারিত। দুঃখীরাম যদি তাহাকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া ফিরাইতে পারে, এইজন্য তিনি অতি ক্ষীপ্র-গতিতে দুঃখীরামের গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন—সে ত এখনও বেশীদূর যাইতে পারে নাই—দুঃখী যদি আজ তাহার গমনে বাধা দিতে পারে।

দুঃখীরাম মামীর মুখে বন্ধুপত্নীর পিতৃভবন গমনের কথা শুনিয়া-ছিল—বৌয়ের বাপের বড় ব্যায়রাম, বাঁচে কি না বাঁচে। তুলসী-দাস এতক্ষণ হাট হইতে আসিয়াছে, দেখি সে বউকে না দেখিয়া কি করিতেছে, বলিয়া দুঃখীরামও আহারাদির পর তাঁহাদের বাটীর দিকে আসিতেছিল, হাতে পূজার দ্রব্যাদিও ছিল। পথে তুলসী-

দেবীর সহিত দেখা হইলে—"কিগো খুড়ীমা কোথায় যাচ্ছ" বলিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল।

তুলসীদেবী দুঃখীরামকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দুঃখী! সর্ব্বনাশ হয়েছে, বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়েছি বলে তুলসী আমার রাগ করে কোথায় চলে গেলো, যাবার সময় বলে গেল—"এই জন্মের মত চল্লাম।" বলিয়া বৃদ্ধা হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—এবং বলিলেন—"কি হবে বাবা দুঃখী, সে যে আমার অন্ধের নড়ী, কাণা মায়ের ধন, এমন জান্‌লে কি আমি বউমাকে পাঠাতাম বাবা!

দুঃখীরাম ব্যাপার সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বলিল—"খুড়ীমা! তার আর ভাবনা কি, বেশী রাগ হয়েছে—তাই অমন কথা বলে বাড়ী থেকে চলে গেছেন, রাগ পড়লেই আবার আস্‌বেন।"

তুলসী। বাবা! যদি সে বিবাগী হয়ে যায়?

দুঃখী। বিবাগী কি হলেই হলো খুড়ীমা, বাড়ী ছেড়ে যাওয়া কি সহজ কাজ—তুমি মনে কর, কে তোমার মত যত্ন করে—খাওয়াবে, পরাবে?

তুলসী। না বাবা! সে যেরূপ একগুঁয়ে ছেলে, তাতে সে সব কর্ত্তে পারে—রাগ্‌লে তার জ্ঞান থাকে না, আমার ও বউমার উপর রাগ করে সে বাড়ী ছাড়াও হতে পারে—তার গুণে ঘাট নেই। বাবা! এখনও সময় আছে—তুই বাবা, এর একটা উপায় কর—নতুবা আমি ঘরে থাকতে পারবো না!

দুঃখী। তার জন্য কোন ভাবনা নেই খুড়ীমা! দাদা বউদিকে ফিরিয়ে আনতে নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ী গিয়েছেন, আজ আকাশের বড়ই দুর্য্যোগ—নইলে আজই আস্‌তেন—কাল আস্‌বেনই, তার জন্য তুমি অত উতলা হইও না!

তুলসী। না বাবা! তোর ওকথা আমার কিছুতেই মনে নেয় না, সে যেরূপ রেগে বেরিয়েছে, তাহাতে একটা অনর্থপাত করবেই! তুই আগে থাকতে তার একটা বিহীত কর।

দুঃখী। তবে কি তুমি আমাকে সেখানে যেতে বলো?

তুলসী। সে এখনও সেখানে যেতে পারে নাই; পথেই আছে—তুই একটু আগ্ বাড়িয়ে, তাড়াতাড়ি গিয়ে, তাকে ধরে নিয়ে আয়।

দুঃখী। তা আমি যাচ্ছি—তোমার কথা ঠেল্‌তে পারবো নাত, কিন্তু তিনি কোন পথে গেছেন, কেমন করে জানবো? ধরমপুরে যাবার ত অনেক পথ—তার উপর এই আকাশ ঘোর ঘটাচ্ছন্ন হয়ে আস্‌ছে!

তুলসী। তাতো দেখছি বাবা! তবে কি হবে?

দুঃখী। খুড়ী, ভালই হয়েছে—আকাশ যখন এত ঘুরে এসেছে, তখন দাদা, আর কোথাও যেতে পারবে না—হয় সেখানে যাবে—নয় ফিরে আস্‌বে। তুমি একটু চুপ করে থাক না—দেখই না দাদা কি কীর্ত্তিটা করে—তারপর আমি কাল খুব ভোরে উঠিতে দাদাকে গিয়ে ধরবো; প্রথমে শ্বশুরবাড়ী তাঁকে যেতেই হবে—সেখানে না যেয়ে পারবেন না। তুমি চল, বেলা প্রায় পড়ে এলো—খাওয়া দাওয়া করবে না?

তুলসী। বাবা! যতক্ষণ না সে আমার ঘরে আসে, ততক্ষণ আমার মুখে কিছু রুচবে না; সে যে বড় মর্ম্মান্তিক কথা বলে গেছে দুঃখী!

দুঃখী। খুড়ী, তুমি ত জান, দাদার মনটা চিরকালই একটু বেতাল, ভাল কথা বল্‌তে বল্‌তে ফস্ করে এমন একটা বেফাস্ কথা

বলে ফেলেন—যে তার মাথামুণ্ড কিছুই নাই; আজও সেইরকম যাঃতা একটা বলে বেরিয়েছেন—তুমি কি মনে কর খুড়ী, সন্ন্যাসী হওয়া সহজ কথা? আর তিনি যেরকম বউদিকে ভালবাসেন, তাতে তাঁর পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া চল্‌তেই পারে না; তুমি সেজন্য কিছু ভেবো না।

তুলসী।—বাবা, ঐ কথা শুনে অবধি প্রাণ টা আমার ধড়ফড় কচ্ছে, কত কি অমঙ্গল-কথা মনে হচ্ছে—তা আর বল্‌তে পারি না। বলিয়া বৃদ্ধা হাপুশ নয়নে রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! মায়ের প্রাণ যে কত কোমল—বাৎসল্য রসে পূর্ণ, সন্তানের অদর্শন যে কিরূপ কষ্টদায়ক, বিশেষতঃ একমাত্র পুত্র "জন্মের মত যাচ্ছি" বল্‌লে যে কি কষ্ট হয়, প্রাণ কিরূপ আঁচর পেঁচর করে—তা দুঃখীরাম কি করে বুঝবে? সে বৃদ্ধার অবস্থা দেখিয়া স্তোক বাক্যে বলিল—খুড়ী মা! তোমার যদি এতই ভাবনা হয়, তা হলে আমি এখনি যাচ্ছি, তুমি নাবে-খাবে চলো।

তুলসী।—আঃ বাবা! কি বলে আর তোকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব্বো, আমার চুলের মত তোর পেরমাই হোক, বাবা! ঐ কথা বল্‌তেই আমি তোর কাছে যাচ্ছিলাম।

দুঃখী।—যাও খুড়ীমা, আর যেতে হবে না, তুমি নাওয়া-খাওয়া করগে যাও, সন্ধ্যে হয়ে এলো; আমি চাদর গামছা নিয়ে এখনি যাচ্ছি।

দুঃখীরাম সেরূপ ছেলে নয়, সে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। যখন বলিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই যাবে, তবে রাত্রে আসা না আসা সে তাদের হাত—এত রাত্রে কি আর ঝি-জামাইকে কেউ পাঠায়? বেহাই ভাল থাকলেও পাঠাবে না, তবে যে ভাবনায়

ভেবে মরছিলাম, দুঃখী গিয়ে পড়লে আর সে ভাবনা নাই! সে গেলে, তুলসী কখনই বিবাগী হয়ে যেতে পারবে না।

তুলসীদাস, চিরকাল সন্ন্যাসী হবো, বাড়ী ছেড়ে দেশে দেশে ফিরবো, বলিয়া সকলের কাছে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধার প্রাণ বড়ই কাতর হইত, একমাত্র পুত্র, বাড়ী ছেড়ে গেলে তিনি এ অন্ধকার পুরীতে কেমন করিয়া থাকিবেন? এই হেতু গুরুর পদে ধরিয়া ইহার একটা প্রতিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন—তুলসী যাহাতে ঐ কথা আর মুখে না আনে, যাহাতে তাহার মতিগতি একেবারে ফিরিয়া যায়, বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া নৃসিংহদাসকে তুলসী উহার একটা কিনারা করিতে বলিতেন।

নৃসিংহদাস সমস্তই জানিতেন, তথাপি বৃদ্ধার মনস্তুষ্টির জন্য তুলসী-দাসের বিবাহ দিলেন। যুবক বড় সৌন্দর্য্য প্রিয়, সুন্দর মুখ দেখিলে সে একেবারে মজিয়া যায়, তাহার কাছ ছাড়া হয় না। একটী খুব রূপসী কন্যার সহিত বিবাহ দিলে মন্দ হয় না; মতিগতি ফিরিলেও ফিরতে পারে কিন্তু তুলসীদাসের সন্ন্যাস যোগ রহিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যাইবে না—একদিন না একদিন সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনায়, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া পরমভক্ত নামে অভিহিত হইবে; বংশের মান, পিতা মাতার মুখোজ্জল করিবে। যদি তাহাই হয়—তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত—যদি সে গৃহত্যাগী হয়, তাহা হইলে বধূটীর দ্বারা তুলসীর সেবা হইবে, কোন কষ্ট হইবে না, এই মনে করিয়া তিনি তুলসীকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়া, জননীর ইচ্ছায় কঠিন প্রণয়-নিগড়ে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া, তিনি গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এত

চেষ্টা করিয়াও কিছু হইল না, তুলসীদাস এখনও যে সেই কথাই বলে, তবে কি তুলসী আর ফিরিবে না?

তুলসীদেবীর ইহাই বিষম চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এতদিন সে বউমাকে দেখিয়া ঐ মর্ম্মান্তিক কথা মুখে আনিত না; বউমার রূপে ভুলিয়া কাছে কাছে থাকিত; দুইজনে কত ভালমন্দ, ধর্ম্মকর্ম্মের কথা কহিত; তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার নাম পর্য্যন্ত একবার মুখে আনিত না, সে বউমাকে এত ভাল বাস্‌তো; আমি সেই বউমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে কি কুকাজই করেছি, এখন বাছা আমার ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে এলে হয়—আমি আর কখনও তার অমতে বউমাকে কোথাও পাঠাব না, হে প্রভু রঘুনাথ! আমার আঁচলের ধন তুলসীর মতিগতি ফিরিয়ে দাও, সে যেন বাড়ী ছাড়া না হয়।

বৃদ্ধা ইষ্ট দেবতার পদে প্রণাম করিতে করিতে বাটী ফিরিল। দুঃখী চলিয়া গিয়াছে, সে নিশ্চয়ই তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিবে। তিনি বধূমাতাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, পাড়ার সকলে তখন তাঁহাকে অনুরোধ করিল কিন্তু এখন ত তুলসীকে সান্ত্বনা দিতে কেহই আসিল না! যাহা হউক, তিনি এত মন্দ কাজই বা কি করিয়াছেন? বেহাইয়ের অবস্থা খারাপ, বাপে ঝিয়ে পাছে দেখা না হয়, এই জন্য দায়ে পড়িয়া পাঠাইয়াছেন—ইহাতে তাঁহার দোষ কিছুমাত্র নাই। তুলসীদেবী নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় অধীরা হইয়া আহারে বসিলেন কিন্তু আহার করিতে পারিলেন না, হাতে ভাতে উঠিয়া, সমস্ত গরুর ডাবায় দিয়া থালা বাসন মাজিয়া আনিলেন। আজ তাহাতে আর তিনি নাই, কেবল একগুঁয়ে তুলসীদাসের কথা মনে করিতেছেন—না জানি সে কি করিতে কি করিয়া বসে।

বৈকাল হইতে আকাশে মেঘ হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাথাপি সেইরূপ মেঘাড়ম্বর—বিদ্যুৎ হানিতেছে, কড় কড় শব্দে বজ্রপাত হইতেছে, কেহ বাটীর বাহির হইতে পারিতেছে না; তুলসী সেই জলঝড়ে ভিজিয়া পুত্রহারা উন্মাদিনীর ন্যায় আবার দুঃখীরামের বাড়ী গমন করিলেন।

দুঃখী ধরমপুরে গিয়াছে। আজ বাড়ী আসিবে না শুনিয়া তাহার মামী মনিয়াদেবী বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তুলসীদেবী আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু কে শুনে—ঝড় বৃষ্টিতে সে স্বর দুঃখীর মামীর কর্ণে পৌছিল না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর মনীয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া বলিল—কি গো দিদি! এত ঝড় জলে কেন? তুলসীদেবী বলিলেন—হাঁ মা! দুঃখী কি ফিরে এসেছে?

মনীয়া বলিলেন—এইত সন্ধ্যের একটু আগে সে গিয়েছে, এর মধ্যে কি ধরমপুর থেকে ফিরে আস্‌তে পারে—তাতে আবার এই দুর্য্যোগ। তুলসী শশব্যস্তে বলিলেন—তাই বলছি মা! তাই বলছি, আহা, না জানি বাছার কত কষ্ট হবে; তা মা তুমি কিছু মনে করো না, যদি একলা থাক্‌তে না পারো, তাহলে আমাদের বাড়ীতে এস না?

তুলসীদেবী নিজেই বাড়ীতে একাকিনী থাকিতে পারিতেছেন না। এইজন্ত তাহাকে লইতে আসিয়া প্রকারান্তরে নিজের মনোভাবই প্রকাশ করিলেন। আহা, পুত্রপ্রাণা জননী একাকিনী কেমন করিয়া গৃহে থাকিবেন—তিনি কখন একাকিনী গৃহে অবস্থান করেন নাই; এরূপ নির্জ্জনে রজনী যাপন একান্ত অসহ্য হওয়ায় প্রাণ অত্যন্ত উদাস হইয়াছে; মনে নানাপ্রকার কুচিন্তার উদয় হইয়া তাঁহাকে যারপর নাই কাতর করিয়া তুলিয়াছে, গৃহে থাকা

তাহার পক্ষে দায় হইয়াছে। তাই এত দুর্য্যোগে তিনি বাড়ী ছাড়িয়া মনীয়ার কাছে আসিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন—মনের কথা বলিয়া তাহাকে আপন গৃহে লইয়া যাইবেন, সমস্ত রাত্রি দুঃখের কথা কহিয়া একপ্রকার মনাবরণ করিয়া থাকিবেন কিন্তু তাহা হইল না, তিনি আপনার কথা বলিবার পূর্ব্বেই মনীয়া বলিলেন—কি কর্ব্বো দিদি! রাখাল ছোঁড়াটাও আজ বাড়ী গিয়েছে, এই দুর্য্যোগে ঘর ফেলিয়া ত যেতে পারি না—নইলে তোমার কাছে গিয়ে শুতাম!

তুলসী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই দুর্য্যোগে তিনিও নিজের বাড়ী ছাড়িয়া তাহাদের বাড়ীতে থাকিতে পারেন না—এই জল ঝড়ে যদি বাড়ী আল্‌গা পাইয়া কেহ চুরি করে; সংসারে যাহা হউক দুচারখানা বাসন-কুসনো ত আছে? তার যেন কিছু দরকার নাই কিন্তু কাল বউ-বেটা এলে ত সে সব দরকার হবে? বৃদ্ধা পুনরায় বাড়ী আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া যাহাতে প্রাণে শান্তি আসে—যাহাতে বিপদে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই বিপদতারণ রাম রাজীবলোচনের নাম-জপ করিতে লাগিলেন। দুঃখী যখন তুলসীর অন্বেষণে গিয়াছে, তখন আর কোন সন্দেহ নাই—ভাবিয়া তিনি একপ্রকার সুখ-দুঃখের আবেগে ভগবানের নাম জপ করিয়া রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৈরাগ্য

দারুণ অন্ধকার, ঝড়—বৃষ্টি—বজ্রাঘাত, তথাপি দৃক্‌পাত নাই। পত্নী-প্রেমমুগ্ধ যুবক তুলসীদাস—একান্তমনে সেই দারুণ দুর্য্যোগে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। পাছে রাত্রি অনেক হইয়া যায়, পাছে তাঁহার প্রাণপ্রিয় পত্নী নিদ্রিতা হইয়া পড়েন—এইজন্য একান্ত অনুরাগে, প্রাণের একান্ত আবেগ ভরে—দিক্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত তুলসীদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত—বস্ত্রাদি সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে; অত্যন্ত বৃষ্টিতে সিক্ত হইয়া দেহ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি বিরাম নাই—কোথাও বিশ্রাম না করিয়া তিনি অনবরত পথ অতিবাহিত করিতেছেন। অন্ধকারময় বন-জঙ্গলের পথ—কোথায় কি হিংস্র জন্তু গুপ্ত ভাবে বাস করিতেছে দংশন করিয়া প্রাণ নষ্ট করিবে—তখন সে চিন্তা তাহার নাই—যত শীঘ্র পারেন, তাঁহার প্রাণের প্রণয়িনীর নিকট পৌছিতে পারিলেই হইল। তুলসীদাসের প্রাণ তখন স্ত্রীর প্রেমে এত মুগ্ধ, ক্ষণিক বিরহের পর তাহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত, যে নিজের প্রাণের প্রতি কিছুমাত্র মায়া নাই, শাস্ত্রপাঠী তুলসীদাসের হিতাহিত বিবেচনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই নব বিকসিত যৌবনা, পদ্মপলাশ লোচনা রত্নাবলীর জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির! স্ত্রীকে তিনি ক্ষণিক চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিতেন না, আর এ যে সমস্ত দিন গিয়াছে; তুলসী আর কতক্ষণ সে অতুলনীয়া মুখচন্দ্রমা

না দেখিয়া থাকিবেন? তাই যত বিলম্ব হইতেছে, পদে পদে যত পদস্খলন হইতেছে, ততই তিনি উঠিপড়ি করিয়া দৌড়িয়াছেন।

যখন বহু কষ্টে ধরমপুর গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন—তখন রাত্রি দুইদণ্ড অতীত হইয়াছে। আকাশের মেঘের মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে; বৃষ্টিও আর পড়িতেছে না, বিদ্যুৎও আর হানিতেছে না; বজ্রও আর ভীম রবে গর্জ্জন করিতেছে না, তুলসীদাস অতীব আগ্রহের সহিত একেবারে শ্বশুরবাটীর প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

সে দিন সকাল হইতে দীনবন্ধু একটু ভাল আছেন, জ্বরের বেগ অনেক কমিয়াছে, পেটের পীড়া অনেক ধরিয়াছে—বোধ হয় আশার ধন নন্দিনীকে বহুদিনের পর দর্শন করিয়া বৃদ্ধের হতাশপ্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে; বাঁচিবার আশা না থাকিলেও এখন যে সেবা ভাল হইবে, সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার পত্নী একাকিনী, কত দিক দেখিবেন? মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া দীনবন্ধুর সেবার অত্যন্ত ত্রুটি হইতেছিল, এই জন্য তুলসীর শাশুড়ী লক্ষ্মীদেবী প্রতিবাসী বলদেওকে একেবারে পাল্কী লইয়া পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা হইলে আর কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না এবং পীড়া যে খুব শক্ত, তাহা সকলেরই প্রতীতি হইবে। বলদেও কন্যাকে লইয়া আসিলে বৃদ্ধ দীনবন্ধু একটু আশ্বস্ত হইয়াছেন; তাহাকে দেখিয়া পীড়ার প্রকোপ ক্ষণিক একটু কমিয়াছে, আজ তাঁহার অবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা খুব ভাল।

রত্নাবলী শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া সমস্তদিন পিতার সেবা করিয়াছেন; সে অবস্থা দেখিয়া নয়নের জলে ভাসিয়াছেন, এখন সে সঙ্গীন অবস্থা হইতে একটু ভাল আছেন; বোধ হয় আজিকার রাত্রিটা টিকিলেও টিকিতে পারেন। তজ্জন্য জননীর অনেক বলা কওয়ায় রত্নাবলী এই

মাত্র চারিটী ভাত মুখে দিয়া, দাবায় আসিয়া একটু বসিয়াছেন। রত্নাবলীর মাতা সমস্ত দিন স্বামী-শুশ্রূষার ভার কন্যার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন কন্যাকে একটু আসান দিয়া অন্যান্য দিনের মত নিজেই সেভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বহুদিন পরে রত্নাবলী শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, শুনিয়া পাড়ার সমবয়সী অনেক স্ত্রীলোক দীনবন্ধুকে যত না হউক, তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। তখন চারিদিকে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। রত্নাবলী আহারাদির পর তারকা পরিবেষ্টিতা রোহিনীর ন্যায় সঙ্গিনীগণ সহ নানাবিধ সুখ-দুঃখের কথা কহিতেছেন। এমন সময় তুলসীদাস সিক্ত বস্ত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—রত্ন! একি, তুমি আমায় না বলিয়া চলিয়া এসেছ? তুলসীদাসকে দেখিয়া প্রতিবাসী যুবতীগণ লজ্জায় মস্তকাবরণ করিয়া পলায়ন করিল। রত্নাবলী স্বামীর নিকটে আসিলেন—তাঁহাকে উন্মাদের ন্যায় এতটা পথ জলে ভিজিয়া আসিতে দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল, সামান্য ক্রোধও যে হয় নাই—তাহাও নহে। এমন কি স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, যে নিজের শরীরের প্রতি মমতা নাই! আর দুই মাস নয়, ছয় মাস নয়, আজ আট দশ ঘণ্টা আসিয়াছি, ইহাতেই এত অধৈর্য্য, পুরুষ মানুষের এত অধৈর্য্য হওয়াত ভাল নয়? বিশেষতঃ শাস্ত্র-পাঠী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্যে যিনি চির সংযমী, তিনি রমণীর মোহে এত মোহিত কেন? রত্নাবলী কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—দেখ, সামান্য স্ত্রীর প্রতি এত আসক্তি ভাল নয়, ব্রাহ্মণ চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ—সংযমই তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ, তুমি সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া একি করিতেছ! সামান্য রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িয়াছ? এই যে ভয়ানক ঝড় জল, এই যে ভীম বজ্রপাত

হইয়া গেল, তুমি প্রাণের মায়া না করিয়া কোন্ সাহসে ঘাটের উপর দিয়া এই দারুণ দুর্য্যোগে ভিজিতে ভিজিতে এখানে আসিলে, কেন একটী দিন কি আর তর সয় না ?

রমণীর রূপ ক্ষণস্থায়ী—নশ্বর, এ দেহ অকিঞ্চিৎকর রক্ত, মাংস বসা প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত—আজ এইরূপ দেখিতেছ, দুদিন পরে ইহার প্রতি তাকাইতেও ইচ্ছা হইবে না, ইহা এমনি বিকৃত হইয়া যাইবে। পার্থিব সকল সৌন্দর্য্যই এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর ; অতএব ইহার প্রতি প্রাণের এত আসক্তি, হৃদয়ের এত অনুরাগ, মনের এত ব্যাকুলতা বৃদ্ধি না করিয়া, এইটে যদি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অর্পণ কর্ত্তে, তাঁহার জন্য যদি এইরূপ ব্যাকুল হইতে পারিতে, তাঁহাকে পাইবার বা দেখিবার জন্য যদি মনের এইরূপ অনুরাগ, এইরূপ প্রগাঢ় আসক্তি দেখাইতে পারিতে, তাহা হইলে আর সামান্য রূপজমোহে অভিভূত হইয়া তোমাকে এত দৌড়াদৌড়ি করিতে হইত না ? জাগতিক সকল রূপের আধার, সকল সৌন্দর্য্যের সারভূত, মহা-মহিমময় নব দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম গুণধামকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে পারিলে তোমার সকল অভাব, সকল চিন্তা মিটিয়া যাইত ! কিছার মিছার রমণীর সৌন্দর্য্য, কিছার মিছার রমণী প্রেম ; সেই চির সুন্দর প্রেমময়ের প্রেম পারাবারে অবগাহন করিতে পারিলে—তোমার ইহকাল, পর কাল, ভবের সমস্ত জঞ্জাল জাল কাটিয়া যাইত, তুমি অনন্ত রূপ-সাগরে, স্বর্গীয় প্রেম-সাগরের অমিয় তরঙ্গে সাঁতার দিয়া মানব জন্ম সার্থক করিতে, নশ্বর জগতের কোন সৌন্দর্য্য আর তোমায় এমন করিয়া বৃথা অভিভূত করিয়া ছুটাছুটী করাইতে পারিত না। স্বামীন ; তোমার এ পত্নী প্রিয়তা বড় বিষম দেখিতেছি !

তুলসীদাসের চমক ভাঙ্গিল। মহিমাময়ী রমণীর তীব্র বচনবাণে,

তাঁহার গুপ্ত হৃদয়ের সুপ্ত প্রায় মনুষ্যত্ব একমুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল, প্রাণের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দেহের প্রত্যেক পরতে পরতে কি একটা নবীন শক্তির সঞ্চার হইল, মন বিবেকের দারুণ কষাঘাতে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল; রমণীর সৌন্দর্য্য-চটকের চটক! ভাঙ্গিয়া গেল, হঠাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিলেন—তাইতো আমি একি করিতেছি! কিসের জন্য এত লালায়িত, কিসের জন্য এত মমতায় অভিভূত, কিসের জন্য সামান্য রমণীর সৌন্দর্য্য-প্রেমে এরূপ মত্ত হইয়া দ্বিজত্বের তথা ব্রাহ্মণত্বের এত অবমাননা করিতেছি? আমি না ঋষিকল্প মহাত্মা আত্মারামের আত্মজ, আমিই না মহাপুরুষ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর সদৃশ গুরুদেব নৃসিংহদাসের প্রিয়তম শিষ্য! তিনি না আজীবন প্রাণপণ করিয়া প্রতিপালন করত আমাকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পদে অর্পণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—বাবা! সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে এই মন্ত্রই তোমার আশ্রয়, এই মন্ত্র ও মূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে জাগরিত রাখিতে পারিলে, ত্রিলোকী তলে তোমার আর কোন ভাবনা থাকিবেনা, জগতে কিছুরই অভাব হইবে না, ত্রিতাপতপ্ত মনপ্রাণ জুড়াইতে হইলে সদা সর্ব্বদা একান্ত মনে এই মহামন্ত্র জপ করিও—এই বীজমন্ত্রের মধ্যেই তোমার জগন্মোহন কমললোচন, নয়নাভিরাম শ্রীরামের মূর্ত্তি বিরাজিত দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দ, অতুলনীয় শান্তি অনুভব করিবে! হায়! এমন অপার্থিব অমৃত পাইয়া, তাহার আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া—আমি একি করিতেছি! স্বর্গীয় সুধায় বঞ্চিত হইয়া বিষ্ঠায় মজিতেছি! তুলসীদাস মুগ্ধচিত্ত হইয়া তীব্র কটাক্ষে রত্নাবলীর সেই সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"রত্নাবলী, প্রিয়তমে! এতদিনে তুমি আমার চৈতন্য সম্পাদন করলে—আমার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার তোমার তীব্র বচন-কষাঘাতে সহসা উন্মুক্ত হয়ে গেল! আজ

বুঝিলাম—তুমি আমার অজ্ঞাননাশিনী, সুশিক্ষাদায়িনী, যথার্থ সহধর্ম্মিনী! আজ জগৎ প্রপঞ্চের সমস্ত মায়া পাশ ছিন্ন হইয়াছে; তোমার তিরস্কার আজ পুরস্কাররূপে আমার প্রাণে ধর্ম্মের উৎস খুলিয়া দিয়াছে; দ্বিজজাতির কর্ত্তব্যের পথ আজ আমার নয়ন সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে—আহা কি সুন্দর! কি মনোরম পন্থা! যোগী-ঋষিগণ যে পন্থানুসরণ করে, গন্তব্যস্থানে গমন করিয়া ভবের সকল ভাবনা হতে অব্যাহতি পাইয়াছেন—সাধুসন্ন্যাসীগণ যে রমণীয় পথের পথিক হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন; এ যে সেই পথ, এই পথে যাইলে যে আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতার দর্শন লাভে মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে! সে চির সুন্দর নবজলধর মূর্ত্তি, ঐ যে আমার নয়নের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঐ যে আমার প্রেমময়ের প্রেম-পারাবার উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করিতেছে—ঐ যে আমার প্রাণের দেবতা তাহার মাঝখানে বসিয়া ডাকিতেছেন—কে দুঃখী, তাপি, পাপী, আয়—এই প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করে আয়—তোদের দারুণ ব্যথার উপশম করিয়া দিই! প্রিয়ে! আর না, আর না—আর দাঁড়াইবার সময় নাই, যাই—যাই—" পাগলের ন্যায় তুলসীদাস উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

রত্নাবলী স্বামার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন—হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন—"প্রভু! দাসী আমি, না জানিয়া অনেক কথা রাগের বশে বলিয়া ফেলিয়াছি—ক্ষমা কর, রক্ষা কর! বলিয়া হাত টানিতে লাগিলেন। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য ভাব একবার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলে—জগতের কোন বাধাই আর তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

তুলসীদাস বিভোর প্রাণে বলিলেন—"প্রিয়ে! নহ দাসী তুমি মোর,—জ্ঞানদাত্রী, শিক্ষাদাত্রী মহাগুরুরূপে আজ আমার চক্ষের আবরণ উন্মোচন

করিয়া দিলে—আর না, ছাড়—যাই যাই! বলিয়া তুলসীদাস আর কাহারও প্রতি চাহিলেন না। এত সাধের—এত স্নেহের—এত ভালবাসার রত্নাবলী ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—তথাপি আর তাহার প্রতি মায়ার সঞ্চার হইল না। প্রেম-বিরাগী সিদ্ধার্থ যেমন প্রেমময়ী গোপার প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া—সমস্ত রাজভোগে জলাঞ্জলী দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, আজ মহাত্মা তুলসীদাস বিবেক-বহ্নির তীব্র তেজে তেজীয়ান হইয়া, জগতের যাবতীয় মায়া পাশ ছেদন করিয়া—সেই রাত্রেই কোথায় উধাও হইয়া গেলেন।

রত্নাবলী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কন্যার কান্না শুনিয়া জননী দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রত্ন! একি, ধূলায় পড়িয়া এমন করিয়া কাঁদছিস্ কেন? কর্ত্তা ত ভাল আছেন; তিনি ত বেশ সজ্ঞানে কথা কহিতেছেন, তবে তুই কাঁদিয়া আকুল হচ্ছিস্ কেন? জননী মনে করিলেন—কন্যা বুঝি মুমূর্ষ পিতার অবস্থা দেখিয়া মনের আবেগে নির্জ্জনে আসিয়া কাঁদিতেছে, তাই তিনি সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—কেন কাঁদছিস্ মা! কর্ত্তা ত ভাল আছেন।"

রত্নাবলী জননীকে দেখিয়া আরও আকুল নয়নে প্রাণের আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা! সর্ব্বনাশ করেছি। তিনি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন—একদণ্ড চক্ষের আড় করেন না—আজ তাঁহাকে না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি, তাই তিনি আমার অদর্শন সহ্য কর্ত্তে না পেরে, এত দুর্য্যোগেও এই সুদূর পথ হেঁটে এতদূর এসেছিলেন কিন্তু আমি হঠাৎ রাগের বশবর্ত্তিনী হয়ে তাঁকে বলে ফেলেছি—"একদণ্ড কি আমায় না দেখলে থাকতে পার না, একটা স্ত্রীলোকের উপর এত আসক্তি কেন.

এইটে যদি ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি দিতে—ত্তা'হ'লে কত ভাল হ'ত, ইহকাল পরকালের কোন ভাবনা থাকতো না।" এই কথা শুনেই জানি না তাঁর প্রাণে কি ভাবান্তর হলো, তিনি আর এক দণ্ড না দাঁড়িয়ে—এই রাত্রেই কোথায় চলে গেলেন। মা—মা! আমার বৃদ্ধা শাশুড়ীর যে অন্ধের নয়ন স্বরূপ- তিনি কোথায় গেলেন! সত্য সত্যই কি তিনি গৃহত্যাগী হলেন—এই সামান্য কথায় কি তিনি দাসীকে পায়ে ঠেলে ফেল্‌লেন? বলিয়া রত্নাবলী আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

জননী লক্ষ্মীদেবী তুলসীদাসের একগুঁয়েমী জানিতেন—সে যাহা বলে, তার অন্যথা কখনই করেনা, তবে কি সত্যসত্যই স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে তুলসী আমার গৃহত্যাগী হবে কিন্তু এ রজনীতে ত আর কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ স্বামী মুমূর্ষ—এখন কে তাহার গমনে বাধা দেয়? বলদেও ত আজ আর আসিবে না; সে ঔষধাদি দিয়া বাড়ী গিয়াছে! লক্ষ্মীদেবী সাত পাঁচ ভাবিয়া মনে একটা বিষম খটকা লাগিলেও কন্যাকে বুঝাইয়া বলিলেন—মা! বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা; তুই সেজন্য কিছু ভাবিসনে, তুলসী নিশ্চয়ই রাগিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কাল না হয় বলদেওকে আবার তাঁর সন্ধানে একবার রাজাপুরে পাঠাব এখন, তার জন্য আর ভাবনা কি মা! রাত্রি অনেক হয়েছে, তুমি একটু ঘুমোওগে, আমি কর্ত্তার কাছে খানিকক্ষণ জাগিয়া থাকি, আমার একটু অবসাদ আসিলে তোমাকে তুলিয়া দিব। আর নিদ্রা! সে চক্ষে কি আর নিদ্রা আসে! তথাপি শোকাতুরা জননীর কথায় কোনও উত্তর না দিয়া রত্নাবলী ভিন্ন কক্ষে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

যেমনি স্বামী তার স্ত্রীও তেমনি। তুলসীদাস যেমন পত্নী-প্রিয়,

স্ত্রীর অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না—রত্নাবলীও তেমনি স্বামীর অনুগতা, স্বামীর বিরহ তাহার পক্ষে একান্ত অসহ্য, এইজন্য এতদিন তিনি স্বামীকে ছাড়িয়া পিত্রালয়ে আসিবার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেন নাই; কিন্তু কি করিবেন—আজ পিতার মুমূর্ষু অবস্থার কথা শুনিয়া না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই। পিতার শেষ দর্শন, তাঁহার অন্তিম সাধ পূরণ করা ত কন্যার অবশ্য কর্ত্তব্য; আর যে তাঁহার পুত্রাদি কিছুই নাই—রত্নাবলীই যে তাঁহার সব, এইজন্য দায়ে পড়িয়া আসিতে হইয়াছে কিন্তু তাহাতে যে এমন অমঙ্গল ঘটিবে—তাহা কে জানে?

রত্নাবলী একাকিনী কক্ষমধ্যে শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন—হায়! আমি কেন, এমন কথা বলিলাম, আসিয়াছিলেন—আহারাদি দিয়া গৃহে রাখিলেই হইত, কেন আমি না বুঝিয়া রাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে এত কথা বলিলাম! পণ্ডিত তিনি, প্রেমিকের অগ্রগণ্য তিনি, হঠাৎ ভিন্ন ভাবে ফিরিয়া পড়িলেন, আমার কথা অন্য প্রকারে গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন—হায়! তিনি কি আর ফিরিবেন না, আর কি দাসীকে দাসী বলিয়া পদাশ্রয়ে তেমন করিয়া আশ্রয় দিবেন না! ওঃ! তাঁর প্রেমের কি গভীরতা, সামান্যা নগণ্যা আমি, আমার মত কত শত রমণীকে তাঁর মত গুণী, জ্ঞানী সুপুরুষ, ইচ্ছা করিলে দুপায়ে জড় কর্ত্তে পারেন কিন্তু তথাপি আমার জন্য তিনি কিনা করেছেন—আজকের ঘটনাই কি সামান্য! হায়! হায়! আমি কি করলাম, কি দুষ্ট সরস্বতীর বশে আমি স্ত্রী হইয়া এমন করুণাময় স্বামীকে উপদেশ দিতে গেলাম! হতভাগিনী আমি কি করিতে কি করিলাম! ছিঃ ছিঃ এখনও আমি ঘরের মধ্যে সুখশয্যায় শায়িতা—আর স্বামী আমার সিক্তবস্ত্রে অনাহারে এই দারুণ দুর্য্যোগে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! না শয্যা আর আমার উপযুক্ত

নয়, এ কণ্টকময় বোধ হচ্ছে! গৃহে, আ-
গৃহত্যাগী—উদাসী, তার স্ত্রীর এত সুখ
কি করি, কোথা যাই, কোথায় গেলে তাঁকে ..
তিনি জন্মের মত দাসীকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে..,
পীড়িত, নতুবা এ কথা শুনিলে কি তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন?
হায়! আমি এখন কি করি!

দারুণ দুশ্চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইয়াছে। রত্নাবলী আর গৃহের মধ্যে শয্যায় শয়ান থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। রাত্রির এই প্রথম যাম—শেষ হইতে এখন অনেক বাকি, আকাশ আবার মেঘযুক্ত হইতেছে; চাঁদের কিরণও তত জোর নয়! রত্নাবলী কাহাকেও কিছু না বলিয়া পাটী পাটী করিয়া সদর দরজা খুলিয়া বাটীর বাহির হইলেন। ধরমপুরের রাস্তা-ঘাট তাঁহার সমস্ত জানা ছিল—এই পল্লীজননীর কোলে তিনি আশৈশব মানুষ হইয়াছেন—ইহার অলিগলি, স্থান-অস্থান সকলই তাঁহার জানা, কোন দিক দিয়া কোথায় যাইলে, কোথায় যাওয়া যায়, তাহা তিনি জানেন—তবে কুলের কুলবধূ বলিয়া একাকিনী যাওয়া, গৃহত্যাগ করা উচিৎ নয় কিন্তু যখন হৃদয়ে দারুণ বিরহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, স্বামীর মর্ম্মান্তিক বাক্য যখন শেলের ন্যায় তাঁহার কোমল হৃদয়ে বিদ্ধ করিতেছে—তখন তাঁহার হ্রস্বদীর্ঘ, ভালমন্দ, হিতাহিত জ্ঞান কোথায়? স্বামী এখনও বেশী দূর যাইতে পারেন নাই—কাল হইলে হয়ত বহু দূরে গিয়া পড়িবেন—খুঁজিবার উপায় থাকিবে না; এখন যাইলে পায়ে ধরিয়া ফিরাইতে পারিবেন, এই আশায় রত্নাবলী কাহাকেও না বলিয়া রজনীর সেই গভীর গম্ভীর নিস্তব্ধ যামে মনের আবেগে একাকিনী স্বামী অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দস্যুহস্তে

পতিবিরহ-বিধুরা রত্নাবলীর গৃহবাস অসহ্য হইল—তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেই রাত্রেই একাকিনী গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তিনি পতিকে দেবতা অপেক্ষাও মান্য করিতেন, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তিনি কখনও কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া তাঁহার প্রাণে কোনপ্রকার কষ্ট প্রদান করেন নাই বা মনে কোনপ্রকার অসন্তোষ উৎপাদন করেন নাই; দুইটীতে একটী হইয়া—দুই কায়ায় একপ্রাণ রূপে আবদ্ধ থাকিয়া এতদিনে মনের আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। আজ কি কুক্ষণে তাঁহার মুখ দিয়া যে স্বামীর প্রতি এরূপ উপদেশ বাণী নির্গত হইল—তাহা তিনি বলিতে পারেন না। স্বামীর কথার উপর, তাঁহার কার্য্যের প্রতি তিনি একদিনের জন্য প্রতিবাদ করেন নাই—কোন-প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করাও তাঁহার রুচিবিরুদ্ধ, স্বামী দেবতা, আমি তাঁর অনুগতা দাসী—তাঁহার কার্য্যের দোষ দেখা বা তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। হায়! আজ কেন এ পাপ প্রতিবাদ বাণী মুখে আনিয়া তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা দিলাম, তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিলাম।

রত্নাবলীর প্রাণ অস্থির—মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানিতেছে না; আবার কেমন করিয়া তাঁহার দর্শন পাইব—তাঁহার চরণতলে আশ্রয় লইয়া আবার কেমন করিয়া এ তাপিত মনপ্রাণ জুড়াইব, আমি ত

তাহার চিন্তা করিতে করিতে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু যাইব কোথা; স্বামীর যাইবার স্থানের ত একটা স্থিরতা নাই? সতী মনের আবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন মাত্র। দেখা পাইলে তাঁহার পদে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন—কাকুতি-মিনতি করিয়া ঘরে ফিরাইবেন—এই আশা, কিন্তু কোথা তিনি? ভগবান, আর কি তাঁহার দেখা পাইব না—আর কি তিনি এ দাসীকে "রতু আমার, প্রাণেশ্বরী আমার" বলিয়া চরণে স্থান দিবেন না—হায়! অভাগিনী আমি, না বুঝিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি,—নিজেত আজীবন এই পাপে পুড়িয়া মরিবই এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ নিরপরাধিনী শাশুড়ীকেও পুড়াইয়া মারিব। তাঁহার যে আর পুত্র নাই—এ সংবাদ শুনিলে কি তিনি আর জীবিত থাকিবেন—হায়, আমি কি করিলাম, নিজে মরিলাম—আর একজন নিরপরাধিনী বৃদ্ধাকেও প্রাণে মারিলাম—রত্নাবলী কাঁদিতে কাঁদিতে সদর রাস্তা ধরিয়া চলিয়া-ছেন। টিপ্-টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে—পথে লোকজন কেহ নাই।

পথে যাইতে যাইতে রত্নাবলী মনে করিলেন—তিনি এ সদর রাস্তা দিয়া কখনই যাইবেন না—পাছে কাহার সহিত দেখা হয়। আর যদি গৃহে যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়—তাহা হইলেও মাঠের পথ ধরিতে হইবে, অতএব আমি আর রাজপথ ধরিয়া কতদূর যাইব? মাঠের পথ ধরিয়া যাই—তাহা হইলে অনেকদূর অবধি লক্ষ্য হইবে—দেখিতে পাই ভাল, নতুবা বাড়ীতে গিয়া সত্বর শাশুড়ীকে এই সংবাদ দিলে তিনি অচিরে তাহার প্রতিকার করিতে পারি-বেন—নানাপ্রকার লোকজন ত তাঁহার বাধ্য আছে?

মনের আবেগে রত্নাবলী প্রান্তরের পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। কতকদূর যাইতে যাইতে এক ভীষণ শ্মশানের মাঝখানে

আসিয়া পড়িলেন। তখন বৃষ্টিও খুব জোরে পড়িতে লাগিল। এতদূর পথ অতিবাহিত করা কখন অভ্যাস নাই—তাহার উপর ভয়ানক বৃষ্টি; সতী-বিবশা হইয়া অবসাদগ্রস্ত দেহে এক বৃক্ষতলায় আশ্রয় লইলেন। এই সময় কতকগুলি তস্কর সময় বুঝিয়া গ্রামান্তর হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য চুরি করিয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্ত্রীলোকের রূপ ও অলঙ্কার পথের শত্রু। সালঙ্কারা রূপবতী স্ত্রীলোককে অরণ্য মাঝারে একাকিনী দেখিলে—সহজ লোকেরই যখন মনে দুরভিসন্ধির উদয় হয়, তখন এত দস্যু—তস্কর, তাহাদের প্রাণে যে উৎসাহ জাগিয়া উঠিবে, তাহারা যে রূপবতী যুবতীর সর্ব্বনাশ করিয়া অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করিবে—তাহার আর বিচিত্র কি? বিদ্যুতের আলোকে তাহারা ঐ অসূর্য্যম্পশ্যা রত্নাবলীকে দেখিয়া লুব্ধচিত্তে নিকটে উপস্থিত হইল। রত্নাবলী তখন অবসাদগ্রস্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন—বিপদ ঘনীভূত দেখিয়া তিনি একেবারে জড়সড় হইয়া গিয়াছেন। এতরাত্রে এই ভীষণ শ্মশানে এমন রূপবতী স্ত্রীলোক দেখিয়া দস্যুগণও প্রথমে তাঁহাকে ভূত বা প্রেত বলিয়া ভীত হইয়াছিল—কেহই সাহস করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ভরসা করিতেছিল না কিন্তু দস্যুপতি নির্ভীকচিত্তে অনুচরগণকে সাহস প্রদান করিয়া বলিল—আরে ভয় কি, আমরা এত লোক থাকৃতে কি ভূতে তোর রক্ত খাবে? একজন দস্যু বলিল—না সর্দ্দার, ও যখন নড়ে চড়ে না—তখন নিশ্চয়ই ভূত, আমি কিছুতেই এগুতে পারবো না, তুমি যদি পারো ত দেখো।

সর্দ্দার।—তবেই দস্যুগিরি করে খেয়েছিস—আর কি; এত ভয় যদি, তবে তুই আমানী হাঁড়ির ভিতর লুকুগে যা; সর্ সর্ আমি

দেখি। বলিয়া সর্দ্দার অগ্রসর হইয়া বলিল—এ মাগী! তুই এখানে একলা কি করছিস্?

আর কথা না কহিলে নয় দেখিয়া রত্নাবলী ভয় বিহ্বল প্রাণে বলিল—বাবা! আমি ধর্ম্মপুরের দীনবন্ধু পাঠকের মেয়ে—শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছিলাম, জল ঝড়ে ছোড়ভঙ্গ হয়ে এখানে এসে পড়িছি। বাবা! তোমরা আমাকে রক্ষা করো। যখন তাহারা দেখিল—এ ভূত-প্রেত নয়—মানুষ, তখন একজন একলম্ফে তাঁহার ঘাড়ে পড়িল। যে অগ্রে লইতে পারিবে, তাহারই হইবে, আর যায় কোথায়!

রত্নাবলী পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—পাষণ্ড! স্পর্শ করিস্ না—যদি অলঙ্কারের লোভ থাকে, তাহা হইলে বল—আমি এখনি সমস্ত খুলিয়া দিতেছি, তবে স্পর্শ করিলে আর রক্ষা থাকিবে না কিন্তু সে কথা শুনে কে? অপর একজন বল-পূর্ব্বক তাঁহার গাত্র হইতে গহনা খুলিয়া লইয়া সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিল। রত্নাবলী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক—বাঙ্গালীর মত নিতান্ত দুর্ব্বল নহেন। আক্রমণকারীকে পুনরায় পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিলেন কিন্তু একাকিনী স্ত্রীলোক, পাঁচ সাতজন দস্যুর সহিত কতক্ষণ যুঝিতে পারিবেন? এইবার তাহারা কয়েকজনে ধরিয়া তাঁহাকে ভূমে পাতিত করিয়া ফেলিল,রত্নাবলী অনন্যোপায় হইয়া তখন অনাথশরণ দীনের বন্ধু দীননাথকে ডাকিয়া বলিলেন—ভগবান! পতি-হারা আমি অনাথিনী—মনের আবেগে স্বামীর দর্শন আশায় বাটীর বাহির হইয়া এই বিপদে পড়িয়াছি—ভগবান, এ সময় তুমি রক্ষা না করিলে আমার সর্ব্বনাশ হয়—মধুসূদন রক্ষা কর ঠাকুর, আমার কেউ নাই; ভগবান রক্ষা কর!

কামোন্মত্ত দস্যুগণ যখন সেই ললামভূতা রমণীর অলঙ্কারাদি হরণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত—আর সতী যখন

প্রাণের কপাট খুলিয়া উচ্চৈস্বরে "ভগবান রক্ষা কর" বলিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন—তখন কি আর অনাথনাথ ভগবান থাকিতে পারেন? ঠিক সেই সময় ভিন্নদিক হইতে "খাঁবো খাঁবো, রক্ত খাঁবো, ঘাঁড় ভেঙ্গে রক্ত খাঁবো" বলিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। একে দুর্য্যোগ, তায় দুরন্ত শ্মশান—চারিদিকে নরমুণ্ড, অস্থি প্রভৃতির ছড়াছড়ি—তাহার উপর ঐ অনুনাসিক শব্দ শুনিয়া দস্যুগণের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, তাহারা প্রাণভয়ে রত্নাবলীকে ছাড়িয়া "বাপ্‌রে পালারে, ভূতরে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

বিপদে পড়িয়া একান্তমনে বিপদতারণ ভগবানকে ডাকিলে তিনি ভক্তকে কেমন করিয়া উদ্ধার করেন, দেখিয়া রত্নাবলী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং বলিলেন—দেবতা দয়া না করিলে আজ আমার সতীত্ব রক্ষার কোনও উপায় ছিল না। ভগবান ভূতনাথ বুঝি আজ সতীর গতি ভগবতীর আজ্ঞায় ভূত পাঠাইয়া আমার সতীত্ব রক্ষা করিলেন। প্রভু! তুমি যে হও, সে হও, ভূত-প্রেত যাহাই হও—তুমি আমার দেবতা, আজ কৃপা করে অমূল্য সতীত্ব ধন সহ আমার প্রাণরক্ষা করিলে, আমি তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। এক্ষণে অগ্রসর হইয়া দর্শন দানে আমায় কৃতার্থ কর!

ঝোঁপের আড়াল হইতে একটী মনুষ্য মূর্ত্তি ধীরে ধীরে নিকটে আসিল, রমণীর গলার স্বর শুনিয়া সে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকাইলে রমণীর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আগন্তুক মনুষ্য মূর্ত্তি অতিশয় বিস্ময় সহকারে বলিল—একে, আমার বৌদিদি; তুমি আজ এখানে কেন! দাদা কোথায়; তাঁহার ও তোমার পিতার কুশলত?

সোদরপ্রতিম পরমাত্মীয় দুঃখীরামকে দেখিয়া এত দুরাশার মধ্যেও

রত্নাবলীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন—ঠাকুরপো! ভগবান আজ তোমার রূপ ধরে এসে আমার জাতকুল রক্ষা করিলেন। ভাই, ভাই! এত রাত্রে তুমি এতদূরে—এ শ্মশানে কেন?

দুঃখী। সে কথা বল্‌ছি, আগে বল, আমার প্রাণের তুলসীদাদার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? তবে কি তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাই কি তুমি এতরাত্রে শ্মশানে এসেছিলে—খুড়ীমার মুখে তাঁর ত খারাপ অবস্থার কথা শুনে এসেছিলাম, তাঁর কি কিছু হইয়াছে?

রত্ন। না ঠাকুরপো! সে সব কিছু নয়—তোমার দাদা বিষম রেগে, এই গভীর রাত্রে জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এসে বল্লেন—তুমি আমাকে না বলে এসেছো—অতএব এখনি চল, আমি তোমাকে এখনি নিয়ে যাব। ভাই! আমি জীবনে কখন তাঁর উপর রাগ করিনি বা তাঁর কথার অবাধ্য হইনি। কিন্তু আজ মাত্র এসেছি, তাও স্বইচ্ছায় নয়, বাপের অবস্থা বড় খারাপ, দুই একদিন থাক্‌বো, তাঁকে একটু সুস্থ করে, তারপর চলে যাবো—কিন্তু তাঁর আর দেরি সয় না, তিনি বল্লেন—আমি একদণ্ড তোমাকে ছেড়ে থাকৃতে পার্ব্বো না। তাঁর কথা শুনে, আমার প্রাণ একটু খারাপ হয়ে গেলো, মুখ দিয়ে কস্‌ করে বেরিয়ে পড়লো—"দেখ, এই ভালবাসাটা যদি আমার উপর না দিয়ে, ভগবান রামচন্দ্রের পদে দিতে, তাহলে আর ভবের ভাবনা থাকতো না"। এই কথা বল্‌বামাত্রই তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন—তারপর আমার দিকে অতি কমনীয়ভাবে বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করে বল্লেন—রত্ন! তুমি আমার যথার্থ স্ত্রী—আজ তুমি ঠিক সহধর্ম্মিনীর মত কাজ করলে—আমার অন্ধ চক্ষু ফুটিয়ে দিলে, আজ তুমি আমার জ্ঞান-গুরু—আর না, আর না, তবে যাই—আর না, বলিয়া সেই ভিজে কাপড়ে ক্ষণমাত্র দাঁড়ালেন না, ছুটিয়া বাড়ীর বার হয়ে

গেলেন। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম, মা বেরিয়ে এলেন, তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বল্লাম, তিনি বল্লেন—এত রাত্রে আর কি হবে, কর্ত্তা ত শয্যাগত, বলদেওও নাই, কাল সকালে খোঁজ নেবো। এই বলে তিনি আমাকে আশা দিয়ে বাবার কাছে গেলেন। কিন্তু আমি আর থাকতে পারলেম না, প্রাণ উদাস হয়ে পড়লো, মন কেবল খারাপ ভাবনাই ভাবতে লাগ্‌লো, কিছুতেই ঘরে থাকৃতে না পেরে রাজাপুর যাবার জন্য বাহির হয়ে, এই বিপদে পড়েছিলাম। তুমি আজ আমায় যে বিপদ থেকে রক্ষা করলে, জীবনেও তাহা শোধ হবে না, হ্যাঁ ঠাকুরপো! তবে তিনি বোধ হয় বাড়ী গিয়েছেন? অতীব আগ্রহের সহিত রত্নাবলী স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুঃখী। তিনি বাড়ী গেলে আর আমি এ দুর্য্যোগে এতদূর আস্‌বো কেন? তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়ায় সেখানেও মায়ে-পোয়ে ঝগড়া করে; দাদা বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন। আস্‌বার সময় বলে এসেছেন—"এই জন্মের মত চল্লাম" শুনে বুড়ি ত কেঁদে কেটে অস্থির। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীতে গিয়ে বল্লেন—দুঃখী বাবা! একবার ধর্ম্মপুরে যা, দেখে আয় সে সেখানে গেছে কিনা, নইলে ত আমি ঘরে থাকৃতে পারবো না, আমাকেই যেতে হবে। আমি আর কি করি—তাঁর কষ্ট দেখে বেরিয়ে আস্‌তে হলো। পথ ত ভাল জানি না—তার উপর এই দুর্য্যোগ—আস্তে আস্তে বিপথে এসে, এই শ্মশানে পড়েছি—এখন দেখ্‌ছি, ভগবান এ পথে এনে ভালই করেছেন।

স্বামী গৃহে গমন করেন নাই শুনিয়া রত্নাবলীর হৃদয় আরও ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আশা করিয়াছিলেন—তিনি নিশ্চয় গৃহে গিয়াছেন কিন্তু দুঃখীর মুখে "তিনি গৃহে গমন করেন নাই" শুনিয়া পতিগতপ্রাণা রত্নাবলী বিষম দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই শ্মশানেই বসিয়া পড়িলেন।

হায় ঠাকুরপো! তবে আর কিসের জন্য সংসার, কেন আমাকে দস্যুগণ প্রাণে মারিয়া ফেলিল না—আমি আর এ পৃথিবীতে কেমন করিয়া থাকিব; কাহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া নারীজন্ম সফল করিব, কে আর আমাকে সেই স্বর্গীয় সোহাগে পরিতুষ্ট করিবে! দেবর! পতিই নারীর ইহ ও পরকালের দেবতা, তাঁহাকে না পাইলে আমি জীবনই রাখিব না।

দুঃখীরাম জানিতেন—রত্নাবলী কিরূপ প্রাণ দিয়া দাদাকে ভাল বাসিতেন। তুলসীদাস যেমন পত্নীকে একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, রত্নাবলীও তদ্রুপ, পতি-বিরহ যে তাঁহার একান্ত অসহ্য, দাদাকে না পাইলে বউদিদিকে এবং তাহার জননীকে বাঁচান দায় হইবে! দুঃখীরাম নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—বৌদিদি! এখানে আর দেরি কল্লে চল্‌বে না। তাঁকে ত খুঁজতে হবে—চল, এখন তোমার বাপেরবাড়ী যাই—সেখানে তোমার বাপকে দেখে, আমি খুব ভোরে ভোরেই এ গ্রাম সে গ্রাম খুজ্‌বো। তোমার ভাবনা কি? যখন আমি রয়েছি, তখন তিনি যাবেন কোথা—যেখান থেকে হউক তাঁকে বাহির কর্ব্বোই!

দুঃখীরামের কার্য্য-কলাপ রত্নাবলী জানিতেন—অসাধ্য সাধন করিতে দুঃখীরাম বিশেষ পারদর্শী, গ্রামে তিনি অনেকবার তাহার এইরূপ অসীম সাহসিকতার পরিচয় পাইয়াছিলেন—কাজেই তাহার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া রত্নাবলী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে উঠিলেন। দুঃখীরাম বলিলেন—রাজাপুর অনেকদূর, এ রাত্রে তথায় যাইতে পারা যাইবে না—এইজন্য তোমার বাপেরবাড়ীই চল। যখন এসেছ—তখন বাপের ওরূপ অবস্থা দেখে যাওয়া উচিত নয়। আমি সমস্ত সকালবেলাটা ঘুরলে, তাঁকে খুজে বার কর্ত্তে পার্ব্বোই—তিনি যাবেন কোথায়?

চৌরগণ যাইবার সময় অনেক লুষ্ঠিত দ্রব্য ফেলিয়া গিয়াছিল। রত্নাবলীর অলঙ্কারগুলিও তাহারা লইয়া যাইতে পারে নাই। দুঃখী-রাম তাহা কুড়াইতে লাগিলেন। রত্নাবলী বলিলেন—ঠাকুরপো! যতদিন তিনি না আসিবেন—যতদিন তাঁহার দর্শন না পাইব—ততদিন আমি আর ও পাপ দ্রব্য স্পর্শ করিব না—তুমি লইয়া যাহা হয় করো! স্বামী যার গৃহত্যাগী-বিরাগী, রত্ন-অলঙ্কার তার কি শোভা বাড়াইবে, আর তাহা পরিয়াই বা কাহার মনস্তুষ্টি করিব? স্বামীই ত স্ত্রীলোকের অলঙ্কার, আমার সে অলঙ্কার যখন ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন পার্থিব সাজসজ্জা আর আমি করিব না, এ রূপকেও বিরূপ করিব—বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর বিরহ কেননা সতীর অসহ্য হইয়াছে—জগত সংসার যখন তাঁহার নিকট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ—তখন কিছার স্বর্ণের অলঙ্কার—কিছার দেহের সৌন্দর্য্য-শোভা!

রত্নাবলীর ভাব দেখিয়া দুঃখীর প্রাণ গভীর দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইল, না জানি সতী স্বামী-বিরহের এই প্রথম আঘাতেই কি ভয়ানক অনর্থপাত করিয়া বসিবে! তিনি কতপ্রকারে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাপেরবাড়ী লইয়া গেলেন। রাত্রিকালে কন্যাকে গৃহে না দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী প্রমাদ গণিতেছিলেন—এক্ষণে তাহাকে আবার গৃহাগতা দেখিয়া দেবতার চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করিলেন।

দুঃখী তেওয়ারী দীনবন্ধুর অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন—আজিকার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় কিন্তু কি করিবেন—এদিক দেখিতে গেলেও ওদিক হয় না, কাজেই তিনি অতি প্রত্যুষে সকলকে সান্ত্বনা করিয়া দাদার অন্বেষণে বাহির হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

কাশীর পথে

একান্ত অনুরাগই মনুষ্যত্ব-বিকাশের পূর্ব্ব লক্ষণ। যাহার প্রতিই তাহা ন্যস্ত হউক না কেন, যাহাতেই মন মজিয়া পড়ুক না কেন— একদিন না একদিন তাহাতে সুফল ফলিবেই ফলিবে। কুপথে একান্ত অনুরাগী হইয়া হটাৎ কোনরূপ ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া পড়িলেও তাহার আর সৌভাগ্যের সীমা থাকে না. তখন প্রাণ-মন একেবারে তীব্র বৈরাগ্যে বিভোর হইয়া, সাংসারীক সমস্ত কামনা-বাসনা, সমস্ত আকাঙ্খা-উন্মাদনা বিসর্জ্জন দিয়া, ভগবানের প্রেম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই সামান্য দাম্পত্য প্রণয়, তখন রসময়ের স্বর্গীয় প্রেমরসে রসিয়া মানুষকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহার ঠিক থাকে না। এইরূপ সামান্য দাম্পত্য প্রেমই কত কত সাধককে ভগবান উচ্চস্তরে লইয়া গিয়া দেবত্ব দান করিয়াছে। সংসারের : এতদূর মাখা অন্তর-কন্দর স্বর্গীয় প্রেমজ্যোতিতে আলোকিত গোঁয়াইলেও জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। হয়—ভগবান

সামান্য বারবণিতা চিন্তামণির প্রেমরসে রসিয়া বিল্বকোলে টানিয়া কিরূপ হইয়াছিল—তাহা কে না জানে? রজকিনী রামীঅসময়ে তাহার হইয়া শেষে চণ্ডীদাস যে কি শক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন করিয়া তাহার লেরই বিদিত? প্রণয়ানুরাগী সাধক যখন বুঝিতে পারে বীজ উপ্ত হইয়া অবস্থায় আছে—ইহার সুখ ক্ষণিকমাত্র, ইন্দ্রিয় চপিড়ে। দুই দিন পূর্ব্বে যায় কিন্তু ভগবৎ প্রেমের কূল-কিনারা নাই—ব্যক্ত হইয়াছিলেন, পঙ্কীর

প্রণয় শিকল পায়ে পরিয়া সংসারকে স্বর্গ বলিয়া অনুমান করিতেছিলেন, ইহার প্রত্যেক বস্তুতে যিনি ত্রিদিবের আনন্দ লাভ করিয়া প্রমত্তচিত্তে একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, আজ তাঁহার প্রাণের এই ভাব দেখিলে, অবহেলায় সংসারের মায়াবন্ধন এইরূপে শিথিল করিতে দেখিলে সহজেই মনে হয়—এসকল কার্য্যে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি, আর ঐশ্বরীক কৃপায় ব্যতীত কেবল তপস্যা বা কেবল ব্রত উপবাস প্রভৃতিতে কিছু হয় না! হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া একবার মাত্র ডাকে যে কাজ হয়—অপ্রেমিক-জীবন, ভক্তিভাব বিহীন প্রাণ বহুজন্ম চেষ্টা করিলেও সেই প্রাণের ধনকে পাইতে পারে না। এইজন্ত পরম ভক্তিমতী সাধিকা মিরাদেবী বলিয়া গিয়াছেন :——

তিরণ্ ভোণ্‌কে হরি মিল্‌তে তো, বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিল্‌তে তো, বহুৎ রহা হায় খোজা,
দুধ পিকে হরি মিল্‌তে তো, বহুৎ বৎস বালা ;
মিরা কহে বিনা প্রেম-সে না মিলে নন্দলালা।

ক্রমশঃ পথ অতিবাহিত করিয়া তুলসীদাস প্রায় দুইমাস পরে কাশীধামের নিকটবর্ত্তী এক প্রান্তরের বটবৃক্ষ ছায়ায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কোথায় যাই, কে আমার প্রাণের পিপাসা মিটাইবার উপায় বলিয়া দেয়, কে আমার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমের প্রবল বন্যা তুলিয়া সেই প্রেমময়ের রাজত্বে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়? আকাঙ্ক্ষার দারুণ অনলে পুড়িয়া প্রাণ ছার খার হইতেছে; কে আমাকে নবদুর্ব্বাদল শ্যাম সেই ধনুর্ব্বাণধারী ভগবান রামচন্দ্রের সন্ধান বলিয়া দেয়, আমার প্রাণের দেবতার সন্ধান বলিয়া দিয়া কে আমার ওষ্ঠাগত প্রাণে শান্তির সঞ্চার করে? অনাহারে অনি-

প্রায়, বহুদূর আসিয়াছি, বোধ হয় পবিত্র বারানসী পৌঁছিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। এই ত অনেক লোকই এই পথে যাওয়া-আসা করিতেছে, তবে কি পবিত্র কাশীধাম অতি সন্নিকট?

তুলসীদাস সন্ধ্যার প্রাক্কালে বটবৃক্ষ মূলে বসিয়া অপার চিন্তা সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, আহার নিদ্রার অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তথাপি দৃকপাত নাই। দেহের অবস্থার জন্য প্রাণের ক্ষুৎপিপাসার জন্য একদিনও তিনি কাতর হন নাই—পথে আসিতে আসিতে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইয়াছেন, তাহাতেই ক্ষুৎপিপাসা একপ্রকার মিটাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে এতদূর আসিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় যেখানে আশ্রয় পাইয়াছেন—সেইখানেই ধূলি শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। এত আদরে প্রতিপালিত তুলসী-দাস একদিনের জন্য এ দারুণ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই—তাঁহার প্রাণ এমনি কষ্টসহিষ্ণু—মন এমনি ধৈর্য্যশীল হইয়া পড়িয়াছে।

ঠিক এই সময় একজন সন্ন্যাসীও সেই পথ দিয়া কাশীধামে যাইতেছিলেন—তুলসীদাসের নবযৌবনে তাঁহার প্রাণের একান্ত অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশেষ সন্তুষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! কে তুমি, কোথা হতে আস্ছো এবং যাইবেই বা কোথায়?

তুলসীদাস বহুদিনের পর এই তপঃপ্রভাববিশিষ্ট সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভক্তি-বিনম্রচিত্তে প্রণাম করিয়া বলিলেন—প্রভো! কোথা যাব, তাহার কোন স্থিরতা নাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হতে আস্‌ছি, আমি কে তা আমি নিজেই জানি না, আমার আত্ম-পরিচয় কিছু নাই—অতি সামান্য ব্যক্তি, তবে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ

করে, এই মাংসপিণ্ডময় দেহভারবহন করে, এই নশ্বর সংসারে দিক্ ভ্রান্ত হয়ে ঘুরিয়া বেড়াচ্ছি।

সন্ন্যাসী। বৎস! দেখছি তুমি যুবক, এই অল্প বয়সে সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে কি আকাঙ্ক্ষায় গৃহত্যাগ করেছ?

তুলসী। প্রভো! প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বড় কঠিন—জগতের কোন বস্তুতে আর আমার চিত্ত সংযত হইতে চাহে না - বিনা সেই ভকতবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল! ঠাকুর। বলে দিন, আমি কি আমার সেই প্রাণের ধনকে পাইয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব?

শ্রীরামের পদে যুবক তুলসীদাসের একান্ত ভক্তি, অসীম অনুরাগ দেখিয়া সন্ন্যাসী আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন—বৎস! যদি দেখিবার সাধ একান্ত হয়ে থাকে—মন যদি তন্ময় ভাবেই গঠিত কর্ত্তে পেরে থাক, তবে তাঁর দেখা পাবার আর ভাবনা কি, কিন্তু এমন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলেত হইবে না, একস্থানে নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, অনবরত পথে পথে ঘুরিলে চিত্ত স্থির হইবে কেন? যদি বাধা না থাকে—আমার আশ্রমে চল—এই কাশীধামের একটী নিভৃত পল্লীতেই আমার আশ্রম, ছাত্র নির্ব্বিশেষ তোমাকে শাস্ত্র-শিক্ষা এবং সাধনার ক্রামশিক্ষা প্রদান করিব।

তুলসীদাস হাতে স্বর্গ পাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র যে তাহাকে দয়া করিবেন—তাঁহার অভীষ্ট যে পূর্ণ হইবে—এইখানে তাহার সুত্রপাত দেখিয়া তিনি পুলকিত চিত্তে তাঁহার অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন—প্রভো! একস্থানে স্থিতি হইতে না পারিলে কোন কার্য্যই হইবে না—তাহা জানি, আর শাস্ত্রপাঠ ও সাধনা-ভজন অভ্যাস করাই আমার একান্ত বাসনা, ঠাকুর! আজ বিনা আয়াসে

আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আশ্রয় পাইয়া বুঝিলাম—ইহা রঘুনাথেরই কৃপা, চলুন, প্রভো! কোথায় যাইতে হইবে?

এইরূপ তৈয়ারী ছাত্র পাইলে, এইরূপ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন যুবকের গুরু হইতে পারিলে—অধ্যাপনা কার্য্যেও যথেষ্ট আনন্দ হইবে; তাহার পরে এ যুবক যেরূপ প্রেমিক দেখিতেছি, রাম নাম করিতে করিতে ইহার নয়ন যুগল হইতে যেরূপ প্রেমাশ্রু প্লাবিত হইতেছে—যদি বাস্তবিক ইহা প্রাণের ভাবে হয়, এ যদি যথার্থ এইরূপভাবে সুগঠিত চিত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধনার সুগম পথ প্রদর্শন করিলে যুবক সহজেই উন্নতি মার্গে উত্তীর্ণ হইয়া, কালে ভগবান রাম চন্দ্রের পরম ভক্তরূপে সংসার পবিত্র করিতে পারিবে—আর আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি এরূপ একজন ভক্তবীরের সহায়তা করিয়াও জীবন ধন্য করিতে পারিবে। কিয়দ্দিন একত্র বসবাস না করিলে ত লোক চেনা যায় না কিন্তু বাহ্যিক দেখিয়া যতদূর অনুমান হয়, তাহাতে বোধ হয়, উত্তরকালে এই যুবক একজন পরম ভক্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় জগতে অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিবে। সন্ন্যাসী আর কিছু না বলিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে তুলসীদাসকে সঙ্গে করিয়া কাশীর মধ্যবর্ত্তী নিজের নিভৃত আশ্রমে লইয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুত্রশোক

পরদিন আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন—না আসিলে পুত্রগতপ্রাণা তুলসীদেবীর জীবনরক্ষা করা দায় হইবে। দুঃখীরাম এইজন্য আসিয়াছেন—নতুবা প্রাণের বন্ধু তুলসীদাসকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া দুঃখীরাম কখনও দুই একদিনের মধ্যে রাজাপুরে ফিরিতে পারিতেন না। কিন্তু কি করিবেন—দাদা ত চলিয়া গিয়াছেন—এখন খুড়ীকে ভিন্ন প্রকারে বুঝাইয়া, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়া তবে ত দাদার সন্ধানে যাইতে হইবে? নতুবা বুড়ী যে পরদিন কোন সংবাদ না পেলে, এক করিতে আর এক করিয়া বসিবে—তাঁর ত সংসারে মায়া নাই, স্বামী-বিয়োগের পর হইতে কেমন যেন আড়ু আড়ু ছাড়ু ছাড়ু বিপরীত ভাব, তবে ছেলের মায়া নাকি অত্যন্ত বেশী—তাই এতদিন একপ্রকার কাদায় গুণ ফেলিয়া সংসারে আছেন।

তুলসী দাদার সংবাদ না দিয়া আমি যদি চলিয়া যাই, তাহা হইলে পরদিন খুড়ীমা ধর্ম্মপুর ছুটিবেন, সেখানে দেখিতে না পাইলে—নিশ্চয়ই জীবন ক্ষয় করিবেন। কাজেই দুঃখীরাম পরদিন প্রাতঃ-কালে আসিয়া স্তোক দিয়া বলিয়াছেন—খুড়ীমা! দাদা কাশীতে এক পণ্ডিতের কাছে বেদান্তশাস্ত্র পড়তে গেলেন, আমাকে বল্লেন—দুঃখী! তুই গিয়ে মায়ের সংসার খরচের মত জিনিষপত্র কিনে দিয়ে, বউকে তাঁর কাছে রেখে আয়, মাস কয়েক পড়লেই বেশ পাকা হতে পারা যাবে—তাহা হইলে শিষ্য-যজমানের কাছে আর অত

ঠকৃতে হবে না—এইজন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কাশী চলে গেলেন।

বাড়ীতে আসিয়া দুঃখীরাম এইরূপ বাক্যে তুলসীদেবীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা কি হয়? মায়ের প্রাণ এরূপ মিথ্যা স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা মানে না, এ জগতে মায়ের প্রাণ পুত্রের ভালমন্দ আগে জানিতে পারে। এমন অতুলনীয়া, সন্তানের এমন প্রিয়কারিণী দেবী কি আর জগতে কেহ আছে? দুঃখী যতই গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন—তুলসীদেবী ততই নানাপ্রকার অবিশ্বাস করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া একপ্রকার শয্যাগত হইয়াছেন—আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন—অনবরত কেবল 'হা তুলসী—হা প্রাণের পুত্র, তুই কোথায় গেলি; আমি তোর মুখ চাহিয়া কর্ত্তার সহিত যাইতে পারি নাই, বাবা! তোর কি এই ধর্ম্ম হলো?' ইত্যাদি অশেষবিধ বিলাপ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন। দুঃখীর মামী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধাকে কত বুঝাইতেছে—পাড়ার লোক কত সান্ত্বনা দিতেছে কিন্তু সে কথা তাঁহার প্রাণে স্থান পাইতেছে না—তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়া ফেলিয়াছেন—অন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছেন।

যতই দিন যাইতেছে, দুঃখীর প্রাণ ততই অস্থির হইতেছে। শীঘ্র শীঘ্র বাটীর বাহির হইলে নিশ্চয়ই দাদাকে ধরিতে পারিতাম, কিন্তু যত বেশী দিন যাইবে, উদাস প্রাণে ততই তিনি বহু দূর দেশে যাইয়া পড়িবেন—তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তখন মহা দায় হইবে।

দুঃখীরাম একদিন বলিলেন—"খুড়ীমা! দাদা আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু এখানে বন্দোবস্ত না করিয়া বউদিদির বাপের

অবস্থা না দেখিয়া ত যাইতে পারি না—এইজন্য এত দেরী করছিলাম। এখন শুনিলাম—বউদিদির বাপ মারা গিয়েছেন। তাঁর আসতে দেরী হবে—মাকে একলা ফেলে—তাঁর শোকে সান্ত্বনা না দিয়ে ত তিনি আসতে পারিবেন না? আর আমিও এদিকে তোমাকে নিয়ে বিব্রতে পড়লাম—দাদা মনে কর্ব্বেন কি বল দেখি? তাঁর খাওয়া দাওয়ার কত কষ্ট হবে—নিজে রেঁধে খেয়ে কি আর লেখাপড়া শিক্ষা হয়? এতে অনেক সময় নষ্ট হলে—তাঁর লেখাপড়া শিখে ফিরতেও দেরী হবে। এখন তুমি কি বলো?"

দুঃখীরাম তুলসীদাসকে আনিতে যাইবে শুনিয়া হুলসীদেবী বলিলেন—"বাবা! আমার সে আশায় দুরাশা! সে আর ফিরবে—সংসারী হবে—তা বলে ত বিশ্বাস হয় না! সে যে অতি একগুঁয়ে ছেলে—তবে যদি তুই দুই একমাসের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারিস্ ত চেষ্টা কর। কিন্তু দুইমাস অবধি দেখে আমি আর সংসারে থাকবো না—আমারও যেদিকে দু-চক্ষু যাবে চলে যাব।"

দুঃখীরাম মনে করিলেন—মামী ত কাছে কাছেই রইলেন, আর পাড়ার লোকের জিম্বায় রেখে যাই—অত বুড়ো মানুষ আর যাবে কোথায়? চক্ষে চক্ষে রাখলে কোনই ভয় নাই। এখন যদি ওঁকে নিয়ে ঘরে বসে থাকি, তা হলে দাদার সন্ধান করা এর পর দায় হবে। এইরূপ মনে করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! খুড়ীমা, তুমি দেখই না, আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না, আগে যে তুমি আমার কথা অকাট্য বলে মনে কর্ত্তে?"

এখন হুলসীদেবীর ভিতর পুড়িয়া খাক হইলেও বাহ্যিক শোক-ভার একটু মন্দীভূত হইতেছে—ইহা স্বভাবেরই স্বভাব। একটা শোক-বেগ, সহ্য হইয়া গেলে বাহ্যিক তাহার প্রভাব আর তত কষ্টদায়ক হয় না।

তুলসীদেবী বলিলেন—"বাবা! তোর প্রতি অবিশ্বাস কিছুই নাই। তুই ছিলি বলেই দ্বিবেদীর সংসার এখনও সমানভাবে চল্‌ছে, তবে কি জানিস্—প্রাণে আর কত জ্বালা সহ্য হবে? স্বামী গেলেন, গুরুদেব ছিলেন—তিনিও গেলেন, ছেলেটাকে নিয়ে এক-প্রকারে মনাবরণ করেছিলাম! সেও এতদিনের পর ফাঁকি দিয়ে চলে গেল—তবে আর কত সহ্য কর্ব্বো! যদি একান্তই তাকে খুঁজ্‌তে যাস্, তবে যা—কিন্তু ঐ সময়ের পর এলে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। এখন যাবার সময় তুই বউমাকে বলে যা—সে যেন তার মাকে সান্ত্বনা করে শীগ্‌গীর চলে আসে—নইলে তার সঙ্গে এই শেষ দেখা।"

তুলসীদেবীর অনুমতি পাইয়া দুঃখীরাম পরদিন সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া, পাড়ার লোক সকলের উপর তাহার মামী এবং তুলসীর জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। প্রাণের তুলসীদা বিহনে তাঁহার মনে সুখের লেশমাত্র নাই। যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে দুঃখী অস্থির হইতেন—যাহার সহবাস সুখ দুঃখী-রাম স্বর্গসুখ অপেক্ষাও প্রীতিকর মনে করিতেন, আজ আট দশ দিন হইল তাঁহার সেই প্রাণের সখার অদর্শন তাঁহাকে কিরূপ কষ্ট দিতেছে—তাঁহাকে কিরূপ মনমরা দিশাহারা করিয়া ফেলিয়াছে—তাহা যাহার এরূপ বন্ধু-বিয়োগ হইয়াছে—যিনি এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বিরহ সহ্য করিয়াছেন—তিনি জানেন—ইহা বর্ণনায় বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

দুঃখীরাম বাটীর বাহির হইয়া প্রথমে ধর্ম্মপুরে তাহার বউদিদির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। একে পতি নিরুদ্দেশ—তাহাতে আজ দুই তিনদিন হইল পিতৃ-বিয়োগের অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া, রত্নাবলী

যেন জীবন্মৃত হইয়াছেন। তাঁর সে অপরূপ রূপ, নবীন যৌবনের সে সৌন্দর্য্য এই কয়দিনের মধ্যে যেন কোথায় তিরোহিত হইয়াছে—দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না। রত্নাবলী দুঃখী-রামকে দেখিয়া প্রাণের আবেগে উচ্চৈস্বরে পিতার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

দুঃখীরাম কিয়ৎক্ষণ ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিয়া বলিলেন—"বৌদি! আর কাঁদিয়া কি করিবে, জগতে কালের হাত ত কেহ এড়াইতে পারে না? তুমি বুদ্ধিমতী, এক্ষণে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া শোক সম্বরণ করিতে চেষ্টা কর। এখন এদিক ওদিক দুই দিকের ভার তোমারই উপর পতিত। তুমি শক্ত না হইলে দুইদিকই ভাসিয়া যাইবে।"

রত্নাবলী।—ভাই! আমার আর কোনদিকেই চাহিতে ইচ্ছা নাই। পিতার ত কাল পূর্ণ হইয়াছিল—তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমার গতি কি হইবে? যম আমাকেও এ সময় গ্রহণ করিলে আমি প্রাণের এ দুর্ব্বিসহ জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাই। আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি।"

দুঃখীরাম বলিলেন—"অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে কে তাহা রোধ করিবে বৌদি! তুমি একটু ধৈর্য্য ধারণ কর—আমি দাদার অন্বেষণে বাহির হইয়াছি—দেখি, ভগবান কি করেন।"

দুঃখীরাম তুলসীদাসের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে; সে অতি বুদ্ধি-মান এবং কষ্ট-সহিষ্ণু যুবক—সহজে হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিবে না, ভাবিয়া একটু আশ্বস্ত চিত্তে রত্নাবলী বলিলেন—"বাড়ীর বন্দোবস্ত কি করিয়া আসিলে?"

দুঃখীরাম কহিলেন—"সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ, খুড়ীকে ত কিছুতেই রাখা যায় না—তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন—কাঁদিয়া কাঁদিয়া একপ্রকার অন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছেন, কিন্তু তা বলিয়া আমি আর কতকাল বসে থাকি? তাঁহার তত্বাবধানে মামীকে রাখিয়া এবং পাড়ার লোককে সমস্ত ভার দিয়া আজ বাহির হইয়াছি। দাদা সাধুসঙ্গ বড় ভালবাসিতেন—কাশী-ধামেই সকলপ্রকার সাধুর আড্ডা, এইজন্য প্রথমে কাশীতেই যাইব। তুমি এক কাজ কর। যত শীঘ্র পার—এখানকার বন্দোবস্ত করিয়া সেখানে খুড়ীর কাছে যাও; তুমি গেলেও কতকটা রক্ষা হয়!"

রত্নাবলী দুঃখীরামের নিকট আপন মনোভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন না। সংসার যে এখন তাঁহার পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ—সে ভাবের কোন আভাস না দিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো! মাকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমি শীঘ্রই তথায় যাইব। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া স্বকার্য্যে গমন কর—ভগবান করেন যদি দুই একমাসের মধ্যে তাঁহাকে আনিতে পার—তবেই মঙ্গল, নতুবা এ সংসার অরণ্যের ঘোর অন্ধকারে আর থাকিতে পারিব না—আমিই যে তাঁহার গৃহত্যাগের প্রধান কারণ, সেদিন যদি মদগর্ব্বে আত্মহারা হইয়া সেরূপ কথা না বলিতাম—তাহা হইলে আর এরূপ মর্ম্মযাতনা ভুগিতে হইত না—তোমাকে আর মাকেও এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। যেমন কর্ম্ম করিয়াছি—চির পদানতা দাসী হইয়া প্রভুর প্রতি তিরস্কারের ফল যথেষ্ট ভোগ করিতে হইবে—আরও কিছুদিন এই দুশ্চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিতে হইলে ধৈর্য্যের বাঁধ বোধ হয় ভাঙ্গিয়া পড়িবে—তিনিও যে পথে গিয়াছেন—আমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে। এখন আর

তাহাতে ভয় নাই—নারীর ভয়ের কারণ যে রূপ-যৌবন, এই কয়দিনের দারুণ দুঃখভোগে তাহা নষ্ট হইয়াছে—এখন কাহারও চক্ষু আর আমার রূপে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইবে না।

দুঃখীরাম রত্নাবলীর উদাস ভাব, তাঁহার মনোগত সঙ্কল্পের আভাস পাইয়া প্রমাদ গণিলেন। রত্নাবলী মনে করিয়াছিলেন—প্রাণের কথা কাহাকেও প্রকাশ করিব না কিন্তু অতিশয় অসহ্য হওয়ায়—তিনি স্বামীর একমাত্র বন্ধু দুঃখীরামের নিকট মনোবেদনা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

স্বামীর গৃহত্যাগের যে আমিই কারণ—রত্নাবলীর তাহাই দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছে। তুলসীদাস যে এই রকমে ফিরিয়া পড়িবে—প্রাণারাম ভগবান রামচন্দ্রের পরম ভক্ত হইয়া জগতীতলে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবে, তাঁহার জন্য যে দ্বিবেদীর কুল পবিত্র হইবে,—রত্নাবলী একদিনের জন্য তাহা ভাবেন নাই। জানেনও না যে ইহা সেই চক্রীর চক্র। তিনি যে নিজেই মহাদোষে দোষী; তাঁহারই তীব্র বচনবাণে স্বামী গৃহ ছাড়া, এই ভাবিয়া সতী রত্নাবলীর প্রাণে ভয়ানক ধিক্কার জন্মিয়াছে। কিন্তু দুঃখীরাম বন্ধুর প্রাণের ভাব জানিতেন—গুরু নৃসিংহদাসের মুখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও শুনিয়াছিলেন—তুলসী সামান্য বালক নহে—ইহার দ্বারা জগতে অতি সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তাই তিনি বৌদিকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন—বৌদি! তুমি ভেবো না—দাদার এই বৈরাগ্যে, বোধ হয় তোমরা ধন্য হইবে—তুমি যে শক্তি তাহাতে প্রয়োগ করিয়াছ—ইহার বলে বোধ হয়—তিনি যথার্থ রঘুনাথের পদে আত্ম-সমর্পণ করিয়া মানব জন্ম সার্থক করিবেন, তুমিও যথার্থ সহধর্ম্মিনীর কার্য্য করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিবে।

ভাই! আমি পাপ পুণ্য কিছুই জানি না—একমাত্র সেই চরণই আমার ভরসা, নারীজীবনে—তাহা ছাড়া যে আর কোন মোক্ষপদ আছে তাহা আমার বিশ্বাস নাই? বলিয়া রত্নাবলী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

লক্ষ্মীদেবী স্বামীর বিয়োগে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তিনি এতক্ষণ আনমনে বসিয়া কেবল নিজ অদৃষ্ট চিন্তায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছিলেন। স্বামীত স্বর্গগত হইয়াছেন, তাহার আর উপায় নাই।

এক্ষণে মেয়ে স্বামীর ঘর করিবে—স্বামী-সুখে সুখিনী হইবে—সকল জননীর প্রাণের ইহাই আকাঙ্ক্ষা—কিন্তু এ কি হইল? একমাত্র কন্যা—রূপ-যৌবন-সুসম্পন্না; কোথায় তাহার উন্নতি দেখিয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে তাহাকে ঘর সংসার করিতে দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দানুভব করিবেন—না মেয়ের এই অল্পবয়সে, তাহার এই দারুণ দুর্দ্দশা—স্বামী-বিরহে তাহাকে একান্ত বিমনা দেখিয়া মন নিরানন্দসাগরে ডুবাইয়া দিতেছেন।

এই সেদিন তাঁহারও কপাল ভাঙ্গিয়াছে—স্বামী স্বর্গগত হইয়াছেন—এ সংসারে আর তাঁহার আপনার বলিতে কেহ নাই। কন্যা জামাতা যদি ঠিক থাকিত, তাহারা যদি মনের আনন্দে সংসার করিত—তাহা হইলে তাঁহারও কতকটা আশা ছিল। এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁহাকে একবেলা এক মুঠা খাবার জন্য, যা তা একখানা পরবার জন্য কষ্ট পাইতে হইত না। লোকে কথায় বলে—"যদি কন্যা পড়ে পাত্রে, কি করিবে দশ পুত্রে" সেইরূপই পড়িয়াছিল—কিন্তু কপাল দোষে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। এখন নিজের অপেক্ষা কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া লক্ষ্মীদেবী অস্থিরা হইয়া পড়িয়াছেন।

দুঃখীরাম আসিয়াছে—সে জামাইয়ের অন্বেষণে যাইতেছে—দেখিয়া প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—বাবা! আর বিলম্ব করো না—শুনিয়াছি তুমি আমার তুলসীর পরম বন্ধু যাও বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শীঘ্র তাঁহার সন্ধান করিয়া আমাদের প্রাণ বাঁচাও—নতুবা একজনের জন্য অনেকগুলি প্রাণীর কষ্টের একশেষ হইবে, এমন কি, খাওয়া পরার অভাবে নানাস্থানী হইতে হইবে।

দুঃখীরাম বলিলেন—মা! কোন চিন্তা নাই, ভগবান ভালই করিবেন। আপনি প্রবীনা—বৌদিকে দেখিবেন—সময়ে সময়ে খুড়ীমার সংবাদ লইবেন—আমি তবে এখন আসি। এই বলিয়া দুঃখীরাম আহারাদি করিয়া ধর্ম্মপুর ত্যাগ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৌভাগ্যোদয়

তুলসীদাসের প্রাণে এখন আর সংসার ভাবনা কিছুমাত্র নাই। এখন তিনি ভূলেও পরিবারের কথা মনোমধ্যে স্থান দেন না—তবে সময়ে সময়ে জননীর স্নেহ তাঁহাকে মুহ্যমান করে, তিনি মনে করেন—কিছুদিন ভগবানের সাধনায় একটু পাকা হইলে তাঁহাকে লইয়া আসিব। রত্নাবলীর প্রতি তাঁহার একান্ত আসক্তি, সেই প্রগাঢ় অনুরাগ, এখন ঈশ্বরমুখী হইয়া প্রাণের সহস্র দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহাকে অনুপম আশার আশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। সাধিলেই সিদ্ধি, কাতর প্রাণে ডাকিলেই ইষ্ট দরশন অনিবার্য্য—তুলসীদাস

এখন এইরূপ বিশ্বাস করিয়া কেবল রঘুপতি সীতানাথের চরণ সার করিয়াছেন।

কাশীতে আসিয়া তিনি সন্ন্যাসীর চতুষ্পাটীতে আশ্রয় পাইয়াছেন। এখানে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র, তত্ত্ব-নির্ণয়, মীমাংসা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থই আয়ত্ত করিয়াছেন; গুরুদেব তাঁহাকে অন্য ছাত্র অপেক্ষা প্রাণের সহিত শিক্ষাদান করিতেছেন। কিন্তু কই, ইহাতে ত তাঁর ইষ্ট আরাধনার পথ বিস্তৃত হইতেছে না। বরং জ্ঞানের প্রাবল্য হেতু ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার যুক্তি তর্ক মনোমধ্যে উদয় হইয়া প্রাণের সরল বিশ্বা[illegible] করিতেছে। ভক্তিহীন জ্ঞানে, অসার শুষ্ক তর্কবাদে [illegible] বিষয়ের মীমাংসা হয় না; কেবল তর্কের বৃদ্ধি হয়। এইজন্য সাধুগণ বলিয়া থাকেন—"বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর।" ভক্তি নব লক্ষণাক্রান্তা—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনং, অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমস্ত নিবেদনম"—এই নব-লক্ষণা ভক্তির দ্বারা ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেই সকল অন্ধকার ঘুচিয়া যায়।

গুরুদেব তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার কিছুমাত্র ক্রটী নাই। সময়ে সময়ে ভগবৎচিন্তার ধ্যান ধারণার বিষয়ও উপদেশ দিতে ক্রটী করেন না। কিন্তু এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছাত্র সকলে একত্র থাকায় তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। সকলের প্রাণ ত আর সমান নয়! সকলে ত আর সমান ভাব লইয়া শিক্ষা করিতে আসে নাই! কাজেই গুরুর অনুমতি গ্রহণ করত তুলসীদাস আরও নির্জ্জন স্থানের দরিদ্র পল্লীতে আপনার বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন এবং প্রত্যহ এক একবার গুরুর নিকট ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিয়া যাইতেন।

তারপর সমস্ত দিবা রজনী তাঁহার সেই নির্জ্জন গৃহে বসিয়া রাম নামে বিভোর হইয়া থাকিতেন। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কুটীরের বাহিরে তিনি সামান্য একখানি পসারীর দোকান খুলিয়াছিলেন। তাহাতে ছাতু, ছোলা, চিড়া, মুড়কী, গুড় প্রভৃতি দ্রব্য কিছু কিছু সাজান থাকিত। দরিদ্র পল্লীবাসী, অভাব হইলে সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট হইতে ঐসকল দ্রব্য খরিদ করিত। ইহাতে তাঁহার একপ্রকার প্রাণধারণোপযোগী জীবিকার্জ্জন হইত।

দোকান করা নাম মাত্র—তবে ভিক্ষা না করিয়া একটা অবলম্বন লইয়া ত থাকিতে হইবে? এইজন্য এই কারবার পাতিয়া বসিয়া তিনি সমস্ত দিন আপনার কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। ভগবান উহাতে যাহা দিতেন, তাহাতেই তিনি পরম সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিতেন। প্রাতঃকালে একবার গুরু গৃহে যাওয়া ভিন্ন তুলসীদাসের আর দিবারাত্র অন্য কোথাও যাইবার সময় বা প্রবৃত্তি ছিল না; নিজ গৃহে সমস্তদিন তন্ময়ভাবে প্রভু রামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতেন।

তুলসীদাস প্রত্যহ প্রাতঃকালে শৌচাদি সমাপন করিয়া পাত্রাবশিষ্ট অপবিত্র জল একটী ঝোঁপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গায় স্নান সমাপন করিয়া কুটীরে আগমন করিতেন—ইহাই তাঁহার নিত্যক্রিয়া ছিল। একদিন অসাবধানতা বশতঃ তুলসী ঐ ঝোঁপের মধ্যে শৌচাবশিষ্ট জল নিক্ষেপ না করিয়া, প্রত্যূষে স্নান সমাপনান্তর কুটীরে আগমন করিয়াছেন। সেদিন তাঁর প্রাণ এত ভাব-বিভোর, মন এত ভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়াছিল যে, সমস্তদিন ভগবানের পাদপদ্মে মতিস্থির রাখিয়াই সময় কাটাইয়া দিলেন। দেহ অনবরত রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল—কোনপ্রকার কাজে মন লাগিল না। এই-

রূপে সমস্তদিন ইষ্টচিন্তায় অতিবাহিত করিয়া তুলসীদাস সন্ধ্যার পর কিছু জলযোগ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। কিছুক্ষণ পরে সহসা এক আশ্চর্য্য ঘটনায় তাহার নিদ্রাবেগ কমিয়া আসিল, তুলসীদাসের ভাগ্যগগণে সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইল। সুনিদ্রা না হওয়ায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—যেন একটী বিকটাকার পিশাচ মূর্ত্তি তাঁহার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ কুমার! তোমার প্রদত্ত প্রত্যহ শৌচান্ত ভৃঙ্গার করিতে আমার পিপাসার শান্তি হয়—আজ তাহা না দিবার কারণ কি, বৎস?

তুলসীদাস ভয়ার্ত্তচিত্তে চমকিত হইয়া নিদ্রোত্থিত হইলেন, ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিলেন—"আপনি কে? আমি কখন কি আপনাকে অপবিত্র বারি প্রদান করিয়াছি?"

প্রেতমূর্ত্তি অভয় প্রদান করিয়া বলিল—বৎস! ভয় নাই, আমি তোমার অপকার করিতে আসি নাই—উপকার করিবার মানসেই আসিয়াছি। তুমি অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর!

তুলসী।—কে আপনি? কিসের জন্যই বা বর প্রার্থনা করিব—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না!

পিশাচ।—বৎস! তুমি প্রত্যহ শৌচান্ত জল, যাহা ঝোঁপের মধ্যে নিক্ষেপ কর—আমি একজন প্রেতমূর্ত্তি, প্রত্যহ ঐ জল পান করিয়া তৃপ্ত হই। আজ তাহা না পাইয়া অস্থির হইলেও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতেছি—তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ কর!

তুলসীদাস বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন—হে পিশাচবর! কি পাপে আপনার এ দুর্গতি হইয়াছে, বলিতে আপত্তি না থাকিলে প্রকাশ করুন এবং যদি কোন প্রতিকার করিলে আপনার প্রেতত্ব মোচন হয়—তাহারও অনুমতি করুন।

পিশাচ। বৎস! তুমি আমার পরম উপকারী। আমার পূর্ব্ব কাহিনী শুনিতে যদি এতই ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বজন্মে নন্দীগ্রামে এক পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করি। বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভাবে এক সদাশয় নৃপতির সভা-পণ্ডিত হইয়াছিলাম। রাজা আমাকে বিশেষ ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। দরিদ্রতা নিবন্ধন তাঁহার নিকট যখন যাহা চাহিতাম, অকাতরে তিনি তাহা প্রদান করিতেন। সভায় আরও অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহাদের নাম করিয়া রাজার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতাম কিন্তু এক কপর্দ্দকও তাঁহাদের দিতাম না। এইরূপে ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিয়া সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলাম।

তুলসীদাস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—তারপর, আপনি নন্দী-গ্রাম বাসী হইয়া কিরূপে এখানে আসিলেন?

পিশাচ পুনরায় বলিতে লাগিল—মহারাজা অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। একদিন সপরিবারে ৺বিশ্বেশ্বরের দর্শন মানসে কাশী আসিবার মনস্থ করিয়া আমাকে সহযাত্রী করিলেন। আমিও মনের আনন্দে কাশীতে আসিলাম। এমন পবিত্র স্থানে আসিয়া—এত বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, এমন পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমার ধনের তৃষা কিছুতেই মিটিল না। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বড় ধনী হইয়াছি—তথাপি পরের নাম করিয়া রাজার নিকট হইতে টাকা লইয়া আত্মসাৎ করার অভ্যাস আমার গেল না—"অর্থ মনর্থং ভাবয় নিত্যং" কেবল পড়িয়া আসিয়াছি—কাজে কিন্তু কিছুই করি নাই। কাশী-তেও আমি ঐ দুষ্টবুদ্ধি বশে চালিত হইয়া একদিন এই প্রান্তর মধ্যে যাইতে যাইতে রাত্রিকালে সর্প দংশনে হটাৎ আমার প্রাণত্যাগ হইল। মহারাজা অনেক চেষ্টা করিয়াও আমার প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না।

তুলসী। আপনি জীবনে আর কোন পুণ্য কার্য্য করেন নাই কি?

পিশাচ।—না, যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছি। শঠতা, প্রবঞ্চনা দ্বারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে কেবল পুত্র-কলত্রের ভরণ-পোষণে ব্যয় করেছি, সংসারের অসার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কেবল উহাদের ভরণ-পোষণই পরম পুরুষার্থ মনে করেছি, অন্য ধর্ম্ম কিছু করি নাই, কেবল একদিনের একটু মাত্র পুণ্য করেছিলাম বলে—তোমার প্রদত্ত ঐ অপবিত্র জলে আমি পিপাসার শান্তি করছি।

তুলসী।—হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ, এই শৌচান্ত জল আপনার পুণ্য প্রভাবে প্রাপ্ত, পিশাচবর! সে পুণ্য কি—যদি আপত্তি না থাকে—অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করুন।

পিশাচ।—বৎস! যখন এতদূর বলিয়াছি তখন আর অবশিষ্ট টুকু না বলিব কেন? তবে শ্রবণ কর। একদিন মধ্যাহ্নকালে দারুণ রৌদ্রে পিপাসার্থ হয়ে একজন ব্রাহ্মণ আমার নিকট বারি প্রার্থনা কল্লেন। আমি তখন অন্য বারির অভাবে আমার শৌচাদির জন্য রক্ষিত ভৃঙ্গারের জল সেই ব্রাহ্মণকে পান কর্ত্তে দিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ বারিপানে তৃপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই আমার সারা জীবনের মধ্যে পুণ্য কর্ম্ম।

তুলসী। তারপর আপনার মৃত্যুর পর কি হলো?

পিশাচ। কাশী মৃত্যুতে যমের অধিকার নাই, অপঘাতে মৃত্যু হলেও যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিলে শিবদূতগণ তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে এইস্থানে প্রেতযোনী করিয়া রক্ষা করিলেন। বহু কষ্টভোগের আদেশ করিয়া বলিলেন—পাপিষ্ঠ, তুই এইখানে এইভাবে অবস্থান কর—কোন ভক্ত ব্রাহ্মণের শৌচান্ত

বারিপানে মুক্তিলাভ কর্ব্বি; তোমার এই বারি আমার মুক্তির উপায়। আর একদিন মাত্র বাকী, বৎস! কল্য তাহা প্রদান করিও, এক্ষণে যদি তোমার কোন বর লইবার ইচ্ছা থাকে—প্রার্থনা কর।

তুলসী। মহাশয়! আপনার অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী শ্রবণ করে আমার চৈতন্ত সঞ্চার হলো। যে অর্থের জন্ত আপনার এত দুর্গতি, সেরূপ পার্থিব কোন অর্থের আকাঙ্ক্ষা আমার নাই—কারণ অর্থই যে অনর্থের মূল তাহা আমি জানি। তবে যদি একান্তই আমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে থাকেন, তাহা হইলে আমার হৃদয় রাজ্যের অধিশ্বর প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন কেমন করিয়া পাইব। যদি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবার কোন পন্থা বলিয়া দিতে পারেন—তাহা হইলে আজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকি। ইহা ভিন্ন আমার জীবনে আর অন্ত কামনা নাই।

পিশাচ। বৎস! আমার সে ক্ষমতাই যদি থাকৃবে তবে আমি এ দুঃসহ কষ্ট সহ্য কর্ব্বো কেন? দেখাইয়া দিবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে আমি একটী উপায় বলে দিচ্ছি—তাহাতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

তুলসীদাস সাগ্রহে বলিলেন—বলুন, বলুন পিশাচবর! সে উপায়টী কি?

পিশাচ। বৎস! কাশীর অনতিদূরে একস্থানে প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ হইতেছে, তুমি প্রত্যহ তথায় রামায়ণ পাঠ শুনতে যাও। সেখানে যাইয়া দেখিবে, একটী ব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণ সকলের অগ্রে আসিয়া আসরের একধারে অতি বিনীতভাবে বসিয়া থাকেন। তারপর পাঠ শেষ হইলে সকলের পর তিনি আস্তে আস্তে সেস্থান ত্যাগ

করেন। তিনি আর কেহই নহেন—তোমার ইষ্ট দেবতার প্রধান ভক্ত পবন নন্দন হনুমান। তাঁর শরণাগত হলে তোমার মনোবাসনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে।

তুলসীদাস পরম পুলকিত হইয়া বলিলেন—পিশাচ প্রবর! পরম ভক্ত ধার্ম্মিক চুড়ামণি হনুমানজী এমন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সকলের অগ্রে আসিয়া সকলের পর যাইবার কারণ কি? এবং তিনি কোথায় গমন করেন?

পিশাচ। বৎস! তুমি শাস্ত্র-পাঠী পণ্ডিত। বোধ হয় জান, অশ্বত্থমা বলি, ব্যাস, হনুমন্ত, বিভীষণ প্রভৃতি ইঁহারা অমর—চিরকালই আছেন—তবে পাপ চক্ষে কেহ দেখিতে পায় না। যেখানে প্রভুর গুণগান হয়, সেইখানে হনুমানজী অলক্ষ্যে আগমন করেন। পাছে কেহ চিনিতে পারে বা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মনের ভাব গ্রহণ করে—এইজন্য অতি ঘৃণীত ব্যাধিগ্রস্ত রূপ ধারণ করিয়া আসেন। তাহা হইলে ঘৃণায় আর কেহ কাছে ঘেঁসিবে না। সকলের শেষে যাইবার কারণ—পাছে কেহ পশ্চাদনুসরণ করে—এইজন্য সকলে চলিয়া গেলে—তবে তিনি স্বস্থানে গমন করেন। কাশীর পশ্চিমে নিবিড় অরণ্যে তাঁহার বাসস্থান। বৎস! এই তোমার অভিলাস পূর্ণ হইবার উপায় বলিয়া দিলাম, এখানে কল্য প্রাতে জল প্রদানে বিস্মৃত হইও না—এই বলিয়া পিশাচ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন।

পুলকাবেশে, ভাবের ঘোরে তুলসীদাস সমস্ত রজনী মনের আনন্দে শ্রীরামের ধ্যানে কাটাইয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া পিশাচের কথা মত সেই ঝোঁপে শৌচান্ত বারি প্রদান করিবামাত্রই—"আঃ! আজ আমি উদ্ধার প্রাপ্ত হইলাম—তুলসীদাস তোমার অভিলাষ পূর্ণ

হউক”—বলিয়া অশরীরি পিশাচ মুর্ত্তি দিব্য দেহ ধারণ করিয়া শিব-লোক প্রাপ্ত হইল।

তুলসীদাসের প্রাণ আজ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। শরীর সর্ব্বদা পুলক রসে আপ্লুত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত, স্বেদ নির্গত ও চক্ষু ভক্তি অশ্রুতে আর্দ্র হইতেছে। সামান্য মাত্র আহার করিয়া তিনি তন্ময়ভাবে রাম নাম কীর্ত্তন করিয়া দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন। সায়াহ্নে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া যথায় রামায়ণ গান হইতেছিল—তথায় যাইয়া একটী নিভৃত স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলেন—বাস্তবিক একটী ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া চত্বরের একধারে উপবেশন করিল। তখন সবেমাত্র বিছানা পাতা হইয়াছে, কোন লোক সমাগম হয় নাই। তারপর সন্ধ্যা হইল, কথক ঠাকুর আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোকের জনতা হইল। রামায়ণ গান শুনিয়া সকলে মোহিত হইল—রাত্রি দশটার সময় সভাভঙ্গ হইলে যে যাহার আবাসে চলিয়া গেল। ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তিটী আসর নির্জ্জন দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, পথে ঘাটে কোন লোকজন নাই। তিনি আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—তুলসীদাসও পশ্চাৎ গ্রহণ করিলেন।

অনবরত এক ঘণ্টা পথ অতিবাহিত করিয়া তিনি যখন মাঠের শেষ প্রান্তে বনমধ্যে প্রবেশ করিবেন—সেই সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিবা-মাত্র তুলসীদাস তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে বলিলেন—কে তুমি, আবার অনুগমন করিতেছ? এদিকে তোমার আবশ্যক কি, এদিকে ত লোকালয় নাই?

তুলসী। প্রভু! লোকালয়ে আমার আবশ্যক নাই—আমি

বহুদিন হইল—গৃহবাস বা লোকালয় একপ্রকার ত্যাগ করিয়া পথে পথে ঘুরিতেছি। আর কিছুদিন যদি আরাধ্য দেবতা প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন না পাই, তাহা হইলে এ জীবন পরিত্যাগ করিব। কিন্তু বিধি সদয়—আজ আপনার দর্শন পাইয়াছি, আপনাকে চিনিতে আমার বাকী নাই; এক্ষণে আমার প্রভুর দর্শনের উপায় বলিয়া দিন, নতুবা আপনার ন্যায় পরম ভক্তের পদে এ প্রাণ আহুতি দিয়া জন্ম সার্থক করিব—এই আমার প্রতিজ্ঞা! ছদ্মবেশী পবনকুমার কিছুক্ষণ আত্মবিস্মৃত যুবকের কথায় ধ্যানস্থ হইলেন—এ যুবক যে পরম ভক্ত, রামচন্দ্র যে প্রকারান্তরে ইহাকে দেখা দিবেন। ইহার জীবনে যে সে সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই—তাহা বুঝিতে পারিলেন, ইহার দ্বারা জগতের যে মহোপকার সাধন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! রামায়ণ রচয়িতা মহাকবি বাল্মিকী আজ তুলসীদাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে। সংস্কৃত রামায়ণ পণ্ডিতের জন্য; হিন্দুস্থানীর দেশে তুলসীদাস নিজ নামে প্রভুর মাহাত্ম্য-গাথা হিন্দি ভাষায় প্রচার করিয়া ধন্য হইবে-সেই উদ্দেশ্যেই প্রভু তাহাকে ধরাধামে পাঠাইয়াছেন। ইহার ভক্তিময় রচনা পাঠ করিয়া সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া প্রভুর মহিমারসে মজিয়া যাইবে! তবে কলিকাল বলিয়া ইহার সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শনে নানা বিঘ্ন ঘটিবে, কিন্তু প্রভু ইহাকে নানাপ্রকারে দর্শন দিবেন। কর্মজ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে তুলসীদাসের হৃদয়ক্ষেত্র উর্ব্বর হইয়া রামনাম মহাবীজে অদ্ভুত বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইতেছে। আজ এই ভক্ত চূড়ামণিকে দেখিয়া আমিও ধন্য হইলাম। হনুমান প্রকাশ্যে বলিলেন—বৎস! তুমি পরম ভাগ্যবান্, আর আমার অনুসরণ করিতে হইবে না। তুমি আগামী পরশ্ব শ্রীরামনবমী তিথিতে তোমার গৃহ বসিয়া

তাঁহার দর্শন লাভ করিবে। যাও বৎস! অনেক দূর হইয়াছে, আর অগ্রসর হইও না, কুটীরে যাইয়া আহারাদি কর! এই বলিয়া পবনকুমার তুলসীদাসকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

তুলসীদাস আবেশ-বিভোর—চলিতে চরণ আর চলে না! আনন্দে বিভোর হইয়া দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না! চক্ষু প্রেমাপ্লুত! কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না—দিশাহারা, দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া আন্‌মনে চলিয়াছেন। সেই নব-দুর্ব্বাদল-শ্যামমূর্ত্তির দর্শন আশায় প্রাণ এত পুলক পূর্ণ হইয়াছে যে, আর চলিবার শক্তি নাই! আনন্দে আত্মহারা হইয়া আধ ঘণ্টার পর দুই ঘণ্টায় আসিয়া রাত্রি শেষে নিজ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। আশার আশ্বাসে প্রাণ ভোরপুর, ভবক্ষুধা নিবৃত্তির আশা যখন পাইয়াছেন, তখন সামান্য ক্ষুধা তাঁহার আর কোথায়? তথাপি দোকানের সামান্য চিড়াগুড় লইয়া সমস্তদিনের পর উদরের তৃপ্তিসাধন করত বাহিরের দাওয়ায় শয়ন করিলেন।

তুলসীদাস মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—যখন পরমভক্ত পবন-কুমার হনুমান আশা দিয়া বলিয়াছেন—আগামী পরশ্ব শ্রীরাম নবমীর দিন প্রভুর সহিত তোমার কুটীরেই দেখা হইবে—আর ইতস্ততঃ করিতে হইবে না—তখন আর চিন্তা কি? তাঁহার কথা কি কখন মিথ্যা হইবার? হায়! এতদিন আমি কি করিয়াছি, বৃথা কুটুম্ব-ভরচিন্তনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি! বৃথা পার্থিব-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি! কিন্তু তুলসীদাস জানেন না যে সেই পার্থীব প্রণয়, স্ত্রীর প্রতি সেই ঐকান্তিক অনুরাগই তাঁহার সাধনার পথ এত সুগম করিয়া দিয়াছে! তাঁহার প্রাণে অনুরাগ-ভক্তির উৎস এমন করিয়া খুলিয়া দিয়াছে! রত্নাবলীর ন্যায় সাধ্বী সতীর অমোঘ শক্তিই তাঁহাকে

এত শীঘ্র ভগবদ্দর্শনে সামার্থ্য প্রদান করিয়াছে। তিনি অনন্যশরণ হইয়া ভাবাবেশে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

চিন্তামণি যেমন বিল্বমঙ্গলকে একদিনের এক কথায় সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, চিন্তামণির হৃদয়ভেদী বাক্যে তিনি যেমন প্রাণের আবেগে ফিরিয়া পড়িয়াছিলেন, আজ অতুল-প্রেমিক তুলসীদাসও সেইরূপ রত্নাবলীর তীব্র বচনবাণে বিদ্ধ হইয়া জীবনের পথ মুক্ত করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরোক্ষ দর্শন

"জপাৎসিদ্ধি" মনেপ্রাণে অনবরত ইষ্টনাম জপে যত শক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, এরূপ আর কিছুতেই পারা যায় না। এই জপ কেহ মালা ঘুরাইয়া সাধনা করেন, কেহ করাঙ্গুলি দ্বারা সংখ্যা রাখিয়া সমাধা করেন, কিন্তু ভক্তসাধক তুলসীদাস এ দুইয়েরই পক্ষপাতি ছিলেন না, তিনি বলিতেন—

মালা জপে শালা, কর জপে ভাই।
যো মন মন জপ্তা, উস্কো বলিহারী যাই।

ভক্ত সাধক তুলসীদাস কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গ উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিমার্গে খুব পাকা হইয়াছিলেন। সেই ভক্তিতে পাকা হইলে প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল। আবার সেই প্রেম হইতে সাধক মহাভাবের ভাবুক হইয়া সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। এইজন্য তাঁহার সাধনকার্য্যে কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার ভাব দেখিয়া

সাধারণ লোক জানিতেও পারিত না যে ইনি একজন মহাত্মা—সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

ভক্তিমার্গে আরোহণ করিয়া তিনি কর্ম্ম বা জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করেন নাই, কর্ম্মে তিনি প্রত্যহ দৃঢ় ভাবে লিপ্ত থাকিতেন। জগতই যে কর্ম্মময়! সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই যে কর্ম্মের অধীন! কর্ম্ম না করিয়া তুমি পরম জ্ঞানী, ভক্ত বা সন্ন্যাসী হইলেও তোমার একদণ্ড থাকিবার অধিকার নাই! নিষ্কর্ম্মী-ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইলেও তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে—তবে সে কর্ম্ম তোমার বন্ধনের কারণ হইবে না। রামময় জীবন তুলসীদাস পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে অতি অল্প বয়সে কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে বেশ পাকা হইলেও প্রত্যহ পূজাহ্নিক, জপতপ করিতেন—গুরুর নিকট নানাবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রভূত জ্ঞানের অধিকার লাভেও তাঁহার বিরতি ছিল না। তিনি প্রত্যহ ইষ্টপূজা করিয়া শ্বেতচন্দনের তিলক ধারণ করিতেন, কণ্ঠে তুলসীর মালা ও যজ্ঞোপবীত শোভা পাইত, কাপড় ময়লা হইবার ভয়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতেন—এ সকল আড়ম্বর বাহ্যিক সাধু সাজবার জন্য নহে! পূজার অঙ্গ বলিয়া এ সকল ধারণ করিতেন। আত্মকার্য্যে অর্থাৎ জপের সময় তিনি বীজমন্ত্রে এতদূর মনপ্রাণ অর্পণ করিতেন, এতদূর তন্ময় হইতেন যে তাঁহার মালা বা করের দ্বারা সংখ্যা রাখিবার সময় হইত না। কারণ কোন কাজে তাঁহার সঙ্কল্প ছিল না—যখন অনবরতই এই কাজ, রামনাম জপ ভিন্ন যখন অন্য কার্য্য তাঁহার ছিল না—তখন তাঁহার পক্ষে সঙ্কল্প বিকল্প কি, আর তার সংখ্যাই বা কি?

আজ চৈত্র মাসের শ্রীরামনবমী তিথি। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণ ভগবানের এই জন্ম তিথিতে উপবাসাদি করিয়া নানাবিধ কর্ম্মের

অনুষ্ঠান করে। গত পরশ্ব মহাবীর পবননন্দন আশা দিয়াছেন—আজ তাঁহার সহিত ভগবান রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে। তুলসীদাস তাই আজ প্রাতঃকাল হইতেই দোকানের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিয়া, ভাব-বিভোর চিত্তে ভগবানের দর্শন আশায় নানাপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন—পূজার আয়োজন করিয়া একান্ত মনে শ্রীরামচন্দ্রের পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। নয়ন মুদিয়া জপ করিতেছেন—আর এক একবার আশা-আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছেন—প্রভু বুঝি এই আসেন! তাঁহার আনন্দ-নিকেতন, কুটীর প্রাঙ্গণ পবিত্র করিতে বুঝি এই আসেন—এই আসেন!

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল—তুলসীদাস ইষ্ট দর্শনে বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহর অতীত হইল তথাপি দেখা নাই। বেলা প্রায় শেষ হয়—উৎকণ্ঠিত চিত্তে তুলসী-দাস ভগ্নমনা হইয়া ভাবিতেছেন—এ কিরূপ হইল! ভগবানের প্রিয় ভক্ত রামদাস হনুমান স্বয়ং আশা দিয়াছেন—আজ দেখা হইবে—তবে একি হইল! দেখি কতক্ষণে তাঁহার দর্শন পাই? তুলসীদাস আবার জপে বসিলেন—পাছে মন চঞ্চল হয় বলিয়া তিনি দোকানের দুইখানি ঝাঁপ বন্ধ করিয়া একখানি খুলিয়া রাখিয়া তদ্গতচিত্তে জপে বসিলেন। কিন্তু মনস্থির করিতে পারিলেন না—বাহিরের কোলাহল আসিয়া তাঁহার দোকানের সংলগ্ন প্রাঙ্গণ মুখরিত করিল।

হঠাৎ একজন বেদিয়া বেদিনী সঙ্গে একটী বাঁদর লইয়া নাচাইতে আসিল। সঙ্গে আরও একজন উত্তর সাধকরূপে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া তুলসীদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"এ সাধুজী! বান্দর কা খেল দেখ, খুব বড়িয়া খেল, বহুৎ কসলৎ দেখা এক্কা, হুকুম হয় ত খেল সুরু কর দেঁই?"

তুলসীদাস তখন তন্ময়চিত্ত। দিবাভাগ অতীত হইয়া যায়—এখনও তাঁহার ইষ্ট দর্শন—ভগবান রামচন্দ্রের দর্শনলাভ হইল না! পরমভক্ত হনুমানের কথাও মিথ্যা হইল? ভাবিয়া তিনি প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছেন—মন ক্ষুন্ন হইয়া গিয়াছে—চিত্ত বড়ই অপ্রসন্ন! তখন কি আর "বাঁদর নাচ" দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে প্রাণ চায়? যে আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিয়া তিনি পরমানন্দে সাঁতার দিবার জন্য আশা করিয়া বসিয়া আছেন—সে আনন্দ কোথায়? এখন আবার এ জঞ্জাল কোথা হইতে আসিল? বৃথা আমোদ-প্রমোদের কোলাহল কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার প্রাঙ্গণে জমা হইয়া এত সাধের, এত কষ্টের, এত আয়াসের সাধন-ঘোর ভাঙ্গিয়া দিল! তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"নেহি নেহি, খেলনেকা কুছ দরকার নেহি, আভি ভাগো।"

তাহারা বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল—এখানে কিছু রোজগার হইবে; বাঁদরের কসলৎ দেখাইয়া তুলসীদাসের নিকট হইতে বেশ দুই পয়সা আদায় করিবে, কিন্তু তাহা হইল না। মালিক যখন বিরক্ত হইয়া তাড়াইয়া দিল, তখন আর কি হইবে? অগত্যা তাহারা মুখভার করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তুলসীদাস হতাশ প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। সেদিন আর তাঁহার খাওয়া হইল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—হায়! অদৃষ্ট ক্রমে হনুমানের ন্যায় ভক্তপ্রবরের কথাও মিথ্যা হইল! তাঁহার কথায় যখন বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করিতে পারা গেল না, তখন আর কাহার কথা সত্য হইবে—কাহার কথায় বিশ্বাস করিব?

পরক্ষণেই বলিলেন—না না—তা কখনও হইতে পারে না। মনুষ্যের যেমন কাজকর্ম্ম আছে—দেবতাদিগের ত সেইরূপ কাজকর্ম্ম আছে। আমরা সামান্য সংসারের কাজে বিব্রত হয়ে যখন কথার ঠিক রাখিতে পারি না, তখন ত্রিলোকের কর্ত্তা যিনি—তাঁহার কত কাজ। হয় ত ভক্তবীর হনুমান তাঁহাকে উপরোধ করিলে তিনি অন্য কার্য্য সম্পাদনের আবশ্যকতা দেখাইয়া, বোধ হয় অদ্য আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের বিষয় স্থগিত রাখিয়াছেন। তাঁহার আরও কত মহৎ ভক্ত ত আছেন? আমি সামান্য, অতি দীন ভক্ত। আজ শ্রীরামনবমী, বোধ হয় কার্য্যের ভিড় বেশী। আচ্ছা দেখি প্রভু কি করেন? নতুবা কল্য আবার সেইস্থানে গিয়া মহাবীরের পায়ে জড়াইয়া পড়িব—যতক্ষণ একটা সদুত্তর না পাইব—যতক্ষণ তাঁহার কথা সঠিক বলিয়া মনে না করিব—ততক্ষণ পা ছাড়িব না। প্রভু! দেখা আমাকে দিতেই হবে—তুলসী চিরকাল একগুঁয়ে ছেলে—যা ধরে, তা না করে ছাড়ে না! দেখি তুমি কত ফাঁকি দাও? "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এ মহাবাক্য যখন সার করেছি, তখন তুমি যাবে কোথা ঠাকুর? ভক্ত প্রাণের তেজ যে অসীম—কার্য্য যে তাঁহাদের অসমসাহসীক! এরূপ আত্মোৎসর্গ, এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে কি সেই দেবের দুর্লভ ধন লাভ করিতে পারা যায়? পৃথিবীর সামান্য বস্তু লাভ করিতে যখন কত সহ্য করিতে হয়, তখন এ অপার্থিব পরমার্থ বস্তু লাভে একদিন নিরাশ হইয়াছি বলিয়া কি চিরকালই হইব? প্রভু যে আমার ভক্তাধীন! ভক্ত কাতর কণ্ঠে ডাকিলে—তিনি যে স্বর্গের মণিমন্দির ত্যাগ করে, মা সীতাদেবীর অমৃত ভোগ ত্যাগ করে, ভক্তের পর্ণ কুটিরে শাকান্ন ভোজন করিতে

দৌড়িয়া আসেন। আজ আমারই ত্রুটী হইয়াছে বোধ হয়! আমার প্রাণের ডাক, তাঁহার চরণে পৌছায় নাই! শুধু হনুমান বলিলে কি হইবে—আমার প্রাণের ঐকান্তিকতাও ত চাই?

ভক্তবীর নিরাশ হইলেন না। আশার আশ্বাসে রামপ্রেমে মজিয়া রজনী যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া গৃহে আসিলেন এবং পূর্ব্বদিনের ব্রত ধারণের মোক্ষফল প্রাপ্তির জন্য, সাধক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর তুলসীদাস কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

সমস্তদিন অতি প্রফুল্ল মনে রামগুণানুকীর্ত্তন করিয়া বৈকালে পুনরায় যেখানে রামায়ণ গান হইতেছিল—সেইখানে হনুমানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেদিনকার মত ঠিক নির্দ্দিষ্টস্থানে সেই ব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মনে মনে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। পাছে কেহ জানিতে পারে, এইজন্য স্বতন্ত্র স্থানে বসিয়া তিনি ভগবানের গুণানুবাদ শুনিয়া ভক্তিভরে অজস্রধারে নেত্রনীর বিসর্জ্জন করত আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

তারপর যখন কথকতা ভাঙ্গিয়া গেল—সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ব্যাধিগ্রস্ত বিপ্র যখন উঠিয়া আপন গন্তব্য পথে ধাবিত হইলেন, তুলসীদাসও পশ্চাদনুসরণ করিয়া সেই বনের প্রান্তভাগে দেখা করিলেন। বলিলেন—ভক্তবীর! একি, আপনি আশা দিয়া নৈরাশ করিলেন? আমি গত কল্য সমস্তদিন প্রভুর আশায় বসিয়া বসিয়া কাল কাটাইলাম, কিন্তু কই, তাঁহার দর্শন ত পাইলাম না! এ কি ছলনা প্রভু! আজ যদি আপনি প্রকৃত পন্থা বলিয়া না দেন, তাহা হইলে আজ আর আপনাকে ছাড়িব না। এই বলিয়া ভূমে লুটাইয়া হনুমানের পদদ্বয় বক্ষে জাপটাইয়া ধরিলেন।

ভক্তের বক্ষ ভগবানের আসন। পবননন্দন সাগ্রহে বলিলেন—আহা, করিস কি তুলসীদাস? ছাড় ছাড়, তুই যে পরমভক্ত. ভগবান যে তোর জন্য সদাই উতলা! এই বলিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন এবং মধুর বচনে বলিলেন—বৎস! সে কি কথা? গত কল্য ত আমরা তোমার ভবনে গিয়াছিলাম। প্রভু স্বয়ং মা জানকীর সহিত, আমার গলায় দড়ি দিয়া নাচাইতে নাচাইতে গিয়াছিলেন, ঠাকুর লক্ষণও ঝুলি কাঁধে করিয়া সঙ্গে ছিলেন। তবে যাই নাই কি? তোমাকে কত জেদ করিয়া প্রভু বাঁদর নাচ দেখিতে বলিলেন, কিন্তু তুমি বিরক্ত হইয়া বলিলে—না, না, আর খেলা দেখাইতে হইবে না—কাজেই আমরা চলিয়া আসিলাম। বরং এই দেখ আমার গলায় এখনও দড়ি বাঁধার দাগ রহিয়াছে। কাল তোমার জন্য আমাকেও পুনরায় বন্ধন যাতনা সহ্য কর্ত্তে হয়েছিল।

তুলসীদাস ঘোর বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কাঁদিয়া হনুমানের পদানত হইয়া বলিলেন—একি প্রভু! এত ছলনার মধ্যে এমন করিয়া দেখা দিলে, আমি কেমন করিয়া বুঝিব? প্রভু! ক্ষমা করুন, আমার জন্য আপনার এত কষ্ট!

হনুমান।—বৎস! এ আর তোমার জন্য কষ্ট কি? এ যে প্রভুর অনুজ্ঞা, তাঁর আশীর্ব্বাদ! তোমার মত ভক্তের জন্য এমন কষ্ট সওয়া ত প্রার্থনার বিষয়!

তুলসী আরও ভক্তি বিনম্রভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন—আপনার এইরূপ দয়াই বটে? আপনার ন্যায় প্রভুর এমন অনুরক্ত ভক্ত না থাকিলে কি ভীষণ রাক্ষস দশাননের কবল হইতে আমার মা জানকীর উদ্ধার হইত? প্রভু! দেখা যদি দিলেন—তবে এমন প্রচ্ছন্ন ভাবে কেন?

হনুমান।—বৎস! কলিতে সাক্ষাৎ দর্শন হয় না। এইজন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকারান্তরে প্রভু ভক্তকে দেখা দেন। নতুবা কখন কিরূপ লোকের সাক্ষাতে পড়িবেন—তাহার ত স্থিরতা নাই? এক ভাবের ঘোরে মনে মনে হৃদয়-সিংহাসনে ভক্ত ভগবানকে দেখিতে পায়। আর যদি সে না-ছোড় বান্দা হয়—প্রত্যক্ষ দেখিতে চায়—তাহা হইলে এইরূপ পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে প্রকারান্তরে দেখা ভিন্ন কলিতে আর অন্য উপায় নাই। তোমার ঐকান্তিক অনুরাগে, তোমার প্রাণভরা ভক্তিভাবে প্রভু আমার তোমার প্রতি বড়ই সুপ্রসন্ন। এরূপভাবে আরও অনেকবার দেখা হইবে। তবে প্রভু তোমার কাছ ছাড়া একদণ্ডও নহেন—ইহা স্থির নিশ্চয়। তোর অন্তরে অন্তর্যামী-রূপে ত রহিয়াছেন—যেমন আমার হৃদয়ে। বৎস! ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেখ—এ জগৎ প্রপঞ্চ যে তাঁহারই মূর্ত্তি। তিনি যে সর্ব্বময়, সকল ভূতে তাঁর অধিষ্ঠান। তুমি যেরূপভাবে তাঁহাকে দেখিতে চাহিবে—যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিবে, তিনি সেই ভাবেই আবির্ভাব হইবেন। কেন, তুমি কি গীতায় পড় নাই—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং"। তবে এরূপ সেরূপ করিয়া বিরূপ হইয়া পড় কেন? যাও, আর কোন চিন্তা নাই। ভক্তশ্রেষ্ঠ, জ্ঞান বৃদ্ধ তুমি বাকসিদ্ধ হইয়াছ। তোমার জীবন্মুক্তি হইয়াছে—ভয় ভীতি আর কিছু নাই। পার তো চিত্রকুট পর্ব্বতে একবার গমন করিও। সেস্থান প্রভুর প্রিয়স্থান, দৃশ্যও অতি মনোরম। এই বলিয়া পবন নন্দন মারুতী অরণ্যের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

তুলসীদাস বিগত দিনের ঘটনায় তাঁহার আহম্মুকীতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। প্রাণ আজ আনন্দে বিভোর—এরূপ আনন্দ তুলসীদাস জীবনে কখন ভোগ করেন

নাই। ইহার সহিত পার্থিব কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না তুলসীদাস সেই দিন হইতে গৃহে আসিয়া দোকান-পাঠ বন্ধ করিয়া কেবল অহরহঃ অমৃত-নির্ঝরিণী রামনাম রসনায় গান করিয়া কাশীর গগন-পবন পবিত্র করিতে লাগিলেন। আহার-নিদ্রা তাঁহার দূরে পলাইল। জীবনের জীবন যাহার জীবন রক্ষার জন্য,—অলক্ষ্যে পাছে পাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার জীবন রক্ষার জন্য ভাবনা কি? তুলসীদাস কোন দিন কোন ছত্রে স্বহস্তে কিছু পাক করিয়া খাইতেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কাহারও পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিতেন না। কোন দিন হয় ত উপবাসী থাকিতেন, তথাপি সে দেহ হইতে এমন কমনীয় নয়নাভিরাম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল যে, যে দেখিত সেই তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে পথ ছাড়িয়া দিত। আহার করিতে চাহিলে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্যদানে তাঁহার সন্তোষসাধন করিত। কিন্তু তিনি প্রায়ই কাহারও দারস্থ হইতেন না—স্বহস্তে যথায় তথায় পাক করিয়াই খাইতেন—যথায় তথায় শুইয়াই রজনী যাপন করিতেন। ভগবান যাহার প্রহরী-রূপে সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন—তাহার সকল স্থানই ত স্বর্গ, সকল খাদ্যই ত অমৃত! ভক্ত ভগবানকে নিবেদন করিয়া বিষ খাইলেও অমৃতের গুণ ধারণ করিবে।

এইজন্য তুলসীদাস পারকপক্ষে কাহার নিকট আহার করিতেন না। নিজের স্কন্ধে একটী বুঝি রাখিয়া তাহাতে আবশ্যকীয় দ্রব্য রক্ষা করিতেন—যেখানে ইচ্ছা হইত, রন্ধন করিয়া খাইতেন। তাঁহার ত স্থানের স্থিরতা নাই! এই সময় হইতে তুলসীদাস এক প্রকার "ভবঘুরে" হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইলে সাধকের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। তখন তাঁহার

নিজস্ব কিছুই থাকে না; তাই বলিয়া সমাজে থাকিতে হইলেও যাহার-তাহার অন্নভোজনও উচিত নহে। সমাজের চক্ষে ইহা অত্যন্ত দোষনীয়—এবং শিক্ষার অপব্যবহারও করা হয়। এইজন্য সাধক তুলসীদাস কখন অনাচারের প্রশ্রয় দেন নাই।

তবে তিনি প্রথমে কামিনীকাঞ্চনের বড়ই বিপক্ষ ছিলেন। সাধনসিদ্ধ হইবার পর হইতে তিনি মুখে মুখে উপদেশ স্বরূপ অনেক হিতকথা কহিয়া গিয়াছেন। সেই সকল উপদেশ "তুলসীর দোঁহা" নামে হিন্দু-সমাজে বিশেষ প্রচলিত। এই দোঁহার একটী না একটী জানে না, এমন লোক অতি বিরল। ঘর-সংসারের উপদেশে পণ্ডিতগ্রগণ্য চাণক্যের শ্লোক যেমন অতি উপাদেয়—একটি না একটী সকলেই জানে—সমগ্র জানিলে যেমন কোন বিষয়ে ঠেকিতে হয় না; সঙ্গীত-বিষয়ে শাক্ত ভক্ত রামপ্রসাদের সঙ্গীত যেমন অতি ভক্তি ভাব পূর্ণ এবং সুখশ্রাব্য সহজবোধ্য, বাঙ্গালাদেশে তাহার সঙ্গীতের একটী মাত্র জানে না, এমন স্ত্রী পুরুষ অতি বিরল—জানিয়া রাখিলে সময়ে অতি কঠোর প্রাণেও শান্তির সুধাধারা বর্ষণ হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেইরূপ, শুধু তাই নয়—এই বাঙ্গালাদেশেও সাধন বিষয়ে ভক্তকবি তুলসীদাসের দোঁহা অতি উপাদেয়- অতি জ্ঞানগর্ভ। সামান্য কথায় তিনি এমন মহৎ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যাহা সাধন বিষয়ে সকলের অনেক উপকারে আইসে। তিনি প্রায়ই বলিতেন—

দিন্‌কা বাঘিনী রাত্‌কা মোহিনী পলক পলক লই চুষে,
দুনিয়া সব বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

নারীজাতিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এই দোঁহা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই রমণীর প্রতি আসক্তিই তাঁহাকে এতদূর উন্নতির সোপানে

তুলিয়াছিল। রমণীর প্রতি আসক্ত হও, পুত্র-কলত্র প্রতিপালন কর—কিন্তু তাহাদের প্রেমে আমার মত বউরা, যথার্থ পাগল হইয়া সময় নষ্ট করিও না। স্ত্রীজাতি শক্তি-স্বরূপা বলিয়া তাহার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি দেখাইয়া পরকালের পথ নষ্ট করিও না—ইহাই উক্ত দোঁহার উদ্দেশ্য। এইজন্য তিনি পরে বলিয়াছেন :—

নিগু'ণ'হোয় সো পিতা হামারা, সগুণ হে য় সে মাতা হামারী।
কাকে নিন্দো, কাকে বন্দো দুণো পাল্লা ভারী।

শেষে তিনি এইরূপে স্ত্রীজাতিকে মহ শক্তির অংশ বলিয়া হৃদয়ে ধারণা করিয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদের গানের ন্যায় দোঁহাগুলি তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। যে গুলি গভীর ভাবপূর্ণ, সেগুলি তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর গভীর জ্ঞানের অবস্থায় রচিত, আর যেগুলি হাল্কা ভাব পূর্ণ, সেগুলি সাধন সিদ্ধির পূর্ব্বাবস্থায় রচিত। অতএব ভাবের তারতম্য অনেক। সাধক রামপ্রসাদের গানেরও এই ভাব।

সাধন সিদ্ধির পর তুলসীদাসের কর্ম্ম-বিপাক কাটিয়া গিয়াছিল। এই সময় তিনি আর বেশী কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না। কেবল শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনায় রাতদিন কাটাইয়া দিতেন—জীবনের প্রধান কর্ম্ম নাওয়া খাওয়া, যাহাতে শরীর রক্ষা হয়—সে কর্ম্মও তাঁহার ভুল হইয়া যাইত, এইজন্য তিনি বলিতেন :——

যাঁহা কাম তাঁহা রাম নেহি, যাঁহা রাম তাঁহা কাম।
দুনো এক নাহি মিলে, রবি রজনী এক ঠাম॥

তুলসীদাসের এই সময়কার ভাব দেখিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে দেখিলে ভক্তিভরে দেবতার ন্যায় আদর করিয়া চরণে প্রণত হইত। তখনকার অনেকানেক

নৃপতিবর্গ, এমন কি অম্বরাধিপতি অমর সিংহ প্রমুখ রাজন্যবর্গও তাঁহার চরণাশ্রয়ে আসিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

তুলসীদাস কাহারও বাড়ী যাইতেন না—আপন সাধন-পাঠে বসিয়া অনবরত রাম নাম জপে বিভোর থাকিতেন—সময় পাইলে অধ্যাপনা কার্য্যেও তিনি খুব আনন্দ অনুভব করিতেন। এইজন্য অনেক ছাত্রও তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিয়া জীবনের পথ মুক্ত করিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অভীষ্ট পুরণ

মনকে সকল প্রকার মালিন্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য, প্রাণকে সৎপথগামী, সৎভাবাপন্ন করিবার জন্য সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। অনেক অসাধু ব্যক্তি যখন এই সৎসঙ্গের শীতল ছায়ায় বসিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে—তখন পবিত্র চিত্ত, নির্ম্মল অন্তঃকরণ সাধু ব্যক্তি যে এ ছায়ায় আসিলে আরও নির্ম্মল এবং উন্নত শক্তিশালী হইবেন—তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তুলসীদাস চিরকাল সাধুসঙ্গের বড়ই প্রিয় ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ভগবান তাঁহাকে সাধু-সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিপালিত করাইয়া তাঁহার স্বভাব এইভাবে বিভোর করিয়া দিয়াছিলেন। সাধুসঙ্গে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিব—মনের কলুষ কালিমা ধৌত করিয়া প্রাণের আনন্দে বিচরণ করিব—তুলসীদাসের ইহা অন্তরের ইচ্ছা হইলেও এতদিন

তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার সকল দ্বার মুক্ত হইয়াছে, সাধন ক্ষেত্রে তিনি এখন অনেকটা উন্নতি করিয়াছেন, কাশীতে পণ্ডিত ও সাধক বলিয়া তাঁহার বেশ সুযশ মহত্ব প্রচারিত হইয়াছে। এইজন্য এখন সম্পূর্ণ ইচ্ছা, একবার তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় জন্মভূমি অযোধ্যা, চিত্রকূট, পঞ্চবটী প্রভৃতি লীলা-নিকেতন দর্শন করিয়া প্রাণে আনন্দ লাভের ইচ্ছা হইল। রামভক্ত হনুমানজীও তাঁহাকে এই সকল দেশ ভ্রমণের আদেশ দিয়াছিলেন। ঐসকল স্থান ভগবানের পদরেণুতে মাথামাখী, অতএব তাঁহার পবিত্র মাটী অঙ্গে মাখিলেও জীবন সার্থক—দেহ পবিত্র হইবে।

গুরুর আদেশে তুলসীদাস নিজের আস্তানায় একটী চতুষ্পাটী খুলিয়াছিলেন, তাহা এখন বেশ চলিতেছে—অনেকগুলি ছাত্র এখন তুলসীদাস বাবাজীর টোলে পাঠ করিতেছে। তুলসীদাস বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের শিক্ষা দানে তাহাদের মনের আঁধার দূর করিতেছেন। অপরাপর চতুষ্পাঠী অপেক্ষা ছাত্রগণ এখানে বেশ সুখে আছে, এবং পাঠাভ্যাসেরও অসুবিধা কিছু নাই। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা তুলসীদাসের ঐকান্তিক যত্নে ছাত্রগণ বেশ লেখাপড়া শিখিতেছে।

একদিন তিনি আপনার ছাত্রগণকে রাজী করিয়া দেশ ভ্রমণের জন্য নিজ গুরুদেব ঘণ্টাকর্ণ যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ঘণ্টাকর্ণ তুলসীদাসের প্রধান সহায়। কাশী-প্রবেশের পথে তিনি তাঁহাকে আনিয়া সাদরে নিজ চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় প্রদান না করিলে, পুত্রের ন্যায় শিক্ষা দান এবং সাধন পন্থা সকল বিবৃত করিয়া না দিলে—তুলসীদাসের

এত শীঘ্র এরূপ উন্নতি কখনই হইত না। আজ যে তিনি কাশী-ধামে এত প্রতিপত্তি সম্পন্ন এবং সাধন-মার্গে এত উন্নত হইয়াছেন, ভগবান যে তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর অগ্রসর করাইয়াছেন—তাহার মূলে যোগীবরের অমোঘ আশীর্বাদ এবং প্রাণান্তিক সদিচ্ছা বর্তমান, ধর্ম্ম জীবনে তিনিই যে গুরুরূপে তাঁহার প্রধান সহায়, সাধু তুলসীদাস তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। এইজন্য যাইবার অগ্রে যোগীবরের পাদবন্দনা করিয়া অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। ঘণ্টাকর্ণ আনন্দের সহিত অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন—বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ভগবানের লীলাক্ষেত্র সকল দর্শন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধলাভ কর, ভগবান রামচন্দ্র তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া ছাত্রগণের উপর চতুষ্পাঠীর ভারার্পণ করত তুলসীদাস প্রথমে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আর যত তীর্থ দেখা হউক বা নাই হউক, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমিও লীলাক্ষেত্র সকল দর্শন করিয়া মনপ্রাণ সুশীতল করিবেন—এই একমাত্র ইচ্ছা। শিষ্যের অনুপস্থিতিতে যাহাতে তাঁহার টোলের অবস্থা খারাপ না হয়—ঘণ্টাকর্ণ প্রত্যহ একবার করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন—প্রয়োজন হইলে কিছু কিছু শিক্ষাদানেও বিরত হইতেন না এবং প্রধান ছাত্রকে অভাব অভিযোগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ছাত্র কোনপ্রকার অভিযোগ করিলে যোগীবর তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতেন। এখনকার মত দ্বেষাদ্বেষী ভাব তাঁহার ছিল না। উন্নতমনা সাধু চরিত্রেও যদি এরূপ কলঙ্ক বর্তমান থাকিবে—তবে তাঁহার সাধুত্ব কোথায়?

তুলসীদাস বহু আয়াসে প্রথমে পঞ্চবটী বন ভ্রমণ করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থান হইতেই

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাখেলার সূত্রপাত। পঞ্চবটীর বনে ঠাকুর লক্ষণ শূর্পনখার নসাকর্ণ ছেদ করিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ সীতা হরণ করিলেন। বনবাসী নিঃসহায় শ্রীরামচন্দ্র এইস্থানে আসিয়াই সুগ্রীব, হনুমান, নল, নীল প্রভৃতির সহিত সখ্যতা করেন এবং অনুচরগণের সাহায্যে রাবণবধ করিয়া সীতাদেবীর উদ্ধার করিয়া আপন মহত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সেই গিরিবর চিত্রকূট, তাঁহার লীলাখেলার প্রথম সোপান। মরি মরি! এমন পবিত্র স্থান কি আর আছে? সম্প্রতি সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে এখানে বহু সাধু সমাগম হইতেছে। বহু সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ করিয়া ভক্তবীর তুলসীদাস আনন্দে অধীর হইতে লাগিলেন। সাধু সহবাসের অপূর্ব্ব মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তিনি কিছুদিন এই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামদাস মারুতাত তাহাকে এইস্থানে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন—অতএব নিশ্চয়ই এস্থানে ভগবানের কোনপ্রকার বিভূতি দেখিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিতে পারিবেন। তুলসীদাস অনন্যচিত্ত হইয়া একটী নিভৃতস্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ সূর্য্যগ্রহণের মেলার অবসান হইল—সাধু সন্ন্যাসীগণ একে একে চিত্রকূট ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তুলসীদাস কোথাও যাইলেন না, একাকী নিজ আবাসেই অবস্থান করিতে লাগিলেন কিন্তু এই অজানা অচেনা দেশে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এ কয়দিন সাধু সজ্জনগণের কৃপায় তাহার কোন অভাব হয় নাই—একপ্রকার বেশ আনন্দে কাটিয়া যাইতেছিল—আহারাদিরও কিছু অনটন হয় নাই। এইবার মেলা ভাঙ্গিলে, তথায় লোকজনের অভাব হইলে, তাঁহার একবেলার সামান্যমাত্র জীবন ধারণের মত আহারেরও অভাব হইতে লাগিল। নিকটে লোকালয় নাই—যে ভিক্ষা করিয়া

তাহা সংগ্রহ করিবেন। সামান্য চিড়াগুড়, ছাতু, চানা পাইবার জন্য কয়েকখানি ক্ষুদ্র দোকান আছে—কিন্তু তাঁহার ত অর্থ নাই, আসিবার সময় সে সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে—তথাপি তুলসীদাস এইরূপ ভয়ানক অভাবে পড়িয়াও কিছুমাত্র মুহ্যমান হইলেন না। ভগবান যখন জীব দিয়াছেন—তখন আহারের জন্য তাঁহাকেই ব্যবস্থা করিতে হইবে—প্রাণে এ বিশ্বাস দৃঢ় না থাকিলে কি সাধু হওয়া যায়? আনন্দময় সাধক-জীবন অর্থাভাবে একদিনের জন্যও নিরানন্দ হইল না। প্রত্যহ নির্ঝরিণী নীরে স্নান করিয়া তুলসীদাস নিজ কুঠিরে ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা পাইলে কেবল গাছের ফল ও ঝরণার জল তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল।

এইরূপ কয়েকদিন গত হইলে হঠাৎ একদিন দুইটী কাঠুরিয়া—একটী বালক ও একজন বৃদ্ধ, মস্তকে কাঠের ভার লইয়া, আর একজন তীর ধনুক লইয়া একটী মৃগের পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে তুলসীদাসের কুঠির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিণটী তখন পলায়ন করিয়াছে, তুলসীদাসকে মুদ্রিত নয়নে দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল—ইঁহার বোধ হয় কাষ্ঠের দরকার আছে, ধূনি জ্বালাইবার জন্য ইনি বোধ হয় কাষ্ঠ খরিদ করিতে পারেন। এইজন্য নিকটবর্ত্তী হইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল—"এ সাধু এ সাধু—এ সাধুজী, আরে লেকড়ি নিবে?"

তুলসীদাস মুদ্রিত নয়নে নিরুত্তর। কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল—"আরে ভালা ত সাধু দেখ্ছি, এতো হাঁকাহাঁকি করছিস্—তবু সাড়া দিল না।"

বালক। না না সাড়া দিল না, আরে আঁখ মুদিয়ে কি মতলব করছেরে, এ সাধুজী, পণ্ডিতজী! লেকড়ী নিবে?

মুদ্রিত নেত্র তুলসীদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"না বাবা! আমার লেকড়ীর আবশ্যক নাই, তোমরা অন্যত্র চেষ্টা কর!"

বালক। আরে সাধু বাবা! তু আঁখি মুদিয়ে বলছিস্‌রে—আঁখি খুলিয়ে দেখ্‌, কই সন্‌ ভালা লেকড়ি নেইয়েছি।

তুলসী। বাবা! আমার রন্ধনের দ্রব্য নাই—কাট লইয়া কি করিব? তুমি ভালই আন, আর মন্দই আন, আমার দেখ্‌বার আবশ্যক নেই; বিরক্ত করো না বাবারা! প্রাণ বড় ব্যাকুল—আমাকে চিন্তা কর্ত্তে দাও—তোমরা অন্যত্র দেখ।

বৃদ্ধ। এ ছেলিয়া! এ সাধু ত চক্ষু চাহিলে না—হামি বহুত সাধু দেখিয়েছি—এমন পাগলা সাধু কভি দেখি নেইরে! আরে, একবার চাহিয়ে দেখ্‌লে কি তোর প্রাণের ধন পালিয়ে যাবে রে?

তুলসীদাস বিরক্ত হইয়া—আচ্ছা বাবা! এই চক্ষু চাহিলাম—এখন কি কর্ত্তে হবে বলো?

কাঠুরিয়া বালক হাস্য করিয়া করতালি দিতে দিতে "আরে বুড়া! এই দেখ সাধু চাহিয়েছেরে চাহিয়াছে!"

তুলসীদাস চক্ষুরুন্মিলন করিয়া বলিলেন—"মরি মরি, কাঠুরিয়া বালকটীর কি রূপ! যেন প্রাণ আকর্ষণ কচ্ছে, নীচ জাতির মধ্যেও ত এমন ছেলে থাকে? তুলসীদাস বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এখন তোমাদের কি কর্ত্তে হবে বাবা, বলো ত?"

বালক। তু লেকড়ি লিবি! হামার বুড়ো মা বাপ ভুখা আছে, খাবার কুছ নাইরে, তু চার পয়সা কা লেকড়ি লে! হামার বুড়ো মা বাপ্‌ খাইয়া বাঁচবে। শীকার কর্ত্তে এলাম—শীকার পলিয়ে গৈলো।

তুলসী। বাবা! আমি বিদেশী, এই কিছুদিন এখানে এসেছি,

যা অর্থ ছিল—সব ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন কিছুই নাই। যদি তোমাদের এতই অভাব হয়ে থাকে, তা হলে আমার এই চাদর-খানি বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ কর, ইহাতে তোমার পিতামাতার একদিনও চল্‌বে ত? এই বলিয়া পরম ধার্ম্মিক পরার্থপর জীবন তুলসীদাস বালকটীর হস্তে নিজের চাদরখানি প্রদান করিলেন।

বালক। দে, দে, তুঁ ইচ্ছা করিয়ে দিচ্ছিস্—হামি লিবো নাই কেনো? রাগ কর্ব্বি নাই ত?

তুলসী। না বালক! যখন স্বইচ্ছায় দিচ্ছি, তখন রাগ কর্ব্বো কেন, তুমি শীঘ্র গ্রহণ করে, ইহার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করো গে, আমি ধ্যান করি।

বালক। এ সাধুজী! আমি তুঁকে কুছু দিব না, দিবো, দিবো, এই এক থাটী লেকড়ী লেরে।

তুলসী। না বালক! আমার কাষ্ঠের প্রয়োজন নাই—তুমি অন্যত্র দিলে, ইহার পরিবর্ত্তে কিছু পাবে—নিয়ে যাও না?

বৃদ্ধ। এ সাধুজী! ছেলিয়া দিচ্ছে, লেরে, কুনো হরজা হোবে না।

বালক। এই লে লে—আমি দিচ্ছি, তুঁ লেরে!

অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তুলসীদাস আর কিছু বলিলেন না, ধ্যানে বসিলেন। তথাপি কাঠুরিয়া বালক সরিল না, বলিল—আরে সাধু! তুঁ আঁখ মুদিয়ে ধ্যান কচ্ছিস্‌রে! আঁখ মুদ্‌লে কি কুছু দেখা যাবে, হেথা কেন আসিয়েছিস্!

তুলসীদাস বালকের মধুর আলাপে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—বাবা! এই চিত্রকূট গিরি ভগবান রামচন্দ্রের লীলা-নিকেতন শুনিয়াছি, ভগবান এখানে নিত্য বিহার করেন, তাই তাঁর রাতুল চরণ দেখে জীবন সার্থক কর্ত্তে এসেছি!

বালক। আরে বুড়ুয়া! সাধু রামজী দেখ্‌বেরে, এ সাধু বাবা;! তুঁ ত. বড় আব্দার ধরিয়েছিস্‌, রামজী কি তেরা সাম্‌নে আসিয়ে খাড়া হোবে রে!

তুলসী। বাবা! ইহাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্যামী হয়ে তিনি আমার অন্তরের আশা পূর্ণ করিবেন না কেন?

বুড়া। সাধুজী! এই লেকড়ি লে, হাম্‌ লোক চলে!

বালক। সাধু বাবা! তব্‌ হাম্‌ লোক চলে!

তুলসীদাস বলিলেন—হাঁ বাবা! তোমরা এস, বেলা অনেক হয়েছে!

কাঠুরিয়াদ্বয় চলিয়া যাইলে তুলসীদাস পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। বালক দৌড়িয়া পলাইবার সময়—"আরে আঁখ খুলিয়ে ধ্যান কররে" বলিয়া—রে-রে-রে—এ বুড়ুয়া একঠো ভালুকী ভগছে—ঐ দেখ রে! বলিয়া পলায়ন করিল। বালক ও বৃদ্ধ অদৃশ্য হইলে তুলসীদাস কাঠের আঁটটী দূরে নিক্ষেপ করিবার সময় তাহা হইতে কতকগুলি স্বর্ণ-মুদ্রা ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তুলসীদাস বিস্ময় সহকারে বলিল—এ কি, এ কি, ইহার মধ্যে এত অর্থ কোথা হইতে আসিল! কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মনের আবেগে "ওহো বুঝেছি" এ কাঠুরিয়া বালক নহে, ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই আমার হৃদয় দেবতা এসেছিলেন, আমার অভাব বুঝতে পেরে, এই খেলা খেল্‌লেন? ভগবান্‌! আর কতদিন এমন করে ছলনা করবে ঠাকুর! তুলসীদাস ভাববিভোর হইয়া তন্ময় হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন—চিত্রকুটের প্রতি লতাগুল্মেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জড়িত হইয়া খেলা করিতেছেন। তুলসীদাস উঠিয়া প্রত্যেক বৃক্ষলতা, প্রত্যেক শিলাখণ্ডকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হইলেন। সেদিন চিত্রকুট গিরিগহনে ফলমূল ও নির্ঝরিণীর জল ব্যতীত আর আর

কিছু খাওয়া হইল না। পুলকপূর্ণিত দেহে তুলসীদাস তাহাই উদরস্থ করিয়া শীলাতলে শয়ন করত রাত্রি যাপন করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন ভক্তবীর তুলসীদাস বনের ফল, নদীর জল খাইয়া চিত্রকূটে কাল কাটাইতে লাগিলেন। যে দিন অত্যন্ত ইচ্ছা হইত—সেদিন পসারীর দোকানে গিয়া কোন দিন ছাতু গুড়, কোন দিন বা চানা গুড় কিনিয়া আনিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতেন। একদিন সেই দারুণ গ্রীষ্মের প্রভাতে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে ভগবানের উপাসনায় যাপন করিয়া অতি প্রত্যূষে তুলসীদাস ইষ্টপূজার জন্ম ঝুলি হইতে চন্দন কাষ্ঠ ও শীলা লইয়া চন্দন ঘসিতেছেন। এমন সময় একটী সুন্দর বালক আসিয়া তাঁহার কুঠিরে উপস্থিত হইল। বালকের অপূর্ব্ব মোহন বেশ, নবীন মেঘের ন্যায় বর্ণ—সন্ন্যাসীর মত মস্তকে জটাভার, অতি সুঠাম গঠন; বালক তুলসীদাসকে লক্ষ্য করিয়া অতি আবদারের সহিত বলিল—সাধুজী! আমাকে চন্দন পরাইয়া দাও না?

বালকের দিব্যজ্যোতি পূর্ণ মনোহর বরবপু দেখিয়া তুলসী মুগ্ধ চিত্তে মনে মনে বলিলেন—মরি! মরি! এ বালক ত যে সে নহে! তিনি করযোড়ে অতিশয় বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

বালক! শুনহ বিনয় মম এহুঁ,
তুম্ শ্রীরামচন্দ্র কি কেহুঁ?

বালক সহাস্যে উত্তর করিল—"সাধু! সকল শ্রীরাম অবতারা।" বালকের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তুলসীদাসের দেহ কণ্ঠকিত হইতে লাগিল, প্রেমপুলকে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, নয়ন কোনে অশ্রু দেখা দিল—স্বেদনির্গমনে শরীর স্নাত হইতে লাগিল—সাধক তখনই সমাধি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে তুলসীদাস চারিদিকে

চাহিয়া দেখিলেন—হৃদয় দর্পণে যাহাকে দেখিতেছিলেন—এইবার নয়নের সম্মুখে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছায় যখন চাহিয়া দেখিলেন—ত আর কেহ নাই, কোথায়ই বা বালক আর কোথায়ই বা কে! সেই অপরূপ বালক, সেই লোকললাম জ্যোতির্বিশিষ্ট সুন্দর সন্ন্যাসী বালক আর তথায় নাই। শিলোপরি ঘর্ষিত চন্দনও দেখিতে পাইলেন না, তখন তাহার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন—তাহাই, এ বালক সামান্য নহে—এ তাঁহারই মনোচোর স্বয়ং ভক্ত-বিমোহন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র! তুলসীদাস তখন প্রভুকে হাতছাড়া হইতে দেখিয়া উন্মাদের মত ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। তন্ময় ভাবে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া যাহাকে দেখিতে লাগিলেন, পথে পথে ঘুরিয়া যাহারই সাক্ষাৎ পাইলেন, তাহারই গলা জড়াইয়া প্রেমাশ্রু বিগলিতনেত্রে বলিতে লাগিলেন :—

চিত্রকূট কি ঘাট পর ভই সন্তন কি ভিড়।
তুলসীদাস তাঁহা চন্দন ঘষয়তঃ তিলক দেই রঘুবীর॥

তুলসীদাস সেইদিন হইতে পাগলের মত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনবরত "হা রাম, হা ইষ্টদেব! একি ছলনা ঠাকুর" বলিয়া বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্ত বৎসল ভগবান, ভক্তের কাতর ক্রন্দনেআর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—ভক্তবীর তুলসীদাস, বৎস! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এ যুগে তুমিই আমার পরম ভক্ত! তুমি একখানি রামায়ণ রচনা করিয়া আমার লীলা-মহিমা প্রকাশ কর, এ কার্য্যে তুমিই যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। প্রভু রামচন্দ্রের আদেশ পাইয়া তুলসীদাস সেইদিনই রামায়ণ রচনার প্রভৃত উপকরণ সংগ্রহের জন্য ভগবানের জন্মভূমি অযোধ্যায় গমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সখ্যতার টান

তুলসীদাস দেশত্যাগী হওয়ায় দুঃখী তেওয়ারীর কষ্টের একশেষ হইয়াছে। সে পাড়ার কাহারও সহিত মিশিত না, কাহারও বাড়ী যাইত না, কেবল তুলসীর সহিত তাহার সখ্যতা ছিল—প্রাণের মিল ছিল। আজ প্রায় এক বৎসর তুলসীদাসের ন্যায় বন্ধুর অদর্শনে সেও কেমন শুখাইয়া গিয়াছে—প্রাণে ঘোর যাতনা অনুভব করিতেছে।

পাছে তুলসীদাসের শিষ্য যজমান নষ্ট হইলে সংসার অচল হয়—তাঁহার বৃদ্ধ জননীর ও পরিবারের কষ্ট হয়, এইজন্য সে প্রাণ-পণে তাহা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু শিষ্য যজমানের লোভে পড়িয়া বেশীদিন নীরবে থাকিলে ত বন্ধুর অন্বেষণ হইবে না, যত দিন যাইবে—ততই তুলসী মনের দুঃখে বেশী দূর দেশে যাইবে, তখন আর সন্ধান পাওয়া দায় হইবে। এইজন্য তিনি নিজের মাতুলানীকে হুলসীদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া, একজন ব্রাহ্মণের উপর শিষ্য-যজমানের কাজকর্ম সমাধার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আজ কয়েক মাস হইল তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। হুলসীদেবীকে এবং পাড়ার সকলকে আশা দিয়া গিয়াছেন—প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় দাদাকে শীঘ্র ঘরে আনিয়া হাজির করিব। কিন্তু প্রায় দুই তিনমাস হইল—কই তাঁহারও ত দেখা নাই?

দুঃখীরাম রত্নাবলীকেও বুঝাইয়া গিয়াছেন—বৌদি! কোন চিন্তা নাই—দাদা আমার চক্ষু এড়াইয়া কোথাও লুকাইতে পারিবে না।

তুমি দেখ না, দুই তিন মাসের মধ্যেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিতেছি কিন্তু কই দুঃখী ত ফিরিল না? সখ্যতার টানে তাঁহার প্রাণ তুলসীদাসের জন্য একান্ত অধীর; সে পুরুষ মানুষ—কাঁদিতে পারে না, পাছে কেহ তাঁহাকে লঘুচিত্ত বলিয়া উপহাস করে কিন্তু তাঁহার প্রাণের ভিতর যে কি হইতেছে—তা সেই জানে, আর জানেন ভগবান যিনি অন্তর্যামী। এরূপ দাগা তিনি জীবনে কখনও পান নাই, এরূপ দুঃখ দুঃখী জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই—বন্ধু তুলসীর বিচ্ছেদে যত করিতেছেন। তিনি যে-থা করেন নাই—সংসারে তাঁর কোন বন্ধন নাই—চিরকাল সদানন্দে কাটাইবেন বলিয়া তিনি কোন বাঁধনে বাঁধা পড়েন নাই কিন্তু একি হইল—এক তুলসীর বিহনেই যে প্রাণ যায় যায়!

প্রকাশ্যে তাঁহার মুখে কোনপ্রকার মলিনতার ভাব নাই—সদাই হাঁসি বিরাজিত, হাস্য কৌতুকে তিনি সদাই মত্ত কিন্তু প্রাণে তাঁহার বন্ধু বিচ্ছেদের দাবানল দাউ দাউ জ্বলিতেছে, ভগবান এ অনল কি নির্ব্বাণ হইবে না, আর কি আমি তুলসীদাদার সঙ্গ লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিব না? দুঃখীরাম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনবরত পথ হাঁটিতেছেন, শরীর অনাহারে অনিদ্রায় দুর্ব্বল—দারুণ দুঃখে প্রাণ ওষ্ঠাগত—তথাপি বিরাম নাই।

তুলসীদাস সাধু সঙ্গ বড় ভাল বাসিতেন। ভাল সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে তিনি আত্মহারা হইয়া, গৃহ সংসার ছাড়িয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন, কাছে কাছে থাকিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মের কথা শুনিতেন—এ অভ্যাস তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবায় একপ্রকার পাগল ছিলেন বলিলেই হয়। তাই দুঃখীরাম যেখানে যত সাধু-সন্ন্যাসীর আস্তানা ছিল—তাঁহার পরিচিত

যে সকল মঠে ভাল ভাল সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিতেন—দুঃখীরাম সেই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কেহ তাহার প্রাণের দাদার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। তথাপি দুঃখীরাম হতাশ না হইয়া এইবার কাশীধামে যাইয়া শেষ চেষ্টা করিবেন—বলিয়া অগ্রসর হইলেন। কাশী যাত্রার পথে একটী পান্থশালায় দুঃখীরাম একদিন বিশ্রাম করিতেছেন—দুইদিন পরে কিছু আহারাদি করিবার আশায় পাকাদির যোগাড় করিতেছেন। এমন সময় তথায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স অতি অল্প, কথাবার্ত্তায় দুঃখীরাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—যে তিনি কাশী যাইবেন—তাঁহার এখনও স্মৃতির শিক্ষা শেষ হয় নাই—তাই কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বম্ভর স্মার্ত্তবাগীশের টোলে যাইতেছেন।

দুঃখীরাম তাঁহাকে তুলসীদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি বলিলেন—হাঁ তুলসীদাস নামে একজন ছাত্র ঘণ্টাকর্ণ যোগীর টোলে পড়িত কিন্তু কেবল শাস্ত্রপাঠে তাঁহার প্রাণে শান্তি না হওয়ায় উক্ত যোগীর নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া কিছুদিন ভব ঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। এখন শুনিতেছি—সে আবার নিজে অসি নদীর ধারে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া টোল খুলিয়াছে—কতকগুলি ছাত্রও পড়াইতেছে। আমাদের গুরুদেবের সহিত তাহার মনের মিল ছিল না, প্রায়ই সে আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যবস্থা ভুল বলিয়া কাটিয়া দিত, এইজন্য আমাদের সহিত তাহার বিরোধ, তাহার কোনও সন্ধান আমরা রাখি না, তবে সে যে কাশীতে আছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই বলিয়া সন্ন্যাসবেশী ছাত্রটী অপর স্থানে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

দুঃখীরাম একেবারে হতাশ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তুলসীদাসের

কতকটা সংবাদ পাইয়া, হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল—তিনি তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া সেদিনই চটী ত্যাগ করিবেন—এই আশা কিন্তু চটীয়াল বলিল—ঠাকুর! প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আজ আর এস্থান ত্যাগ করিবেন না—কিছুদূর যাইলে বড় মাঠ পার হইতে হইবে, সেখানে ভারি ঠাঙ্গারের উপদ্রব—রাত্রিকালে তাহাদের হাতে পড়িলে প্রাণের আশা বড় কম। অতএব রাত্রি অতিবাহিত করিয়া যাইলে ভাল হয় না? দুঃখীরাম দরিদ্র—ডাকাতগণ তাঁহার কি করিবে—টাকার জন্যইত তাহারা রাহী ব্যক্তির প্রাণ হনন করে, কিন্তু দুঃখীর ত তাহা নাই? তথাপি চটীয়াল অতি ভাল মানুষ এবং বৃদ্ধ—"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং মাপৎকালেহ্যুপস্থিতে" অতএব তাহার কথা অবহেলা করা ভাল নয়, ভাবিয়া দুঃখীরাম সেদিন আহারাদির পর চটীর একপার্শ্বে কম্বল পাতিয়া শয়ন করিলেন।

বহুদিন তাঁহার নিদ্রা হয় না। বন্ধুর জন্য প্রাণ অস্থির—মন চিন্তান্বিত ছিল, নিদ্রা হইবে কোথা হইতে? চিন্তার নিকট নিদ্রার প্রভাব যে কোন কার্য্যকারী হয় না! আজ বন্ধুর সন্ধান পাইয়া মনের আনন্দে বহুদিনের পর দুঃখীরাম গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—তাঁহার বৌদিদি যেন স্বামী-শোকে পাগলিনী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; তাহার খুড়ীমার অবস্থাও নিতান্ত খারাপ, বাটীর বার না হইলেও পুত্রশোকে তিনি একপ্রকার হতাশ হইয়া, নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক—কত সহ্য করিবেন? দুঃখীরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল—তিনি করযোড়ে উর্দ্ধে হস্তোত্তলন করিয়া বলিলেন—জগদীশ! যখন আশা দিয়াছ, যখন দাদার সন্ধান বলিয়া দিয়াছ, তখন আর কিছুদিন অভাগিনী জননী আর তাঁর

পত্নীকে প্রাণে বল দাও, আমি যেন দাদার সন্তান লইয়া তাহাদিগকে সুস্থ শরীরে দেখিতে পাই। পরোপকারী দুঃখীরামের আর নিদ্রা হইল না—বসিয়া বসিয়া রজনী যাপন করিলেন—তারপর পূর্ব্বাকাশে উষার আলোকরশ্মি দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চণ্ডালের নিকট বিদায় হইলেন।

কাশী আর বেশীদূর নাই। এই মাঠ পার হইয়া দুই তিন খানি গ্রাম অতিবাহিত করিতে পারিলেই বাবা বিশ্বনাথের শান্তিময় কাশীধামে প্রবেশ করিতে পারিবেন শুনিয়া দুঃখীরাম দ্বিগুণ উৎসাহে পথ চলিতে লাগিলেন।

প্রাণের আবেগে পথ চলিয়া তিনি বৈকাল বেলায় কাশীধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশীর মনোরম শোভা, তথাকার লোক সকলের ধর্ম্মময় ভাব দেখিয়া ধার্ম্মিক দুঃখীরাম মনে মনে বলিতে লাগিলেন—মরি মরি, এ কি স্বর্গ! এইজন্যই বুঝি লোকে কাশীবাসের জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করে—আর এইজন্যই বুঝি কাশীর মাহাত্ম্য পুরাণাদিতে এত বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে? বাস্তবিক এখানে আসিলে মানুষের সকল ভাবনা সকল যাতনা, তিরোহিত হয়—প্রাণে ধর্ম্মভাব না থাকিলেও সঙ্গগুণে তাহার উদ্রেক হইয়া জীবন পবিত্র হইয়া যায়! দাদা, এইজন্যই অন্য কোথাও না যাইয়া বাছিয়া বাছিয়া মন নয়নের আনন্দপ্রদ এইরূপ আনন্দ-নিকেতনে আসিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছেন। তিনি যে চিরকাল সৌন্দর্য্যের মধ্যে এবং আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন—এইজন্য দাদা আমার এত শীঘ্র সংসার ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। হৃদয়ে ত বৈরাগ্যের ভাব ছিলই, তারপর স্থান-মাহাত্ম্যে দাদা সকল ভুলিয়া এখানেই মজিয়া পড়িয়াছেন।

দুঃখীরাম একে, ওকে, তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন অসি নদীতীরে তুলসীদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। তুলসীদাস কিছুদিন দেশ ভ্রমণে যাওয়ায় পাছে প্রিয় শিষ্যের চতুষ্পাঠীর বদ্‌নাম হয়—পাছে ছাত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আশ্রম ছাড়িয়া যায়—এইজন্য সাধু ঘণ্টাকর্ণ প্রত্যহ দুবার করিয়া তুলসীদাসের টোলে আগমন করেন—ছাত্রদের রীতিমত অধ্যাপনা করান,—যাহাতে তাহারা ঠিক নিজ গুরুদেবের মত পাঠাভ্যাস করিতে পারে, ঘণ্টাকর্ণ প্রত্যহ তাহার প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সকালে বৈকালে তিনি সহস্র কর্ম্ম ফেলিয়া তুলসীর টোলে পদার্পণ করিয়া টোল পবিত্র করেন। কিন্তু তুলসীদাস ছাত্রগণকে যেরূপ শিক্ষা দিতেন—তাহার শাস্ত্র-বাখ্যা শ্রবণ করিয়া ছাত্রগণ যেরূপ তুষ্ট হইত, ঘণ্টাকর্ণের অধ্যাপনা কার্য্যে তাহারা সেরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। তাহার কারণ ঘণ্টাকর্ণ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন—মানসিক পরিশ্রম এখন আর তিনি করিতে পারেন না। তারপর শুধু পাণ্ডিত্যে কি হইবে? প্রাণে ঈশ্বর ভাব না জাগিলে ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া সুকঠিন, তুলসীদাস রামময় প্রাণ লইয়া, তাঁর ভাবে বিভোর হইয়া যোগসূত্রাদি যাহা বাখ্যা করিতেন—তাহা অতি উপাদেয়, ঘণ্টাকর্ণ কেবল তুলসীদাস ছাড়া আর কাহাকেও তত ত্যাগ স্বীকার করিয়া পড়ান না, আর এখন তাঁহার তত ক্ষমতাও নাই? ছাত্রগণ একবারের বেশী দুইবার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিরক্ত হইয়া পড়িতেন, কাজেই ছাত্রগণের আশা মিটিত না, প্রাণের পিপাসার শান্তি হইত না। তিনি প্রাণ খুলিয়া তুলসীদাসকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন—তাঁহার প্রতি যেরূপ করিয়াছেন—জীবনের শেষদশায় ক্ষমতার অভাবে আর কাহার প্রতি তিনি তাহা করিতে পারেন না—তবে

কাশীধামে যে তাঁহার তুল্য বৈদান্তিক এবং যোগপরায়ণ যোগী আর কেহ নাই—ইহা সকলেই জানিত—এইজন্য সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত। ছাত্রগণও তাঁহার পদার্পণ সৌভাগ্যদয় মনে করিয়া আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসার জন্য বিরক্ত করিত না।

দুঃখীরাম যখন তুলসীদাসের টোলে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময় ঘণ্টাকর্ণ নিজ আশ্রমে আসিতেছেন—তাঁহার সেই দেবতুল্য কান্তি দেখিয়া দুঃখীরাম সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিলেন। তিনি চলিয়া যাইলে দুঃখীরাম জনৈক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁ মহাশয়! তুলসীদাস নামে একজন সাধু কাশীতে টোল খুলিয়াছেন—ইহা কি তাঁহারই টোল?

ছাত্র। হঁ্যা—এই টোল ও এই আশ্রম—তাঁহারই; আপনি কোথা হতে আস্‌ছেন?

দুঃখীরাম। আমি তার দেশ থেকে আস্‌ছি; তিনি কোথায় গিয়াছেন?

ছাত্র। তিনি সম্প্রতি এখানে নাই—শীঘ্র আস্‌বেন।

দুঃখী। কত দেরী হবে—কত দিন গিয়াছেন?

ছাত্র। প্রায় ছমাস গিয়াছেন, বোধ হয়—আর মাস খানের মধ্যেই আস্‌বেন।

দুঃখীরামের বয়স বেশী নয়—লেখাপড়া শিখিবার এখনও বয়স আছে। ছাত্রটী মনে করিল—পণ্ডিতজীর নাম শুনে বোধ হয়, ইনি ছাত্র হতে এসেছেন, তাই খাতির করে বল্লেন, তার আর ভাবনা কি। আপনি থাকুন না—তিনি এলেই দেখা হবে, পড়া-শুনার বন্দোবস্ত হবে।

আজ রাত্রের মত ত থাকতেই হবে, নতুবা যাই কোথা?

দাদা না থাকলে এদের কাছে থাকা হবে না, তাহা হইলে কথায় কথায় অনেক কথা বাহির হয়ে পড়ে, দাদার অনিষ্ট হতে পারে—এই ভাবিয়া দুঃখীরাম কেবলমাত্র সেই দিনকার মত থাকিবার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলে—ছাত্রগণ আপত্তি করিল না। দুঃখীরাম বিনাক্লেশে আহারাদি করিয়া তথায় রাত্রি বাস করিলেন।

নিদ্রাকর্ষণের পূর্ব্বে মনে করিতে লাগিলেন—দাদা! কাশীতে আসিয়া খুব ঘাঁটী জমাইয়া লইয়াছেন দেখ্ছি, পণ্ডিতিতেও যেমন নাম—সাধুগিরিতেও তেমনি, সকলে তাঁহার নামে একেবারে ডঙ্কা বাজাচ্ছে! যাহা হউক, কেরদানীটা দেখিয়েছেন। আর না হবে কেন, সাধ্লেই যে এ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হয়, তিনি যেরূপ একগুঁয়ে, তাহাতে তিনি যে এই সামান্য দিনের মধ্যে লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছেন—তাতো তাঁর টোলের ছাত্র-সংখ্যা দেখ্লেই বুঝতে পারা যায়। পড়া-শুনা ভাল না হলে কি আর এত বুড়ো বুড়ো ছাত্র এখানে থেকে কেবল ভাত মারছে! নিশ্চয়ই ইহারা ফল পায়, তাই টেঁকে আছে! বাবা! ছাত্র নয়ত যেন ছেলের বাপ,—এদের পড়ান কি সামান্য বিদ্যের কর্ম্ম? দাদা! যে সামান্য দিনের মধ্যে খুব উন্নতি করেছে, তার আর সন্দেহ নাই?

দুঃখীরাম মনের আনন্দে রজনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালেই বিদায় হইলেন। মনে মনে করিলেন দিনকয়েক কাশীধামের শোভা দেখিয়া বাড়ী যাই, দাদা যখন এখানে নাই, তখন আমি এখানে থেকে সময় নষ্ট করি কেন? বাড়ী গিয়ে খুড়ীমা, মামী ও বৌদিকে নিয়ে একেবারে সেখানকার বিষয়-আশয় বেচে চলে আসি। দাদা যখন এখানে এত নামজাদা সাধু হয়েছে, তখন আর আমরা সেখানে একলা থেকে কষ্ট পাই কেন? আর খুড়ীমা, বৌদিকে আন্লে

দাদা আর ঘাড় তুল্‌তে পার্ব্বে না, আমার একার কথায় সম্মত হতে নাও পারেন—হয়ত নানা যুক্তি তর্কে আমাকে হারিয়ে দিতে পারে কিন্তু সে বুড়িকে দেখ্‌লে, তাঁর মরা কান্না শুন্‌লে দাদার আর সাধ্য নাই যে কেটে ছেঁটে ফেলে দিবেন। বুড়ীর অবস্থা দেখে, যখন পাড়ার লোক কেঁদে আকুল হয়, তখন দাদা ত তার ছেলে—এত নিষ্ঠুর কখনই হতে পারবেন না।

দুঃখীরাম কয়েকদিন কাশী বাস করিয়া মনের আনন্দে তাহা-দিগকে আনিতে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। এবার বাড়ী-ঘর বিক্রয় করিয়া হাতে টাকা হইবে, তখন একান্ত পথ চলিতে না পারিলে বৌদি, খুড়ীমা ও মামীকে ডুলী করিয়া দিবেন। দুঃখীরাম এইরূপ আশ্বস্ত চিত্ত হইয়া মনের আনন্দে রাজাপুরে ফিরিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাগ্‌লী মা

কাশী ও অযোধ্যার মধ্যবর্ত্তী গোঁসাইগঞ্জ নামক স্থানে ছগনলাল চৌবে নামক একজন অতি বদান্যবর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ছগন সে অঞ্চলের জমীদার—অনেক টাকার মালীক কিন্তু তাঁহার যত্র আয়—তত্র ব্যয়, টাকাকে তিনি টাকা জ্ঞান করিতেন না। পর-হিতব্রতে তাঁহার যাবতীয় অর্থ ব্যয় হইত, বিস্তৃত জমীদারীর আয়ের এক কপর্দ্দকও তিনি বাজে নষ্ট করিতেন না।

ছগনলাল প্রৌঢ়, হৃষ্টপুষ্ট ও বলীষ্ট। চেহারা অতি সুন্দর—যেন রাজপুত্র। সংসারে তাঁহার স্ত্রী যশোদাদেবী এবং কন্যা—নাম

সরস্বতীদেবী ছাড়া আর কেহ ছিল না। তবে অর্থ হইলে যেমন আত্মীয়-স্বজনের ভাবনা থাকেনা—সকলেই একটা না একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, ছগনের সংসারে সে সকলের কিছুই অভাব ছিল না। সে হিসাবে তাহার সংসার অতি বৃহৎ, পোষ্যবর্গ বিশ-পঁচিশটীর কম নহে। তাহার উপর বড়লোকের বাড়ী—দাসদাসী ত আছেই। তিনি এই সকল আত্মীয় স্বজনের ভরণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তীর্থযাত্রার পথে কোন স্ত্রীপুরুষ বিপন্ন হইলে বা অর্থের অভাব হইলে, তিনি তাহাদের সাহায্য করিতেন। কোন লোক পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইতেছে কিম্বা আহারের সংস্থান করিতে পারিতেছে না, জানিতে পারিলে ছগন তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া রীতিমত চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, অন্নহীনের অন্ন সংস্থান করিতেও ছগন কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেন না। এইরূপে তাহার মাসিক সংসার খরচ যে কত, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিত না। ইহার কারণ—তাহার সৎকর্ম্ম অসংখ্য প্রকারে অনুষ্ঠিত হইত! এত ব্যয় করিয়াও তিনি কখন অভাব গ্রস্ত হয় নাই? যখন যেরূপ সৎকার্য্য মনে করিতেন—অম্লানবদনে তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই সকল কার্য্যে শুধু তিনি নহেন, পত্নী যশোদাও তাহার অনুরূপা ছিলেন। কন্যাটী বালিকা হইলেও পিতামাতার সমস্ত গুণ তাহাতে বর্ত্তাইয়াছিল, বার চোদ্দ বৎসরের বালিকা, তাহার হৃদয়ের কোমলতা দেখিলে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া বোধ হইত। কোন পীড়িত বা অভাবগ্রস্ত স্ত্রী কিম্বা পুরুষকে পিতা কুড়াইয়া আনিলে, আর কেহ না হউক—সরস্বতী আগে তাহার সেবায় ব্রতী হইত। দেশও সমাজের হিসাবে সরস্বতী এখন অনূঢ়া—বিবাহ হয় নাই। বাঙ্গালার মত হিন্দুস্থানীর দেশে এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ না দিলেও কোন দোষ হয় না।

ছগনলাল পরোপকারীতা ও দানে এইরূপ মুক্ত হস্ত হইলেও বিধাতা তাঁহাকে ঐ একমাত্র কন্যারত্ন ভিন্ন আর কোন পুত্রাদি দেন নাই? যশোদা বা ছগন তাহার জন্য একদিনও কোনপ্রকার দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন—"সরস্বতী মাই হাম্ লোগোনকা সব হ্যায়। আউর এতনা দীন-দরিদ্র হ্যায়, ঐহি সব হাম্ লোগোন্‌কা বাল্ বাচ্ছা!

হৃদয় যাঁহাদের এত উদার, মন যাঁহাদের এত বড়—নাই বা হইল তাহাদের পুত্র, তাঁহারা একটী কিম্বা দুইটী পুত্রের কাঙ্গাল নহেন। যত দীন-দরিদ্র আছে—সকলকে তাঁহারা পুত্র-কন্যা বলিয়া মনে করেন—কাজেই পুত্র নাই বলিয়া তাঁহাদের হৃদয় অভাব অনুভব করিবে কেন? এইজন্যই তাঁহারা এতদিন সরস্বতীর বিবাহ দেন নাই। কোনও একটী সৎস্বভাব সম্পন্ন দরিদ্র যুবক পাইলে তাহার সহিত সরস্বতীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহ-জামাতা রূপে নিজের কাছে রাখিবেন, প্রাণের একমাত্র পুত্রী, আনন্দ প্রতিমাকে তাঁহারা চক্ষুর অন্তরাল করিয়া পরের বাড়ী পাঠাইতে পারিবেন না; এইজন্য সরস্বতী এখনও অনূঢ়া। মনের মত পাত্র মিলিতেছে না বলিয়া সেইজন্য তাঁহারা তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না।

নিজের পরিবারবর্গ মোটে দুইজন হইলেও ছগনলালের গৃহ সদাই জন কোলাহল মুখর, সদাই আনন্দরোলে পরিপূর্ণ। সুবৃহৎ রাজবাটীর মত অট্টালিকা, প্রায় দশ পনর বিঘা জমী যুড়িয়া বৃহৎ পরিখার মধ্যে তাঁহার এই বাসভবন অবস্থিত। বাহিরেও অন্দরে স্বচ্ছ সরোবর, চারিদিকে সুন্দর বাগান—ফলে-ফুলে সুশোভিত; সরস্বতী প্রত্যহ সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া এই সরোবরে খেলা করে—বাগানে ফুল তুলে—ফুলের মালা গাঁথে—সেই মালা প্রত্যহ তাহাদের গৃহ দেবতার গলদেশে দুলাইয়া বালিকা সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিত।

আজ কয়েকদিন হইল ছগন রাস্তা হইতে একটী পাগলীকে ধরিয়া আনিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন ও কবিরাজ দেখাইতেছেন। পাগলী মেয়ে বোধ হয় কোন ভদ্র গৃহস্থের কুলবধূ, কোন মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাহার মাথা খারাপ হওয়ায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। ছগন একদিন গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পথের ধারে তাহাকে দেখিয়া বাড়ী লইয়া আসিয়াছেন। সরস্বতী ঐ পাগলীর রূপ দেখিয়া একেবারে মোহিতা হইয়া পিতার মত অনবরত তাহার সেবা করিতেছে, যাহাতে সে শীঘ্র ভাল হয়, এই ধার্ম্মিক পরিবারের স্বত পরত তাহাই ইচ্ছা? ছগন এই পাগলিনীকে মা বলিয়া ডাকে, তাহাকে কত আশ্বাস দেয়—বলে মা! তুমি ভাল হও, তোমার বাড়ী কোথা বল—আমি তোমাকে সেখানে রাখিয়া আসিব—যদি টাকাকড়ির অভাব থাকে তাহা হই-লেও আমি সে অভাব পুরণ করিয়া দিব। পাগলী কোন কথাই শুনে না, কেবল আপন মনে বলে—

"আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে,
ঢাল মেগোর ঘাগোর বাজে,
বাজে বাজে চল্‌লো ডুলি,
ডুলি গেল সেই কমলাপুরী,
কমলাপুরী টেটা
সূর্য্যি মামার বেটা।"

একথার কেহ কোন মানে বুঝিতে পারেনা বটে, তবে ইহা হইতেও কতকটা বুঝিতে পারা যায় যে কমলাপুরী নামক কোন স্থানে ইহার বাড়ী; ডুলী করিয়া সেখানে যাইতে হয়। যাহা হউক, এখন ত আর সেকথা নয়, যখন তাহাকে আশ্রয়ে আনিয়াছি, তখন তাহাকে

যে কোন প্রকারে হউক রোগমুক্ত করিতে হইবে—পাগল ভাল করিতে হইবে—তারপর অন্য কথা।

কবিরাজ প্রত্যহ আসে, প্রত্যহ দেখিয়া যায়, নানাপ্রকার তৈল ঔষধ ব্যবস্থা করে, আর ছগন সস্ত্রীক সরস্বতীকে লইয়া তাহার সেবা করেন। দুঃখীর দুঃখমোচন, আর্ত্তের সেবা-শুশ্রূষা করিতে পাইলে এই মহৎ বংশ যেন হাতে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়—নিজেদের আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পরার্থে এইরূপে জীবন উৎসর্গ করে। এমন পরোপকার পরায়ণ না হইলে কি এই সংসারে পাকা কর্ম্মযোগী হইতে পারা যায়? ছগন সপরিবারে যে আদর্শ কর্ম্মী তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

পাগলী এখন বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন বাটীর মধ্যে, কখন পুকুর ঘাটে, কখন ফুলের বাগানে সে আনমনে পদচারণা করে; ঔষধ বা পথ্য খাওয়াইবার সময় হইলে—হয় ছগন, না হয় সরস্বতী অথবা বাটীর কোন দাসী তাহাকে খুঁজিয়া আনে। সুবৃহৎ প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ চত্বর ছাড়া তাহাকে আর কোথাও যাইতে দেওয়া হইত না। পাছে সে কোথাও বাহির হইয়া যায়, এইজন্য দ্বারবান প্রভৃতির উপর কড়া হুকুম ছিল—পাগলী পলাইলে তাহাদের জরিমানা হইবে। এইজন্য সকলেই পাগলিনীকে চক্ষে চক্ষে রাখিত।

সরস্বতী আজ বৈকাল বেলা সখীগণ পরিবৃত হইয়া পুষ্করিণীতে গাত্র ধৌত করিতে আসিয়া দেখিল—পাগলিনী তথায় বসিয়া মালা গাঁথিতেছে আর আপন মনে বলিতেছে—

"রাম দুই তিন, অমাবস্যা ঘোড়ার ডিম"

উঃ হু চারিদিকে আগুন, যেখানে পা বাড়াই সেখানেই আগুন, আকাশে আগুন, নীচে আগুন, জলে আগুন, আমার মনে আগুন

ধূ ধূ করে জ্বল্‌ছে, উঃ হুঃ পুড়ে গেল, পুড়ে গেল। আমার মুখে আগুন, আকাশে সূর্য্যে উঠে—তাতেও আগুন, রেতে চাঁদ উঠে তাতেও আগুন কিন্তু সে আগুনে তাপ নেই—যত তাপ আমার এই মনের আগুনে। ধূ ধূ জ্বলে আর বুকে ফোস্কা ওঠে, জল দিলেও নেবেনা—বুকটা যেন পুড়ে পুড়ে আঙ্গার হয়ে গেছে!

পাগলিনী তথায় বসিয়া ঐরূপ খেদের কথা কহিতেছে দেখিয়া সরস্বতী অতীব দুঃখের সহিত বলিল—হ্যাঁ ভাই! তুমি এখানে এসে একলা বসে আছ—আর বাবা, মা, ও আমি যে তোমায় খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছি—তুমি এখানে এসে কি করছো!

পাগলিনী। বুক পোড়াচ্ছি গো, বুক পোড়াচ্ছি—আর কি কর্ব্বো।

১ম সখী। আহা! সখী বোধ হয় ওর বুকের ভিতর ধড় ফড় কচ্ছে—তাই ওকথা বল্লে।

পাগ। আমার কেন কর্ব্বে, শত্তুরের করুক, বাবা যে আমায় ওষুধ দেয়—তার জন্যে! ভাল হবে বলে। দেখ মা! একদিন আমি গঙ্গা নাইতে গেছলুম, দেখি একজন মাটীর রামসীতা গড়ে ঘাটে বসে ভিক্ষে করছে, আমাকে দেখে তার সেই রামসীতা বল্লে—ও পাগ্‌লী! তোর কি কিছু হারিয়েছে! আমি বল্লুম—"মদনমোহন পালিয়েছে" বলিয়া পাগলিনী উচ্চ হাসিয়া হাতের ফুলের মালা ছড়াটী ছিঁড়িয়া ফেলিল।

সরস্বতী। হা দিদি! তোর মদনমোহন কোথা—তাই বল না, তা হলে ত রোগ এখনি সেরে যায়।

পাগ। তাই ত বলছি গো, আমার মদনমোহন পালিয়েছে।

দ্বিতীয় সখী বলিল—আহা ভাই! ওকি আর ওতে আছে, ওর স্বামী বোধ হয় বিবাগী হয়ে গেছে বলে ও অমন পাগল হয়েছে।

আহা, এমন রূপের ডালি মেয়ের অমন কপাল পুড়ে, ছুঁড়ীর অল্প বয়েস কিনা, তাই সহ্য কর্ত্তে পারেনি! মাথা গরম হয়ে গেছে।

সরস্বতী। বল কি ভাই! হিন্দুর মেয়ের স্বামী যে কি জিনিস—তা যার হয়েছে সেই জানে; সেই স্বামী হারা হলে মেয়ে মানুষের আর কি থাকে, পাগল হবে নাত কি?

১ম। আহা, ছুঁড়ীর এই সোমর্ত্ত বয়স, তায় রূপ যেন ফেটে পড়ছে, আর বেহায়া ত নয়—যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণ!

পাগ। দেখ্ মা! এ বাজারে লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর একদর, বরং অলক্ষ্মীর তেজ বেশী, কাজেই দরও বেশী, আর লক্ষ্মী ত নারায়ণের পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তা হাঁ মা, লক্ষ্মী ত নারায়ণের বুকের উপরই থাকেন?

২য়। দিদি! দেখ দেখ, এখন ত বেশ জ্ঞানের কথা কচ্ছে—আহা মরি মরি, ওর কত কষ্ট হচ্ছে।

সরস্বতীর প্রাণ অতি কোমল ঠিক মা-বাপের মত, সে ছলছলনেত্রে পাগলিনীর কাছে গিয়া হাত ধরিয়া বলিল—পাগলী দিদি! আয়, এখানে বসে আর কাজ নাই, চল ঔষধ খাবার সময় হয়েছে, আহা কত দিনে ভাই! তুই ভাল হবি, আমি তোর হাত ধরে ছোট বোনের মত খেলা কর্ব্বো!

পাগ। ওলো কর্ব্বি লো কর্ব্বি! আমার সঙ্গে না হয়—তোর বরের সঙ্গে খেলা কর্ব্বি—তার জন্য এত ভাবনা কেন? এই বলিয়া পাগলিনী সরস্বতীর কাপড়ের আঁচলে কতকগুলি ফুল বাঁধিয়া দিয়া বলিল—যা, তোর বরের জন্য মালা গাঁথগে যা!

সর। আচ্ছা, পাগলী দিদি! আমরা যদি তোর মদনমোহনকে ধরে দিতে পারি, তা হলে কি দিবি?

পাগ। ইস্ তা আর পারতে হয়না—আমার মদনমোহন তেমন নয়—সে কাকুকেও ধরা দেয় না, যা একবার মা যশোদাকে দিয়ে ছিল, তাও কত কষ্টে।

সর। তাত বেশ জানি—এখন তুমি কি কর্ত্তে এখানে এসেছ, চল ঘরে যাই—ঔষধ খাবার সময় হয়েছে।

পাগ। কি কর্ত্তে আর আস্‌বো, মদনমোহনকে খুঁজতে এসেছি, তোরা যদি খুঁজে পাস্ আমাকে দিবি ত? "খুঁজি খুঁজি নারী—যে পায় তারি" বলিতে বলিতে পাগলী সেখানে আর দাঁড়াইল না—ছুটিয়া ঘরের দিকে পলাইয়া গেল।

সরস্বতী সহচরীগণকে সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীতে বস্ত্রাদি ধৌত করত বাড়ী গেল। এবং জননীকে পাগলী দিদির ঔষধ দিতে বলিল। কবিরাজ আজ বহু অর্থব্যয় করিয়া একটী নূতন ঔষধ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—এই ঔষধ নিয়মমত খাওয়াইলে মাথা গরম্ নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ছগনলাল এই পাগলিনীর জন্য অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র ক্রুটী করিতেছেন না। কবিরাজ যখন যত টাকার ঔষধের ফর্দ্দ দিতেছেন—তিনি অকাতরে তাহা খরচ করিতেছেন। আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্য লোকে যাহা করিতে পারে না, এই পরোপকারী ব্রাহ্মণ একটা কুড়ানো পাগলির জন্য তাহাই করিতেছেন। বলিহারী তাঁহার দানশক্তির—আর বলিহারী তাঁহার পরোপকার ব্রতপরায়ণতার।

এইরূপ সপরিবারের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অসীম ত্যাগ স্বীকারে প্রায় ছয় মাসের পর পাগলিনীর মাথা গরম একটু প্রশমিত হইল—পাগলামীর ভাব একটু কম পড়িয়া আসিল। রোগের উপশম হইয়াছে দেখিয়া ছগনের ও তদীয় পত্নীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এতদিন পরে যে তাঁহারা ভগবানের একটী পরম প্রিয়কার্য্য সমাধা করিতে পারিলেন—তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তরের শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সরস্বতীর আনন্দও ততোধিক, সে এই অনুপমা রূপসী সঙ্গিনীর সহিত আনন্দে কাল কাটাইবে—তাহাকে সখীত্বে বরণ করিয়া তাহার নিকট হইতে নানাপ্রকার উপদেশ গ্রহণ করিবে—ইহাই তাহার একান্ত ইচ্ছা। ভগবানের কৃপায় আজ তাহা সফল হইয়াছে, পাগলিনী ভাল হইয়াছে—তবে আর ভাবনা কি? এই পাগল অবস্থাতেই সে সময়ে সময়ে এক একটী এমন সুন্দর জ্ঞানের কথা কহিত—যাহা সামান্য স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া কখন বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতিস্থ থাকিলে—ভাল হইলে না জানি, ইহার দ্বারা কত শিক্ষাই হইবে। স্ত্রীজাতির শিক্ষাই যে পদে পদে, জগতে তাহাদের কর্ত্তব্য যে অনেক, জননীর জাতি তাহারা—মাতৃত্বের আদর্শ তাহারা, অনেক দায়ীত্ব যে ভগবান্ তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। জননীর নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া সরস্বতী একপ্রকার সাংসারিক বিষয়ে পাকা হইয়াছে কিন্তু একজন উপযুক্ত সমবয়সী থাকিলে যেমন মনের কথা, প্রাণের কথা খুলিয়া বলা যায়—তাহার কাছে যেমন অন্য বিষয়ের শিক্ষা লাভ করা যায়, জননীর নিকট ত আর তাহা হয় না? পাগলিনী ভাল হওয়ায় সরস্বতীর তাই এত আনন্দ—সে এখন সদা সর্ব্বদা তাহারই নিকটে থাকে—তাহাকে বড় ভগ্নীর মত মান্য করে। ছগনলালও যশোদাও তাহাকে বড় মেয়ের মতই ভালবাসে। সকল কথায় সে বেশ ভাল উত্তর দেয় কিন্তু তাহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলেন না।' পিতার এবং শ্বশুরের নাম মুখে আনে না—তবে লিখিয়া জানায়! তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিলে সে বড় দুঃখিত হয় বলিয়া আর কেহ তাহার জন্য তত পীড়াপীড়ি করে না। যখন ব্রাহ্মণের মেয়ে জানা গিয়াছে, তখন আর কেন, ও যতদিন পারে আমার কন্যার মত থাক, পরে যদি কেহ সঠিক সংবাদ দিতে পারে এবং যদি কেহ সন্ধান করিয়া সন্তোষজনক পরিচয় দেয় তখন পাগলী মায়ের অভিমত লইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিব। এখন পাগলিনী আমার পরিবার মধ্যে ঠিক বড় মেয়েটীর মত প্রতিপত্তিশালিনী হইয়া অবস্থান করুন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হুলসী ও দুঃখী

হ্যাঁ বাবা! দুঃখী! তবে কি তুই আমার তুলসীর দেখা পেয়েছিস্—সে কি আমার প্রাণে বেঁচে আছে; আবার কি আমি তার চাঁদমুখে মা বুলি শুন্‌তে পাব? বলিয়া বৃদ্ধা হুলসীদেবী দুঃখী তেওয়ারীর মুখের দিকে সজল নয়নে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দুঃখী বলিল—খুড়ীমা! আমি তোমার মত বুড়ো মানুষের কাছে মিথ্যে বল্‌ছি না, আমি কি কখন অকারণে মিথ্যে কথা বলি? হুলসীদেবী বলিলেন—না বাবা! তুমি সোণার চাঁদ ছেলে—কার সাধ্যি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে—তবে বাবা! এত দিনের পর অত আশার কথা শুনলে একেবারে বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনে বাবা! তাই বলছি? দুঃখীরাম বলিলেন—না খুড়ী তার জন্য ভাবনা নাই—আমি বেশ করে দেখে এসেছি, দাদার এখন সময় খুব ভাল—তিনি এখন কাশীতে খুব নামজাদা হয়েছেন; অনেক ছাত্রকে বেদান্ত

শাস্ত্র পড়াচ্ছেন,—এখন খুব বড় একজন পণ্ডিত হয়েছেন। দুঃখীরাম এই বলিয়া তাহার মাতুলানীকে শিষ্য যজমানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যে লোকটীকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন—সে ঠিক কাজ করেছে কি না; শিষ্য যজমান তাহার উপর সন্তুষ্ট কি না? দুঃখীর মামী মনিয়াদেবী বলিল—হাঁ বাবা! সে কাজ বেশ করছে, কোন গলদ করে নাই, তবে তুলসী আর তোর উপর শিষ্যযজমানেরা যেমন সন্তুষ্ট, তেমন কি আর তার উপর হবে তবে কি কর্ব্বে, না হলে আর উপায় কি?

হুলসীদেবী আর এ সকল বিষয়ে কিছুমাত্র দেখেন না, যে দিন থেকে তুলসীদাস বাড়ী ছাড়া হয়েছেন। হুলসীদেবী সেই দিন হইতেই সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল হা তুলসী হা জীবনধন বলিয়া অহরহঃ রোদন করিতেছেন। শিষ্য যজমান থাকিল—কি গেল, সে বিষয় দেখিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। আর দেখিয়াই বা কি হইবে? এক ছেলে সেও বিবাগী হইল—বউটীও আর তাঁহাকে দেখিল না—এত দিন গেলো একবার খোঁজ করলে না—তবে আর এ সকল কার জন্য? চারটী খেতে হয় তাই খান্—একখানা পরিতে হয়—তাহাই পরেন। যেখানে বসে থাকেন—সেইখানেই থাকেন, দুঃখীর মামী হাত ধরিয়া তুলিয়া না আনিলে আর সেখান হইতে আসেন না—একপ্রকার যবুথবু হইয়া পড়িয়াছেন।

তুলসীদাসের মত নয়নাভিরাম পুত্র গৃহত্যাগী হইলে হুলসীদেবী যে জীবিত আছেন—এই যথেষ্ট, সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখা ত পরের কথা। দুঃখীরাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সমস্ত ভার তাঁহার মাতুলানীর উপর দিয়া গিয়াছিলেন এবং হুলসীদেবীকে খুব সযত্নে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, খুড়ীমারই

সব—ইহাঁর কৃপায়ই এখনও আমাদের অস্তিত্ব আছে—ইহাঁকে অযত্ন করিয়া ধর্ম্মে পতিত হইও না। মাতুলানী মনিয়াদেবীও ধার্ম্মিকা রমণীর মত বৃদ্ধার যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছেন।

বহুদিনের পর দুঃখীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া এবং তাহার মুখে প্রিয় পুত্রের কুশল সংবাদ পাইয়া এ কয়দিন বৃদ্ধা যেন একটু আশ্বস্ত হইয়াছেন—সে জড় ভাব যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। এখন কেবলই বলেন—হ্যাঁরে দুঃখী, কাশীতে যদি আমার তুলসীর সন্ধান পেয়েছিস্, সে যদি সেখানকার বড় পণ্ডিত হয়েছে, আর ঐ কি বলছিস্ ছাত্রগণকে "বেদানা" না কি পড়াচ্ছে, সকলে তার খুব সুখ্যাতি করছে, তবে আর দেরী কেন বাবা! আমাকে সেখানে নিয়ে চল না, এতদিনের পর বাছার মুখ দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি। আর শেষ দশাটায় পণ্ডিতের মা হয়ে, তুলসীর হাতের আগুন নিয়ে মরতে পারলেও জীবনটা সার্থক হয়—বাবা! দুঃখী এত দুঃখ কষ্ট করে যখন সন্ধানটা আন্‌লি—তখন আর দেরী করছিস্ কেন?

দুঃখী। খুড়ীমা! দুই একদিন সবুর করোনা—বৌদিদির খপরটা একবার নিই, শুন্‌ছি তিনি দাদার সংবাদ না পেয়ে পাগল হয়ে কোথায় ছট্‌কে বেরিয়ে পড়েছেন।

হুলসী। তা হতেও পারে—অমন স্বামীশোক কি সোমত্ত মেয়ে মানুষ সাম্‌লাতে পারে? তুলসী যে আমার বউ অন্ত জীবন ছিল, হতভাগী আমি, ঐ বউকে বাপেরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েইত যত গোল করলুম। মর্ত্তে যদি সেই সময় বউমাকে না পাঠাতুম তাহলে আর কি এমন হয় বাবা! বলিয়া বুড়ী হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, রত্নাবলীর নাম করিয়া তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বসুধারা বাহির হইতে

লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—আহা! সে কি আমার তেমন বউ; মাথা ঠিক নেই বলেই আমার কোন খোঁজ নেইনি—এখানে আসেনি, পাগলের ঝোঁকে কোথায় চলে গেছে, হাঁা রে বাবা দুঃখী! শেষকালে কি আমার কপালে এই ছিল—ছেলে গেল, বউ গেল, তবে আমি কি কর্ত্তে আছি? এই বলিয়া বৃদ্ধা গভীর দুঃখে বুক চাপড়াইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধার অবস্থা দেখিয়া দুঃখীরামের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি স্বখেদে মনে মনে বলিতে লাগিলেন—ধর্ম্মকর্ম্ম করবার জন্য দাদার ঘর ছেড়ে না গেলেই কি হতো না। ধর্ম্ম-সাধনার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেবী-স্বরূপিনী এই জননী ও পত্নীর প্রাণে কষ্ট দিলে কি ধর্ম্ম হয়? জানি না দাদার বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন বিগড়ে গিয়েছে, যাহাই হউক, যখন্ সন্ধান পেয়েছি, তখন আর তাঁর কোন ওজর-আপত্তি শুন্‌বো না, আমি দুই একদিনের মধ্যে এখনকার বন্দোবস্ত ঠিক করে খুড়ীকে কাশী নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বো, দেখি তিনি কেমন করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। বুড়ো মা থাক্‌তে সন্ন্যাসী—এত শাস্ত্র পড়ে তাঁর এই বিদ্যে হয়েছে—কোন্ শাস্ত্রে বলে "মা-বাপ ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে?" জেনে শুনে দাদার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে, বুদ্ধিশুদ্ধি চুলোর দোরে হাজির হয়েছে। যাহা হউক, খুড়ীমাকে ত নিয়ে যাবই কিন্তু বউদিদি গেলেন কোথা, তার ত সন্ধান পাচ্ছি না। কেউত কোন সন্ধানও বল্‌তে পারলে না, তাঁর পতি শোকাতুরা জননী ত কেঁদে কেঁদে মরবার দাখিল হয়েছেন। হায় দাদা! তুমি জেনে শুনে এমন সাজান সংসারটাকে ছারখার করলে?

দুঃখীরাম বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—খুড়ীমা! আর কেঁদোকেটো না বাপু! চল, তোমাকে আগে কাশীতে রেখে এসে,

তারপর বৌদির সন্ধান কর্ব্বো! তবে তুই চারদিন অপেক্ষা কর, আমি একবার ভাল করে বউদির খপরটা নিয়ে আসি, কোন দিকে গিয়েছেন, কি করেছেন, ভাল করে জেনে আসি—তারপর জায়গাজমীর একটা কিনারা করে—তোমায় রেখে আস্‌ব।

তুলসী। হাঁ বাবা! দুঃখী তোকে কি বলে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো, তুই যা ভাল বুঝিস্, তাই কর, কিন্তু আমি বাবা! আর এমন করে থাক্‌তে পারবো না, নয়ত বল, আমি আফিম খেয়ে, না হয় বিষ খেয়ে মরি—প্রাণের এমন হিচ্‌পিচানী আর সহ্যি কর্ত্তে পারি না।

দুঃখী। খুড়ীমা! এতদিন কষ্টে কাটালে আর কয়টাদিন দেরী সয় না? আমি এত কষ্ট করে দাদার সন্ধান করলুম—তারপরও তুমি ঐ কথা বল্‌ছো?

তুলসী। বাবা! এতদিন কেবল তোর আশায় বসেছিলাম—জানি তুই যখন সন্ধানে গিয়েছিস্—তখন একটা না একটা উপায় করবেই।

দুঃখী। তা যদি বিশ্বাস হয়—তবে আর অমন কথা বল্‌ছো কেন, ভবিষ্যতের একটা কিনারা করে যেতে হবে, আর কিছু টাকাও সংগ্রহ কর্ত্তে হবে—নইলে তুমি অতদূর চলে যেতে পারবে কেন?

তুলসী। বাবা! আমি খুব পারবো! সেজন্য তোর কোন ভাবনা নেই—তবে যদি কিছু টাকা সংগ্রহ কর্ত্তে চাস্, তাহলে ঐ বাহিরের জমীটা ছেড়ে দে!

দুঃখী। বাড়ী-ঘর-দোর কি বেচতে চাও?

তুলসী। না বাবা! শ্বশুরের ভিটেটা বেচে কাজ নেই, ঠাকুরপালা রয়েছে, তাহলে চল্‌বে কেমন করে, এ সকল ঠিক থাক্!

যদি সেখানে তুলসীর আমার বোলবালা খুব ভাল দেখি, আর যদি সে এখানে আস্‌তে না চায়, তাহলে সব তোর থাক্‌বে—তুই আমার ছোট ছেলে—এ সমস্ত তুই ভোগ করবি।

দুঃখীরাম বৃদ্ধার উদার প্রকৃতি দেখিয়া মনে মনে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—খুড়ীমার ও দাদার আমাদের প্রতি প্রাণের টান যে যথেষ্ট আছে—তাহা সকলেই জানে, নতুবা নিঃস্বার্থ ভাবে এমন ত্যাগস্বীকার কেউ করিতে পারে কি? খুড়ীমা মনে করেন দাদাকে ছাড়িয়া আমি গ্রামে আসিয়া বাস করিব, কিন্তু দাদা ছাড়া আমি যে তিলার্দ্ধ কোথাও থাকতে পারি না, তা তো তিনি জানেন না? দাদাকে না দেখিয়া আমি যে প্রাণহীন দেহ লইয়া মনের ভীষণ কষ্ট মনে চাপিয়া দিশাহারা হইয়া ঘু'রে বেড়াচ্ছি—বুড়ী তার কিছুই জানে না। অবশ্য তাঁর মত কষ্ট না হলেও, অন্তর্যামী জানেন—তুলসীদাকে ছেড়ে দুঃখীর প্রাণ কিরূপ কষ্ট ভোগ করছে, হায় দাদা! কাছে কাছে রেখে, পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়ে, শেষে কি এইরকম করে কাঁদাতে হয় ভাই? প্রাণ ফাঁটা দুঃখে অলক্ষ্যে দুই এক ফোঁটা রক্তাশ্রুপাত করিয়া দুঃখীরাম বলিলেন—খুড়ীমা! আজ আর একবার ধর্ম্মপুরে যাই—রাত্রে আসিয়া ও পাড়ার পোদ্দারদের কাছে বাহিরের জায়গা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা লইব। তুমি এখন খাওয়া-দাওয়া কর।

এই বলিয়া দুঃখীরাম আহারাদির পর পুনরায় ধর্ম্মপুর গমন করিলেন, রত্নাবলীর কি হইয়াছিল—তিনি কেমন করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন, মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল কি না; প্রভৃতি সংবাদ লইয়া আসিবেন।

তাঁহার তিরস্কার বাক্যেই যে স্বামী গৃহত্যাগী হইয়াছেন—রত্নাবলীর ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় তিনি কিছুদিন আহার-নিদ্র

ত্যাগ করিয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া "হা নাথ—হা হৃদয় দেবতা, তুমি চিরদিন আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে, আর সেদিনের এই সামান্ত দোষটী ক্ষমা না করিয়া একেবারে চরণে ঠেলিলে—"এই বলিয়া কেবল কাঁদিতেন, কখন কি বলিতেন তাহার স্থিরতা ছিল না। লক্ষ্মীদেবী স্বামীর শোকে অধীরা হইলেও কন্যাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন—চিকিৎসা করাইয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, অবশেষে একদিন কাশী যাইব কাশী যাইব করিয়া তিনি রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; পাড়াশুদ্ধ লোক তাহার সন্ধান করিয়া কোন কিনারা করিতে পারে নাই।

দুঃখীরাম রত্নাবলীর অবস্থা এবং গৃহত্যাগের বিষয় সমস্ত শুনিয়া সেইদিন রাত্রেই রাজাপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং পোদ্দারদের নিকট বাহিরের জমীখানি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন। হুলসীদেবী তাহাতে সম্পূর্ণ অভিমত জানাইলে ক্রেতা আর কোনও প্রকার সন্দেহ করিল না। ঐ জমীখানি হুলসীদেবীর নিজস্ব সম্পত্তি, আত্মারাম পত্নীর নামে যখন উহা কিনিয়াছিলেন—তখন তুলসীদাস ভূমিষ্ঠ হন নাই।

দুঃখীরাম পরদিন মনিয়াদেবীকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া, বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া, হুলসীদেবীর সহিত কাশী যাত্রা করিলেন। হারানিধি পাইবার জন্য বৃদ্ধা পথের কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া বাহির হইলেন বটে কিন্তু এ বয়সে এই সুদীর্ঘ পথ কেমন করিয়া হাঁটিবেন—তাহা ভগবানই জানেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রামায়ণ রচনা

ঈশ্বরের অনুকম্পা হইলে এ জগতে মানুষের অসাধ্য কিছুতেই থাকে না। পঙ্গু যখন গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে—মূর্খ যখন বাচালতা প্রকাশ করিতে পারে—তখন দৈবাদেশে ভক্তকবি তুলসীদাস যে তাঁহার প্রাণের আরাধ্য দেবতা রাম-চরিত্র রচনা করিবেন—তাহার আর বিচিত্র কি? একে তুলসীদাস ঘণ্টাকর্ণ যোগীর টোলে নানাপ্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছেন। তারপর যোগতপস্যায় তাঁর কৃতীত্ব যথেষ্ট জন্মিয়াছে, ভক্তিমার্গে তিনি যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন ভক্তিডোরে বাঁধা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন—তখন ভক্তবীর তুলসীদাস যে রামায়ণ রচনা করিয়া যশস্বী হইবেন—হিন্দুর ঘরে ঘরে যে এই ভক্তিভাবমাখা রামচরিত্র পঠিত হইবে—তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

যোগসাধনায় তুলসীদাস সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বহুদিনের পথ অতি অল্পক্ষণের মধ্যে যাইতে পারিতেন, যোগী ইচ্ছা করিলে প্রাণায়ামের দ্বারা দেহভার লাঘব করিয়া বাতাসে উড়িতে পারিতেন। যোগীর যোগবলের কি তুলনা আছে?

তুলসীদাস ভগবানের আদেশে যোগবলে অযোধ্যায় আগমন করিলেন। প্রভুর লীলা-নিকেতন অযোধ্যানগরীর শোভাসম্পদ—তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভক্তকবি তুলসীদাসের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কিছুদিন ইহার গগনপবনে দেহ মন

পবিত্র করিয়া, ইহার প্রান্তর প্রাঙ্গনের পবিত্র ধূলি—ভগবানের পদরজ বিবেচনায় অঙ্গে মাখিয়া—প্রাণে অপার আনন্দ, হৃদয়ে অসীম ভক্তির স্ফূরণ করিয়া রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুলসীদাস স্বভাব কবি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তিনি আজীবন মুগ্ধ, কোন কিছু সুন্দর দেখিলে তাঁহার প্রাণ পূর্ব্ব হইতেই মুগ্ধ হইয়া তাহা হইতে একটা অভাবনীয় কবীত্ব শক্তির স্ফূর্ত্তি পাইত।

এই নয়নানন্দকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমাখা অযোধ্যাধামে আসিয়া ভক্ত কবির প্রাণের দ্বার দশদিকে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রামায়ণ রচনা আরম্ভ করিয়া অতিশয় কৃতীত্বের সহিত তাহার বালকাণ্ড সম্পূর্ণ করিলেন। বহু রাজন্যবর্গ তাঁহার এই উপাদেয় ভক্তিভাব সমন্বিত রামায়ণ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। যাহার প্রাণে একটুমাত্রও ভক্তিরসের উদ্রেক হইয়াছে, তিনি এই রমণীয় গ্রন্থ অতীব আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন—ইহার প্রত্যেক পত্রে, প্রত্যেক শ্লোকে, এমন কি প্রত্যেক ছত্রে, ভক্তির অমিয় সুধা ক্ষরণ হইতেছে। শ্রীরামের পরম ভক্ত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়পদ্মে বসাইতে না পারিলে, শুধু পাণ্ডিত্যে পুস্তকের মধ্যে এমন ভক্তিমধু ঢালিয়া দিয়া কেহ তাহাকে সাধারণের এত রসনাতৃপ্তিকর করিতে পারে না; তাই ভগবদ্ভক্ত ভাবুকগণের পক্ষে ইহা স্বর্গের সুধা, বাঞ্ছিতের চরণ-পদ্মের পবিত্র নির্ম্মাল্য।

এই রামায়ণ পাঠে সকলের প্রীতির উদ্রেক হইল; সকলেই তুলসীদাসকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল কিন্তু তথাকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল। তুলসীদাস বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করায় তাহারা তাঁহার প্রতি হাড়ে চটিয়া গেল।

তুলসীদাস রামাৎ বৈষ্ণব নামে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করিলেন।

তাহারা দ্বিজ নামে অভিহিত হইল, ব্রাহ্মণের মত সমস্ত ক্রিয়াকলাপে তাহারা অধিকারী হইতে পারিবে, ব্রাহ্মণের মত উপবীত ধারণ করিয়া তাহারা দেবসেবা করিতে পারিবে—ইহারাই তুলসীদাসের সৃষ্ট সম্প্রদায়, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সে সকল অধিকার কিছুই থাকিবে না, তাহারা উপবীত ধারণ করিতে পারিবেন না, কেবল বৈষ্ণবের চিহ্ন—তুলসীমালা, তিলকসেবা প্রভৃতি করিবে এবং হরিনাম জপ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবে।

এইরূপ সাম্প্রদায়িক মত বিরোধ হওয়ায় অযোধ্যার বৈষ্ণব সম্প্রদায় তুলসীদাসের প্রতি খড়্গ-হস্ত হইল, সকলেই—তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সাধু ভক্ত বলিয়া এখন কেহ আর তাঁহার খাতির করিল না। ব্রাহ্মণবংসে জন্মগ্রহণ না করিলে রামাৎ বৈষ্ণব হইবার ক্ষমতা কাহার থাকিবে না—ইহাই সাধক তুলসীদাসের মত কিন্তু তথাকার আখড়ার প্রধান পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার মতে মত না দেওয়ায় কলহের সূত্রপাত আরম্ভ হইল।

সাধু ব্যক্তি কাহার সহিত কলহ করিতে স্বীকৃত নহেন। পণ্ডিতী ফলাইয়া কাহার মনোকষ্ট দেওয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; উদ্দেশ্য অধিকারী ও অনধিকারী লইয়া। ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ দেবসেবার অধিকারী হইতে পারে না এবং তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কিন্তু যখন শাস্ত্রের এ সকল বিধিনিষেধ তাঁহারা মানিতে চাহেন না, তখন তুলসীদাস আর কি করিবেন—অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করত, পুনরায় কাশীধামে আসিয়া তাঁহার শান্তিময় পবিত্র আশ্রমে বসিয়া রামায়ণের অপরাপর কাণ্ড লিখিয়া শেষ করিলেন। এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাশী—নরেশ তাঁহাকে পরম ভক্ত জ্ঞানে তাঁহার টোলের মাসিক একটী বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। নদীতীরের যে আশ্রমে বসিয়া তুলসীদাস

বাবাজী এই রামায়ণ রচনা করেন—অদ্যাবধি কাশীর সেই স্থান তুলসী-ঘাট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। অনেক সাধু সন্ন্যাসী প্রত্যহ এই পবিত্র ঘাটে স্নান করিয়া সাধক কবি তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিয়া ধন্য হন।

রামায়ণ শেষ করিয়া তুলসীদাসের প্রাণ আর জগতের কোন বন্ধনে বাঁধা থাকিতে চাহিল না। প্রাণ ভক্তিভাবে বিভোর, মন প্রেম পুলকে মাতোয়ারা—এ অবস্থায় তাঁহার কি আর কোন বন্ধন সাজে, না কোন বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পার? তুলসীদাস সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—ভবঘুরের ন্যায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি জোর করিয়া কাহাকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বলিতেন না; প্রত্যহ ছাত্রদের শিক্ষাদান করিতেন এবং বলিয়া দিতেন—বাবা! সংসার আশ্রম সকলের শ্রেষ্ঠ, ইহার কাজকর্ম বড়ই দায়ীত্বপূর্ণ; বুঝিয়া এই সংসার করিতে পারিলে—ইহাতেই সকল শান্তিলাভ করিতে পারা যায়। সন্ন্যাস আশ্রম জোর করিয়া গ্রহণ করা যায় না, যথার্থ ত্যাগী না হইলে—প্রাণে ত্যাগের বহ্নি না জ্বলিলে কেবল বাহিরের সাজ সজ্জায় সন্ন্যাসী হওয়া না হওয়া সমান কথা, যাহারা কেবল বাহিরের দৃশ্য দেখাইবার জন্য সন্ন্যাসী সাজে—তাহারা ভণ্ড; লোকমুগ্ধ করিয়া কিছু আদায় করিবার ভাণ দেখান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যথার্থ ত্যাগীর পক্ষে সংসার ও অরণ্য সমান, সংসার ত্যাগ না করিলেও তাহার কিছু যায় আসে না। সে যেখানেই থাকুক নির্লিপ্ত ভাবে থাকিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিবে। তুলসীদাস সকাল সন্ধ্যায় ছাত্রদিগকে নিজের মত শিক্ষা দিতেন; চতুষ্পাঠীর যে সকল বৃত্তি আদায় হইত—তাহা প্রধান ছাত্রের অধিকারেই থাকিত, তিনি

অবস্থা বুঝিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেন—তুলসীদাস তাহার স্পর্শও করিতেন না। এইজন্য তুলসীদাসের আশ্রমে ছাত্রবর্গের কোন কষ্টও হইত না—আর পাঠাভ্যাস যাহা হইত—তাহা আর কোন টোলে হইত কি না সন্দেহ; তাহার কারণ তুলসীর শিক্ষা দান ত কেবল পুঁথিগত নহে—কেবল পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ছাত্রের শিক্ষা দান ত তিনি করিতেন না। বেদ-বেদান্তের যাহা কিছু বলিতেন—সমস্তই যে তাঁহার প্রাণের, তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে যাহা বাহির হইত, মনভৃঙ্গ প্রাণময় শ্রীরামচন্দ্রের চরণতলে বসিয়া যাহা শিক্ষা করিত—তুলসী দাস তাহাই প্রাণের আবেগে পুত্রেরমত যত্নে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। সাধারণ অধ্যাপকের এ ক্ষমতা কোথায় যে তাঁহারা এমন উপাদেয় মনো-মুগ্ধকর বিষয় সকল শিক্ষা দান করিয়া ছাত্রগণের চিত্তরঞ্জন করিবেন, কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় কি প্রাণের সন্তোষ সাধন করিতে পারা যায়, না লোকমুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাতে আসে? প্রাণের ধনকে না পাইয়া শাস্ত্রের নিগূঢ়ভাব না বুঝিয়া যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যেরই পরিচয়; যথার্থ অধ্যাত্ম শক্তির পরিচয় তাহা নহে।

সামান্য দিনের মধ্যে তুলসীদাসের নাম কাশীর আবাল বৃদ্ধ বণিতার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল; সকলেই এই সাধু পুরুষের নাম করিয়া ধন্য হইতেন, প্রাতঃকালে এ পবিত্র নাম উচ্চারাণ করিলে দিন ভাল যাইবে বলিয়া মনে করিতেন।

তুলসীদাসের চতুষ্পাঠীর নামও এখন দেশবিদিত। কাহার কোন কিছু শিক্ষা করিবার আবশ্যক হইলে সকলেই অগ্রে তুলসীদাস বাবাজীর টোলে আসিত; এই সাধু মহাপুরুষের চরণ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইত। এখানে কোন প্রকার ব্যবসাদারী ছিল না, অর্থের লোভে একটা যা তা বিধান দেওয়া হইত না। যাহা ঠিক শাস্ত্রসঙ্গত এবং দেশ কাল

পাত্রভেদে যাহা সমীচীন, বাবাজী সেইরূপ বিধানই দিতেন। এইজন্য তাঁর নাম অন্যান্য টোলধারী অপেক্ষা অতি সত্বর বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। তুলসীদাসের অভ্যুদয়ে অনেক বৃত্তিভোগী টুলোপণ্ডিতের ক্ষতি হইয়াছিল বটে; কিন্তু যাহারা গুণের পক্ষপাতী, তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইত না। তবে বিশ্বম্ভর স্মার্ত্তবাগীশ নামক একজন পণ্ডিত তুলসীদাসের অভ্যুদয়ে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নানাপ্রকারে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। তুলসীদাসের নামে অযথা নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু শ্রীভগবান যাহার প্রাণের মধ্যে রহিয়াছেন, সম্পদে বিপদে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, লোকের সাধ্য কি যে তাঁহার অনিষ্ট করে!

কাশীতে এক সময় ঘণ্টাকর্ণ যোগীর ব্যবস্থা অতীব আদরণীয় ছিল, তিনি যাহা ব্যবস্থা দিতেন—তাহা অকাট্য এবং সাধারণ লোক তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত। এই ঘণ্টাকর্ণই তুলসীদাসের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু, তিনি প্রথমে ইহার আশ্রয়ে থাকিয়াই শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে এত উন্নতি করিয়াছেন। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া জগতের কার্য্য হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করত নিজের পরকাল চিন্তায় কাল কাটাইতেছেন। ইনি শুধু পণ্ডিত নহেন ভগবদ্ভক্তি সম্পন্ন তপস্বী, তাই তাঁহার ব্যবস্থার—তাঁহার বাক্যের একদিন সমাজে খুব কদর ছিল। ইনি কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিলে কাশীতে বিশ্বম্ভরের প্রসার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া ছিল; কাশীতে তাঁহার মত স্মৃতি শাস্ত্রের পণ্ডিত আর কেহ ছিল না, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি প্রদানে তাঁহার শক্তি অসীম; তবে ব্রাহ্মণ বড় লোভী, অর্থের প্রতি বড়ই আসক্ত; এই জন্য মহা পণ্ডিত হইলেও অন্তসার শূন্য: ভিতরে ধর্ম্মের লেশমাত্র ছিল না; এক প্রকার নাস্তিক বলিলে ও হয় এবং অত্যন্ত দাম্ভিক

প্রকৃতি ; নিজে বড় পণ্ডিত বলিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া মরিতেন। যখন পণ্ডিত আর কেহ নাই, তখন লোকে অনন্যোপায় হইয়া তাহারই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিত। এইরূপে প্রণামী ও তৈলবট ইত্যাদিতে তাঁহার অর্থেরও কোন অপ্রতুলতা রহিল না। কিন্তু আত্মাভিমানী অহংবাদী লোকের প্রতিপত্তি সমাজে কতদিন থাকে? দর্পহারী মধুসূদন কাহার দর্প রাখেন না ; অহংকারীর হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন বলিয়া ভগবানের কোমল চরণ ছায়া তাহাতে পতিত হয় না। কর্ম্মফলে কিছুদিন তাহার প্রতাপ অক্ষুন্ন থাকিলেও চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

ঠিক এই সময়ে, বিশ্বম্ভরের উন্নতির ষোলকলা পূর্ণ হইবার কিছুদিন পরে কাশীর অসিনদীর তীরে সাধকপ্রবর তুলসীদাসের অভ্যুত্থান হইল। ভগবান আচম্বিতে অতি সামান্য দিনের মধ্যে নিজ ভক্তকে লোক-লোচনের গোচর করিয়া বিশ্বম্ভরের দম্ভ অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিলেন। এক সময়ে ঘণ্টাকর্ণ যে প্রতিপত্তি, যে ক্ষমতা লইয়া কাশী-ক্ষেত্র সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ভক্তবীর তুলসীদাস তাঁহারই মত অথবা তাহা অপেক্ষাও বেশী সাধন ক্ষমতা লইয়া সাধারণে প্রকাশমান হইয়া পড়িলেন। করুণাময় রামচন্দ্রের করুণাবলে তুলসীদাস কাশীর অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সাধকাগ্রগণ্য বলিয়া সকলের নিকট পূজিত হইতে লাগিলেন। কাজেই বিশ্বম্ভরের অবাধ শক্তির গতি নিরুদ্ধ হইয়া পড়িল, তিনি আর সমাজে তত আদরণীয় হইতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। তিনি অর্থের লোভে সকলকে যেরূপ কঠিন ব্যবস্থা দিতেন ; তুলসীদাসের নিকট যাইলে, তিনি দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার বিপরীত ব্যবস্থা প্রদান করিয়া—সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তুলসীদাসের শিক্ষার নিকট বিশ্বম্ভরের শিক্ষা অনেক নীচে পড়িয়া গেল।

যাহারা তুলসীদাসকে বেশী চিনিত না—অথবা যাহারা পুরুষানুক্রমে বিশ্বস্তরের ব্যবস্থানুসারে কাজ করিয়া আসিতেছে—তাহারই প্রথম প্রথম তাঁহার নিকট যাইত কিন্তু মনোগত না হইলে আবার তুলসীদাসের পরামর্শ লইয়া কার্য্যও করিত। ইহাতে পণ্ডিতজীর পসার ত কমিতে লাগিলই—অর্থাগমনের পথে ত কাঁটা পড়িলই—মানেরও যথেষ্ট লাঘব হইয়া পড়িল দেখিয়া তিনি তুলসীদাসের প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন। কিসে তাঁহাকে নষ্ট করিবেন, কাশী হইতে তাড়াইবেন—এমন কি কিসে তাঁহাকে প্রাণে মারিয়া নিষ্কণ্টক হইবেন—ভিতরে ভিতরে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ভবানী মিশ্র

পাপের দংশন বড় ভয়ানক—মানুষ তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। বাহিরে তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইলেও ভিতরে যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার তাপ, তাহার দহন, যন্ত্রণা কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

ভবানী মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার প্রত্যহ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পর কিছুক্ষণ ব্যায়াম চর্চ্চা করিত। তখন শরীর সবল ও সুস্থ করিবার জন্য আমাদের দেশে কুস্তি ও বইটকী প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চ্চার খুবই আদর ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে ইহা জীবনের একটী প্রধান আবশ্যকীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

ভবানী মিশ্র তখন যুবক—কুস্তিবাজ বলিয়া তাহার খুব খ্যাতি

ছিল; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাহার মত কুস্তিবাজ কেহ ছিল না বলিলেই হয়। একদিন সে প্রাতঃকালে অপর একজন সমকক্ষ কুস্তিবাজের সহিত কুস্তি করিয়া জয়লাভ করিবার জন্য আসরে অবতীর্ণ হইল। নানাস্থান হইতে বহু দর্শক আসিয়া আজ সেইস্থানে কুস্তি দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। ভবানী মিশ্র আজ ধাবন কুর্দ্দনে নৃত্য করিতেছে; গায়ে মাটি মাখিতেছে, বাহুবাস্ফোটন করিতেছে। অপর খেলুয়াড়টীও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেও আপনাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। প্রথমে হাতে হাতে, তারপর পায়ে পায়ে, তারপর দুই জনে বল পরীক্ষা করিতে লাগিল। ভবানী একবার তাহাকে ভূমে পাতিত করিয়া বক্ষের উপর উপবেশন করে; আবার অপর খেলোয়াড়টী তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, বুকের উপর উপবেশন করত ভবানীকে বিষম কায়দা করিয়া ধরে, ভবানী আর কিছুতেই তাহাকে ফেলিতে পারে না, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ মুহুর্মুহু করতালি দিতে লাগিল। বিষম লজ্জায় ভবানী দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া এইবার নূতন খেলুয়াড়টীকে এমন জোরে জাপ্টাইয়া ধরিল এবং বিষমবেগে ভূমে পাতিত করিল যে তাহাতে সে একটী বৃহৎ শীলার ধাক্কা লাগিয়া একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। কোন প্রকারেই তাহার আর কোনও চৈতন্য হইল না, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ ভয়ে পলায়ন করিল। ভবানী তখন নিজের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষায় রত হইল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না—সে চিরদিনের জন্য ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিল।

সামান্য খেলায় জয়লাভ করিবার জন্য একজনের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ভবানীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইল। ব্রহ্ম-হত্যা মহাপাপে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল—হায়! কি

করিলাম, সামান্ত কুস্তি খেলা খেলিতে গিয়া বিষম খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া—একজনের প্রাণসংহার করিলাম, খেলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মহত্যা করিলাম! যুবক ভবানীর হৃদয়ে অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইয়া অন্তর কন্দর দগ্ধ করিতে লাগিল। এ পাপের দংশন সে সহ্য করিতে না পারিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল কেবল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল—কিসে এ দারুণ জ্বালার অবসান হয়। এমন যে নধর দেহ, পরিপাটী শরীর কান্তি ক্রমশঃ শুকাইয়া মলিন হইয়া যাইতে লাগিল। আহারে রুচি কমিয়া গেল, দারুণ চিন্তায় সে ক্ষণেকের জন্যও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ব্রাহ্মণের সেই ভয়ানক মূর্ত্তি যেন তাহার হৃদয় মধ্যে উদিত হইয়া ভীষণ ভীতি প্রদান করিতে থাকে। মৃতের সেই নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া তাহার অন্তরে বাহিরে যেন নাচিয়া নাচিয়া প্রতিহিংসার জন্য অনল-চক্ষু বাহির করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভবানীর ভয়শূন্য হিয়া সেই প্রেতমূর্ত্তির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। কি করিলে ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, কে বলিয়া দিবে—এই ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি! হায়! কেন আমি এমন বিষম কুস্তি খেলা শিখিয়াছিলাম, কেনই বা সেদিন এমন বিষমভাবে খেলার অবতারণা করিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট বাহাদুরী লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছিলাম! এক্ষণে এ ব্রহ্মহত্যা পাপের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই? উঃ এ যে বিষম যন্ত্রণা, পাপানলে যে সমস্ত শরীর ঝলসিয়া যাইতেছে; ইহা অপেক্ষা মৃত্যু যে সহস্রগুণে শ্রেয়! বাহিরে কিছুই নাই বটে কিন্তু ভিতর যে পুড়িয়া খাক হইল—আর যে সহ্য করিতে পারি না!

পাপের ভার অসহ্য হইলে—প্রবলবেগে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে ভবানী একদিন কাশীর প্রধান ব্যবস্থাপক বিশ্বম্ভর স্মার্ত্ত-বাগিশের নিকট উপস্থিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভবানী বহুদিন বিশ্বম্ভরের চতুষ্পাঠীতে পড়িয়াছিল,—বিশ্বম্ভর এই কুস্তিবাজ যুবককে বেশ চিনিতেন।

ভবানী যখন উপস্থিত হইল—বিশ্বম্ভর তখন ছাত্রগণের সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছিলেন। একজন ছাত্র বলিল—গুরু-দেব! আপনি যে ব্রহ্মসূত্রের পরিভাষ্যের মীমাংসা করে দিয়েছিলেন তুলসীদাস বাবাজীর একজন ছাত্র তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করে, আমার মনে সংশয়োৎপাদন করে দিয়াছিল। গত রজনীতে আমি তাহা পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করেও প্রনিধান কর্ত্তে পারি নাই, এখন বেশ বুঝতে পেরেছি, তবে কি তুলসীদাস বাবাজীর ছাত্র ভুল ব্যাখ্যা করেছিল?

মহা দাম্ভিক প্রকৃতি বিশ্বম্ভর অতি ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—তুলসীদাস আবার লেখা পড়া শিখ্‌লে কবে—তার গুরুই পূর্ব্বে আমার কাছে কত বিষয়ের মীমাংসা করে নিয়ে যেতো, এখন সে বৃদ্ধ হয়ে টোল ছেড়ে দিয়েছে তাই; তুলসী ত ঘণ্টাকর্ণ যোগীর ছাত্র; তার গুরুই বড় পণ্ডিত, তা আবার সে! অহংজ্ঞানী দাম্ভিক বিশ্বম্ভর জানিত না যে ঘণ্টাকর্ণ যোগীর সহিত তাহার আকাশ পাতাল প্রভেদ। ঘণ্টাকর্ণ শুধু পণ্ডিত নহেন—যোগী, যোগশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দখল আছে, সেই জন্য পুঁথিগত বিদ্যাকে তিনি বিদ্যা বলেই ধরেন না। তিনি দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষায় ভগবদ্বিষয়ের কোন তত্ত্ব নিরূপিত হয় না বলিয়া—তিনি যোগমার্গ আলম্বন করত জগদগুরু বিশ্বনাথের নিকট শিক্ষার লাভ করিবার জন্য একেবারে টোল ছাড়িয়া দিয়াছেন। ঘণ্টাকর্ণ এখন কাশী-

বাসী সকলের প্রণম্য, সকলে তাহাকে যোগী বলিয়া মান্য করেন, আর তুলসীদাস এই গুরুর শিষ্য ; এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা লাভ করিয়া বাকসিদ্ধ যোগী হইয়াছেন। বলিয়া ব্যবস্থার জন্য সকলেই তাহার দারস্থ হয়। বিশ্বম্ভর অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন—সামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ঋষিকল্প এই সকল মহাত্মগণের অপমান করেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতেছেন।

মহাত্মা তুলসীদাসের আবির্ভাব হইয়া কাশীতে তাঁহার প্রতিপত্তি কমিতেছে—ইহাই তাঁহার গাত্রদাহের প্রধান কারণ। এই জন্য তিনি তাহাদের সুখ্যাতি শুনিলে জ্বলিয়া উঠেন এবং নানাপ্রকার কুকথায় তাহাদের অপমান করিয়া আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন।

ভবানী মিশ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিশ্বম্ভর তুলসীদাসের নামে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করত ছাত্রের নিকট আত্মপ্রতিষ্টায় মত্ত হইয়াছিলেন। এইবার একজন ছাত্র ভবানীকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—গুরুদেব! ভবানী আপনার নিকট আসিয়াছে, সে কি দোষ করিয়া ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছে—একবার দেখুন।

বিশ্বম্ভর ভবানীর প্রতি চাহিয়া বলিল—কি হে 'বাপু! কি করেছ; কিসের ব্যবস্থা চাই? কিছু তৈল বট আনিয়াছ কি? একজন ছাত্র বলিল—প্রভু! ওর অপরাধ বড় গুরুতর; আপনি ব্যবস্থা না দিলে উহার আর কোন উপায় নাই ; ও মনের দুঃখে আজ প্রায় দশ দিন হইল বাড়ী যায় নাই ; কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিশ্বম্ভর বলিলেন—কেন, কাশীতেত আরও অনেক টোল আছে, তাহাদের কাছে যাইতে পারে নাই ; বাবা! বড় বড় ব্যবস্থা এই বিশ্বম্ভর না হলে আর কার সাধ্য যে প্রদান করে—আর জানেই বা

কে, এত শাস্ত্র ঘাঁটাই বা কার আছে? এ সকল কাজেত ভুঁইফোঁড় হলে চল্‌বে না—এ বিষয়ে যে রীতিমত বিদ্যের দরকার। বিশ্বম্ভর অহঙ্কারে মঠ মঠ করিতে করিতে ভবানীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—কিহে বাপু! কি হয়েছে, একবার দোষটাই বলনা, আমি হাতগুণে কি তোমার দোষ ধর্ব্বো!

ভবানী চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে কেবল পদনখে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল, ব্রহ্মবধের কথা মুখ দিয়া বলিতে তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ভবানীর অবস্থা দেখিয়া একজন ছাত্র, যে সেদিন দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিল, সে বলিল—গুরুদেব! ও দিনকতক আমাদের টোলে পড়েছিল। এখন একজন বড় কুস্তিবাজ পালোয়ান হয়েছে—সেদিন অপর একজনের সঙ্গে কুস্তি কর্ত্তে কর্ত্তে তাহাকে এমন জোরে একটা পাথরের উপর ফেলিয়া দিল যে তাহাতেই তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, এখন তারই ব্যবস্থা জান্‌তে এসেছে—ওকে কি কর্ত্তে হবে?

বিশ্বম্ভর। যাকে মেরেছে সে কি জাতি?

ছাত্র। সেও একজন ব্রাহ্মণ যুবক।

বিশ্বম্ভর। ওঃ কি পাষণ্ড, খেলার ছলে ব্রহ্মহত্যা, ওর আর ব্যবস্থা কি? তুষানল না হয় জাহ্নবী জীবনে জীবন বিসর্জ্জন—তা ছাড়া আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই—ব্রহ্মহত্যাকারীর মুখদর্শন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, ও হতভাগা মহাপাপীকে এস্থান ত্যাগ করিতে বল, কেহ উহার মুখদর্শন করো না।

ভবানীও একে প্রাণের জ্বালায় অস্থির হইয়াছিল—তার উপর পণ্ডিতের ঘৃণা ব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া এবং বিষম ব্যবস্থার বিষয় অবগত হইয়া একেবারে মরমে মরিয়া গেল।

এই টোলের ছাত্রবর্গ একদিন তাহার সহপাঠী বন্ধু ছিল কিন্তু গুরুর মুখে ঐ পাপীর মুখদর্শন করিতে নাই শুনিয়া অতি ঘৃণার সহিত তাহাকে সেস্থান ত্যাগ করিতে বলিল। ভবানী মর্ম্মজ্বালায় অস্থির হইয়া চারিদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। যে শুনিল—সেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাহার প্রতি মুখ বাঁকাইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। ভবানী সাধারণের নিকট এত ঘৃণার্হ হইল যে, শৃগাল কুকুরের আশ্রয় আছে তথাপি লোকালয়ে তাহাকে কেহ আশ্রয় দিল না। সকলেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। সে প্রাণের জ্বালায় অস্থির হইয়া জীবন ভারবহ মনে করিল এবং একদিন জীবন পরিত্যাগের জন্য পতিত-পাবনী জাহ্নবীকূলে উপস্থিত হইয়া স্মার্ত্ত বাগীশের ব্যবস্থামত গঙ্গা সলিলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যত্নবান হইল।

তখন প্রভাত হয় নাই। রজনীর গভীরতা তখন খুব বেশী; ভবানী পাপের দংশনে সমস্ত রাত্রি একটী ছত্রে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিল, তারপর অসহ্য বোধে রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই জীবলীলা শেষ করিবার জন্য ঘাটে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে বলিল—"মা! সর্ব্বপাতক-সংহন্ত্রী, পতিত-পাবনী! আমি মহাপাতকী, আমার পাপের ইয়ত্তা নাই; খেলার ছলে একজন ব্রাহ্মণের প্রাণ বিনাশ করিয়া সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়াছি, মা অন্তর্যামিনী। তুমি আমার অন্তরের ভাব জান, আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলি নাই, হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ও সেকাজ করি নাই। অসাবধানতাবশতঃ সে একটা শিলার আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মা! আমিই তার মৃত্যুর কারণ নই! তবে বন্ধুর মৃত্যুতে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইয়াছি—তোমার ক্রোড়ে স্থান গ্রহণ করা ভিন্ন

আমার আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নেই! মা পতিতপাবনী! পাপী বলে সকলেই আমাকে ঠেলিয়া ফেলিতেছে কিন্তু মা! তুমি ত পাপী নিস্তারিণী, কলুষ নাশিনী, অধম তারিণী—তোমা ভিন্ন অধমের আর গতি কোথায় মা! মহাপাপ কলুষিত জীবের তুমিই একমাত্র গতি-মুক্তি; তোমার এই পবিত্রনীরে জীবন বিসর্জ্জন করিলে যত বড় পাপীই হউক না কেন, সে নাকি অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয়—তাই মা! বড় আশা করিয়া তোমার কূলে আসিয়াছি, মা! পাপের ভীষণ যাতনা আর সহ্য হয় না—পুড়ে মলাম মা! পতিত পুত্রকে শান্তি দে মা শান্তি বিধায়িনী, আর সহ্য হয় না" বলিয়া যেমন জলে ঝম্প প্রদান করিবে, নির্জ্জনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার এই উপযুক্ত সময়, কেহ দেখিতে পাইবে না, কেহ নিষেধ করিবে না বলিয়া ভবানী যেমন জলে পড়িবে—অমনি পশ্চাৎ দিক হইতে "কি কর, কি কর, দেখিতেছি তুমি, ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা মহাপাপ; সকল পাপের মোচন আছে; আত্মহত্যাকারীর মোচন নাই—সে নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত নরক ভোগ করে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, ব্রাহ্মণ; আত্মনাশ আশা ত্যাগ কর।" বলিয়া কে সেই গভীর রজনীর নির্জ্জন যামে আসিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তে বাধা প্রদান করিল।

ভবানী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—এক অপূর্ব্ব যোগক্ষেম মূর্ত্তি; সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ একজন যোগীপুরুষ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার মরণে বাধা প্রদান করিতেছে। সে অপূর্ব্ব যোগজ্যোতিঃ বিশিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিয়, ভবানী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল—কে প্রভু আপনি! আমাকে স্পর্শ করিবেন না—আমি যে মানুষ হইয়া আজ একপক্ষ হইল কুকুরেরও অধম হইয়াছি, ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কেহ আমাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক—আমার প্রতি

কেহ ফিরিয়া দেখিতেও পাপানুভব করিতেছে। কে আপনি প্রভু! না জানিয়া এই মহাপাতকীকে স্পর্শ করিলেন?

আগন্তুক। মহাশয়! আমি বিশ্বেশ্বরের বিশাল বিশ্বরাজ্যে একটী অতি নগণ্য জীব, লোকে আমাকে দয়া করিয়া তুলসীদাস বলে।

ভবানী। ওহো মহাত্মা তুলসীদাস সাধকজীবন রামময় প্রাণ তুলসীদাস! কাশীধামের প্রধান বৈদান্তিক সাধক প্রবর তুলসীদাস! দেব, এই ঘোর নিশিথ সময়ে কোথা হতে এসে আমার ন্যায় মহাপাতকীকে স্পর্শ করে—অপবিত্র হলেন, আমার প্রায়শ্চিত্তে বাধা দিলেন।

তুলসী। কিজন্য তুমি আপনাকে মহাপাতকী বলে অভিহিত কর্চ্ছো এবং তোমার এ আত্মনাশের কারণ কি ব্রাহ্মণ!

ভবানী। পণ্ডিতজী! আমার পাপের ইয়ত্তা নাই; আমি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত, তাই আজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া এ পাপজীবন পরিত্যাগ করবার জন্য এখানে এসেছি।

তুলসী। কিরূপ ব্রহ্মহত্যা করেছো এবং এ প্রায়শ্চিত্তের বিধানই বা তোমায় দিলে কে?

ভবানী। প্রভু আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মদোষে আজ পতিত! আমি কুস্তিবাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম। আজ কয়েকদিন হইল—কুস্তি খেলায় একজন সহযোগীকে আহ্বান করিয়াছিলাম, অসাবধানতা বশতঃ জাপ্‌টাজাপ্‌টী করিয়া উভয়ে একটী বৃহৎ শীলাতলে পড়িয়া যাই। তাহাতে সে মস্তকেবে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। খেলায় জয়লাভ করিবার জন্য মত্ত হইয়াছিলাম—সে যে মরিয়া যাইবে—তাহা আমার জ্ঞান ছিল না বা ইচ্ছা করিয়া তাহার মৃত্যু ঘটাই

নাই। ইহার জন্য আমিও হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া আজ প্রায় এক পক্ষ হইল—কেবল অনুতাপের কান্না কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছি—কোন প্রকারে শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া আজ প্রাতঃকালে কাশীর প্রধান স্মার্ত্ত বিশ্বম্ভর ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম—তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন—হয় তুষানল, না হয় জাহ্নবী জীবনে জীবন বিসর্জ্জন! তাই আজ নির্জ্জনে সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছি; মাহাত্মন্! কেন আমাকে এই যন্ত্রণাময় জীবন ত্যাগে বাধা দিলেন?

তুলসী। ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মহত্যা পাপের ইহাই প্রায়শ্চিত্ত বটে; তবে যেরূপ বলিলেন তাহাতে তোমায় সে পাপ ও স্পর্শ করে নাই, তবে একটী ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের ক্ষয় করিতে গিয়া আর একটী ব্রহ্মহত্যা করা সাধুজনানু মোদিত নহে।' ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছ মনে করিয়া তোমার হৃদয়ে যে ঘোর অনুতাপাগ্নি জ্বলিত হইয়াছে। যখন তোমার অনুতাপ আসিয়াছে এবং খেলার ছলে যখন একার্য্যও তোমার অনিচ্ছায় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা যখন তোমার প্রাণে ছিল না—তখন অন্য ব্যবস্থা করলেও তোমার পাপের প্রতিবিধান হতে পারে।

ভবানী! বলেন কি প্রভু। প্রাণত্যাগ ছাড়া এ মহাপাপীর কি অন্য ব্যবস্থা আছে?

তুলসী। ব্রাহ্মণ। বেশী উৎসাহিত হইও না; তবে প্রাণত্যাগ কর্ত্তে হবে না—আমার ব্যবস্থামত কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমার উদ্ধার হবে।

ভবানী। আঃ বলেন কি যোগীবর! তবে দেখছি আপনি আমার সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমাকে ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত করবার জন্য এসেছেন—বলুন বলুন প্রভু। আপনার পায়ে ধরি—আমাকে এখন

কি কর্ত্তে হবে? কি কার্য্য অনুষ্ঠান কল্লে আমি এই ভীষণ পাপের দংশন জ্বালায় মুক্তি পাব? এই বলিয়া ভবানী সাধক প্রবর তুলসীদাসের চরণ ধারণ করিল! তুলসীদাস বলিলেন—আহা। কর কি তুমি ব্রাহ্মণ চরণ পরিত্যাগ কর, আমি তোমার উপায় বলিয়া দিতেছি।

ভবানী। সাধক প্রবর! আমি আর এখন ব্রাহ্মণ নই; আমি ব্রহ্মহত্যা পাপে চণ্ডালেরও অধম হইয়াছি; আপনার পদ ধারণ করে—আমার দেহ পবিত্র হলো—বলুন প্রভো! আমার উপায় কি?

তুলসী। বিপ্র! উৎকণ্ঠিতচিত্ত স্থির কর, মনে একাগ্রতা আনয়ন কর, অবশ্য তোমার নিষ্কৃতি লাভ হবে।

ভবানী। সাধকোত্তম। আপনার ব্যবস্থামত কার্য্য কল্লে আমাকে সমাজে গ্রহণ কর্ব্বে ত?

তুলসী নিষ্পাপ হলে সমাজে কেন গ্রহণ কর্ব্বে না, অবশ্যই কর্ব্বে?

ভবানী। বলেন কি প্রভো! এমন ব্যবস্থা থাকৃতে সকলে আমাকে জোর করে মেরে ফেল্‌ছিল? এক্ষণে কি কর্ত্তে হবে দয়া করে বলুন।

তুলসী। ব্রাহ্মণ। যে নাম পঞ্চানন পঞ্চমুখে গান করেন, যে নামের গুণে সাগরে শীলা ভাসে, চোর রত্নাকর যে নাম জপ করিয়া, মুনি শ্রেষ্ঠ বাল্মিকী হইয়া সমস্ত পাপ বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই মহামন্ত্র "রামনাম" এই পবিত্র গঙ্গাতীরে বসিয়া একাগ্রমনে একপক্ষ জপ কর, তাহা হইলেই তুমি সকল পাপ বিমুক্ত হয়ে নিষ্পাপ দেহ ধারণ করিবে। সুধাসিক্ত এই পবিত্র নাম রসনায় উচ্চারণ করিবামাত্র জীবন ধন্য হয়, জীব সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তিমে অক্ষয় স্বর্গে গমন করে; এই রামনাম মহামন্ত্রই তোমার সন্দেহান্দলিত ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনিষ্ট করিবার মহৌষধ; ইহাতেই তুমি সকল যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাবে, তবে আর কোন ভাবনা থাকৃবে না।

ভবানী। মরি মরি, পাপ বিনাশের এমন পবিত্র নাম—রাম নাম; ঠাকুর। এই নাম জপ করে যে আমি সকল পাপ হতে বিমুক্ত হব; তা জানবো কেমন করে?

তুলসী। ব্রাহ্মণ। তার জন্য আর তোমাকে বেশী চিন্তা কর্ত্তে হবে না। হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাণ হবে—যে জ্বালায় জ্বলে মরছো—তাহার শান্তি হয়ে প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ কর্ব্বে—তোমার মনই তোমাকে বলে দিবে—তুমি নিষ্পাপ; হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে একটা শান্তির অপূর্ব্ব রসাভিষেক হইলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে তোমার সমস্ত পাপ বিধৌত হয়ে গেছে, তুমি সন্দেহান্দলিত ব্রহ্মহত্যা পাপে অব্যাহতি লাভ করেছো।

ভবানী। যে আজ্ঞা প্রভো! তবে আমার কর্ণে সেই মহামন্ত্র প্রদান করুন। আমি ধন্য হই!

তুলসীদাস ইষ্টদেবের পুতমন্ত্র মহাপাতকী ভবানী মিশ্রের কর্ণে প্রদান করিয়া বলিলেন—বৎস! এই পবিত্র দ্ব্যক্ষর যুক্ত নাম অবিরাম একপক্ষকাল জপ কর—তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা পাপ ত বিমুক্ত হইবেই—পরন্তু জীবনে আর কখন পাপ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না, তোমার জীবন গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হইবে!

ভবানী। মরি মরি কি মধুর নাম! অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় পবিত্র হইল, মন আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল, গুরুদেব! আপনি যথার্থ মহাপুরুষ, এই মহাপাপীকে উদ্ধারের জন্য বারানসী ক্ষেত্র পবিত্র করিয়াছেন। আজ আমি ধন্য হলাম। এক্ষণে নির্জ্জনে বসে, এই নাম জপমালা করিগে, পক্ষান্তে আবার আপনার আশ্রমে ঐ মুক্তি মূলাধার পাদপদ্ম দর্শন করিব! ভবানী মিশ্র স্থির বিশ্বাসের সহিত নাম জপে মন প্রাণ সমর্পণ করিল।

বাস্তবিক ভবানী ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মবধ করে নাই; ইহাতে তাহার কোন দোষ নাই—অতএব এপাপে তাহার তুষানল বা জীবনত্যাগ ব্যবস্থা হইতেই পারে না; শ্রীভগবান রামচন্দ্রের কৃপায় নিশ্চয়ই ভবানীর পাপ-ভয়-ভীত-চিত্ত; ভীতিশূন্য হবে। যাই, সময় বয়ে যাচ্ছে, ভগবান আজ আমাকে ইহার জন্যই বুঝি এই দিকে এনেছিলেন—নতুবা আমার এদিকে আসিবার ত কোন আবশ্যকই ছিল না? দয়াময়! এ জগত প্রপঞ্চে যাহা হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে—সমস্ত কার্য্যেরই মূলাধার তুমি; মানুষ তোমার দাসানুদাস, তোমার হুকুমের চাকর—উপলক্ষ হয়ে তোমার আদেশ পালন করে মাত্র, তাহাদের কর্তৃত্ব ইহাতে কিছু নাই, যে ভাবে কর্তৃত্ব আছে—সে জানে না, সে অধম হইতেও অধম—সে মহাপাপী! প্রভূ! ভবানী যুবক; সে ইচ্ছা করিয়া পাপ করে নাই; তথাপি তাহার মনে অনুতাপের অগ্নি এমন জ্বলিয়াছে, যে সে অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়; ঠাকুর! তাহাকে নিষ্পাপ কর, তার প্রাণে শান্তিরসুধা-ধারা ঢালিয়া নির্ম্মল করিয়া দাও। এই বলিয়া তুলসীদাস করযোড়ে শ্রীরামচন্দ্রের রাতুল চরণে ভক্তিগদগদ চিত্তে প্রণাম করিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দুঃখীরাম

ওঃ কি কষ্ট! অত বুড়ো মানুষকে এত দূর হাঁটিয়ে কাশী আনা কি সহজ কথা? বুড়ী কি চল্‌তে পারে, প্রাণের দায়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিল বটে কিন্তু এক ক্রোশ পথ হাঁট্‌তে না হাঁট্‌তে একবারে শুয়ে পোড়ল। তাকে কখন কাঁদে, কখন পীঠে করে আর কত-দূর আন্‌বো? ভাগ্যে ভদ্রলোকটীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাগ্যে তিনি দয়া করে, বুড়ীকে তাঁর গাড়ীতে তুলে নিলেন—তাই, নতুবা এতদিনেও আমরা কাশীতে পৌঁছিতে পারতাম না। ভদ্রলোকটী খুব দয়াবান বটে, গাড়ী করে ত নিয়ে এসেছেন, তার পর আশ্রয় দান করে বলেছেন—যত দিন ইচ্ছা হয়, তোমারা আমার এখানে থাক, কিন্তু তাকি হয়? খুড়ীকে ত স্তোক দিয়ে বেরিয়েছি, দেখি এখন দাদা কি করেন—কাশীতে এসেছেন কি না, সেবার ত দেখা পায়নি। এই বলিয়া দুঃখীরাম—মনিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিলেন। কাশী যে এমন পবিত্র স্থান, তাহার মাহাত্ম্য যে এত, দুঃখীর সে দিকে কোন দেখাশুনা নাই, তিনি তুলসীদাস ও তাঁর জননী এবং পত্নীর জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন—তাহাদের তিলমাত্র উপকার করিতে পারিলে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করেন। কৃতজ্ঞ হৃদয়ের এমনি মহীয়সী শক্তি, পবিত্র পরোপকার ব্রতের এমনি ভাব। ধর্ম্ম আর কাহাকে বলে, কর্ম্মযোগী মানুষ আর কেমন করিয়া হয়? জগতে ইহাই কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ—ইহাই মহাযোগ।

আজ দুঃখীরাম তুলসীদাসের সন্ধানে যাইবেন। তাই অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া ভগবান দাসের বাড়ী—সকাল সকাল চারিটী আহার করিয়া লইলেন। কাশীতে আসিয়া অবধি এ কয়দিন অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল, তাই গৃহের বাহির হইতে পারেন নাই এবং ভগবান দাস মিশিরও তাহাকে বাহির হইতে দেন নাই। লোকটী খুব ভদ্র, অনেক টাকার মালিক, দয়া-ধর্ম্ম ও তাঁহার যথেষ্ট আছে; কাশীতে তাঁহার কয়েকখানি বাড়ী আছে; একখানি নিজের, যখন আসেন—তখন সেই বাটীতে অবস্থান করেন। আজ হুলসী ও দুঃখীরামের সহিত তিনি সেই বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন।

যত দিন যাইতেছে—হুলসীর প্রাণ তত ছটফট্ করিতেছে। তিনি কেবল দুঃখীকে বিরক্ত করিয়া বলিতেছেন—কই বাবা দুঃখী! তুই যে আমাকে এতদূর, আন্‌লি; তুলসীর কাছে নিয়ে যাবি বলে আশা দিলি; কই, তার যে আর নাম করিস্ না।

দুঃখী।—খুড়ি! এখন কি আর তোর তুলসী সেই রাজাপুরের দুঃখীর বন্ধু তুলসী আছে। সে যে এখন কাশীর একজন মহাগণ্য-মান্য লোক, বেদান্তের মহাপণ্ডিত, সাধকের অগ্রগণ্য হয়েছেন; মনে করলেই কি তাঁর কাছে যাওয়া যায়—সময় অসময় দেখতে হবে ত।

হুলসী।—কি তুই বল্‌লি বাবা! তুলসী আমার বেদনার পণ্ডিত হয়েছে; খুব বড় সাধক হয়েছে—আচ্ছা, তাহ'ক না, তাব'লে কি, আর মা বাপ, বন্ধুবান্ধব কাছে যেতে পাবে না, এযে অনাসৃষ্টে কথা তুই বল্‌ছিস্ দুঃখী!

দুঃখী।—অনাসৃষ্টে কথা কি খুড়ী! তুই কি জানিস্ না—

কৃষ্ণ যখন মথুরায় রাজা হয়েছিল; তখন নন্দ যশোদাকেও ঢুক্‌তে দেয় নাই; বড় হলে যে তার সব বড় হয়!

তুলসী।—ও দুঃখী, সে কিরে বাবা! তবে এত আশা দিয়ে তুই এ একরাজ্জীর পথ আন্‌লি কেন,—যদি সে দেখাই না কর্ব্বে, তবে এতদূর আসা যে বৃথা, তুই আমাকে না হয়, নিয়ে চল না; দেখি সে কেমন বেদানার পণ্ডিত হয়েছে।

দুঃখী। খুড়ী, অত উতলা হচ্ছিস্ কেন, যখন এনেছি, তখন তুলসীদাকে এনে দিবই—বা তার কাছে তোকে নিয়ে যাবই—তবে এখন ত সে আর পুজারী বামুন নয়—এখন সে খুব বড় লোক, রাজারাজড়া তার কাছে লাগে না, কত বড় বড় রাজা, তাঁর আশ্রমে এসে যখন গড়াগড়ি দেয়, তখন সময় বুঝে না গেলে, যে তাঁর ক্ষতি হবে, সে ক্ষতিটা করা কি উচিত, তাহ'লে হয়ত চটে যাবেন—দেখা কর্ব্বেন না! আর কাশীতে আস্‌বার সময় আমি বৌদিরও সন্ধান পেয়েছি, তিনি পাগল হয়ে—এদিকেই কোথায় চলে এসেছেন, তাই মনে করছি, একেবারে তাঁর সন্ধান করে, দুজনকে নিয়েই তাঁর কাছে যাবো, বউদিকে দেখ্‌লে—দাদা হয়ত আর কথা কইতে পারবে না—সে মুখের জন্য দাদা কত কাতর তাত তুমি জান?

তুলসী।—হাঁ বাবা! তা জানি, তবে তাই কর—কিন্তু বেশী দেরী করিস্‌নি?

দুঃখী।—না না আর দেরী কি, যত শীঘ্র পারি, আমি খুব চেষ্টায় আছি, এখন শিবরাত্রি, কাশীতে অনেক বড় লোকের ভিড়, একটু কমুক না, তাতে আর ক্ষতি কি, সেই তকে আমি একবার বউদির সন্ধান করে নিই!

তুলসী।—বেশ বেশ বাবা! তুই চিরজীবী হ।

তুলসীদেবীকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখীরাম বৈকালে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অসি নদীর তীরে তুলসীদাসের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। দুঃখীরামের হৃদয় পরোপকারে ভরা, কৃতজ্ঞতায় মাখামাখী যাহার নুন একদিনের জন্য খাইয়াছেন—তাহার জন্য প্রাণ দিতেও দুঃখীরাম কুণ্ঠিত নহেন—এমন পবিত্র প্রাণ যুবক কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? তুলসীদাসের উপকার দুঃখীর হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা—তাই তিনি তাহাদের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল—"হা তুলসী দাদা,—হা বন্ধু" বলিয়া কাতর এবং কেবল সেই অনুরাগেই তিনি আপন হারা হইয়া কার্য্য করিতেছেন। দুঃখীরামের এ উপকারের কি তুলনা আছে?

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কেবল তাহার চিন্তা, বউদিদিকে কেমন করিয়া খুঁজিয়া পাই। কাশীতে আসিবার সময় গোঁসাই-গঞ্জের চটিতে সেই লোকটী বলিয়া গেল—একটী ভদ্রঘরের যুবতী বউ পাগল হয়ে, আজ কয়দিন এখানে—সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ছগনলাল ত্রিবেদী বলে কে একজন বড়লোক তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে? সেইজন্য একবার গোঁসাইগঞ্জে সন্ধান কর্ত্তে হবে, আজ আর হলো না, কাল এর একটা বীহিত কর্ব্বেই কিন্তু যে মাঠ-ঘাট, বন জঙ্গল পথে বেরুতেও ভয় করে—যা হউক, তাতে আর কি হবে—না হয় প্রাণ যাবে—তথাপি, বউদির অনুসন্ধান কর্ত্তে ছাড়বো না। আহা বউদি, যে আমাকে ঠিক ছোট দেবরটীর মত না খেয়ে খাইয়েছেন—তার বিপদে না দেখ্‌লে—অধর্ম্ম হবে যে, প্রাণের মায়া কল্লে চল্‌বেনা, উপরে ভগবান আছেন।

দুঃখীরাম বউদির ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন অন্ধকারের কালো ছায়া ধরণীর বক্ষে ঘনাইয়া আসে নাই—

চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেই সময় দুঃখীরাম তুলসীদাসের আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর যোগজ্যোতি পূর্ণ দেহ লইয়া তাহারই প্রাণের বন্ধু তুলসীদাস পশ্চাৎ ফিরিয়া একজন ছাত্রকে কি পাঠ বুঝাইয়া দিতেছেন। তুলসীদাস তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, দুঃখীরাম তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দেওয়ালের আড়াল হইতে ডাকিলেন—তুলসী দাদা, ভাই! আজ মথুরায় রাজা হয়েছ বলে কি—সাধের বৃন্দাবন, প্রাণের রাধা, ও জননী যশোদাকে, এবং তোমার প্রাণের সখা দুঃখে ভাইকে ভুলে গেছো?

তুলসীদাস নিবিষ্টচিত্তে পড়াইতে ছিলেন; কথা কয়টী কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র হৃদয়ে উদ্বেলিত হইল—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সোহাগে গাথা সেই চিরপরিচিত স্বর বুঝিতে পারিয়া আকুল প্রাণে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—তখন দুঃখীরাম আড়াল হইতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তুলসীদাস দুঃখীরামকে দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ স্বরে বলিলেন—দুঃখে ভাই! আয় আয় পরের মত বাহিরে দাঁড়িয়ে কেন?

দুঃখী। ভাই! পর করেছো, আর পরের মত বাহিরে দাঁড়াব না ত কি?

তুলসী। পর করিনি ভাই! দুঃখী, তোর ভালবাসা কি জীবনে ভুলিবার, তবে অনেক দূরে এসে পড়েছি বলে, কিছু করতে পারি নাই। ভাই দুঃখে! সব ভাল তো?

দুঃখী। ভাই! ভাল আর কি করে, প্রাণ একপ্রকার আছে মাত্র! বুড়ী মাকে মেরে সন্ন্যাস গ্রহণ করা কোন শাস্ত্রের বিধি দাদা! আর সাধ্যাসতী পূণ্যবতী রমণী স্বামীশোকে উন্মাদিনী হয়ে

কোথায় চলে গেল, এমন কি তাঁহার সন্ধানও পাওয়া যায় নি—জানি না তিনি জীবিতা কি মৃতা। দাদা! তাদের কাঁদিয়ে ধর্ম্ম করবার জন্ত ঘর ছাড়া কি তোমার উচিত হয়েছে? কেন, এদের নিয়ে সংসারে থাকলে কি তোমার ধর্ম্ম হতো না? আমি তোমার সহোদর না হলেও অতি স্নেহের, আমাকে না বলে তুমি কোন কাজই কর্ত্তে না, আমিও তোমা বই কিছু জানিতাম না, ভাই! এ অবস্থায় আমরা ভাল আছি, কি মন্দ আছি তাত বুঝতেই পারছো। বলিয়া দুঃখীরাম কাঁদিতে লাগিলেন।

মায়ামোহের অতীত মহাজ্ঞানী তুলসীদাস বাল্যবন্ধু দুঃখীরামকে দেখিয়া পূর্ব্বস্মৃতি মনোমাঝে উদিত হওয়ায় তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ভাই দুঃখী! কিছু মনে করিস্ নি, বহুদিনের পর তোকে দেখে ঘরের কথা জান্‌তে ইচ্ছা হয়—এইজন্য ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করা অন্যায় নয়—মায়ের কিছু দুঃসংবাদ শুনাবি না ত?

দুঃখী। ভাই, খুড়িমার ভালমন্দ বিস্ময়ের কথা নয়, একে অতি বৃদ্ধ, তায় পুত্রের অদর্শনজনিত শোকে যে খুড়িমার দেহ পতন হবে,—এর আর আশ্চর্য্য কি? তার প্রাণটী কেবল বেরুতে বাকী আছে মাত্র, ভেবে, ভেবে এদিকের সব মৃত্যুর মতনই হয়ে আস্‌ছে? হ্যাঁ দাদা! মার কথাত জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু কই বউদিদির কথাত জিজ্ঞাসা করলে না—এটা কি তোমার বৈরাগ্য-শাস্ত্রের একটা নিষিদ্ধ বিধি নাকি?

তুলসী। ভাই! এই ত তুই বল্লি—সে মনের দুঃখে উন্মাদিনী হয়ে কোথায় চলে গেছে!

দুঃখী। বস্, এই পর্য্যন্ত জানলেই কি তোমার সব শেষ হলো? খোঁজ তল্লাস হয়েছে কি না, আছেন কি মরেছেন, পাওয়া গেলে

আরোগ্যের উপায় কি, এ সকল জান্‌বার, বল্‌বার কি অধিকার তোমার নাই? দাদা! তিনি তোমার ধর্ম্মপত্নী; দেবতা সাক্ষী করে, ধর্ম্মের কত শপথ করে—তুমি তাঁর ধর্ম্মরক্ষার, শুধু তাই কেন—সর্ব্বতোভাবে প্রতি পালনের ভার গ্রহণ করেছ! তুমি যখন যেরূপ অবস্থায় থাক না কেন, তিনি সর্ব্বদা সকল সময়ে তোমার পালনীয়া, রক্ষনীয়া—তুলসী দা! মনোযোগের সহিত এইসকল কর্ত্তব্য পালন করা কি তোমার ধর্ম্ম নহে! মনে করলে, বুঝি বৌদি পাগল হয়ে চলে গেলেই আপদ চুক্‌লো?

তুলসী। ভাই দুঃখে! মায়ের আমরা দুই ছেলে ছিলাম—আমি বড়, তুই ছোট; আমি চলে এসেছি, তুই আছিস্—কাজেই আমার সে চিন্তা বেশী নাই, আর তোর বউদির কথা যে বল্লি, সে ত আমার পরম উপকার করেছে?

দুঃখী। সেইজন্য বুঝি তার উপকারের এই প্রত্যুপকার কর্‌ছো।

তুলসী। না ভাই! আগে আমার সব কথাগুলি শোন—তারপর বলিস্!

দুঃখী। বল বল, খুব শুন্‌ছি—যা বল্‌বে বল!

তুলসী। ভাই! তোর বউদিই আমার জ্ঞানদাত্রী, তাঁর কথাতেই আমার চৈতন্য হয়েছে; প্রাণের কপাট খুলেছে; তাই তিনি এখন আমার গুরুস্থানীয়া; রমণী ধর্ম্মের আধার, স্বামীর পাপ কলুষিত হৃদয়ে রমণীই ধর্ম্মের ভাব জাগাইয়া দেয়; তাহার অন্ধকারময় জীবন-পথে সতী-স্ত্রী ধর্ম্মের আলোকবর্ত্তীকা ধরিয়া পথ দেখাইয়া দেন—এইজন্য স্ত্রী-সহধর্ম্মিণী; তোর বউদি আমার তাই করেছেন? আমি তাঁরই বাক্যে পরম শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি; ভাই! এ ধর্ম্ম বড় কঠিন—সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম কর্ত্তে না পার্‌লে এ ধর্ম্মের অধিকারী

হওয়া যায় না। এ জগতে কামিনী-কাঞ্চন অতি লোভনীয় সামগ্রী—এইজন্য শাস্ত্রকারগণ এই ধর্ম্মের অধিকারীকে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্ত্তে উপদেশ-দিয়াছেন ; রমণীর মুখাবলোকন করা, এধর্ম্মে একেবারে নিষিদ্ধ, ভাই দুঃখী ! প্রাণের বন্ধু হ'য়ে তুই আর আমাকে এপথ থেকে বিচলিত করিস্ নে ?

দুঃখী। দাদা ! তোমার বৈরাগ্যের কথা শুনে—এত দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছে; কেন ? ধর্ম্মপথগামী বা বৈরাগী হলে কি স্ত্রী পরিবার সব ত্যাগ কর্ত্তে হয়—না হলে কি ধর্ম্ম হয় না, না ভগবানকে পাওয়া যায় না ? সে কালের বড় বড় ঋষিরা ত কই কেহই সংসার ছেড়ে চলে যান নি, তাহারা বরং সংসারকেই শ্রেষ্ঠ বলে—এইখানেই ধর্ম্ম কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন। কেন বশিষ্ঠ, গৌতম, জাবালী, কশ্যপ, বামদেব, অগস্ত্য প্রভৃতি কতশত ঋষি ছিলেন—ধর্ম্ম-কর্ম্ম তাঁদের একরকম একচেটে ছিল—বল্লেই হয়, যা যা করে গেছেন—অদ্যাবধি তার বিন্দুমাত্র বেশী আমাদের কেউ কর্ত্তে পারলে না—কই, তারা কি ছেলেপুলে ছেড়ে ; ঘর সংসার ভাসিয়ে দিয়ে—এসব করেছিলেন ? আচ্ছা দাদা ! জনক রাজার মত কে ছিল—আর এখনই বা কে তাঁর সমকক্ষ হতে পেরেছে—তাঁর মত বৈরাগ্য আর কেহ অবলম্বন কর্ত্তে পেরেছে কি ?—শুকদেব হেন—পরম বৈষ্ণব ও যোগশিক্ষা করিবার জন্য সাতদিন যাঁর দ্বারস্থ ছিলেন ; সেই জনক রাজা যে ঘোর সংসারী হয়ে রাজ্যপর্য্যন্ত পরিচালন করে গেছেন ? অথচ বৈরাগ্যের হদ্দমুদ্দ ; ত্যাগের চূড়ান্ত করে গেছেন। ভাই ! যে সংসারের কাছে কেহই নয়—তুমি রাগ করো না, যা বলছি তা শুন—আশ্রমই বল—চল, ঘরে গিয়ে আবার যেমন সংসার করছিলে—সেইরূপ কর্ব্বে,—আহা ! তোমার বিহনে খুড়ীমার সেই বুক চাপ্‌ড়ান আর মড়া-

কান্না দেখ্‌লে পাষাণ ভেদ হয়ে যায়। এই বলিয়া দুঃখীরাম চক্ষের জলধারা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—ভাই দুঃখে! আমি রাগ কর্ব্বো কেন, রাগ যে পরম শত্রু, এ শত্রু জয় কর্ত্তে না পার্‌লে কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা যায়। তোর যুক্তিতর্ক খুব বেশী বটে কিন্তু কি কর্ব্বো এ আশ্রমে প্রবেশ কর্‌লে সংসার করা নিষেধ; তুই ঘরে যা—ছোট ছেলেটীর মত তাঁকে দেখ্‌গে যা। আমি আর কিছুদিন পরে একবার জন্মভূমি দেখ্‌তে যাব।

দুঃখী। সে দফা আমি রক্ষা করে এসেছি; সব বেচে কিনে, খুড়ীমাকে কাশী নিয়ে এসেছি; একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁকে রেখে তোমায় বল্‌তে এসেছি। এইবার বৌদির সন্ধান করে দেখি; তারপর কি কর্ত্তে পারি—একবার দেখ্‌বো! এই বলিয়া দুঃখীরাম কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তুলসীদাস কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। ছাত্রগণ গুরুদেবের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া, ভাবিতে লাগিল—হায়! কি দুর্দৈব, যদি বাস্তবিক লোকটা ইহার জননীও পত্নীকে আনয়ন করে, তাহলে ত সব মাটি হল—প্রভু! যতদূর অগ্রসর হয়েছেন—তাহলে ত এখানেই তার খতম হবে—সংসারে মাখামাখি হলে কি আর এতদূর ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন থাকবে?

অপর একজন ছাত্র চুপে চুপে বল্লে—ভাই! তুমি ভুল বুঝেছ; ঐ লোকটী যা বল্লে—তার কথা কি অসত্য; বর্ণে বর্ণে যে সমস্ত ঠিক; আমাদের যে ঋষিরা ছিলেন—সকলেই ত সংসারী ছিলেন—স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসার কর্ত্তেন—অথচ ধর্ম্ম-কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন।

সংসার আশ্রমে থাকলেই যে ধর্ম্ম হয় না—ইহা সম্পূর্ণ ভুল ; আমার মতে গুরুদেব যদি সংসারী হন, জননী-পত্নীকে নিয়ে আসেন, তাহলে এর চেয়ে উন্নতি ত হবে, আমাদেরও এমন করে পড়া বন্ধ দিতে হবে না, এখন ওঁর সমস্ত খামখেয়ালী ; কখন এখানে—কখন সেখানে, কখন কাশী—কখন অযোধ্যা ; একটা ত মতিস্থির নেই—যেখানে ইচ্ছা পড়ে থাকেন। তাঁরা এলে একটা দায়ীত্ব এসে পড়বে, আর এমন করে—এথায় সেথায় কর্ত্তে পারবেন না। আমার মতে লোকটা যা বলে গেলো—তা যদি করে, তাহলে ভালই হয়। আমরাও সকল সময়ে তাঁকে পেয়ে লেখাপড়া ও ধর্ম্ম-কর্ম্মে অনেক উন্নতি কর্ত্তে পারি ! গুরুদেব যে মুক্ত হয়ে গেছেন, এখন ওর সংসারই কি আর অরণ্যই কি ; অত উন্নত ব্যক্তিকে কি সংসার কখন ধর্ম্মচ্যুত কর্ত্তে পারে ? বোধ হয়, আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাই লোকটা এসে, গুরুদেবকে একস্থানে রাখবার চেষ্টা কচ্চে ; ও আর একবার এখানে এসেছিল নয় ?

ছাত্র। হাঁ ; অনেক দিন হলো একবার এসেছিল—তখন প্রভু এখানে ছিলেন না। ভগবান করেন—ওঁর জননী-পত্নী যেন শীঘ্র এসে উপস্থিত হন্। চল এখন, সায়ং সন্ধ্যার কাল উপস্থিত হয়েছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এই বলিয়া ছাত্রবৃন্দ নদী-তীরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

তুলসীদাস চিন্তায় বিভোর—তখনও তাঁহার চৈতন্য নাই। দুঃখীরাম যখন সন্ধান পাইয়াছেন, যখন মাকে এতদূর আনিয়াছে—তখন তাহাকে দেখা দিতেই হইবে—নিকটে রাখিতেই হইবে। যাহা হউক, বলিহারী দুঃখীরামের হৃদয়—সেত আমার কেউ নয়—তথাপি, আমার জন্য, আমার জননী-পত্নীর জন্য, কিনা কর্চ্ছে, আহা !

আমার ভাবনা ভেবে ভেবে ছোঁড়াটা আধখানা হয়ে গেছে—একেই বলে বন্ধুত্ব! আর ভাবলে কি হবে—যা করেন ভগবান রামচন্দ্র; তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত ত কিছুই হবে না, যদি তিনি পুনরায় সংসারে সং সাজান ত আবার সাজিতে হইবে, ভেবে আর কি কর্ব্বো! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যদি হয়—তিনি যদি দুঃখীকে উপলক্ষ করে—আবার জননীর কাছে নিয়ে যান—তা আর কি কর্ব্বো, যাই এক্ষণে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো—সাধনার সময় বৃথা নষ্ট কর্ব্বো না। "জয় প্রভু রামচন্দ্র" বলিয়া সাধক ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া সাধন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সাধনায় আজ তাঁহার চিত্ত স্থির না হইয়া অন্য দিন অপেক্ষা সুস্থির ভাব ধারণ করিল দেখিয়া বিভোর প্রাণে ভগবানের শরণাগত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যোগাসনে

সাধকের চিত্ত-বিকৃতি হইলেই—মনে নানাপ্রকার সংসারভাব প্রবেশ করিলেই, প্রথমে তাঁহারা উপাসনা, ধ্যান ধারণার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করেন। সকলপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করার নামই যোগ।

বন্ধু দুঃখীরাম চলিয়া যাওয়ার পর হইতে পরমযোগী তুলসীদাসের প্রাণে সংসারভাব প্রবেশ করিয়াছে। এখন কি করি, কিনা করি ইত্যাদি ভাবে বিভোর হইয়া যেন সন্দেহ দোলায় দুলিতেছেন, কাজেই প্রাণের দেবতার একটা অনুমতি না পাইলে ত মনের সান্ত্বনা হইতেছে না। তাই সাধক আজ যোগাসনে বসিলেন।

যোগ সাধনের অসংখ্য আসন—সমস্ত আয়ত্ত করা মানবের সাধ্যাতীত। জগতে যতপ্রকার জীব—ততপ্রকার আসন; মহাযোগী মহেশ্বর এসকল আসন সম্যক প্রকারে অভ্যাস করিয়াছিলেন—মানবের ইহা সাধ্যের অতীত। আর এতপ্রকার আসন শিখিবার প্রয়োজন নাই। যেরূপ আসনে বসিলে সাধকের চিত্তস্থির হয়—মনের কোনপ্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না—যাহাতে সাধক সহজেই একাগ্রচিত্ত হইতে পারেন, তাহাই তাহার পক্ষে প্রকৃত আসন—পাতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের ইহাই আদেশ। সচরাচর সাধকগণ পদ্মাসনে বসিয়া সাধন ভজন করেন।

তুলসীদাস দক্ষিণ উরুর উপর বামপদ এবং বাম উরুর উপর দক্ষিণপদ সযত্নে স্থাপন পূর্ব্বক হস্তদ্বয় উত্থানভাবে রাখিয়া অর্থাৎ বামহস্ত দক্ষিণ উরুতে এবং দক্ষিণহস্ত বাম উরুতে সংস্থাপন করিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। জিহ্বা দন্তমূলে স্থাপিত করতঃ চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া সূর্য্য ও চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসার মধ্য দিয়া বায়ুর পূরণ ও রেচন করিয়া সুষুম্না মধ্যে স্তম্ভিত করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ করিলেন।

শাক্ত বলেন—কুণ্ডলিনী শক্তিকে এই সুষুম্না পথে ক্রমে উত্থিত করিয়া সহস্রারে পরম শিবের মিলিত করিবার নাম যোগ; অপর সাধক বলেন—জীবাত্মার সহিত সহস্রারে পরমাত্মার মিলন সংঘটন করিতে পারিলেই সাধকের সকল যোগ—শিক্ষা হয়, জীব শিব হয়। সাধক সেই যোগসাধনের অমৃতধারা পান করিয়া যতদিন ইচ্ছা বাঁচিতে পারেন—অমরত্ব লাভ করেন। এই শিবশক্তি বা আত্মা ও পরমাত্মার যোগাযোগে যে সুধাক্ষরণ হয় তাহাই মদ্য নামে অভিহিত সাধক তাহা পান করিয়া বিভোর হয়—তাহার আর বাহ্য চৈতন্য থাকে না—ইহাই মত্ত

পান। আর ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে যে মৎস্য বিচরণ করে—তাহার আস্বাদ লাভ করিয়া জীবন ধন্য হয়। রসনার বাক্য সংযমের নাম—মাংস ভক্ষণ—এই তত্ত্ব সম্যক জ্ঞাত হইলে সাধক বাকসিদ্ধ হয়—তাঁহার মুখনিসৃত বাক্য তখন বেদবাক্য—অকাট্য, তাহার ফল সুনিশ্চয়। সাধক তুলসীদাস যোগসাধনার এই অসীম ক্ষমতা সম্যক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই সাধক যোগাসনে বসিয়া পুলকিত, রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন—প্রতি লোমকূপে মৈথুনের সুখ উপলব্ধি হইয়া তিনি তন্ময় হইয়া পড়িলেন—ইহাই মৈথুন তত্ত্ব বা সমাধির অবস্থা! তুলসীদাস সমস্ত রাত্রি এই ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন।

সেদিন ছাত্রগণ বাড়ী গিয়াছিল—কাজেই যোগ-সাধনার কোন ব্যাঘাত হইল না। সমস্ত রাত্রি এই সমাধির অবস্থায় কাটাইয়া ভোরের সময় তুলসীদাস বিভোর প্রাণে হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহার প্রাণের দেবতার দর্শন পাইলেন। ভগবান রামচন্দ্র বামে মা জানকীকে লইয়া তুলসীর পবিত্র হৃদপদ্মাসনে আবির্ভাব হইয়া বলিলেন—বৎস! এত উতলা কেন? সংসার করিতে এত ভীত কেন, যাহার চিত্ত যোগে এত অনুরক্ত হইয়াছে; সংসার-ভাব যাহার হৃদয় হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছে, সংসারের মধ্যে থাকিলেও তাহার পতনের সম্ভাবনা নাই। তোমার পত্নী রত্নাবলী সাক্ষাৎ শক্তি স্বরূপিনী—তাঁহারজন্যই তোমার এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে সেও এখন তোমার মত যোগিনী, ভোগের ভাব তাহার নষ্ট হইয়া চিত্ত ত্যাগের ভাবে বিভোর—যোগ-সাধনায় তাহারও চিত্তদৃঢ় হইয়াছে। রত্নাবলী সামান্ত স্ত্রীলোক নহেন—সামান্য হইলে সে তোমার সহধর্ম্মিনী হইতে পারিত না। আর জননী তোমার রত্নগর্ভা; তাঁহার পদাশ্রয়ে আশ্রয় হইলে তুমি যাবতীয় যোগের ফল লাভ করিবে। বৎস!

ভয় কি, আমি যে তোর সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি, যখনই চিত্ত কোন প্রকারে অস্থির হইয়া পড়িবে—এইরূপ যোগাবলম্বন করিস্—তাহা হইলেই আমি তোর হৃদয় মধ্যে আসিয়া সমস্ত ভ্রম দূর করিয়া দিব! তুলসীদাস আরাধনার ধনকে হৃদয়মন্দিরে দেখিতে পাইয়া "জয় সীতাপতি রামচন্দ্রকি জয়" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সভয়চিত্ত অভয় প্রাপ্ত হইল—প্রাণের যাবতীয় ভীতি দূরে পলায়ন করিল। তুলসীদাস যেন বিশ্বজয়ী হইয়া প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া দেখিলেন—ভবানী তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। পূর্ণ শশধরের ন্যায় জ্যোতিবিশিষ্ট পাপমুক্ত ভবানীর সেই প্রফুল্ল বদনকান্তি দেখিয়া তুলসীদাস সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—বৎস! এখন নিজেকে কিরূপ বিবেচনা করিতেছ?"

ভবানী তুলসীদাসের চরণে পড়িয়া বলিলেন—ধন্য আপনার মন্ত্র দান—আজ আমি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক, আমার মনে আর কোন প্রকার মলিনতা নাই—সদাই যে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিতেছে—তাহা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। প্রভু! রামনামের এত গুণ?

তুলসী। এ নামের তুলনা নাই; মরজীব এই নাম জপমালা করিলে অমর হয়—পাপ তাহাকে আর কখন আশ্রয় করিতে পারে না—আর সঞ্চিত পাপ ত মনে-প্রাণে ঐক্য করিয়া জপ করিবামাত্রই ক্ষয় হইবে—এই নাম মাহাত্ম্যে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে—

রাশব্দোচ্চারণেনৈব বহির্নির্যাতি পাতকং।
পুনরাগমনঞ্চেৎস্যা মকারোহস্ত কবাটকম্॥

রামশব্দের আদ্যক্ষর রা উচ্চারণ করিতে যে মুখব্যাদান করিতে হয়—তাহাতেই জীব-দেহের সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়—পুনর্ব্বার আসিবার

উপক্রম করিলে মকাররূপ কবাটে বদন আবদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে আর বাহিরের পাপ অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না—বৎস! কলিকলুষনাশ করিতে প্রাণারাম রামনামের তুল্য আর কিছুই নাই। বৎস! চল, আজ পাপী নিস্তারিণী জাহ্নবী সলিলে স্নান করিয়া পবিত্রচিত্তে শ্রীরামের আরাধনা করিগে।

ভবানী মিশ্রের প্রাণ পুলকপূর্ণ—মন আনন্দে ভোরপুর। বিশ্বম্ভর ব্রহ্মহত্যা পাপের জন্য যাহাকে জীবন ত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—মাংসভূক বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ তুলসীদাস তাহাকে জীবনদান করিলেন। সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধন্য হইল। একথা রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না। অল্প সময়ের মধ্যে বায়ু-বিস্তৃতির মত চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সকলে বাক্‌সিদ্ধ যোগীবর তুলসীদাসের ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

স্মার্ত্তবাগীশ বিশ্বম্ভরের জারিজুরী সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল. সমাজে তাহার প্রতিপত্তি ক্রমশ কম হইতে লাগিল। তিনি যে এখন আর ভাল ব্যবস্থা দিতে পারেন না—অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট তাঁহার ব্যবস্থা যে অগ্রাহ্য হয়—তাহা সকলেই জানিতে পারিল। এইজন্য তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ব্যবস্থাপ্রার্থী লোকের সংখ্যাও দিন দিন কম হইয়া আয়ের পথে কাঁটা পড়িতে লাগিল। তৈল বটাদির প্রাপ্য গণ্ডা অত্যন্ত অল্প হওয়ায় ছাত্রগণের ভরণপোষণের অর্থাভাব হইতে লাগিল। বিশ্বম্ভর হাড়ে হাড়ে চটিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

তুলসীদাস সন্ন্যাসী—অর্থের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। অধিকাংশ ছাত্র ঘরের খাইয়া তাঁহার নিকট পড়িতে আসে, অনেক বড় বড় পণ্ডিতও শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম অনুভব করিতে, বেদ বেদান্তের সূক্ষ্ম বিষয় সকল

সরলভাবে বুঝিতে, তুলসীদাসের শরণাপন্ন হন। বিশ্বম্ভরের নিকট আর কেহ গমন করেন না, গমন করিলেও তিনি ভক্তবীর সাধকাগ্রগণ্য তুলসীদাসের মত এ সকল গভীর বিষয় সহজে লোকের বোধগম্য করিতে পারেন না। শুধু পাণ্ডিত্যের ভগবৎ বিষয়ের সার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে পারা যায় না। তিনি যাহাকে বুঝাইবার শক্তি দিয়াছেন—সেই বুঝাইতে পারে, তাহার কথা শুনিয়া লোকের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়, অন্যের সে ক্ষমতা কোথায়? অহংকারী পণ্ডিতের সে ভাব মনোমধ্যে উদিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু তুলসীদাস আপনাকে তৃণ হইতেও লঘু মনে করিতেন। বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়া কাহার নিকট অহংঙ্কারের ভাব দেখাইতেন না। তিনি সদাই নম্র প্রকৃতি লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন অখ্যাতি খ্যাতির ধার তিনি ধরিতেন না। যে ভগবানকে যথার্থ জানিয়াছে, হৃদয়-রাজ্য সেই রাজ্যেশ্বরের জন্য বিস্তার করিয়া দাসানুদাস রূপে আত্মসমর্পন করিয়াছে—সামান্য দম্ভ-তেজ-অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুগণ কি তাহাকে আয়ত্ত করিয়া মনুষ্যত্ব নাশের পথে লইয়া যাইতে পারে? সাধকের নিকট রিপুগণের প্রভুত্ব খাটে না।

ভবানী মিশ্র আজ আনন্দিত চিত্তে গুরুদেবের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া ভগবানের আরাধনায় যোগদান করিল। সমস্ত দিন একাগ্রচিত্তে রামসীতার পুজা-ভোগ প্রদান করিয়া সায়ংকালে দুইজনে একত্র আহার করত আপনহারা হইয়া ভজন, গান করিতে লাগিলেন। ভবানী আজ হইতে তুলসীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কাহার ছায়ারমত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল। সেও সংসার ত্যাগ করিল, শাস্ত্রপাঠে তার প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই বেশ নিবদ্ধ ছিল,

এখন হইতে সে তুলসীদাসের নিকট নানাপ্রকার শাস্ত্র বিষয় আয়ত্ত করিতে লাগিল, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি যোগাঙ্গ সকলও ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে লাগিল। কুস্তি খেলার নেশা সে একবারে ছাড়িয়া দিল, তাহার নাম করিলে সে এখন শিহরিয়া উঠে, সে জন্য কেহ ডাকিতে আসিলে, সে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নিমন্ত্রণ রহিত

হিংসায় মানুষকে পশুত্ব প্রদান করিয়া থাকে। হিংসার বশে মানুষ করিতে পারে না—এমন কাজ নাই। একজন বড় হইতেছে, জীবনের পথ মুক্ত করিতেছে, লোক সমাজে প্রতিপত্তিশালী হইতেছে দেখিলে—পাছে আমাপেক্ষা সে বড় হয়—এই হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া যাহাতে সে আর বাড়িতে না পারে, উঠিবার মুখেই তাহার পতন হয়—এরূপভাবে আঘাত করাই হিংসুকের কার্য্য।

বিশ্বম্ভর তুলসীদাসের পশ্চাতে লাগিয়া আছেন। যাহাতে তিনি আর উঠিতে না পারেন—লোকে তাহাকে মান্যগণ্য না করে—তাহার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস বৈষ্ণবের নিন্দাকারী, তাহার বয়স অতি অল্প, কিছু জানে না, ইত্যাদি প্রকারে তাঁহার নিন্দা রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সমাজে যাহাতে তুলসীদাস বাবাজী স্থান না পান, হেয় হইয়া থাকেন—তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিবার ত্রুটী করিলেন না।

তুলসীদাস বৈষ্ণবের নিন্দাকারী—সে সময়কার লোক এ কথা

শুনিলে নিশ্চয়ই তুলসীদাসকে ঘৃণা করিবে, কারণ তখন দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী; বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ক্ষমতাও তখন অতুলনীয়, কাজেই একথা প্রচার করিলে তুলসীদাস সকলের নিকটই নিন্দনীয় হইবে—সমাজে অপদস্থ হইতেও বাকী থাকিবে না—সহজে কেহ আর তাহার নিকট যাইবে না বা তাহার কথা শুনিবে না—এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সশিষ্য বিশ্বম্ভর চারিদিকে তাহার গ্লানি আরম্ভ করিলেন।

ভক্তমাল রচয়িতা পরম বৈষ্ণব নাভাজীর তিরোভাব উপলক্ষে সেই সময়ে পুষ্করতীর্থে এক মহা ভাণ্ডারার আয়োজন হয়। দেশ বিদেশ হইতে অনেক সাধু সন্ন্যাসী এই শোক-সভায় উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি নাভাজীর ভাণ্ডারা-উৎসব সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বিশ্বম্ভরের সহপাঠি বন্ধু; তুলসীদাস তখনকার দিনে কাশীর একজন প্রসিদ্ধ সাধু—যোগ-তপস্যায় সমুন্নত হইলেও শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় বন্ধু বিশ্বম্ভরের কথা শুনিয়া, তাহাকে সে সভায় নিমন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলেন। বৈষ্ণবের শোক-সভায় বৈষ্ণবদ্বেষী তুলসীদাসের নিমন্ত্রণ কখনও সম্ভবপর নহে।

তুলসীদাস সন্ন্যাসী হইলেও যজ্ঞোপবীত ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এতাবৎকাল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন—অন্যান্য সাধুর মত তিনি তাহা ফেলিয়া দেন নাই এবং আচার-ব্যবহারে কোনপ্রকার ব্যভিচারও করেন নাই। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেই যে যথায় তথায়, যাহার তাহার হাতে খাইতে হইবে—ইহা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল—তিনি কখনও এরূপ অনাচার করিতেন না—নিজের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেন।

যখন তিনি বৈষ্ণবদ্বেষী এবং এখনও ব্রাহ্মণোচিত আচার-বিচারে অভ্যস্ত, তখন তিনি এই সকল অজ্ঞাত কুলশীল বৈষ্ণবদিগের সহিত পংক্তি ভোজন করিবেন কি না এই সন্দেহেও তুলসীদাস গোস্বামীর নাম সে নিমন্ত্রণ-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। বৈষ্ণবদ্বেষী তুলসীদাস গোস্বামীর নাম বৈষ্ণব তালিকা ভুক্ত হইতে দেওয়া কাহার অভিপ্রেত হইল না এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বন্ধুর আদেশে তুলসীদাসের নিমন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলেন। তুলসীর কর্ণে একথা পৌঁছিতে বাকী রহিল না।

শ্রাদ্ধের নির্দ্দিষ্ট দিনে ভারতের দেশ দেশান্তর হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসী সেই সভায় আসিয়া যোগদান করিলেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীনিবাস সকলকেই সাদর সম্ভাষণ করিয়া সভায় আসন প্রদান করিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে নাভাজীর শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নাভাজী দেশের অনেক মঙ্গল কার্য্যও করিয়াছিলেন—জনে জনে তাঁহার সেই সকল মহৎ-কীর্ত্তি-গাথা বিবৃত করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এই সকল শোকাবহ কার্য্য সমাধা হইবার পর মঠের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সাধু বৈষ্ণবগণের আহারের স্থান হইল। বৃদ্ধ বিশ্বম্ভর কোন কার্য্যগতিকে আজ এ সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তিনি কায়মনে কার্য্যের সুসম্পন্নতা প্রার্থনা করিয়া বন্ধুবর শ্রীনিবাসকে পত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সাধুগণ পংক্তি ভোজনে বসিলেন। প্রথমে পাতা, লবণ, জল—

পাত্র দেওয়া হইল, তারপর মোটা মোটা ঘৃতভর্জ্জিত আটার রুটী ও অড়হর ডাল পরিবেশন করা হইল। সাধুগণ ইষ্টদেব লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে ভোজ উৎসর্গ করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুই তিনজন পরিবেশনকারী প্রতি পুংক্তিতে ডাল ও রুটী লইয়া ঘুরিতে লাগিল।

সাধুদিগের ভোজন আরম্ভ হইয়াছে—এমন সময় পরদেশী দুই জন অনিমন্ত্রিত সাধু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে একজন প্রৌঢ় আর একজন যুবা। অনিমন্ত্রিত এবং অপরিচিত বলিয়া কেহই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল না। আগন্তুক সাধুদ্বয় স্থানাভাবে যেখানে মহাত্মাগণের পাদুকা রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহারা তাহারই একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাদের সাধু জনোচিত বেশভূষার কোন প্রকার পরিপাঠ্য ছিল না—যাহাতে তাঁহারা সকলের চিত্তা-কর্ষণ করিতে পারেন। সন্ন্যাসী বেশধারী সামান্য নাগাভিক্ষুক মনে করিয়া কেহই আর সেদিকে দৃষ্টিপাত করিল না।

রুটী পরিবেশনকারী যখন পুংক্তির প্রান্তভাগে আগন্তুক প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর কাছে আসিল, তখন তিনি হাত পাতিয়া দুইজনের জন্য রুটী চাহিলেন। আয়োজনের অপ্রতুলতা নাই—কাজেই চাহিবা-মাত্র পরিবেশনকারী তাঁহাদের দুইজনকে দুইখানি করিয়া চারিখানি রুটী দিল। সেরূপ রুটী দুইখানি খাইলেই একপ্রকার উদরপূর্ণ হয়। পরিবেশন কর্ত্তা কোন আপত্তি না করিয়া ইহাদের রুটী প্রদান করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। তারপর একজন ডাল পরিবেশন করিতে করিতে সেইদিকে আসিলে, প্রৌঢ় সাধু ডাল প্রার্থনা করিল। পরিবেশনকারী তাহাকে অতি অন্ত্যজ ছোট লোক মনে করিয়া মুখবিকৃত করত বলিল—কোনও পাত্র আন নাই ত ডাল লইবে কিসে?

ইহার পূর্ব্বে সেই পুংক্তিতে একজন রামাৎ বৈষ্ণব সাধু আহারে বসিয়া প্রতি উদ্গারের সময় "রামনাম" অজ্ঞাতসারে উচ্চারণ করিয়া ভোজন করিতেছিলেন—তাঁহার পাদুকাও সেই-স্থানে রক্ষিত ছিল। আগন্তুক সাধুদ্বয় সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরিবেশনকারী পাত্র চাহিবামাত্র প্রৌঢ় সাধু ভূপৃষ্ঠ হইতে সেই পাদুকার একখানি তুলিয়া লইয়া তাহাতেই ডাল দিতে বলিলেন।

ডাল পরিবেশনকারী প্রৌঢ় সাধুর এই ম্লেচ্ছোচিত ব্যবহারে বড়ই বিস্মিত হইয়া পড়িল। তাঁহার গলদেশে লম্বমান যজ্ঞোপবীত, হাতে তুলসীর মালা এবং কপালে চন্দনের তিলক এবং স্কন্ধে ঝুলি দেখিয়া তাহাকে কোন দরিদ্র বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার ম্লেচ্ছোচিত ব্যবহার দেখিয়া অতীব ঘৃণার সহিত বলিল—ছিঃ তুমি একি করিতেছ, এত সাধু মহাত্মার সম্মুখে তুমি নিতান্ত হীনজাতির ন্যায় অস্পৃশ্য জুতার উপর আহারের জন্য ডাল চাহিতেছ, তোমার কি মানুষের চামড়া গায়ে নাই?

তখন সেই দিব্যকান্তি প্রৌঢ় সন্ন্যাসী—গুরুগম্ভীর অথচ মধুরস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

তুলসী যাকে মুখনতে কি ধোখো আয়ত রাম।
তাকে পদ্‌কী পানহী, কে মেরে তন্‌কা চাম॥

আগন্তুক তখন ভক্তি গদগদচিত্তে, প্রেমাশ্রু প্লুতনেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চকণ্ঠে বলিল—যাঁহার মুখ হইতে আহারের সময় অজ্ঞাত-সারে রামনাম বাহির হয়, তাঁহার জুতার চামড়াকে তুলসীদাস নিজের গায়ের চামড়ার অপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া মনে করে, অতএব ইহাতে খাইতে দোষ কি?

সাধুর অপূর্ব্ব রাম ভক্তিপূর্ণ তেজস্বী কথা শুনিয়া সকলের চৈতন্য হইল। তখন সকলের দৃষ্টি সেই দুইজন সাধুর উপর পতিত হইল—প্রৌঢ় সাধুর সেই সুধা বিজড়িত বচন, তাঁহার সেই কমনীয় জ্যোতিপূর্ণ বদনকান্তি এবং বৈষ্ণবোচিত নম্রস্বভাব দেখিয়া, সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই তখন বুঝিতে পারিলেন—এই শান্তোজ্জ্বল পবিত্রমূর্ত্তি সাধকোত্তম তুলসীদাস ভিন্ন আর কাহারও নহে, এত নম্রতা সাধক তুলসীদাস ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না!

তুলসীদাস স্বীয় উদারতা গুণে তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য ভবানী মিশ্রের সহিত বিনা আহ্বানে সুদূর কাশীধাম হইতে পুষ্করের এই সাধু সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আসিয়াছেন; বৈষ্ণব যে তাঁহার নিকট কত আদরের, কত সম্মানের তাহা বৈষ্ণবের পাদুকায় ডাল ভোজনের বিষয় লইয়া দেখাইয়া দিলেন। নাভাজীর পুণ্যবলে তাঁহার শোকসভা আজ তুলসীদাসের পদার্পণে সার্থক হইল দেখিয়া তখন চারিদিক হইতে সহস্র ভক্তিপুত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"জয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রকি জয়"। তুলসীদাস ও ভবানী মিশ্র সেই পবিত্র সাধু-সম্মিলনীর পবিত্র ধূলিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিলেন—"জয় সীতাপতি বিশ্বপতি কি জয়"। মঠাধ্যক্ষ তখন নিজের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া, তৃণাদপি সুনীচ এমন বৈষ্ণব চূড়ামণির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বিশ্বম্ভরকে নানাবিধ ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস কাহার নিন্দাশ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর অপবিত্র করিতে চাহেন না। তিনি বলিলেন—আমি ও সমস্ত কথা শুনিতে চাহি না। তবে আমি বৈষ্ণবদ্বেষী এ ভুল ধারণা, যেন আপনাদের মনে কখনও স্থান না পায়—আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস। পরম পবিত্র বিষ্ণুভক্তি

লাভ করিয়া বৈষ্ণব হওয়া মানুষের বহু জন্মে সুকৃতির ফল, সাতিশয় ভাগ্যবান না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়কে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি, জীবনেও আমি তাঁহাদের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করি নাই। তবে অযোধ্যার রামভক্ত বৈষ্ণব গণকে আমি এক সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলাম; ব্রাহ্মণ না হইলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিবে না—ব্রাহ্মণ মাত্রেই ইহার অধিকারী হইবে। এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় জাত হারা-ইয়া লোকে বৈষ্ণব হয়, যাহাদের জাতি-কুল কিছুই নাই—ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না, কেবল পেটের দায়ে এবং বৈষ্ণবী কাড়িবার জন্য বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়—আমি একদিন অযোধ্যায় এই সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়াছিলাম। যাহাদের ভিতর অন্তসারশূন্য, ভক্তির লেশমাত্র নাই—তাহারা আবার ভক্ত কিসের? আমি আপনাদের নিন্দা করি নাই এবং মহাত্মাদের নিন্দা করিবার শক্তি আমার কোথায়? প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য যে নিজেই প্রেমের ঠাকুর, তাঁহার সম্প্রদায় কি নিন্দনীয় হইতে পারে? তবে যাহারা তাঁহার নামে ব্যভিচার করে আমি তাহাদের নিন্দাই করিয়াছিলাম।

ভক্তবীর তুলসীদাসের সেই সরলতামাখা পবিত্র হৃদয়-ভাব, দেখিয়া শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গলিয়া গেলেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত রামাৎ বৈষ্ণবগণকে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিলেন। সাধক চূড়ামণি তুলসীদাস তাঁহাদের সকলের নিকট যুবক ভবানী মিশ্রের পরিচয় প্রদান করিয়া, অকস্মাৎ তাহার রামনামে রতিমতির বিষয় বিবৃত করিয়া সকলের নিকট বিদায় হইলেন। সাধু সম্প্রদায় তাঁহার নকট অশেষপ্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অভিবাদন করিলেন।

মঠাধ্যক্ষ বয়সে বড়—তাই যাইবার সময় তুলসীদাসকে অশেষবিধ আদর-আপ্যায়ন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আজ নাভাজীর ভাণ্ডারা মহোৎসব যথার্থ বৈষ্ণব-প্রীতি-ভোজে সুসম্পন্ন হইয়া মঠের পবিত্রতা বর্দ্ধিত করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপন্নের সহায়

"যার কাজ তারে সাজে, অন্যকে লাঠী বাজে"। কথাটী পাবে পাবে সত্য। এই যে একটী লোক গোঁসাইগঞ্জ ও মৃজাপুরের উপকণ্ঠে মাঠের ধারে রাস্তার উপর পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে—বোধ হয়, কাল রাত্রে উহাকে ডাকাতে ঘাল করিয়া এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে—তাই লোকটী রক্তাক্ত দেহে রাস্তার পাশে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে; কিন্তু কই, এত লোক ত এই পথ দিয়া যাইতেছে, ভোর হতে এত লোক ত এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে কিন্তু কই, কেহইত উহার কষ্টে কষ্ট অনুভব করিয়া একবার জিজ্ঞাসাও করিল না—হাঁগা তোমার কি হয়েছে? পাছে বিপন্নকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজকে বিপন্ন হতে হয়—পাছে একটু গতর খাটিয়ে সেবা করতে হয় বা দুই একদিন খেতে দিতে হয়। পোড়াকালেরই স্বধর্ম্মরে—ঘোর কলি উপস্থিত কিনা, তাই বিপন্নের বিপদুদ্ধার করা, এখন ধর্ম্ম-কর্ম্মের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে—ভুলেও আর কেহ একার্য্য করে না, এমন পরদুঃখ কাতর লোকও আর নাই।

সত্যই কি তাই—দয়াময়ের এই দয়ার বিশ্ব কি একেবারে

দয়াশূন্য হইয়াছে, বাস্তবিকই কি এখন আর দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের সহায়, অনাথের নাথ কেহ নাই? না না তাহা কি হয়? যতদিন এ বিশ্ব থাকিবে—যতদিন তাহাতে মানব সমাগম থাকিবে—ততদিন এ জগৎ হইতে মানবের মহৎগুণ দয়াধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন হইবে না। দয়াইত জীবজগতের মহত্ব—এ মহত্ব যে দিন পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে—একটী প্রাণীও যে দিন এ গুণের পক্ষপাতী থাকিবে না—সেদিন ত ইহা রাক্ষসের রাজত্ব হইবে—মনুষ্য নাম সেদিন হইতে ত জগত হইতে লোপ হইয়া যাইবে? এখনও সে দিন আসে নাই—আসিবে বলিয়া ত বোধ হয় না; দয়াময়ের রাজত্ব কখনই দয়াশূন্য হইবে না। ঐ দেখ পাঠক! একজন পরম দয়ালু ব্যক্তি প্রাতঃকালে যানারোহণে যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বে ঐ বিপন্নকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং নিকটে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—কোন দস্যু কর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যুবক রক্তস্রাবে অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে। এখনও জীবন আছে—শুশ্রূষা করিলে বোধ হয় জীবিত হইতে পারে। তিনি ডাকিলেন—"রামাচরণ জল্‌দি পাণি লে যাও।" গাড়ীর সহিস ও কোচম্যান তাড়াতাড়ি আসিয়া বাবুর আজ্ঞা পালন করিল—তাড়াতাড়ি জল আনিতে ছুটিল। ইত্যবসরে বাবুটী পথিপার্শ্বে বনের মধ্যে গমন করিয়া কতগুলি লতার পাতা আনিয়া হস্তে মর্দ্দন করিয়া তাহার রস ক্ষতস্থানে দিতে লাগিলেন, তাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া গেল। তার পর ভৃত্য দুইজন বাল্‌তি করিয়া জল আনিলে বাবু নিজের স্কন্ধ হইতে মূল্যবান রেশমের চাদরখানি ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া রোগীর ক্ষতস্থান ভৃত্যদ্বয়ের সাহায্যে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে যুবক এতক্ষণ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন;

এইবার প্রাণে একটু শান্তি পাইয়া যুবক চক্ষু মেলিয়া চাহিল, মুখ ব্যাদন করিয়া পিপাসা জানাইলে দয়ালু ব্যক্তিটী তাহার বদনে সামান্য জল প্রদান করিলেন—তারপর ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া বিপন্ন যুবককে নিজের বাটী লইয়া গেলেন। কে বলে ঈশ্বরের রাজ্য এ কলিতে দয়া-মায়া-হীন হইয়াছে; কে বলে এ জগতে আর দয়ালু ব্যক্তি নাই? "তবে যার কাজ, তাকে সাজে, অন্যকে লাঠী বাজে"। যার হৃদয় আছে; প্রশস্ত হৃদয় লইয়া যে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজত্বে পরকে আপনার করিয়া মহত্ব বিস্তার করিতে আসিয়াছে—তাহার নজরে পড়িলে কি কাহার বিপদ থাকে?

বাবুটী যুবককে গাড়ীতে তুলিয়া কোচ্‌ম্যানকে দ্রুত গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন এবং অতি সত্বর গৃহে আসিয়া তাহাকে পুনরায় ধরাধরি করিয়া নিজের সুসজ্জিত বৈঠকখানার মধ্যে পরিচ্ছন্ন গদীর উপর শুয়াইয়া ডাকিলেন—মা সরস্বতি! শীঘ্র খানিকটা দুগ্ধ গরম করিয়া লইয়া এসো ত?

"যাই বাবা!" বলিয়া অতি রমণীয় বামাকণ্ঠে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া চকিতের মধ্যে একটী সুন্দরী বালিকা রৌপ্য পাত্রে কতকটা দুগ্ধ লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং পিতার হাতে দিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিস্মৃতনেত্রে বিপন্ন যুবকের অবস্থা দেখিতে লাগিল। কন্যা বুঝিতে পারিয়াছিল—বাবা! যখন গরম দুগ্ধ চাহিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন রোগীকে কুড়াইয়া আনিয়াছেন। এ গৃহস্থের যে এ সকল চিরাভ্যস্থ, চির-জানিত—তবে পিতার কথা বুঝিতে বাকী থাকিবে কেন?

বহুক্ষণ কোন আহারাদি হয় নাই, তাহার উপর গুরুতর আঘাতে যুবক বহুক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে;

তাই বাবুটী আস্তে আস্তে তাহার মুখে সেই গরম দুধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। রোগী তাহা পান করিয়া কতকটা সুস্থ এবং সবল হইল; মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া ইতঃস্তুতঃ দেখিতে লাগিল। সরস্বতী ততক্ষণ এ সংবাদ অন্তঃপুরে বহন করিয়া লইয়া গেল। এইবার যুবকের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে সে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল—বউদি! আর বুঝি তোমার সন্ধান করিতে পারিলাম না, কাশীতে আসিবার সময় শুনিয়াছিলাম—তুমি পাগল হইয়া বরাবর কাশীতে আসিতেছিলে, পথে ছগনলাল চৌবে নামক জনৈক মহানুভব ব্যক্তি তোমাকে আটক করিয়া চিকিৎসা করাইতেছেন। সেই কথা শুনিয়া আমি ভগবান দাস দূরের বাড়ী খুড়ীমাকে রাখিয়া এবং দাদার সন্ধান লইয়া তোমার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু রাস্তায় দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে একেবারে মরণের পথে আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয়, এ যাত্রা আর দেখা হইল না—মনের আশা মনেই রহিয়া গেল—বলিয়া যুবক কাঁদিতে লাগিল।

বাবু পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন—"যুবক এখন প্রাণে বেশী উদ্বেগ আনিও না, তাহা হইলে রক্তস্রাব আরও বেশী হইবে—জীবন আরও বিপন্ন হইবে—ভয় নাই ভগবানে বিশ্বাস কর। যুবক নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া চুপ করিয়া উপাধানে ঠেস দিয়া শুইয়া রহিল। একজন চাকরকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলিয়া তিনি নিজেই কবিরাজের বাড়ী দৌড়িলেন।

পথে যাইতে যাইতে মনে করিলেন—এ যুবকটী কে, অতি সুন্দর সুঠাম গঠন; দেখিলে খুব ভাল ঘরের ছেলে বলেই বোধ হয়—আর প্রলাপোক্তিতে যা বল্লে—তাতে ত এ পাগলী মায়ের কোন

আত্মীয় বলিয়া বোধ হয়, আমারও নাম করিল—তবে কি সে পাগ্‌লী মার সন্ধানে আসিতেছিল? ভগবান! তাই যেন হয় পাগ্‌লী মায়ের বিষণ্ণ মুখ আর দেখ্‌তে পারিনা। মা আমার কোন কথাই বলেন না, আত্ম পরিচয় কিছুই দেন না, জিজ্ঞাসা করিলে কেবল কাঁদেন—আর অনবরত ঠাকুর ঘরে পূজাহ্নিক নিয়ে ব্যস্ত থাকেন—খাওয়া-দাওয়ার প্রতি, কি এই অল্প বয়সে বেশভূষার প্রতি কিছুমাত্র নজর নাই—চাট্টি খাইতে হয়—তাই খান, একখানা পরতে হয়—তাই পরেন, কেবল বাগানে ফুল তোলা, গা ধোয়া—আর দেবমন্দিরে পূজায় রত থাকাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছে। বাড়ীর মহলে প্রায়ই আসেন না, সরস্বতী যদি ডেকে আনে—আমার স্ত্রী যদি কিছু বলেন তবেই আসেন, নতুবা কেবল চক্ষু বুজে মন্দির দুয়ারে বসে জপ আর দেবতার চরণে প্রণিপাত করেন। মরি মরি, এমন নিষ্টা কি এ অল্প বয়সে কারু দেখা যায়! পাগ্‌লি মা যেন আমার সরলতার আধার, যেন দয়ার প্রতিমূর্ত্তি· মন্দিরে ভিখারী আসিলে একটীও ফেরে না; এত দয়াময়ী না হলে কি স্ত্রীমূর্ত্তির রমণীয়তা বাড়ে? আমি তাঁর জন্য কেবল ইতস্ততঃ সন্ধান করে বেড়াচ্ছি—তার কথা বলিয়া সকলের নিকট সন্ধান নিচ্ছি—কালও তাঁর জন্য মুজাপুর গিয়েছিলাম, আসিবার সময় বিপন্ন যুবককে কুড়াইয়া পাইলাম। বোধ হয়, ভগবান এই যুবকের দ্বারাই তাঁহার একটা কিনারা করিয়া দিবেন, যুবকের প্রলাপ বচনে যেন তাহারই কতকটা আভাস পাওয়া গেল। জয় দীননাথ, সকলই তোমার করুণা; এ বিশ্বসংসারে তোমার মহত্ত্বই বলবৎ—মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র।

এই বাবুটীর পরিচয় লইতে বোধ হয়, পাঠকের আর আবশ্যক হইবে না—ইনিই আমাদের পরোপকার ব্রতপরায়ণ; বিপন্নের বন্ধু ছগনলাল চৌবে আর যে যুবককে বিপন্ন অবস্থায় তিনি গৃহে

আনিয়াছেন—তিনি আমাদের পরমধার্ম্মিক তুলসীদাসের প্রিয় বন্ধু—দুঃখীরাম। বৌদির অন্বেষণে আসিয়া যে বিপন্ন হইয়াছেন—তাহা তাঁহার প্রলাপোক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

ছগনলাল তাড়াতাড়ি কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া লইয়া যুবকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বড়বাড়ীর চিকিৎসা বৃদ্ধ, কবিরাজ প্রাণপণে করিতে লাগিলেন এবং আশা দিলেন—জীবনের কোন হানি হইবে না, তবে আঘাত গুরুতর বলিয়া কিছুদিন সময় লাগিবে। ছগনলাল বলিলেন—কবিরাজ মহাশয়! সময় লাগে—তাহাতে ক্ষতি নাই—আমি ও সেবার ক্রটী করিব না, প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হয়, তাও করিব কিন্তু আপনি যত সত্বর পারেন—উহাকে আরোগ্য করিয়া দিন।

"কোন চিন্তা নাই" বলিয়া কবিরাজ মহাশয় ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। ছগনলাল তারপর ঔষধাদি খাওয়াইয়া বেলা তিনটার সময় পূজাহ্নিক শেষ করিয়া,—আহারে বসিলেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী যশোদা আসিয়া যুবকের শিরোদেশে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। পাগ্‌লী মাকে লইয়া তাঁহারা প্রায় তিন মাস কাল অজস্র অর্থব্যয় করতঃ স্বামী-স্ত্রীতে বিনিদ্রনয়নে রজনীযাপন করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছেন, তিনি ভাল হইতে না হইতেই আবার একজন আসিল। ইহাতে তাঁহারা অসুখী না হইয়া বরং মহা সুখানুভব করিলেন—পরের সেবা করিতে পারিলে তাঁহারা যেন জীবন সার্থক্য বলিয়া জ্ঞান করেন, এইজন্য বলিতে হয়—ভগবানের এ দয়ার সংসারে কি দয়ালু ব্যক্তির অভাব হয়? যেদিন তাহা হইবে, সেদিন মর্ত্ত্য নিশ্চয়ই রসাতলে যাইবে।

দুঃখীরাম কয়েকদিন বেশ ভালছিলেন। ছগনলাল এত শীঘ্র তাহাকে

আরোগ্য হইতে দেখিয়া, প্রাণে যারপর-নাই-আনন্দ অনুভব করিতে ছিলেন কিন্তু বিগত রজনী হইতে জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, রোগী আবার সাতিশয় যাতনা অনুভব করিতেছে দেখিয়া, পরোপকার পরায়ণ ছগনের প্রাণ অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। রোগী ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্য হইতেছে, জ্বরের ধমকে প্রলাপ বকিতেছে। ছগনলাল ও যশোদা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়াও রোগীর যন্ত্রণার উপশম করিতে পারিতেছে না। তাই প্রাতঃকালেই কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন—কেন এমন হইল, ভালোর দিকে আসিয়া রোগ আবার এমন করিয়া বাঁকিয়া পড়িল কেন? রোগী বিকারের ঝোঁকে নানপ্রকার ভুল বকিতেছে। ছগন বলিতেছেন—যুবক! চিন্তা কি, বেশী কথা কহিও না—তাহা হইলে অসুক বাড়িয়া যাইবে—আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইবে কিন্তু সে কথা শুনে কে, চৈতন্যই বা কার আছে?

যুবক এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন—এইবার কিছুক্ষণ ছগনের মুখের প্রতি বিলোল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—হ্যাগা, আমি কোথা, গোঁসাইগঞ্জ এখান থেকে কতদূর; ছগনলালের বাটী কি তোমরা জান? আমার বৌদিদি যে সেখানে আছেন—আর বুঝি দেখা হইল না, হাঁগা তোমরা এত করছো, একবার তাঁকে এনে আমার সঙ্গে শেষ দেখা করিয়ে দাও না?

ছগন যুবকের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—যুবক! এত অস্থিরতা প্রকাশ কর্চ্ছো কেন, আর কিছুদিন থাক, তোমার বৌদিদিকে শীঘ্রই এখানে আনিব—তুমি একটু ভাল হও। এখন তাঁর বিষয় বেশী চিন্তা করিলে রোগ যে কিছুতেই আরাম হইবে না।

যুবক। আর আমার আরামে কাজ নাই—আপনারা যথেষ্ট করেছেন—যা মানুষে পারে না কিন্তু বোধ হয়, এ যাত্রা আমার রক্ষা নাই; আপনি আমার বউদিদিকে একবার এনে দিন, তাঁকে সমস্ত কথা বলে আমি চিরজীবনের মত বিদায় হই—ও: বড় পিপাসা!

পিপাসার কথা শুনিয়া ছগনলাল ডাকিলেন—সরস্বতী মা! একটু গরম দুধ লইয়া এসো ত? সরস্বতী এতক্ষণ দুধ গরম করিতেছিল, সে পিতার আহ্বান শুনিয়া সত্বর দুধ লইয়া আসিল। ছগন খুব সন্তর্পণে রোগীকে গরম দুধটুকু খাওইয়া দিলেন। ইত্যবসরে রামশরণের আহ্বানে কবিরাজ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছগনলাল বলিলেন—মহাশয়! এ কয়দিন রোগী বেশ ছিল—হঠাৎ কাল রাত্রি হইতে এরূপ বাড়িয়া উঠিল কেন? "আচ্ছা দেখিতেছি" বলিয়া কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—ভয়ের কোনও কারণ নাই, জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে মাত্র। অত্যন্ত মানসিক চিন্তায় জ্বরের সময় এরূপ প্রলাপ বকিয়াছে—নতুবা নাড়ীর গতি কোন প্রকার খারাপ হয় নাই। আপনি চিন্তা করিবেন না এবং উহাকে বেশী বকিতে দিবেন না।

মহাশয়! আমি কি উহাকে বকিতে দিতেছি—পীড়ার ঝোঁকে নিজেই ঐরূপ করিতেছে। পাছে কেহ বিরক্ত করে, পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হয়, এইজন্য আমি কাহাকেও উহার কাছে আসিতে দিই না—নিজেই সমস্ত কার্য্য করিতেছি।

তাহা হইলে শীঘ্রই সারিয়া যাইবে—আপনি বেশী উতলা হইবেন না। এই ঔষধটী দিলাম, দিনে ও রাত্রিতে চারিবার খাওয়াইয়া দিবেন। এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় অভয়দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

ছগন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—মা! ঔষধ খাওয়াইবার পাত্রটী লইয়া আইস, আর মধুর শিশিটী ওখানে আছে, আনিয়া দাও। কন্যা তাহাই করিল—ছগন ঔষধ মাড়িতে আরম্ভ করিলেন। গৃহে অপর কেহ নাই দেখিয়া, যশোদা আসিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁগা! কবিরাজ মহাশয় কি বলিয়া গেলেন?

ছগন। তিনি বলিলেন—কিছু ভয় নাই, জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে বলিয়া রোগী ঐরূপ আল্‌মাল্‌ করিতেছে, এই ঔষধটী খাওয়াইলেই ভাল হইবে।

"আহা! ভগবান যেন তাই করেন, আর যেন বাছাকে কষ্ট না দেন!" বলিয়া যশোদা রোগীর শিরোদেশে বসিয়া জননীর ন্যায় পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। সরস্বতী ঠাকুর-বাড়ীতে পাগ্‌লী মার উদ্দেশে চলিয়া গেল। সরস্বতী পাগ্‌লী মার কাছে থাকিতেই ভালবাসে, তাহার উপদেশপূর্ণ ধর্ম্মকথা শুনিলে তাহার প্রাণ গলিয়া যায়। এই যুবকের কথা পাগ্‌লী মাও শুনিয়াছিলেন। এ বাটীর পরোপকার ব্রতের কথা, আর্ত্তের সেবা-শুশ্রূষার কথা পাগ্‌লী মার জানিতে বাকি ছিল না। একজন অপরিচিত যুবকের জন্য ছগনের এরূপ ত্যাগ স্বীকারে তিনি বিশেষ কিছু বিস্মিত হন নাই—তবে কাল্‌কের বাড়াবাড়ীর সংবাদে একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন—তাই সরস্বতী তাঁকে রোগীর ভাল সংবাদ দিতে দৌড়িয়া গেল।

যশোদা স্বামীকে বলিলেন—দেখ, যুবক নিশ্চয়ই কোন ভাল বংশের ছেলে—আকার প্রকারে যেন সেই রকমই বোধ হয়।

ছগল চুপে চুপে বলিলেন—ভাল আর কোন্ ঘরের, পাগ্‌লী মার কোন আত্মীয় হবে—দুই একদিনের প্রলাপবাক্যে তাহা আমি

শুনেছি; পাগ্‌লীকে খুঁজিবার জন্যই বাহির হইয়া যুবক এমন বিপন্ন হয়েছে।

যশোদা। সত্য নাকি, তাহলে ত কোন কথাই নাই—ভগবান বিনায়াসেই আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াছেন।

ছগন। দেখ, এখন এত আশা করো না, আগে ভালই হউক তারপর অন্য কথা।

যশোদা। তোমার এত প্রাণান্তিক পরিশ্রম কি তিনি বিফল করিবেন! যুবক নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

ছগন। উহার আর কেহই নাই—তাহাও প্রকাশ করিয়াছে। তাহা হইলে আমাদের মনের আশা "গৃহ-জামাতা" রাখা, তাহাতেও বোধ হয় কোন ব্যঘাত হইবে না। পাগ্‌লী মার কাছে এখনও ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি নাই বা দেখা করাই নাই, পাছে অতিরিক্ত উৎসাহে আবার রোগ বাড়িয়া যায়। এইবার আস্তে আস্তে একটু একটু করিয়া আশার কথা বলিব। তুমি এখন ক্ষতস্থানে দিবার জন্য প্রলেপটী তৈয়ারী করে আন।

স্বামীর অনুমতি পাইয়া যশোদা প্রলেপ প্রস্তুত করিতে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এত দাসদাসী থাকিতে এ সকল কার্য্য তাঁহারা স্বহস্তেই করেন, অপরকে দিয়া বিশ্বাস হয় না—পাছে কেহ হিতে বিপরীত করিয়া ফেলে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অলৌকিক কাণ্ড

আজ সূর্য্যগ্রহণ। কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে, কেদার ঘাটে ও দশাশ্বমেধ ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। এই গ্রহণোপলক্ষে বহু দূরদেশ হইতেও যাত্রিগণ মুক্তিস্নান করিবে বলিয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বেলা এক প্রহরের পর ঈশানকোণে গ্রহণ লাগিয়া সর্ব্বগ্রাস হইবে—সূর্য্যে এরূপ গ্রহণ বহুদিন লাগে নাই। তাই সাধু সন্ন্যাসী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই আসিয়া আজ পবিত্র ভাগীরথী তীরে, অসি-বরুণরের মধ্যে প্রত্যেক ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে। আর এক একবারে "ব্যোম বাবা বিশ্বনাথ" "জয় মা অন্নপূর্ণা" বলিয়া প্রাণের ডাকে কাশীর গগন-পবন মুখরিত করিতেছে।

কেহবা গঙ্গার পবিত্র গর্ভে বসিয়া পুরঃশ্চরণ করিতেছে, কেহ সঙ্কল্প করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপে মনোনিবেশ করিয়াছে। কোথাও গীতা পাঠ, কোথাও চণ্ডীপাঠ হইতেছে—অসংখ্য লোক তথায় সমবেত হইয়া সেই পবিত্র পুরাণ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে! হিন্দুধর্ম্মের এই একতান সাধনা দেখিয়া অন্যজাতীয় জনগণ মুগ্ধ হইতেছে, তাহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা, তন্ময়তা দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছে, মনে মনে হিন্দুধর্ম্মের, গম্ভীরতার গম্ভীর ভাব. উপলব্ধি করিতে গিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মের কাছে থাকিলে, ধার্ম্মিকের সঙ্গ করিলে প্রাণে

যে একটা শান্তি আসে—তাহা কেবল হিন্দুই জানে। এইজন্য তাহারা সামান্য একটী ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আজ সাধুজন সেবিত পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে আগমন করিয়া ধন্য হইতেছে, ধর্ম্মের এমন বাঁধাবাঁধি ভাব আর কোন সম্প্রদায়ে নাই—তাই ইহারা সামান্য একটী পার্ব্বণও বাদ দেয় না। এখন না হউক, পূর্ব্বে হিন্দুর নিকট ধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই বাদ পড়িত না।

টোলের পণ্ডিত ও ছাত্রগণ আজ দলেদলে আসিয়া গঙ্গাতীরে সমবেত হইতেছে। যাহারা একটু বয়স্থ হইয়াছে—যাহাদের আয়ুসূর্য্য একটু ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহারা এই সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছে—পতিতপাবনীর পবিত্র-নীরে অবগাহন করিয়া জীবনের পথ মুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে, আর যাহাদের বয়স অল্প, রক্ত এখন তরল হয় নাই, তাহারা কেহ ধর্ম্ম করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ কেহ বা শাণ্ডিল্যসূত্রের মীমাংসা গুরুদেব কেমন পরিপাটী রূপে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতেছে। মোটের উপর যে যেখানে যে বিষয়েই কথাবার্ত্তা বা গল্প করিতেছে, ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ভাব তাহাদের মনোমধ্যে স্থান পায় নাই—স্নানমাহাত্ম্য এমনি সংক্রামক!

এই সময়ে কাশীর কেদার ঘাটে বসিয়া বিশ্বম্ভরের দুইটী ছাত্র কি বলাবলি করিতেছে—পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। প্রথম ছাত্র বলিল—তুমি ভাই! যাই মনে কর, আর গুরুদেব যাই বলুন; তুলসীদাস গোস্বামী যে একটা মহাপুরুষ, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু নাই!

দ্বিতীয় ছাত্র। কেনহে ভায়া, তুমি এইবার আমাদের ছেড়ে ভবানী মিশ্রের মত তাঁর টোলে ভর্ত্তি হবে নাকি?

১ম ছাত্র। না তা নয়—তবে গুণের আদর ত কর্ত্তে হবে? তুলসীদাস যে সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাচ্ছেন; তা কখনও সাধারণ মানুষে দেখাতে পারে না, ভিতরে একটু ঈশ্বরতত্ত্ব না ঢুকলে, কাহারও ঐরূপ করবার সাধ্য নাই।

২য় ছাত্র। কি আশ্চর্য্য অলৌকিক কাণ্ড দেখ্‌লে ভায়া!

১ম ছাত্র। কেন, তুমি কি কিছু শোন নাই, সে সকল কথাত দেশময় রাষ্ট্র হয়েছে?

২য় ছাত্র। কথাত অনেক রটে, তবে তুমি কি স্বচক্ষে দেখেছো, না কারুর মারফতে শুনেছ? আমার কিন্তু ঐ সকল আজগুবী কথায় বিশ্বাস হয় না!

১ম ছাত্র। ভাই, যা রটে—তার কতকটাও বটে, একেবারে অবিশ্বাস করা কি উচিত; কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাচ্ছেন—তা তুমি কি জান?

২য় ছাত্র। কিরকম একবার বলই না হে, তোমার মুখে শুনি?

১ম ছাত্র। দেখ, সেদিন একটা কুঁজোকে ধরতে হলো না, গায়ে হাত দেবামাত্রই, তার কুঁজটা চচ্চড় করে বসে গেলো—সে সোজা হয়ে চল্‌তে লাগলো; লোকগুলো দেখেই ত অবাক্, কারুর মুখে আর কোনও কথা সরলোনা, এ আমার নিজের চক্ষে দেখা, কারুর বরাতি নয়।

২য় ছাত্র। একি কখন সম্ভব, তুমি দেখ্‌ছি—তুলসীদাসের গোঁড়া হয়ে পড়লে?

১ম ছাত্র। ভায়া সাধনার কাছে অসম্ভব কি, সাধকের সাধন বলের ক্ষমতা যে অসীম!

২য় ছাত্র। তাত জানি কিন্তু সে এরূপ সাধনা কল্লে কবে,

সেই ঘণ্টাকর্ণ যোগীর কাছে বৎসর কয়েক ছিল—তাতেই এত ?

১ম ছাত্র। সেখানে তিনি ঐ কয়বৎসর, প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যোগশিক্ষা করেছেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সকল ঋতুতে তিনি যাহা যাহা কর্ত্তে হয়—যোগীবরের কাছে সে সব শিখেছেন, ঘণ্টাকর্ণ যোগী যোগশক্তি বিষয়ে তুলসীদাসকে নিজের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আর এখনত বাবাজীর ঐ কাজ হয়েছে—যেখানে যেখানে ভাল লোকের সন্ধান পাচ্ছেন—অমনি ছুটে গিয়ে, তাঁর কাছে শিখে আস্‌ছেন, ছেলে পড়ান এখন ত একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছেন। সময় পেলে যা দুই এক ঘণ্টা পড়ান, তাহাতেই ছেলেদের শিক্ষা এত হয় যে অন্য টোলে পাঁচবৎসর খাট্‌লেও তা হয়না।

২য় ছাত্র। তুমি একান্তই দেখ্‌ছি আমাদের সঙ্গত্যাগ করলে, যেরূপ গোঁড়ামী দেখ্‌ছি, তাতে বিশ্বম্ভরের শিষ্যত্ব আর বেশী দিন নয়!

১ম ছাত্র। তুমি যদি তাই মনে কর—তাতে আর ক্ষতি কি ? তবে আমার কথায় যদি বিশ্বাস না কর—তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আজ নিশ্চয়ই গ্রহণোপলক্ষে তিনি গঙ্গাস্নান কর্ত্তে বেরুবেন, তাহলেই একবার বুঝতে পারবে, তার বাহাদুরীটা কি এবং কত লোক তাঁর পাছু নিয়েছে, ফল না পেলে কি সহজে কেউ কারু শরণাপন্ন হয় ?

ছাত্রদ্বয় এইরূপ কথা কাটাকাটী করিতেছে, এমন সময় একটী বৃদ্ধ একটী অন্ধ বালকের হাত ধরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাবা! তোমরা তুলসীদাস বাবাজীকে কি এই পথে আস্‌তে দেখেছো ?

২য় ছাত্র। কেন, তোমার তাঁকে কি দরকার ?

বাবা তিনি নাকি সাক্ষাৎ দেবতার মত যাকে যা বলছেন—তাই হচ্ছে; তাই বাবা! আমার এই একমাত্র পুত্রকে তাঁর কাছে এনেছি, যদি কিছু কিনারা হয়, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, বলিয়া বৃদ্ধ পথশ্রান্তি হেতু সেইস্থানে বসিয়া পড়িল।

১ম ছাত্র। তোমাকে বেশীদূর যাইতে হইবে না; তিনি এই পথ দিয়াই গঙ্গাস্নানে যাবেন—তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। বৃদ্ধ ছাত্রদ্বয়ের কথামত অন্ধ পুত্রকে লইয়া আশার আশ্বাসে সেইস্থানেই বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে যখন আকাশে সূর্য্যগ্রহণ লাগিবার উপক্রম হইয়াছে, লোক সকল স্তম্ভিত হইয়া আকাশে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আছে, ঠিক সেই সময়ে অসিনদীর দিক হইতে বিপুল জনসংঙ্ঘের মধ্য হইতে "জয় সীতা রামজী কি জয়" শব্দে উচ্চরোল উত্থিত হইল। সকলেই তুলসীদাসের আগমন হইতেছে, ভাবিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল। ছাত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথম ছাত্রত পূর্ব্ব হইতে তুলসীদাসের নামে গলিয়া গিয়াছিল, সে সোৎসুক নেত্রে করযোড়ে দাঁড়াইয়া উঠিল, দ্বিতীয় ছাত্রও দায়ে পড়িয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—ব্যাপার কি? বড় বড় রাজা রাজড়ার সমাগম হইলেও ত লোকে এরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না, তবে এ ব্যাপার কি?

দেখিতে দেখিতে বিপুল জনবাহিনী "জয় জয় রাম রবে" গান করিতে করিতে সেইদিকেই আসিল। সেই বিপুল জনস্রোতের মাঝখানে ঠিক পাগলের মত প্রেমোন্মত্ত সাধকবীর তুলসীদাস, তাঁহার পাশে সেই অনুরক্ত ভক্ত "ভবানী মিশ্র"। যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই "শ্রীরামচন্দ্রের জয়" রবে চারিদিক প্লাবিত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ বসিয়াছিল, অন্ধপুত্রকে লইয়া সে আশান্বিত হইয়া আসিয়াছে;

আজ তুলসীদাসের কৃপায় তাহার পুত্রটীকে চক্ষুষ্মান করিয়া লইবে। সে তুলসীদাসকে দেখিবামাত্র পুত্রের সহিত তাঁহার চরণে গড়াইয়া পড়িয়া বলিল—"সাধুবাবা! ছেলেটি আমার বুড়ো বয়সের ধন, আর কেউ নাই বাবা! দয়া কর বাবা! নইলে চরণ ছাড়বো না" বলিয়া পা জড়াইয়া পড়িল। দুঃস্থ শোকার্ত্ত জীবের উপকার করাই এখন তুলসীদাসের জীবনের মহাব্রত হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইলেন এবং তাহার পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—বৎস! অন্ধ তুমি; চক্ষুষ্মান হইবার সাধ, আচ্ছা! রাম কৃপা-বলে দৃষ্টিশক্তি হউক তোমার"।

বাকসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে এইকথা উচ্চারিত হইবামাত্র, অন্ধ বালক দৃষ্টিশক্তি পাইল; "বাবা! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, বলিয়া তাহার পিতা তুলসীদাসের পদবন্দনা করিতে লাগিল, বালকটিও সাধুর পায়ে মাথা রাখিয়া আনন্দাশ্রু সিক্ত করিতে লাগিল। বৃদ্ধ অপরিসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল—বাবা, আজ হতে আমরা পিতা-পুত্রে তোমার দাস হলাম।

তুলসীদাস বলিলেন—বৃদ্ধ! তুমি আমার পিতৃস্থানীয়—ওরূপ কথা বলো না। তোমার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করি, সে দীর্ঘজীবি হউক, তুমি পুত্রকে লইয়া সংসার করগে। একার্য্যে আমার কোন কৃতীত্ব নাই, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান রামচন্দ্রের ইচ্ছায় এসমস্ত হইতেছে—আমি উপ-লক্ষ্য মাত্র। এই বলিয়া তিনি ছাত্রগণসহ মণিকর্ণিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রথম ছাত্রটী তখন দ্বিতীয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল—দেখলে ভায়া! কেরদানীটা স্বচক্ষে দেখলে ত আর কোন অবিশ্বাসের কারণ আছে কি? দ্বিতীয় ছাত্রের তখনও বিশ্বাস হয় নাই যে মানুষে

এরূপ করিতে পারে—হয়, ইহা ভেল্কি, নয়—অন্ধকে সাজাইয়া আনিয়া তুলসীদাস নিজের বাহাদুরী দেখাইতেছে, লোক সমাজে বড় হইবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিতেছে। সে বলিল—ভাই! আমার যেন মনে লাগিল না, যদি ঐ অন্ধ বালকটী তুলসীদাসের দ্বারা পূর্ব্ব হইতে ঐরূপ শিক্ষা পাইয়া আসিয়া থাকে, তাহাওত হইতে পারে?

প্রথম ছাত্র অতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিল—ভাই! তুলসীদাস বাবাজীর ত এ সকল পয়সা রোজগার করিবার ফন্দি নয়? উনি ত কাহার নিকট হইতে পয়সা লইতেছেন না, তবে ঐরূপ করিবার আবশ্যক কি?

দ্বিতীয় ছাত্র। ভাই! তুমি যতই বল, আমার কিন্তু উহাতেও বিশ্বাস হয় নাই—যেন কোন ভেল্কি বলিয়া বোধ হয়।

প্রথম ছাত্র। আচ্ছা! চল, বাবাজীত বাহির হইয়াছেন—এখন ত অনেকক্ষণ নানাস্থান ভ্রমণ করিবেন, আর মুক্তিস্নানের অনেক বিলম্বও আছে, আমরা উহাঁর সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখি চল, তাহা হইলে আরও অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তোমার না হউক, আমারও মন মোহিত হইবে। এই বলিয়া তাহারা দুইজনে তুলসীদাসের সহিত গমন করিতে লাগিল। তাহার সহিত যেন একটা বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছে, অসংখ্য লোক যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। সূর্য্যে যে গ্রহণ লাগিয়াছে, সেদিকে কাহার দৃষ্টি নাই—সকলেই উন্মত্ত ভাবে সেই রামনামে উন্মাদ ভাবুক তুলসীদাসের সহিত চলিয়াছে।

তখন আমাদের দেশে সহমরণ প্রথা খুব প্রচলিত ছিল। পতির মরণে সতী-স্ত্রী তদনুগামিনী হইয়া জলন্তচিতায় আরোহণ করিতেন।

তখন এ প্রথা সমস্ত ভারত পরিব্যাপ্ত ছিল, বলিলেই হয়। স্বামী রমণী জাতির ইহ পরকালের দেবতা। অতিশয় দুঃখের মধ্যে থাকিলেও, মুখে হাসি না আসিলেও পতি যদি হাস্য করেন—সতী হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না; আবার সতী অত্যন্ত প্রফুল্লিতা হইলেও স্বামীকে কোনপ্রকারে ম্রিয়মান দেখিলে তাহার বিষাদভাব আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। রমণীজাতির মত ধর্ম্মপরায়ণা, সাধনসক্ষমা জীব জগতে আর কে আছে? সাধক ভগবানের জন্য যাহা করিতে পারেন না—স্ত্রীজাতি পতির সুখের জন্য, তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য করিতে পারেন না, ত্রিজগতে এমন কার্য্য কিছুই নাই—এইজন্য হিন্দু-স্ত্রী সকল স্ত্রীজাতির আদর্শ।

অনেকে বলেন—সহমরণ প্রথা বড়ই অন্যায়াচরণ কিন্তু তাহারা জানেন না যে, পতির মৃত্যুতে যথার্থ সতী স্ত্রী কখনই জীবিত থাকিতে পারে না—সহমরণ বন্ধ করিলেও—সে মরিবে? বাস্তবিক এইরকম স্ত্রীর পক্ষেই সহমরণ বিধিবদ্ধ ছিল। যেখানে জোরজবরদস্তি করিয়া প্রথা বজায় রাখিতে হইবে—সেখানে তেমন প্রথা উঠিয়া যাওয়াই বিশেষ প্রার্থনীয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন শক্তির অংশস্বরূপা সতী-কুলসিমন্তিনীগণের পদরেণুতে ভারত পবিত্রীকৃত ছিল বলিয়া এসকল প্রথার এত আদর ছিল। তুলসীদাস বাবাজীর দল বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় ভিন্ন পথ দিয়া একটী সহমরণ গমনোদ্যতা যুবতী পূর্ণ ঘট কক্ষে, সুন্দররূপে সীমন্তে সিন্দুর ধারণ করিয়া, সুন্দর চওড়া লাল পাড়া সাড়ী পরিয়া এবং পদদ্বয় অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত করিত স্ত্রীও পুরুষ পরিবেষ্টিত হইয়া সেই সময় হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানঘাটে যাইতেছিলেন, অপর লোক সকল তাঁহার পতির শব লইয়া পূর্ব্বে তথায় চলিয়া গিয়াছে।

রমণী তুলসীদাসের সম্মুখীন হইলে একজন বয়স্থা স্ত্রীলোক বলিল—মা! আজ তোমার বড় শুভদিন—আজ এই শুভ সূর্য্যগ্রহণের দিনে পতিঅনুগামিনী হইবার সময় দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, আর এই মুক্তপুরুষ, সাক্ষাৎ দেবকল্প মহাত্মা তুলসীদাসের চরণে প্রণাম করিয়া অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

রমণী হাস্য-বিষাদ-জড়িত ঢলঢল মুখখানি লইয়া গলবস্ত্রে তুলসীদাসের চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—ঠাকুর! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মনোবাসনা পূর্ণ হয়!

উদার প্রকৃতি তুলসীদাস সংসারের লীলাখেলা কিছুই বুঝিতেন না। সংসার ত্যাগ করিয়া অবধি তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি কখন দৃষ্টিপাত করেন নাই, আজ সহসা সেই সুন্দরী যুবতীকে পদতলে পতিতা হইতে দেখিয়া, অতি কোমল স্বরে বলিলেন—মা! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক, মনের আনন্দে পতিসহ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর, রাম কৃপা বলে তোমাদের সংসার উজ্জ্বল হউক।

রমণী সজলনয়নে করযোড়ে বলিলেন—প্রভু! আপনি কি আশীর্ব্বাদ কল্লেন। আমার পতি যে প্রাতঃকালে ইহধাম ত্যাগ করেছেন, আমি যে তাঁহার সহিত সহমরণে যাইব বলিয়া প্রস্তুত হয়ে এসেছি; এখন যে আমি শ্মশানে যাচ্ছি—এরূপ অবস্থায় ঠাকুর! আপনি কিরূপ আশীর্ব্বাদ কল্লেন?

তুলসীদাস সহগমনের বেশভূষা কখনও দেখেন নাই—তাই বুঝিতে না পারিয়া অকপট হৃদয়ে সরল বিশ্বাসে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তারপর যখন শুনিলেন—রমণী পতির চিতারোহণের জন্য যাইতেছেন, অথচ আশীর্ব্বাদ করাটা অন্যরূপ হইয়াছে। বাক্‌সিদ্ধ সাধক তাহাতে বিচলিত না হইয়া বলিলেন—মা! তার জন্য আর চিন্তা কি?

আমার বাক্য নিষ্ফল হইবার নয়; তোমার অদৃষ্টে বৈধব্যযোগ নাই। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার এই চিরানুগত দাসের দ্বারা আবার একটা নূতন কীর্ত্তি দেখাইবেন—বলিয়া আমার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির করিয়াছেন। চল দেখি, তোমার স্বামী কোথায়?

এই আশ্চর্য্য বিস্ময়কর ঘটনা দেখিয়া জনসংঙ্ঘ বিষম আনন্দে গগনভেদী স্বরে চীৎকার করিল—"জয় প্রভু রামচন্দ্র কি জয়, জয় বাবা তুলসীদাস কি জয়"। যে বৃদ্ধটীর অন্ধ পুত্র চক্ষু পাইয়াছিল, সে আনন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাবা! তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই বাবা! যাহার কুঁজ সারিয়া গিয়াছিল—সে বলিল—বাবা! ভগবান্ তোমাকে এইরকম দুঃখীদের জন্যই পাঠিয়েছেন—বাবা! তুমি সব কর্ত্তে পার! বিশ্বম্ভরের ছাত্রদ্বয়ও এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য লুব্ধচিত্তে তাহাদের সহিত শ্মশানে গমন করিল। তুলসীদাসের এই অমানুষিক ক্ষমতা দেখিবার জন্য তখন দলে দলে লোক শ্মশানের দিকে ছুটিল, সূর্য্যগ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, গঙ্গাস্নান করিতে হইবে—ইহা ভুলিয়া অনেকেই সেই অপূর্ব্ব বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিতে হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে সমবেত হইল। যে সকল ভাগ্যবান্ সাধক তুলসীদাসকে জানিতেন—তাঁহারা বলিলেন—সাধনবলে মানুষ দেবতার অপেক্ষাও অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, তুলসীদাস ভক্তির অবতার, সাধকের অগ্রগণ্য, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় সাধক, তাঁহার দ্বারা এ অসাধ্য-সাধন আর অসম্ভব কি, হায়, জগন্নাথ। কবে আমরা সাধু মহারাজ তুলসীদাসের মত ক্ষমতা লাভ করিয়া তোমার চরণ সমীপে দাঁড়াইয়া ভবের ভাবনা, যমযন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি পাইব? প্রভু! অধম আমাদের সে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া নরজন্ম সার্থক কর; সর্ব্বসাক্ষী দেব দিবাকর।

আমাদের এ পুরশ্চারণ সার্থক কর। বলিয়া তাঁহারা ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে মুক্তির স্নান করিলেন।

এদিকে বাবাজী তুলসীদাস গোস্বামী নিজবাক্য সফল করিবার জন্য শ্মশানে উপনীত হইলেন—অজস্র জনস্রোত তাঁহার সঙ্গে সেই শ্মশানঘাটে আসিয়া জলদগম্ভীর স্বরে রামনামে নদীসৈকত মুখরিত করিল, শববাহীগণও তাহাদের সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"রামনাম সত্য হ্যায়"।

ভক্তপ্রবর তুলসীদাসের হৃদয় চিরকালই অতি কোমল—যুবতী-রমণীর সেই বিষাদমাখা মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। তিনি আপনার প্রাণের ধনকে হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া বলিলেন—প্রভু! এ কার্য্য তোমারই; তুমি যেমন বলাইয়াছ, আমি তেমনি বলিয়াছি, এক্ষণে তোমার করুণা বলে যেন মাতৃসমা এ রমণীর বৈধব্য তিরোহিত হয়, তোমার জয়নিনাদে যেন ভুবন ভরিয়া যায়! তারপর রমণীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—কই মা! তোমার পতির মৃতদেহ?

রমণী সজলনয়নে—এই যে প্রভু! আমার স্বামীর মৃতদেহ, বলিয়া দেখাইয়া দিলেন।

ভক্তবীর তুলসীদাস খট্টোপরি শায়িত শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া, তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—আমি যদি রামনাম জপে কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি, সেই পুণ্যফলে হে শব! তুমি নবজীবন লাভ করিয়া রামনাম গাহিতে গাহিতে গাত্রোত্থান কর, রামনামের প্রভাব জগতে পরিব্যাপ্ত হউক—জগৎ দেখুক, রামনামের বলে জগতে কত অসাধ্য-সাধন হইতে পারে।

সিদ্ধ সাধকের প্রাণান্তিক প্রার্থনাবলে, তাঁহার পবিত্র হস্তের পবিত্র

স্পর্শে শবদেহ স্পন্দিত হইল—পরক্ষণে প্রাণ প্রাপ্ত হইয়া রামনাম করিতে করিতে উঠিয়া বসিল। দর্শকবৃন্দ এই বিস্ময়কর ঘটনা সন্দর্শন করিয়া আর থাকিতে পারিল না—সকলে উচ্চৈঃস্বরে রামনাম করিতে করিতে সাধকশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল। তুলসীদাস সেই নবদেহীর হস্তধারণ করিয়া রমণীকে বলিলেন—মা! এই তোমার পতিকে গ্রহণ কর এবং পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর। সুখে দুঃখে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপমালা করিও, তাহা হইলে সংসারে আর কোন কষ্ট থাকিবে না।

মৃতদেহে প্রাণ পাইয়া এবং রামনামের অদ্ভুত মহিমা বুঝিতে পারিয়া নবদেহধারী যুবক তুলসীদাসের পায়ে ধরিয়া বলিল—ঠাকুর! যে নামের এত শক্তি, যে নাম মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার করিতে পারে, সে নাম ঘরে বসিয়া হইবে না—আমি আজ হইতে আপনার সহিত ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করত সাধু সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিব! আপনি আমাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করুন।

তুলসী। না বৎস! আমি তোমার সতী পত্নীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অতএব তাহা হইতে পারে না, তুমি অতি নিবিষ্টচিত্তে গৃহে বসিয়া সস্ত্রীক প্রভুর নাম করিলে কখনই বিফল মনোরথ হইবে না। যাও বৎস! গৃহে যাও। যোগশক্তির অপূর্ব্বশক্তি দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিল।

সাধু তুলসীদাস সেস্থান ত্যাগ করিয়া পুনরায় জাহ্নবীকূলে আগমন করিলেন। তখন সূর্য্যগ্রহণ শেষ হইয়া গিয়াছে—সকলে পূজনীয় সাধকবরের সহিত পবিত্র গঙ্গানীরে স্নান করিয়া যে যার গৃহ-যাত্রা করিল।

এই অমানুষিক ঘটনা দেখিয়া বিশ্বম্ভরের প্রথম শিষ্য দ্বিতীয়কে

সম্বোধন করিয়া বলিল—কেমন ভায়া! এইবার বিশ্বাস হয়েছে কি! না, এখনও সন্দেহ করবার কিছু আছে?

দ্বিতীয় ছাত্র। দাদা! আমাকে ত "থ" করে দিয়েছে, ব্যাপারটা দেখে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি; তুলসীদাস বাবাজী দেখ্‌ছি—সত্য সত্যই দেবতা! ভায়া! আর ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্রের কচ্‌কচানী করে কি হবে—যদি এ রকম ক্ষমতা না হয়, ত মানুষ জন্মের সার্থকতা কি? আমিত ভাই লেখাপড়া ছেড়ে যাতে এই রকম মনুষ্যত্ব লাভ কর্ত্তে পারি, এখন থেকে তার চেষ্টা কর্ব্বো! এই বলিতে বলিতে দুই বন্ধুতে গঙ্গাস্নান করিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে গুরু গৃহে গমন করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্রাট-সদনে

যোগের ক্ষমতা অতুলনীয়। শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য কিছুই ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না। শারীরিক শক্তি পার্থিব রাজ্যে লৌকিক কার্য্য করে, আর যোগশক্তি পার্থিব ও অপার্থিব উভয় রাজ্যে অলৌকিক শক্তি দেখাইতে সক্ষম। তাই যোগী তুলসীদাসের শক্তি এত বিস্ময়কর।

মৃতের প্রাণদানের পর তুলসীদাসের নাম ভারতের চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তিনি যে একজন দৈবশক্তি সম্পন্ন, ঈশ্বর জানিত মহাপুরুষ—তাহা আর কাহার জানিতে বাকী রহিল না। এই ঘটনার পর হইতে প্রতিদিন দলে দলে কতলোক আসিয়া তাঁহার

নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তবে তিনি বেশীদিন একস্থানে থাকিতেন না, কাশীধাম তাঁহার প্রধান অবস্থান ক্ষেত্র হইলেও তিনি দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার ছাত্র এবং প্রধান শিষ্য ভবানী মিশ্র কার্য্য করিতেন। তুলসী দাসের দরিদ্র সেবা একটী প্রধান কার্য্য ছিল, তিনি না থাকিলেও সে কার্য্যে ব্যাঘাত হইত না। ভবানী মিশ্র ছাত্রবর্গকে লইয়া তাহা সুচারুরূপে চালাইয়া লইতেন। ভবানী এখন তুলসীদাসের প্রধান শিষ্য, গুরুর কৃপায় সাধন ক্ষেত্রে তিনিও এখন খুব উন্নতিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা তুলসীদাসের মত সাধকপ্রবর যাহার জীবন পথের পথ প্রদর্শক, তাহার সে পন্থা সুগম ও আলোকময় না হইবে কেন? সেই গুণ্ডা প্রধান ভবানীমিশ্র এখন সাধনমার্গের শীর্ষে সমাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তুলসীদাস কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে গমন করিয়াছেন। প্রাণায়াম সিদ্ধ যোগীর পথ ভ্রমণে কোন কষ্ট হয় না, দশদিনের পথ একদিনে বা তাহা অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে যাইতে সক্ষম, অন্যের সে ক্ষমতা নাই। যোগের দ্বারা শরীর অত্যন্ত লঘু ভাবাপন্ন হইলে, বায়ুভরে তাঁহাদের গতি হইয়া থাকে এইজন্য পথের পরিশ্রম তাঁহাদের সহ্য করিতে হয় না—যতদূর ইচ্ছা, সহজে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন।

একদিন তদানীন্তন রাজধানী দিল্লী সহর দর্শন করিবার জন্য যোগীবর তথায় উপস্থিত হইলেন। দিল্লী প্রাচীন হস্তিনানগরী, পুরাণের কত পুরাতন কীর্ত্তি ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে, হিন্দুরাজাগণের কত ঐতিহাসিক ধর্ম্মতত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহীত রহিয়াছে দেখিবার জন্য কাহার না ইচ্ছা হয়? বিশেষতঃ মহাত্মা তুলসীদাস পথ পর্য্যটনে,

সাধু সন্ন্যাসী দর্শনে এবং তাঁহাদের সহবাস সংমিলনে—চিরদিনই একান্ত অনুরাগী। মনের এ আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য তিনি দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইবামাত্র হিন্দুগণ তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিল।

তখন ভারতে মুসলমান রাজত্ব বিস্তৃত; দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা নামে প্রখ্যাত হইয়া তখন পাৎসাহ আকবর দিল্লীর সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিতেছিলেন। আকবরের রাজত্ব সময়ে হিন্দুগণের আদর যত্ন, তাহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যত অক্ষুণ্ণ ছিল, তত আর কাহার রাজত্বে ছিল না। আকবর সাহ হিন্দুদিগকে সোণার চক্ষে দেখিতেন; তাহাদের আদর-অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু মহারথীগণ সসম্মানে সমাদৃত হইয়া উচ্চ পদবীলাভ করিতেন—গুণের আদর তাঁহার নিকট ছিল—কারণ তিনি নিজে মহাগুণী ও জ্ঞানী নরপতি ছিলেন। মুসলমান অধিকারে এমন কবিত্বকর্ম্মা— উচ্চমনা ধার্ম্মিক নরপতি আর কেহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিবেশন করে নাই। আকবর বাদসাহই মুসলমান নরপতিগণের মুকুটভূষণ ছিলেন—ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য। তিনি প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন, তাঁহার রাজত্বে হিন্দুগণের সকল প্রকার সুখের পথ মুক্ত ছিল; তিনি হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন—অনেককে নানা প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনে অনেক সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

তুলসীদাস একজন মহাসাধু, সাধনবলে তিনি অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, মৃতের জীবনদানের ক্ষমতাও তাঁহার আছে, তিনি এখন দিল্লী নগরের হিন্দু পল্লীতে হিন্দুগণের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন, শুনিয়া আকবর সাহ প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনকে

লইয়া একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তুলসীদাস সম্রাটকে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং সম্রাট ভগবানের অবতার বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। হিন্দুপল্লীতে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া তান্‌সেন মহাত্মা কবীর কৃত কয়েকটি গজল গান করিলেন, তুলসীদাস সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও—তাহা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সম্রাট আকবর, তুলসীদাসের সেই কমনীয় কান্তি তাঁহার যোগ-প্রভাব-সম্পন্ন দৈহিক সৌন্দর্য্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে একদিন তাঁহার সভায় পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তুলসীদাস সম্রাটের অনুরোধ উপেক্ষা না করিয়া একদিন অবসরক্রমে তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন, সম্রাট সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাস্থ করিলেন।

সে দিন অনেক আমীর ওমরাহগণও মহাত্মা তুলসীদাসকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিলেন। নানাপ্রকার গীতবাদ্য, বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ সেই উপলক্ষে সমাহিত হইয়া সাধক-চিত্তে বিশেষ পরিতোষ প্রদান করিল। এইরূপ আমোদ-প্রমোদে উপর্য্যুপরি দুই চারি দিন কাটিবার পর, সম্রাটের সহিত তুলসীদাসের মেশামেশি হইলে বাদসাহ একদিন তাঁহাকে কিছু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতে বলিলেন। যোগশক্তি ভোজবাজী দেখাইবার জন্য প্রদর্শিত হইতে পারে না; ভগবানের অভিপ্রেত বিশ্বের কোন হিতার্থে না হইলে একটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যোগশক্তির অপব্যয় করিতে কোন্ সাধুচিত্ত সম্মতি প্রদান করে?

আকবর তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিলেও তুলসীদাস তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন—আমি অতি সামান্য ব্যক্তি,

আমার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা কি প্রদর্শিত হইতে পারে? ভগবানের ইচ্ছা না হইলে জগতের কোন কার্য্যই হইতে পারে না, এবং সে বিষয়ে আমার নিজের শক্তি কিছুই নাই; খেলার ছলে যোগবিভূতি দেখান হয় না।

তুলসীদাস সম্রাটের অমান্য করায় তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং তাঁহার বাক্য অবহেলা করার জন্য তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। নিমন্ত্রিত লোক সকল একটা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল—তুলসীদাস তাহা দেখাইলেন না—আকবরের তাহাতে রাগ হইবার কথা কিন্তু যোগশক্তির ক্ষমতা দেখান, ভোজবিদ্যার মত সহজ সাধ্য নহে। জনসাধারণ তাহা না বুঝিয়া অসন্তুষ্ট হওয়ায় বাদসাহও লজ্জিত হইয়া তুলসীদাসের প্রতি কড়া হুকুম জারি করিলেন। সাধক কারারুদ্ধ হইলেন।

সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহ ও কারাগার সমান। পৃথিবীইত ভীষণ কারাগার—এই কারাগার হইতে পরিমুক্ত হইবার জন্য, ইহার গতাগতি বন্ধ করিবার জন্যই ত যোগশিক্ষা, যাঁহারা এই কারাগার মুক্তির জন্য ভগবানের চরণে আশ্রয় লইয়াছেন—তাঁহাদিগকে এই লৌকিক কারাগার আর কি যন্ত্রণা প্রদান করিবে? তুলসীদাস হিন্দুব্রাহ্মণ, তিনি অম্লানবদনে কারা প্রবেশ করিলেন কিন্তু তিনি তথায় জলস্পর্শ করিলেন না। তিনি যখন কাহার পৃষ্ট অন্ন-জল গ্রহণ করেন না, সপাকে সমস্ত আহার করেন, তখন মুসলমানের অন্ন-জল গ্রহণ করিবেন কেন? যোগ-পরায়ণ যোগীগণ অন্নজল গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধ বায়ু ভক্ষণে অনেকদিন জীবিত থাকিতে পারেন। জিহ্বার অগ্রভাব ব্রহ্মতালুপথে প্রবেশ করাইয়া অমৃতপানে বিভোর হইলে সাধকের অন্য আহারের আবশ্যক হয় না।

ইহা দ্বারা যোগীগণ বহুদিন যোগাসনে থাকিয়া তপস্যা করিতে পারেন। তুলসীদাস তাহাই করিলেন কিন্তু দুই চারি দিন তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার পর রাজত্বে মহা গোলোযোগ উপস্থিত হইল। কোথা হইতে অজস্র বানরের আমদানী হইয়া দিল্লীনগরে প্রবেশ করত তাহার প্রতিবাসীবর্গকে মহা উত্যক্ত করিতে লাগিল। নগরবাসিগণ প্রাণ লইয়া অস্থির সমুদ্র-স্রোতের ন্যায়, কোথা হইতে যে এত বানরের আগমন হইতেছে এবং কেন হইতেছে কেহ, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিল না। রাজসভায়ও তাহাদের উপদ্রব কম হইল না, বাহিরে কিছু রাখিবার উপায় নাই—অমনি বানর আসিয়া তাহা লইয়া যায়। কাপড় বা বিছানা পত্র রৌদ্র শুষ্ক করিতে দিলে তাহা আর বানরের অত্যাচারে ঠিক থাকে না, কাটিয়া ছিঁড়িয়া, বিষ্ঠা মুত্র ত্যাগ করিয়া তাহা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। ছোট ছেলে-মেয়ে বাটীর বাহির হইলে তাহাদের আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া, কখন ভয় দেখাইয়া বিব্রত করে। বড় বড় বানরগণ বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া লোকের ঘাড়ে পড়িয়া আচড়াইয়া কামড়াইয়া দেয়! মহাহুলুস্থুল ব্যাপার, সামান্য লাঠি-সোটায় ইহার কেহ কোন প্রতিকার করিতে পারে না। এই ভীষণ বানর-বিদ্রোহ ক্রমশঃ সম্রাটের কাণে পৌছিল।

তিনি প্রথমতঃ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন—তারপর যখন অন্দর মহল হইতে এ সংবাদ শুনিতে পাইলেন; সভাধিবেশনের সময়ে যখন অট্টালিকার উপরিভাগে বানর-হনুমানের গতাগতি দেখিতে পাইলেন—তখন তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি তাহাদিগকে মারিবার জন্য হুকুম দিলেন কিন্তু কয়টা মারিবে—এ যে অসংখ্য! তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—একি বিপদ? হঠাৎ এত পশুর

আমদানী কোথা হইতে হইল—এ সকল শাখামৃগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিসে? নগরবাসীকে, শুধু তাই কেন—আমার পারিষদবর্গকেও যেরূপ কষ্ট দিতেছে—তাহাতে রাজত্ব করা দায় হইল! সম্রাট বড়ই উতলা হইয়া পড়িলেন, এ আবার কি উপসর্গ, এমন ত কখনও দেখি নাই! অন্য কেহ বিদ্রোহী হইলে সৈন্য সামন্ত দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারিত, কিন্তু বানরগণকে প্রতিনিবৃত্ত বা সংহার করা যায় কেমন করিয়া? তাহারা ত একস্থানে থাকে না; অট্টালিকার ছাদে, বৃক্ষে-রাস্তায় ঘাটে থানা দিয়া বসিয়া রহিয়াছে, ইহাদিগকে গোলাগুলির দ্বারা সংহার করিলে ত রাজত্ব নষ্ট হইয়া যায়। আকবর মহা ভাবিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে তুলসীদাসকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন—তিনি যে জল স্পর্শ না করিয়া কারাগারে যোগাসনে বসিয়া আছেন—কাহার সহিত কথা কন না, কেহ ডাকিলে সাড়া দেন না—এ সকল কথা তাঁহার আদৌ মনে নাই।

একদিন কার্য্যাধ্যক্ষ আসিয়া পাতসাহের নিকট কয়েদী তুলসীদাসের আশ্চর্য্য কাহিনী বিবৃত করিল। কথা শুনিয়া সম্রাটের চমক ভাঙ্গিল, তিনি কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিতকে ডাকিয়া তুলসীদাসের সান্ত্বনার জন্য কারাগারে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইত্যবসরে একদিন রাজমহলের রাজা মানসিংহ সম্রাট আকবরের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। রাজত্বে বানরের উপদ্রব দেখিয়া হিন্দুবীর মানসিংহও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তারপর জনে জনে শুনিলেন—সম্রাট কিছুদিন পূর্ব্বে একজন হিন্দু সাধককে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করার দুই তিন দিন পর হইতেই এই উপদ্রব আরম্ভ

হইয়াছে। সাধু এখনও কারাগারে আছেন—কিছু খান না, কাহার সহিত কথা কন না—কেবল যোগে নিমগ্ন।

মানসিংহ সম্রাটের মুখেও এই কথার সত্যতা বিদিত হইয়া একদিন কারাগারে গমন করত সাধুর ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিলেন—হিন্দুপণ্ডিতগণ যাহা বুঝিতে পারেন নাই—বিচক্ষণ মানসিংহ যোগাসনস্থ তুলসীদাসের তপঃশৈশ্চর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তিনি বুঝিলেন—এই মহাত্মার প্রতি সম্রাটের এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞায় রাজত্বে এইরূপ দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। সাধু মহাত্মার অপমান করাই ইহার প্রধান কারণ, তিনি সম্রাটকে বুঝাইয়া বলিলেন—যাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি সাধারণ লোক নহেন; একদিন তাঁহার নিকট আপনি কিছু অলৌকিক দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার দ্বারাই এই অলৌকিক দৃশ্যের সূত্রপাত হইয়াছে। এখন তাঁহাকে সন্তুষ্ট না করিলে ইহা এরূপ ভীষণভাব ধারণ করিবে, যে আপনার রাজত্ব রক্ষা করা দায় হইবে, আর এত রাষ্ট্র-বিপ্লব নহে যে আপনি সৈন্য সামন্তের দ্বারা তাহা রোধ করিবেন—ইহা দৈবদুর্ঘটনা; সাধুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনই ইহার কারণ!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আকবর সাহের মত পরম বিচারী, ধার্ম্মিক নরপতি দীল্লির সিংহাসনে আর কেহ উপবেশন করেন নাই। মানসিংহের কথায় তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং সাধুর যোগ-সমাধিভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রায় অষ্টাহকাল এইভাবে থাকিয়া তুলসীদাস একদিন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—তাহার সমাধিভঙ্গ হইল। সম্রাটের নিকট সে সংবাদ পৌছিবামাত্র তিনি মানসিংহের সহিত কারাগারে আসিয়া তুলসীদাসকে অপ্যায়িত করিলেন এবং তিনি না জানিয়া তাঁহাকে

কারাগারে প্রেরণ করায় বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। আকবর সম্রাটের আদর্শ, গুণীর আদর তিনি চিরকাল করেন—তাহাতে জাতিনির্ব্বিশেষ বা পক্ষপাতিতা তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ সাধু সন্ন্যাসীগণকে তিনি সাতিশয় মান্য করিতেন—আকবর চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব ছিল।

তুলসীদাসকে সাদরে কারামুক্ত করত সম্রাট এই সকল উপদ্রবের কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার করিবার জন্য জেদ করিলেন—তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করার অপরাধে যে এই দৈবদুর্ব্বিপাক হইয়াছে; সকলে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া তাহা বলিলেন তুলসীদাস বানরগণের অত্যাচারে শোভাময় নগরের সৌন্দর্য্যহানি দেখিয়া মনে মনে ভক্তের প্রতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দয়ার অবধি নাই বুঝিতে পারিলেন, এবং তাহার প্রতিকার জন্য তিনি পুনরায় যোগে বসিলেন। তুলসীদাসের তুই একদিন আরাধনার পর, শ্রীরামচরণাশ্রিত রামানুচর তদীয় গুরুদেব মহাবীরের ধ্যানধারণার পর একদিন কোথা হইতে কয়েকটী বড় বড় বীর হনুমান আসিয়া ঐসকল ক্ষুদ্র বানরকটককে বিতাড়িত করিয়া দিয়া নিজেরা অদৃশ্য হইয়া পড়িল, তুলসীদাস ইষ্টপদে প্রণতি করিয়া যোগাসন ত্যাগ করিলেন।

মুসলমানগণ এই সময় হিন্দুসাধকের যোগ-বিভূতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আকবর সাহ তুলসীদাসকে একজন অপূর্ব্ব যোগী-বিভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদায় দান করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

দর্পচূর্ণ

ধর্ম্মের টান বড় টান—এই টানে আকৃষ্ট হইলে মানুষ আর কোন দিকে চাহিয়া দেখে না; কেবল ঐ একটানা স্রোতে গা ভাসাইয়া মনুষ্যত্বের কূলে—ভগবানের পাদমূলে আসিয়া জীবন ধন্য করিতে চেষ্টা করে। তুলসীদাসের সেদিনকার ক্ষমতা দেখিয়া বিশ্বম্ভরের ছাত্রগণ বিচলিত হইয়াছেন। তাহারা বিশ্বম্ভরের টোল ছাড়িয়া তুলসীদাসের টোলে চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্বম্ভরের পাণ্ডিত্য আর তাহাদের আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাহারা এখন ধর্ম্মের টানে পড়িয়া বুঝিয়াছে, শুধু পাণ্ডিত্যে জীবনের কোন উপকার হয় না। তাই তাহারা আজ মহাত্মা তুলসীদাসের শরণাপন্ন; শরণাগত প্রতিপালক তুলসীদাসও তাঁহাদিগকে ঠিক পিতার ন্যায় কোলে তুলিয়া লইয়া অভয় দিয়াছেন, তাহাদের অন্ধকারময় হৃদয় রামনামের জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছেন।

বিশ্বম্ভরের টোলে এখন আর কোন ছাত্র নাই। কেবল তাহার প্রিয় সহচর ও ছাত্র ভানুদত্ত এখনও তাহাকে ছাড়িতে পারে নাই—সে এখনও কায়ার ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের তারিফ করিতেছে, তোষামোদ করিয়া তাঁহার শীর্ণ পুচ্ছ স্ফীত করিয়া দিতেছে। ধর্ম্মভাব ত' তাহার হৃদয়ে নাই—তাই সে পাণ্ডিত্যকেই বড় দেখে—তুলসীদাসের ন্যায় গুণী-জ্ঞানীকে তাহার পছন্দ হয়না। বিশ্বম্ভরের খ্যাতি প্রতিপত্তি এখন আর তত না থাকিলেও

পূর্ব্ব প্রতিপত্তির জন্য রাজন্যবর্গের নিকট যে মাসহারা বন্দোবস্ত আছে, তাহাতেই খুব স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়—দৈনিক আয়ের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না।

আজ তিনি জাতক্রোধ শান্তির জন্য তুলসীদাসের প্রতি সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাতে পণ্ডিত সমাজ তুলসীদাসকে মান্য না করেন—সাধু-সমাজ যাহাতে তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন—সেইরূপ একটা দোষাবহ কুৎসা রটনা করিয়া তাহাকে সমাজে রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই আজ তাঁহার সভাপতিত্বে কাশীতে দণ্ডী, সন্ন্যাসী, যোগী এবং পণ্ডিতগণের এক সভা আহূত হইয়াছে। বিশ্বম্ভর সকলকে বলিতেছেন—মহোদয়গণ! শ্রবণ করুন, তুলসীদাস কিরূপ অন্যায়াচরণ করিতেছে; সে দুই একটা ভোজবিদ্যা দেখাইয়া এরূপ অনাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে সাধুও বুধ সমাজে তাহার আর স্থান হইতে পারেনা, সে একান্ত পতিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ভ্রষ্টাচারিত্বের বিষয় আমার প্রিয় সুহৃদ ভানুদত্ত সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। কেমন হে ভানুদত্ত! তুমি কি সত্য সত্যই তুলসীদাসকে সেই ব্রহ্মহত্যাকারী, বিপ্র কুল-কলঙ্ক ভবানী মিশ্রের সহিত একত্র ভোজন করিতে দেখিয়াছ?

ভানু। আজ্ঞা হ্যাঁ! আমি স্বচক্ষে তাহার ঐ অনাচার দেখিয়াছি, পরের মুখে শুনি নাই। তুলসীদাস ভবানীর সহিত একপাত্রে আহার করিতেছেন—ইহা আমার স্বচক্ষে দেখা।

সাধু সন্ন্যাসীগণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—কিমাশ্চর্য্য—দিনে দিনে হলো কি, দুই একটা ছোঁড়া সাধু-সন্ন্যাসী সাজিয়া আর্য্যশাস্ত্রের শাসন অমর্য্যাদা করিল—আচ্ছা, ভানু! তুমি তাঁহাকে সে সময় কোন কথা বল্লে না কেন?

ভানু। আজ্ঞা হাঁ! আমি বলেছিলাম কিন্তু তিনি বল্লেন—এ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপ বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ দেহধারী হইয়াছে, ইহার সহিত আহারে কোন দোষ হইতে পারে না।

বিশ্বম্ভর। এখন তিনি নূতন যোগী কি না, তাই তাঁর এরূপ দাম্ভিকতা বিস্ময়ের বিষয় নহে! বিশেষতঃ তিনি ঘণ্টাকর্ণ যোগীর প্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হয়ে, এখন চতুষ্পাঠী খুলেছেন, নূতন ব্যবস্থার উদ্ভাবন কচ্ছেন—এরূপ আত্মাভিমান হবে বৈকি? এখন এরূপ বিধি-ব্যবস্থার উলটপালট করে—লোকের সর্ব্বনাশ কর্ব্বেন বই কি! কিন্তু আমি এতদিন এই ঈশ্বরজ্ঞ সাধু-সন্ন্যাসী-দণ্ডী-গণের পবিত্র পন্থানুসরণ করে—কাশীর মধ্যে প্রধান ব্যবস্থাপক রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছি—অতএব আপনাদের অনুমতি লইয়া তাঁহার পাপের সমুচিত দণ্ড বিধান কর্ব্বোই কর্ব্বো—এক্ষণে সভ্যমণ্ডলী তাহার জন্য আমাকে কি আজ্ঞা করেন?

সকলে স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয়ের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন এবং যাহাতে তুলসীদাসের দমন হয়, তাহার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

একজন বলিলেন—আমরা সকলে ত তুলসীদাসের অর্ব্বাচীনতার কথা শুন্‌লেম এবং আপনার প্রস্তাবানুসারে তাঁহাকে সামাজিক দণ্ড বিধানেও প্রস্তুত আছি কিন্তু কাশীর মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ যোগী প্রবীণ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং যোগ বিশারদ; ধর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি কাশীর যোগীমণ্ডলী অপেক্ষা সমধিক অগ্রসর—এ সভায় তাঁহার আগমন হয় নাই; তিনি উহার গুরু, তাঁহার মতামত ভিন্ন ত কোন কাজ হইতে পারে না!

ভানুদত্ত বলিল—তাঁহাকে এই সভায় সর্ব্ব প্রথমেই আহ্বান

করা হইয়াছিল, তিনি সকলেরই প্রণম্য ; তবে কেন যে তিনি আসেন নাই—তাহা জানি না, বেলা প্রায় শেষ হয়—আসিবেন কি না তাহারও স্থিরতা নাই ; বোধ হয় তুলসীদাস তাঁহার প্রিয় শিষ্য এবং তাঁহাকে রহিত করাই এ সভার উদ্দেশ্য জানিয়া হয়ত নাও আসিতে পারেন !

সকলে সমস্বরে বলিল—ভুল, ভুল, মহাভুল ! ঘণ্টাকর্ণ সেরূপ ধরণের মহাপুরুষ নহেন, যে একজন অধার্ম্মিককে প্রশ্রয় দিবেন, পুত্র হইলেও তাঁহার নিকট অব্যাহতি নাই, শিষ্য ত কোন ছার !

ঘণ্টাকর্ণ যোগীর জন্য তুলসীদাসের সমাজরাহিত্য বিষয়ে কেহ কোন মতামত প্রদান করিতে পারিতেছেন না ; ঘণ্টাকর্ণ যে এখনকার সমাজের শিরোভূষণ ; তাঁহাকে বাদ দিয়া, তাঁহার মতামত না লইয়া এত বড় একটা মহৎ কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব আজ সভার কার্য্য স্থগিত থাকুক—তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠান হউক, তার পর ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করা যাইবে। বৃদ্ধ তিনি—অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারেন ত ? বিশ্বম্ভর মহা চিন্তিত হইলেন—আজ সভার কার্য্য স্থগিত থাকিলে, হয় ত তুলসীদাস সময় পাইয়া সকলকে ঠিক করিবেন—কাঁদিয়া কাটিয়া ধরিলে—সকলে হয় ত তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন—তাহা হইলে তাঁহার মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে না। বিশ্বম্ভর বিষাদিত চিত্তে সভার কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় সশিষ্য ঘণ্টাকর্ণ যোগী তথায় সমুপস্থিত হইয়া আপনার বিলম্বের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিলেন।

সকলে অতি সমাদরে তাঁহাকে সভার মধ্যস্থলে লইয়া গেল,

এবং সভাপতি রূপে বরণ করিয়া সে দিনকার সভার কর্ত্তব্যকার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তুলসীদাসকে সমাজে রহিত করিতে হইবে, শুনিয়া ঘণ্টাকর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, তাহার অপরাধ কি?

বিশ্বম্ভর বলিলেন—সে ব্রহ্মঘাতী ভবানী মিশ্রের সহিত একত্র পান-ভোজন করিয়াছে। এইজন্য সন্ন্যাসী ও দণ্ডী সমাজ তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য করিতে বা তাঁহার সহিত সমাজে চলিতে রাজি নহেন। সকলেই এ বিষয়ে একবাক্যে মত প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিমত পাইলেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমরা তুলসীদাসের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারি।

ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন—তুলসীদাস অতি অল্প বয়স হইতেই আমার নিকট মানুষ হইয়াছে, তাহার স্বভাব চরিত্র আমি ভাল জানি—সে যে সহজে একজন ব্রহ্মঘাতীর সহিত অন্নভোজন করিবে—ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। সে পরম মেধাবী ছাত্র, বিশেষ শিক্ষিত, গুণী এবং জ্ঞানী, প্রাণায়াম সাধনায় সুসিদ্ধ মহাযোগশালী, সে যে না বুঝিয়া হঠাৎ ভবানী মিশ্রের সহিত মেশামেশি করিয়াছে—তাহা আমার বোধ হয় না, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন গূঢ় কারণ আছে। অতএব আমার অনুমতি জানাইয়া তাহাকে এই সভায় পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হউক?

সাধুর সংযুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সকলেই বলিলেন—বেশ বেশ—তাহাই হউক! বলিয়া একজন তুলসীদাস বাবাজীকে ডাকিতে যাইবে! এমন সময় দেখিল—বিষম সমারোহে অন্ধ, খঞ্জ এবং কয়েকটী বিপ্র-সন্তান সেই পথ দিয়া বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরপানে প্রধাবিত হইতেছে। তাহারা সঘনে বাবা বিশ্বেশ্বর ও মহাত্মা তুলসীদাসের জয় ঘোষণা করিতেছে। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণপল্লীর রামসর্ব্বস্ব,

নিধিরাম প্রভৃতি অনেক ধার্ম্মিক মহাত্মাও রহিয়াছেন, দেখিয়া বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন—আরে রামসর্ব্বস্ব ভায়া যে, ব্যাপার কি, এত সমারোহে আজ পূজার আয়োজন কেন ?

রামসর্ব্বস্ব। কেন, আপনি কি কিছু শুনেন নাই, আমার মৃতপুত্র নিধিরাম মহাত্মা তুলসীদাস বাবাজীর কৃপায় পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়েছে ?

বিশ্ব। বল কি! তোমার পুত্র এই নিধিরাম কি মারা গিয়াছিল না কি ?

রাম। আজ্ঞা হাঁ, গত পরশ্ব রাত্রে বিসূচিকা রোগে প্রাণ হারাইয়াছিল, দ্বাদশ দণ্ড শবদেহ রক্ষা করিয়া ইহাকে শ্মশানে দাহ করিতে লইয়া যাওয়া হয়—বধূমাতাও হিন্দু-রীতি অনুসারে সহমৃতা হইতে গিয়া রাস্তার ধারে মহাত্মাকে প্রণাম করেন—তিনি না জানিয়া "জন্মায়তী" হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—পরে যখন শুনিলেন—ইহার পতি মৃত, ইনি সহগমনোদ্যতা ; তখন সাধু বলিলেন—আমার কথা অন্যথা হইবে না, চল দেখি, বলিয়া শ্মশানে গমন করিয়া "রামনাম" বলে ইহাকে বাঁচাইয়াছেন, শুধু কি তাই, এই সকল অন্ধ-খঞ্জ ও ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে। ভাই ! তুলসীদাস বাবাজী সাক্ষাৎ দেবতা, আমরা সপরিবারে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি।

রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য কাশীর একজন বিশিষ্ট বড়লোক এবং ধার্ম্মিক, তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে বলিল—কি আশ্চর্য্য, তবে তুলসীদাস বাবাজীকে ত সহজ লোক বলে বোধ হয় না !

বিশ্বম্ভর সক্রোধে আস্ফালন করিয়া বলিলেন—বুজরুকী, বিষম মায়াবী, সাধু-মণ্ডলী ! আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হবেন না—সেটা গোড়া

থেকেই ভেল্কী বিদ্যা শিক্ষা করে, লোকের চক্ষে ধাঁধাঁ দিতে শিখেছে!

ঘণ্টা। পণ্ডিত জী! নিরপেক্ষতা অবলম্বন করুন, একদেশ-দর্শীতার বশবর্ত্তী হয়ে—ক্রোধ কর্ব্বেন না—বিশেষ প্রণিধান করুন।

সকলে সমস্বরে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—অন্ধ-খঞ্জ আরাম করা না হয়—ভেল্কী হইল কিন্তু মৃত ব্যক্তির প্রাণদান দৈব-ক্ষমতা ভিন্ন কখন সম্ভবপর নহে।

রাম। মহোদয়গণ! ভক্তবীর তুলসীদাস নিশ্চয়ই পরম যোগী, তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন হয়ে ভগবানের আদেশে পৃথিবীর উপকার কর্ত্তে জন্মেছেন। সাধারণ অজ্ঞ লোকের চক্ষে না হয়—তিনি ধাঁধাঁ দিতে পারেন বা ভেল্কী লাগাতে পারেন কিন্তু আপনাদের ন্যায় পরম জ্ঞানীর নয়ন ত কখন প্রতারিত হবে না, আপনারা একবার মহাত্মাকে পরীক্ষা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন!

ঘণ্টাকর্ণ উচ্চৈস্বরে বলিলেন—পণ্ডিতমণ্ডলী! আপনারা একটু অপেক্ষা করুন; সে আমার পুত্রস্থানীয় এবং প্রিয়শিষ্য তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি; আসিলেই সমস্ত সংশয় দূর হইবে।

"যে আজ্ঞা যে আজ্ঞা" বলিয়া সকলে যোগীবর ঘণ্টাকর্ণের কথায় অনুমোদন করিল।

কাশীর প্রধান স্মার্ত্তবাগীশ পণ্ডিত বিশ্বম্ভর বিষম ক্রোধান্ধ হইয়া রামসর্ব্বস্বকে বলিলেন—তুমি এখন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে পাবে না যতক্ষণ তাহার পরীক্ষা না হয়। ব্রহ্মঘাতীর সহিত যে একত্র আহার করে, সেই তুলসীদাসের শিষ্যের পূজা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দেওয়া নিষিদ্ধ!

রামসর্ব্বস্ব রাগে জলিয়া উঠিয়া বলিলেন—দেখুন স্মার্ত্ত-বাগীশ

মহাশয়! আপনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য বটেন,—কিন্তু যোগশক্তি আপনার কোথায়, যে আপনি বাবাজীর সমকক্ষ হইবেন? ধর্ম্ম জগতে তুলসীদাসের তুলনায় আপনি অতি নগণ্য।

রামসর্ব্বস্ব প্রভূত অর্থের অধিকারী এবং ধাম্মিক পণ্ডিত, তিনি দাম্ভিক বিশ্বম্ভরকে গ্রাহ্য করিবেন কেন? তিনি রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বিশ্বম্ভরকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন—বিশ্বম্ভরের ক্রোধও সামান্য নয়—দুইজনে হাতাহাতি হয় দেখিয়া ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন—আপনারা স্থির হউন, তুলসীদাস আসিলে আমি সমস্ত বিষয়ের মিমাংসা করিয়া দিতেছি—একটু অপেক্ষা করুন।

ইতিপূর্ব্বে একজন লোক তুলসীদাসকে ঘণ্টাকর্ণ যোগীর আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য গিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহার পূর্ব্বে বহুজন পরিবেষ্টিত, রামনামে উন্মত্তবৎ হইয়া ভবানী মিশ্রের সহিত খঞ্জনী সহকারে গান গাহিতে গাহিতে তথায় উপস্থিত হইলেন, সেই হৃদয়োন্মাদকারী রাম গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভক্তমাত্রেই নয়নের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে গান থামিল, তথাপি তুলসীদাসের প্রাণের আবেগ এখনও ঘুচে নাই—ভবানীর কোলে মাথা দিয়া তখনও তিনি অচৈতন্য, এ দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বম্ভর ভিন্ন সকলেই ভক্ত তুলসীদাসকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণপরে তুলসীদাস প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করত অবনত মস্তকে আদেশ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন—বৎস তুলসীদাস! আজ বড় সমস্যার মধ্যে আহ্বান করিয়া তোমার সাধন-ভজনে বাধা দিয়াছি বলিয়া কিছু মনে করো না।

তুলসীদাস ভক্তি-বিমিশ্র স্বরে বলিলেন—প্রভু! আপনার পাদ-পদ্ম দর্শনই যে মহাসাধনা; আজ বহুদিনের পর ও রাজীবচরণ দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে প্রভু! দাসের প্রতি কি কোন আদেশ করিবেন?

ঘণ্টাকর্ণ। বৎস! এই সমাগত সাধুগণ আজ তোমার প্রতি বিরূপ, বিশেষতঃ বিশ্বম্ভর স্মার্ত্ত্যবাগীশ তোমার প্রতি অত্যন্ত বিরোধ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলেন—তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাপী ভবানীর সহিত একত্র ভোজন করিয়াছ; অতএব তুমি পণ্ডিত-মণ্ডলীর ঘৃণার পাত্র হইয়াছ। এইজন্য বিশ্বম্ভর আজ এই সভার আহ্বান করিয়া তোমার সহিত সকল সংশ্রব রহিত করত শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। এক্ষণে তুমি সকলের সমক্ষে গমন করত অপরাধ মোচনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমার মান রক্ষা কর।

তুলসী। ভগবন্! এই ভবানী মিশ্র শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মহত্যাকারী নহে; পণ্ডিতজী তাহাকে জোর করিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া জীবন ত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। খেলার সময় ধাবন-কুর্দ্দনে সে ব্যক্তি পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহাতে ভবানীর দোষ কি? সেত ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বধ করে নাই?

ভানুদত্তের সহিত বিশ্বম্ভর সরোষ-কটাক্ষে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—ভুল, ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। সে ইচ্ছা করিয়া, রাগের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছে—এইজন্য শাস্ত্রসঙ্গত তাহার জীবনান্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল।

তুলসী। মহাত্মন্! আমি যতদূর জানি এবং প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে সে ইচ্ছা করিয়া ঐ মহাপাপ করে নাই—তবে যদি আপনি

জোর করিয়া বলেন—করিয়াছে, তবে আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাহি না; কিন্তু যদি ব্রহ্মহত্যাই করিয়া থাকে—তাহার জন্য আবার একটা জীববধের ব্যবস্থা কেন? অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়াই ভাল—তাহাকে দেখিয়া লোকের শিক্ষা হইবে, মরিলেই ত সব ফুরাইয়া গেল। আমি যতদূর জানি, তাহাতে সে ব্রহ্মঘাতী নহে, অথচ মরণের জন্য জাহ্নবী-জীবনে জীবনত্যাগ করিতে গিয়াছিল। আমি তাহাকে প্রতি-নিবৃত্ত করিয়া পক্ষকাল অনাহারে অনিদ্রায় রামনাম জপের ব্যবস্থা দিয়াছি। যে রামনাম একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে লক্ষ লক্ষ মহাপাতক ক্ষয় হয়, আমি তাহাকে পক্ষকাল—ওহো অসংখ্য জপের ব্যবস্থা দিয়াছি। ভক্তিভাবে প্রাণের সহিত "নাম" জপ করিয়া ভবানী সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। "রামভক্ত ত্রিকাল মুক্ত" এইজন্য আমি উহার সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকি। ভবানী এখন যে গঙ্গা বারির মত পবিত্র!

বিশ্ব। সে বিষয় প্রমাণ কি?

তুলসী। প্রমাণ মহাশয়ের নিকট, আপনি যেরূপ ভাবে তাহাকে পরীক্ষা করিতে হয়—করুন, ভবানী তাহাতে প্রস্তুত আছে!

সকলে। বেশ কথা, ভাল কথা, উত্তম প্রস্তাব, এর বাড়া আর কি কথা আছে। পণ্ডিতজী আপনার এক্ষণে কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

বিশ্বম্ভর। অবশ্যই কর্ব্বো; এক্ষণে আপনারা অনুমতি করুন, আমি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করি।

সকলে। আমরা কায়মনে বল্‌ছি—আপনি হৃদয়-ভাব প্রকাশ করিয়া ভবানীকে পরীক্ষা করুন।

বিশ্ব। হে সাধু মণ্ডলী! আপনারা আমার মনোগত অভিপ্রায়

শ্রবণ করুন—ঐ মহাপাপী ভবানী মিশ্রের হস্তে কিছু মিষ্টান্ন এবং ফলমূল দিয়া ভগবান বিশ্বনাথের মন্দির সম্মুখে ঐ প্রস্তর নির্ম্মিত যণ্ডের নিকট প্রেরণ করা হউক; ভবানী ঐ সকল উপকরণ যণ্ডের মুখের নিকট ধরিলে ঐ প্রস্তর নির্ম্মিত যণ্ড যদি উহা ভক্ষণ করে, তবে জানিব—যে ভবানী নিষ্পাপ হইয়াছে এবং তুলসীদাসের ব্যবস্থা দান সত্য হইয়াছে, নতুবা মনে মনে আপনাকে নিষ্পাপ জানিয়া এই মহাপাপের একটা মনগড়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে ত চলিবে না!

সকলে সমস্বরে বলিলেন—উপযুক্ত পরীক্ষা, এ প্রস্তাব যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া সকলে সভাপতি ঘণ্টাকর্ণ যোগীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

"বিষম পরীক্ষা" ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন—বৎস; তুলসীদাস! শুনিলে কি, সাধুমণ্ডলীর মনোগত ইচ্ছা, এক্ষণে ভবানী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি?

তুলসী। প্রভু! আপনার আদেশ এবং সাধু মহোদয়গণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আপনি কিছু ফলমুল ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিতে বলুন—ভবানী পরীক্ষা দান করিবে।

সমাগত জনমণ্ডলী ভক্তবীর তুলসীদাসের ভক্তি-তেজো-গর্ব্ব কথা শুনিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার বদনের প্রতি চাহিয়া ভবানীর পরীক্ষা দেখিবার জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিপক্ষ সকল মনে করিল—এইবার তুলসীদাসের বাহাদুরী সকলের সমক্ষে ঘুচিয়া যাইবে, প্রস্তর নির্ম্মিত যণ্ড কি কখন ভবানীর হস্ত হইতে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিবে—অসম্ভব!

ঘণ্টাকর্ণ আদেশ করিবামাত্র একটী পাত্রে করিয়া কিছু মিষ্টান্ন ও

ফলমূল লইয়া আসা হইল। তুলসীদাসের বদন তখন ভক্তিভরে অতি কমনীয় রক্তিমাভ ভাব ধারণ করিয়াছে—আর ভবানীর হৃদয় ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিতেছে। তুলসীদাসের হৃদয় তখন ভক্তি-তেজে ভরা—রামনামের অনন্ত-মহিমায় পুরা, তিনি পাত্র হস্তে করিয়া বলিলেন—বৎস ভবানী! যাও, হৃদয়-পদ্মে ইষ্টমূর্ত্তি স্থাপন করত রামনামে মন সুদৃঢ় করিয়া যাও বৎস! ষণ্ডের নিকট; রামনাম মহামন্ত্র বলে—ঐ জড় দেহে প্রাণ সঞ্চার হইয়া তোমার প্রদত্ত খাদ্য নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিবে। ভক্তাধীন ভগবান কখনও ভক্তের প্রতি বাম নহেন। অবশ্যই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

ভবানী মিশ্রের প্রাণ বহু পূর্ব্ব হইতেই তৈয়ারী হইয়াছিল। হৃদয় তার ভক্তিভরা, মনে তার দুর্ব্বলতার লেশমাত্র নাই। গুরু-দেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, ভক্তি-বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সে সেই পাত্রপূর্ণ খাদ্য-দ্রব্য লইয়া ষণ্ডের নিকট অগ্রসর হইল। রাম-প্রেমে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে সে যেমন পাত্রটী প্রস্তরময় ষণ্ডের মুখের নিকট ধরিল—অমনি সকলে উচ্চৈঃস্বরে "জয় প্রভু রামচন্দ্রকি জয়" নাদে গগন বিদীর্ণ করিল—আর এ কি এ, মরি মরি এ যে অসম্ভব—সম্ভব হইল! রামনামের অসীম মহিমা দেখাইতে; ভক্তের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতে ঐ যে প্রস্তর নির্ম্মিত ষণ্ড লহ লহ রসনা বহির্গত করিয়া অতি আগ্রহের সহিত ভবানী প্রদত্ত আহার্য্য দ্রব্য অবাধে ভক্ষণ করিল! সকলে নির্নীমেষ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দধ্বনি ও করতালি সহকারে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"জয় সীতাপতি রামচন্দ্র জীকি জয়" "জয় ভক্তবীর বাবা তুলসীদাস গোঁসাইজীকি জয়"

"জয় ভক্তপ্রবর ভবানী মিশ্রকি জয়"। জনমণ্ডলী আর থাকিতে পারিল না—সকলে আসিয়া তুলসীদাসের পদপ্রান্তে পতিত হইল এবং ভবানীকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইল।

ঘণ্টাকর্ণ যোগ-বিহ্বল হইয়া বসিয়া ছিলেন—এক্ষণে শিষ্যের এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া, তাহার অসীম ক্ষমতা—অতুলনীয় রামভক্তির বিভূতি দর্শন করত সাগ্রহে নামিয়া আসিয়া তুলসীকে বুকে ধরিয়া বলিলেন—ভক্ত চূড়ামণি! আজ তোকে আলিঙ্গন কোরে আমিও ধন্য হলাম; ধন্য তোর রাম ভক্তি, ধন্য তোর সাধন-শক্তি। আজ ঘণ্টাকর্ণ তোর মত পরম ভক্তের গুরু হইয়া নিজেকে স্পর্দ্ধান্বিত মনে করিতেছে। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুই দীর্ঘজীবী হয়ে এরূপে জগতে শ্রীরাম মাহাত্ম্য প্রচার করত জীবকুলের উদ্ধার সাধন কর।

তুলসীদাস তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভক্তি গদগদকণ্ঠে করযোড়ে বলিলেন—গুরুদেব! নররূপী সাক্ষাৎ দেবতা আপনি; দাসের যাহা কিছু শক্তি, সমস্তই ঐ পদ প্রসাদেই লাভ হইয়াছে; ইহাতে আমার কৃতীত্ব কিছুই নাই আমি অতি অজ্ঞ; জ্ঞানহীন, প্রেমভক্তি বিহীন, রামনামের মহিমা জানা আমার সাধ্য কই প্রভু? অনন্ত অনন্ত বদনে যাহা ব্যক্ত কর্ত্তে পারেন না, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে মহিমা বর্ণনে অশক্ত, ক্ষুদ্র আমি সেই মহতোমহিয়ানের মহিমা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব দেব! তবে গুরু আপনি, আশীর্ব্বাদ করুন—যেন রামপদে মতি রাখিয়া এ ছার জীবন অবসান কর্ত্তে পারি! আবার জয়ধ্বনি সহকারে জনমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া বিশ্বম্ভরের প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভানুদত্ত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তথাপি গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিল না।

ঘণ্টাকর্ণ বিশ্বম্ভরের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—পণ্ডিতজী! তুলসীদাস ও ভবানীকে আর কিছু পরীক্ষা করিতে চাও কি?

জনমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে বলিল—ছিঃ ছিঃ!

বিশ্বম্ভর লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন—না, আজ হইতে আমি তুলসীদাসকে আর পরীক্ষার কথা বলিব না—ভবানী যে নিষ্পাপ হইয়াছে, তাহা এই পরীক্ষায় স্বীকার করিলাম। তারপর সকলে ভগবান রামচন্দ্রের, তুলসীদাসের ও ভবানীর জয় এবং বিশ্বম্ভর পণ্ডিতজীর ক্ষয় চিন্তা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে সে দিনকার মত আপন আপন ভবনে প্রস্থান করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

চোরের উপদ্রব

আগুন কতক্ষণ চাপা থাকে, পাংশুজালে কতক্ষণ সে আবদ্ধ থাকিয়া আপন প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হয়? একটু বাতাস আসিলেই ছাই উড়িয়া যায়—অগ্নির প্রভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সাধক তুলসীদাসের তাহাই হইল। তিনি এতদিন নিজেকে অতি গোপনে রাখিয়া ভগবানের পদে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। কেহ ধরা-ছোঁয়া না পায়, কেহ তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতে না পারে, এইজন্য তিনি ছাই ঢাকা আগুনের মত এতদিন স্বইচ্ছায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের পরীক্ষারূপ বাতাস আজ তাঁহার সে আবরণ ঘুচাইয়া দিল। জগত জানিতে পারিল—তুলসীদাস একজন সিদ্ধ সাধক—মহাপুরুষ! তখন বড় বড় ধনীলোক তাঁহার

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। তুলসীদাস বেগতিক দেখিয়া তাঁহার সে আশ্রম ত্যাগ করত, অগস্তকুণ্ডের নিকট খুব একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু প্রকাশ হইলে কি আর লুকান থাকা যায়? ভক্তমণ্ডলী সেইখানেও গমন করিতে লাগিল। সাধু মহাত্মার কিছু আবশ্যক নাই, তিনি কাহার নিকট কিছু চাহেন না, তথাপি কোথা হইতে যে তাঁহার অর্থাগম হইতেছে—তাহা ভগবানই জানেন। এই সেদিন রামশর্ম্মা তাহার পুত্র জীবিত হওয়ায় সাধু বাবাকে এক প্রস্থত সোণার ও রূপার বাসন পূজার জন্য দিয়া গিয়াছেন।

তুলসীদাসের সামান্য কুটীরে ঐ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্যাদি দেখিয়া কত লোকের লোভ হইয়াছে; দস্যু তস্করগণ কেবল সন্ধান গ্রহণ করিতেছে—কখন তুলসীদাস বাড়ীছাড়া হইবেন, তাহারা ঐগুলি লইয়া চম্পট দিবে। তুলসীদাসের কুটীরত বড় অট্টালিকা নয়—যে তাহার মধ্য হইতে ঐ সকল দ্রব্য লইতে কষ্ট হইবে—বা সিঁদ কাটিতে পারিবে না সাধু একবার সরিলে বা দুই দণ্ড চক্ষু বুজিয়া বসিলেই কাজ হাঁসিল করা যাইবে, তুলসীদাস একবার কোথাও যাইলেই হয়।

আপনার তপঃশক্তি ক্ষয় না করিলে, মৃতের জীবন দান, প্রস্তর নির্ম্মিত যণ্ডের আহার গ্রহণ ইত্যাদি অমানুষিক ক্রিয়া দেখান হয় না; আর এ সকল না দেখাইলেও প্রভু রামচন্দ্রের মহিমা প্রচার হয় না, এই জন্য তুলসীদাস এই সকল কার্য্যে বিশেষ তপক্ষয় করিয়া, এখন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাই তপস্যা না করিলে আর চলে না। ভবানী কয়েক দিন হইল, দেশান্তরে গিয়াছেন—তুলসীদাসের কোন বিশিষ্ট আবশ্যকের জন্যই তিনি গিয়াছেন। কুটীরে এখন লোক নাই—বেশ জনশূন্য। তাই তুলসীদাস আজ সন্ধ্যার পর সামান্যমাত্র জলযোগ করিয়া ভগবানের পূজায় বসিবেন।

আজিকার পূজায় আড়ম্বর নাই; ফুল-চন্দন-তুলসী প্রভৃতি দ্রব্যাদি সংগ্রহের আবশ্যক নাই। ভক্ত নিজের মন-কুসুমে, ভক্তি-চন্দন মাখাইয়া ভগবানের পাদপদ্মে প্রদান করত মানসপূজা করিবেন। ইহাই যথার্থ পূজা—সাধক এই পূজা করিয়াই আপনার ইষ্টদেবকে প্রসন্ন করিতে পারেন, সাকারভাবে বাহ্যিকপূজা কতকটা চিত্তস্থির করিবার জন্য কিন্তু চিত্ত যার বশে আসিয়াছে—মন যার মনের মত হইয়া ডাকিতে শিখিয়াছে—তাহার আর বাহ্যিক পূজার তত দরকার হয় না।

সন্ধ্যার সময় তুলসীদাস একবার উঠিয়া গৃহে দীপদান করিলেন। তারপর কমণ্ডলু লইয়া নদীতীরে স্নানার্থ গমন করিলেন। আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পূজার ইচ্ছা, তাই স্নান না করিলে—এই দারুণ গ্রীষ্মে গৃহের মধ্যে অবস্থান করিতে পারা যাইবে না। ভক্ত ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইলেন। গৃহের দ্রব্যাদি সমস্ত চারিদিকে ছড়ান রহিল, কেবল দরজায় শিকলটী তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহী হইলে কত যত্নে, কত সাবধানের সহিত ঐসকল মহামূল্য দ্রব্য রাখিয়া যাইত কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুর সে চিন্তা নাই, সোণার বাসন-কোসনে তিনি মহামূল্যত্ব দেখিতে পান না, মহামূল্যত্ব তাঁহার রামনামে; পার্থিব দ্রব্যের মূল্য তাঁহার কাছে কিছু নাই।

একটী তস্কর ওত পাতিয়া বসিয়াছিল—সাধু চলিয়া যাইলে, ঐ দ্রব্য গুলি চুরী করাই তাহার উদ্দেশ্য, তুলসী চলিয়া যাইবা-মাত্র সে সেই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে জড়সড় হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল গৃহ-প্রজ্জলিত আলোর সাহায্যে স্বর্ণ রৌপ্যের দ্রব্যাদি সমস্ত একত্র করিয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, অমনি কোথা হইতে একটী তীক্ষ্ন তীর আসিয়া তাহার মস্তকের উপর দিয়া

চলিয়া গেল। তস্কর দেখিল—অদূরে একটি সুন্দর সুঠাম বালক রূপের প্রভায় বনভূমি আলো করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। তস্কর আর দাঁড়াইল না, অন্ধকারে বনের মধ্যে মিশিয়া গেল। এই রূপে কিয়ৎক্ষণ আর কাহার সাড়া পাওয়া গেল না—বালক আর দেখা দিল না।

লোভ সম্বরণ করা বড় শক্ত—বিশেষতঃ এতগুলি সোণা রূপার জিনিষ তস্করের চক্ষে পড়িলে সে লোভ সামলাইতে পারিবে কেন? আর যখন চুরি করিবার খুব সুযোগ রহিয়াছে, তখন কি ছাড়া যায়! রাত্রি অনেক হইয়াছে, বালক আর কতক্ষণ ঘুরিবে—এইবার সে নিজস্থানে চলিয়া গিয়াছে—এ বালক বোধ হয়, তুলসীদাসের কোন আত্মীয় হইবে। যাহা হউক, এতরাত্রে আর কেহ নাই, মনে করিয়া চোর আবার আসিল, গৃহ-প্রবেশ করিয়া আবার দ্রব্যগুলি লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু কাহার পদশব্দ শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে সাধু বাবাজী কুটীর সম্মুখে আসিলেন, তস্কর আর পলাইতে না পারিয়া কুটীরের একপাশে একখানি কালো কম্বল মুড়ি দিয়া অন্ধকারে পড়িয়া রহিল। সে জানে বাবাজী এখনি পূজায় বসিয়া ধ্যানস্থ হইবে—তাহা হইলেই সে দ্রব্যাদি লইয়া সরিয়া পড়িবে। আর হইলও তাই, ভক্তবীর তুলসীদাস ভাব গদগদ হইয়া বলিলেন—প্রভু! আর কতকাল এমন করিয়া ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিব—আর কতকাল তুমি আমাকে পরের মত অকূলপাথারে ফেলিয়া রাখিবে! পিতা ছাড়া পুত্র আর কতকাল একাকী বাহিরে বাহিরে ঘুরিবে দীননাথ! বড় বাসনা—একবার চর্ম্মচক্ষে তোমার সেই নবদূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ দেখে জীবন সার্থক করবো কিন্তু কই, সে সাধ কি পূর্ণ

কর্ব্বে না ঠাকুর! লীলাময় লীলাবশে কি অধমকে দেখা দিবে না? কিন্তু তা হবে না—তুমি যত চাতুরী করিবে, আমি তত তোমার সে চাতুরী ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিব। তুমি যাবে কোথায় প্রভু! ভক্তিরটানে তোমাকে যে আসিতেই হইবে? এই বলিয়া একেবারে সমাধীস্থ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার বাহ্যচৈতন্য কিছুমাত্র রহিল না!

"অয়মেব সময়ঃ" এই ঠিক সময় বুঝিতে পারিয়া তস্কর গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। রাত্রি তখন অনেক, প্রকৃতি নীরব, দারুণ অন্ধকারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত, অগস্তকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বের রাস্তা নির্জ্জন, কেবল বনের মধ্যে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ ঝিঁ করিতেছে, একটি নিশাচর পক্ষী বা পশুরও গতাগতি নাই! তস্কর দ্রব্যগুলি লইয়া যেমন পালায়ন করিবে, অমনি সেই বালক ধনুর্ব্বাণ লইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে—দেখিতে পাইল। তস্কর বুঝিল—সাধুবাবা! বুঝি এই বালকটীকে চর রাখিয়াছে, এ যেরূপ ধনুর্ব্বিদ্যা জানে, তাতে ত আমার একার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না, যাহা হউক—আজ পালাই, আর একদিন দেখিব কিন্তু মরি মরি! এমন বালক ত কখন দেখি নাই—যেন সাক্ষাৎ গোলোকের হরি, রূপের প্রভায় অন্ধকারে আলো ফুটেছে!

পুনরায় আর একটী ভীষণ শল্য গভীরশব্দে সেইদিকে নিক্ষিপ্ত হইলে তস্কর আর দাঁড়াইল না—প্রাণভরে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, তাহার এত সাধের, এত লোভের দ্রব্য সমস্তই পড়িয়া রহিল। এত তত্ত্ব হইতেছে—গৃহে চোর প্রবেশ করিয়াছে; তথাপি সাধুর চৈতন্য নাই, তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন—বাহিরে কি হইতেছে—কি না হইতেছে, ধ্যানস্থ সাধুর চিত্ত—তাহা জানিতে পারিল না, অন্তরে তিনি পরমানন্দে ভগবানের চরণ-মকরন্দের অমৃত পানে

বিভোর, তুচ্ছ বিষয়-বৈভব তাঁহার নির্লিপ্ত চিত্তকে বিব্রত করিতে পারিবে কেন?

যখন ধ্যান ভাঙ্গিল—তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে; সকলে স্ব স্ব কার্য্য ব্যপদেশে প্রস্থান করিতেছে; কাক কোকিল এতক্ষণ গাছের ডালে, মন্দির চূড়ে বসিয়া সূর্য্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল. যাই, লোহিত লোচন ভানু পূর্ব্ব গগনে বিকসিত হইলেন—তাহারাও অমনি আহারান্বেষণে নিজ নিজ কলরব করিতে করিতে বাসার বাহির হইল। তুলসীদাসের ছাত্রগণ আসিয়া আপনাদের বসিবার স্থান পরিষ্কার করিয়া নিজ নিজ পাঠে মন দিল। বাবাজী প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তাহাদের সম্মুখের আসনে সমাসীন হইয়া বলিলেন—কাল তোমাদের কোন্ বিষয় সন্দেহ ঠেকেছিল, বল দেখি?

১ম ছাত্র। প্রভু! আপনি বলেছেন, ভগবান রামচন্দ্র সকল জীবের হৃদয় মধ্যে বিরাজ কচ্ছেন কিন্তু সব মানবে সেই পরমাত্মার বিকাশ ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায় না কেন?

তুলসী। "সবহি ঘটমে হরি বসে, যেও গিরিসুতমে জ্যোতি।
জ্ঞান গুরু চকমক্ বিনা কৈসে প্রকট হোতি॥"

বৎস! সকল জীবের দেহে ভগবান আত্মারূপে বিরাজ কর্‌ছেন বটে কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন তাঁহার প্রকাশ হয় না। সকল পাথরেই আগুণ আছে কিন্তু লৌহের আঘাত ভিন্ন যেমন তাহার প্রকাশ হয় না, তেমনি গুরুর উপদেশ রূপ চকমকি ভিন্ন মানব হৃদয়ে কি প্রকারে সেই আত্মার প্রকাশ সম্ভব? অতএব বৎস! গুরুর উপদেশ মত ভজন-সাধন কর, তাহা হইলেই ভগবানের কৃপালাভ কর্ত্তে পারবে!

ছাত্র। প্রভো! আপনি ত আমাদের মহাগুরু—উপদেশ দিন, কেমন করে ভগবান রামচন্দ্রের ভজনা কর্ব্বো?

তুলসী। তুম্ জ্যায়সা রাম পর, তুম্‌সে ত্যায়সা রাম।
ডাহিনে যাওত ডাহিতে যায়, বামে যাওত বাম॥

বৎস! গীতাতেও ভগবান এই কথা বলেছেন—তুমি তাঁকে যেমন করে ডাকবে, তিনি তোমাকে সেইরূপ ভাবেই দেখা দিবেন। অনুকূলভাবে ভজনা কর, তিনি অনুকূল হবেন—প্রতিকূল ভাবে কল্লে তিনি প্রতিকূল হবেন। অতএব চিত্ত সংযত করে ভগবানকে অনুকূল ভাবে ভজনা কর! তাহা হইলে মনোবাসনা সিদ্ধ হবে।

ছাত্র। তবে অতি সংযতভাবে, সর্ব্বান্তকরণে ভগবানের চরণপদ্মে আত্ম সমর্পণ কল্লে—তবে তিনি সদয় হবেন?

তুলসী। হাঁ বৎস!
"যো যাকে শরণ লিয়ে, সো রাখে তাকো লাজ।
উল্‌টা জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ॥

যে যাহার শরণ গ্রহণ করে—সে তাহার মান নিশ্চয়ই রক্ষা করে থাকে। দেখ, জলের শরণাগত হয়ে, মৎস্য সকল অনায়াসে উজান জলে ভীষণ তরঙ্গ অতিবাহিত করে যেতে পারে—উহারা কত ক্ষুদ্র, কিন্তু বৃহদাকার হস্তি ভীষণ প্রতাপশালী হয়েও তাহা পারে না—তাহা ত জানে না?

ছাত্র। তাতো জানি, তবে ভগবানের শরণাগত হওয়া চাই—নতুবা কিছু হয় না?

তুলসী। হাঁ বৎস! প্রভু যে আমার শরণাগত প্রতিপালক, তাঁকে আত্ম সমর্পণ না কল্লে কি তাঁর দয়া হয়, তিনি দীন-জন-বল্লভ।

"নিজ দাসনকে ওর প্রভু, করত কৃপা অতি ভুরি।
ভক্ত কৃপা বৎসল হরি, জানত হ্যায় কবি শুরি ॥"

ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার অনুগত জনের প্রতি অতিশয় কৃপা প্রকাশ করেন, তিনি যে ভক্তবৎসল এবং ভক্তাধীন—তাহা কবি ও পণ্ডিত মাত্রেই জানেন।

সাধকবীর তুলসীদাস নানাপ্রকারে তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন। শিষ্যবর্গ গুরুদেবের মুখে সেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন, চারি-দিকে নিস্তব্ধতা বিরাজিত।

এমন সময় একজন লোক "বুক গেলো" সাধু বাবা রক্ষা করো, "বুক গেলো" বলিয়া আছাড় খাইয়া তুলসীদাসের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তুলসীদাস সশিষ্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন—কেন, কেন, কি হয়েছে! ভয় কি, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?

আগন্তুক অতিশয় কাতরতা সহকারে বলিলেন—বাবা! আমি আর এমন কাজ কখন কর্ব্বো না, কাল থেকে আমি চারিদিকে একটা কালো ছেলের চেহারা দেখে কেবল আঁতকে উঠছি, ঘুমুতে পাচ্ছি না, যেন চারিদিকেই সেই কালো ছেলেটার চেহারা আমায় ভয় দেখাচ্ছে। তুমি বাবা, তাকে বারণ করো, আর যেন আমাকে এমন করে সে ভয় না দেখায়, আমি আর চুরি কর্ব্বো না, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি আজ থেকে চুরি বিত্তে ছেড়ে দিলুম।

তুলসী। কে তুমি, কি বলছো! আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

আগন্তুক। বুঝবে কি করে বাবা! তোমার সোণা রূপার বাসন দেখে আমি চুরি কর্ত্তে এসেছিলাম কিন্তু একটা কালো ছেলে—

আমাকে তীর মেরে মেরেফেল্‌বার উদ্যোগ করেছিল, যতবার চুরি করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি, ততবারই সে তীর ছুঁড়েছে, তার পর প্রাণ নিয়ে পালিয়েও নিস্তার নাই, কেবল যেন ভয় দেখাচ্ছে, বাবা! তুমি না হয়, তোমার তাকে একবার ডাক, আমি তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাই।

তুলসীদাস বুঝিলেন—এ লোকটা তস্কর, আমার বাসন চুরি কর্ত্তে এসেছিল কিন্তু আমিত ঘরে ছিলুম না—অনায়াসেই ত নিয়ে যেতে পার্‌তো, কে একে বাধা দিয়েছিল; কালো ছেলে কে, আমার ঘরে ত কেউ ছিল না! হ্যাঁ বাপু! সে ছেলেটী কেমন, তার রূপ কিরূপ—দেখেছো কি?

আগন্তক। ওগো! আমি এখন যে আব্‌ছা আব্‌ছা দেখ্‌ছি, সে কালো হলেও যেন ভুবন আলো করে রয়েছে, কি তার বাণের তেজ—লাগেনি তাই, নতুবা কি রক্ষে ছিল?

তুলসী। হাঁ বাপু! তুমি কাকে আমার কুটীর চৌকী দিতে দেখেছো; তার আকৃতি প্রকৃতি কি রকম বল্‌তে পার কি?

তস্কর। সাধু বাবা! তার প্রকৃতি যেমন সুন্দর, দেহটীও সেইরূপ নধর, আমি তেমন খুবসুরৎ বালক কখন দেখি নি। তাই তাকে দেখে অবধি আমার কেবল তারই রূপ মনে হচ্ছে, চারিদিকেই সেই মোহন বালকের রূপ-মাধুরী দেখ্‌তে পাচ্ছি—সাধুবাবা! সে ছেলেটী কোথায়, একবার দেখাও না?

তুলসীদাস আর থাকিতে পারিলেন না। তস্করের মুখে তাঁহার কুটীর-প্রহরীর রূপ গুণ শুনিয়া ভাবমগ্ন হইয়া বলিলেন—তস্কর! তস্কর! ভাই আমার, এস তোমায় আলিঙ্গন করে, আমি ধন্য হই। আমি বেশ বুঝেছি সে শ্যামবর্ণ নধর বালক আর কেহই

নয়—আমারও অন্তর মধ্যে অবস্থিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। তস্কর, কে বলে তুমি তস্কর—মহাপাপী, তুমি অতি সৌভাগ্যবান—তোমার পুণ্যের তুলনা নাই; আমি আজন্ম তপস্যা করে যাকে দেখ্‌তে পাইনি—তুমি তস্কর হয়ে তাকে দেখ্‌তে পেলে! এইজন্য বলিতে হয়—তিনি যাকে দয়া করে দেখা দেন, সেই দেখ্‌তে পায়—নতুবা কেবল যোগ তপস্যাতে কিছু হয় না। হায় হায়! আমি এই সকল মূল্যবান বাসন গৃহমধ্যে স্থান দিয়ে কি কুকর্ম্মই করেছি! প্রভূকে আমার এই ধন রক্ষার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ কর্ত্তে হয়েছে? হায়, আমি কি নরাধম—আমার উপায় কি হবে? না আর না, আমি এসকল দ্রব্য আর ঘরে স্থান দিব না, এখনি এ সমস্ত বিতরণ করে দিবো! ভাই তস্কর! তুমি ঐ সকল দ্রব্য অনায়াসে গ্রহণ কর, স্ব-ইচ্ছায় আমি তোমাকে ঐ সকল দ্রব্য প্রদান কর্‌ছি।

তস্কর। সাধু বাবা! আর আমায় এমন কথা বলো না; আমার কিছুতেই আর দরকার নেই স্ত্রী-পুত্র, সংসার আর কোন দিকেই আমার মন টান্‌ছে না—কেবল মনে হচ্ছে, কখন্ সেই কালো ছেলেটীকে আর একবার দেখবো।

তুলসী। সাধু সাধু! আমি সাধু নয়, তস্কর তুমিই যথার্থ সাধু, পূর্ব্বজন্মের মহা সাধনা না থাক্‌লে—কখন জীবের এ ভাব মনোমধ্যে জাগে না। ভাই তস্কর! তোমার কোন সাধনার দরকার নাই, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে তুমি যাহা করিয়াছ—বহু বৎসর তপস্যায়ও তাহা করা যায় না।

তারপর আপনার ছাত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন—বৎসগণ! তোমরা ঐ সকল দ্রব্য এখনই দীন-দুঃখীগণকে বিতরণ করে এসো।

আহা! প্রভু আমার ঐ সকল ছার দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চোর তাড়াইয়াছেন! আমার ধন রক্ষার জন্য তাঁর এত কষ্ট হয়েছে। না জানি এতে আমার কত পাপ সঞ্চয় হয়েছে?

গুরু বাক্য অবহেলা করা মহাপাপ। ছাত্রগণ কি করিবেন—ঐ সকল সোণা-রূপার পাত্র গ্রহণ করিয়া দরিদ্র পল্লীতে বিতরণার্থ গমন করিলেন। গুরুদেবের ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়া গেল এবং একজন পাপী তস্করের সৌভাগ্য দেখিয়া মনে করিল, যোগ-যাগ সকলই বৃথা, সার কেবল তাঁর নাম গান—তিনি দয়া না কর্‌লে, যোগ-যাগ কিছুতেই কিছু হয় না। ভাই! তাঁকে প্রসন্ন করবার উপায় কি?

২য় ছাত্র। ভাই! তুমি যা বলেছো! নাম গান করে, কেবল কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকা, এ ছাড়া চিত্তশুদ্ধির আর কোন উপায় নাই, এইরূপ করিলে ভগবান দেখা না দিয়ে থাকৃতে পারবেন না। ভাই! আমি জানি ঐ মধু সর্দ্দার চিরকাল চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া কাল কাটাইয়াছে; তবে—সে যখন ঘরে থাকৃতো, কেবল ভগবানের নাম গান কর্ত্তো, আর ঐ চুরির ধন সব সে সংসারে লাগাতো না, কেউ খেতে না পেলে, কারুর কষ্ট দেখ্‌লে সে অকাতরে তাহা বিতরণ কর্ত্তো। এখন তার সৌভাগ্য দেখ, বিনা আয়াসে সে সাধনার ধন ভগবানকে দেখ্‌তে পেলে।

১ম ছাত্র। আর গুরুদেবের মত ঈশ্বর জানিত ব্যক্তির সঙ্গলাভ করেও ধন্য হলো, গুরুদেবের বাটীতে চুরি কর্ত্তে এসেছিল বলেই ত, নতুবা আরও কত জায়গায় করেছে—কই ভগবদ্দর্শন হয়েছে কি? কেবল গুরুদেবের পূজার দ্রব্যাদি চুরি

করিতে আসায়, তাহার এরূপ সৌভাগ্যদয় হয়েছে, কখন কিরূপে লোকের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়—কে বল্‌তে পারে, চোর রত্নাকর কি করে বাল্মীকি হয়েছিল, তাতো জান? এই বলিয়া যখন তাহারা দরিদ্র পল্লীর পথে প্রবেশ করিতে যাইবে—এমন সময় সেই তস্কর আসিয়া বলিল—আপনারা দয়া করে একটু দাঁড়ান, আমার ঘরে যা কিছু মহামূল্য দ্রব্য আছে—এনে দিচ্ছি, সেগুলিও ঐ সঙ্গে বিতরণ করে আস্‌বেন। এই বলিয়া সে দৌড়িয়া গৃহে গমন করিল এবং কতকগুলি রত্নালঙ্কার আনিয়া তাহাদের হাতে দিল। ছাত্রদ্বয় অবাক হইয়া তাহার প্রদত্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া একটী স্বর্ণকারের দোকানে বিক্রয় করত সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ বহু দীন-দরিদ্রকে বিতরণ করিয়া ধন্য হইল। মন যখন ঈশ্বরমুখী হয়, ধর্ম্ম-কর্ম্মে মজিয়া পড়ে—তখন আর তাহার জাগতিক কোন বস্তুতে লোভ থাকে না। মন গড়িয়া উঠিলে তখন সাধু-তস্কর এক হইয়া যায়। কর্ম্মফলে কেবল কিছুদিন দুষ্কর্ম্ম ভোগ হয় মাত্র।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিহিংসা

মন একবার কলুষিত হইলে, সহজে তাহাকে বশে আনা যায় না—তা সে পণ্ডিত হউক, আর মূর্খই হউক। মূর্খ ত কিছুতেই সুপথে আসে না, পণ্ডিতও আসিতে পারে না—আমাদের বিশ্বম্ভর পণ্ডিত তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। সেদিন কাশীতে সর্ব্বসমক্ষে তুলসীদাসের পরীক্ষা, ভবানী মিশ্রের পরাক্ষা দেখিয়া সকল লোক

তুলসীদাসকে মহাপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রস্তরের ষণ্ড ভবানীর হস্ত হইতে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করায় সকলেই তাহাকে নিষ্পাপ বলিয়া ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছে, সকলেই একবাক্যে বলিতেছে—তুলসীদাসের শিষ্য হইয়া সে এই অমানুষিক শক্তি লাভ করিয়াছে। বিশ্বম্ভর এমন সাধু মহাত্মার প্রতি অকারণ নিন্দাবাদ ও তাঁহার শিষ্যের প্রতি বৃথা দোষারোপ করায়, সকলেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছে; এখন লোকালয়ে তাঁহার মুখ দেখান ভার হইয়াছে। সভাস্থলে সেদিন তুলসীদাসের নিকট তাঁহাকে অপদস্থ হইয়া হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে।

পাণ্ডিত্যাভিমানী বিশ্বম্ভর সেদিন যাহাই করুন কিন্তু প্রাণে যেরূপ দাগা পাইয়াছেন, লোকের নিকট যেরূপ হতমান, গত-গৌরব হইয়াছেন—তাহাতে প্রতিশোধের বহ্নি তাঁহার প্রাণে এরূপভাবে প্রজ্বলিত হইয়াছে যে তিনি তুলসীর মত একজন সাধু মহাত্মাকে প্রাণে মারিতেও কুণ্ঠিত নহেন। আজ সেইজন্য প্রিয়শিষ্য ভানুদত্তের সহিত এই বৃন্দাবনের পথে আসিয়া উভয়ে ষড়যন্ত্র করিতেছেন—কিসে তাঁহাকে প্রাণে মারা যায়, কিসে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তুলসীদাসের নাম জগত হইতে লোপ করিতে পারা যায়!

ভবানীমিশ্র তীর্থ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই তুলসীদাস তাহার হস্তে চতুষ্পাঠির ভারার্পণ করিয়া এবং মধুসদ্দারকে বিশেষরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতে বলিয়া তিনি একবার কলির পরম তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কল্য শুভদিনে তিনি রওনা হইবেন। ভানুদত্ত এইকথা শুনিয়া আসিয়া গুরুদেব বিশ্বম্ভরকে বলিল।

বিশ্বম্ভর তুলসীকে মারিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন—এক্ষণে প্রিয়শিষ্য ভানুদত্ত প্রমুখাৎ তুলসীর বৃন্দাবন গমন ব্যাপার শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—বৎস! হইয়াছে; এইবার তুলসীদাসকে জগৎ হইতে সরাইবার সুযোগ-সুবিধা আসিয়াছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইহাই স্বর্ণ সুযোগ।

তখন কাশী হইতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাইতে হইলে কতক পথ বনে বনে কতক বা ভালপথে যাইতে হইত, পথও বেশ সুগম ছিল না, স্থানে স্থানে বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল। কিন্তু যাহাদের প্রাণ বিপদহারীর পদে সমর্পিত হইয়াছে—যাহারা বিপদ-সম্পদ সমান জ্ঞান করিয়াছে, যাহারা সন্ন্যাসী-সংসারের মায়াজাল কাটিয়াছে, এবং যাহারা অর্থাদি লইয়া পথ চলে না, তাহাদের দস্যু তস্করের ভয় কোথায়? তুলসীদাস মনে প্রাণে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার জন্য পথে বাহির হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন—প্রভু তথায় যুগল মূর্ত্তিতে বিরাজিত, তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সদাই ক্ষিপ্রহস্ত! তাই ভক্ত তুলসীদাস আর থাকিতে পারিলেন না, ভগবানের পাদপদ্ম পূজা করিতে বৃন্দাবনাভিমুখে রওনা হইলেন।

সমস্ত দিন পথ চলিয়াছেন, কোথাও বিশ্রাম করেন নাই। প্রাণ টানিলে, একবার প্রাণে ভগবদ্দর্শনের ইচ্ছা জাগিলে, ভক্তের প্রাণকে আর কে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? তখন তাহার দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, প্রাণের প্রাণ প্রাণময়ের জন্য জগতের কোন বাধা-বিপত্তিকেই গ্রাহ্য করে না।

দারুণ রৌদ্রের পথ অতিবাহিত করিয়া ভক্তবীর তুলসীদাস বৈকালে একটী বৃক্ষতলায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সম্মুখে অরণ্য; রজনী

আসিতে না আসিতেই কোন প্রকারে এই বনভূমি পার হইতে হইবে, নতুবা অন্ধকারে বনের পথ দেখা যাইবে না—চলিবার সুবিধাও হইবে না, এইরূপ মনে করিয়া উঠিলেন—বনের পথে প্রবেশ করিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দিবাভাগেই বন এত অন্ধকার, পথ এত দুর্গম, যে সহজে যাওয়া যায় না—রাত্রিকালে কাহার সাধ্য ইহার মধ্যে গমনাগমন করে?

তুলসীদাস যাইতে যাইতে একস্থানে শুনিতে পাইলেন—কে যেন আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে, "কে আছ! আমার প্রাণ যায়, রক্ষা কর, জল দাও!" তুলসীর কোমল প্রাণে দয়া হইল, সেই কাতর স্বর শ্রবণ করিয়া তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। পর দুঃখে কাতর প্রাণই ত সাধকের, সেই প্রাণেই ত ভগবানের রাজত্ব বিস্তার—এইজন্য সাধকগণ সর্ব্বভূতে ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তুলসীদাস সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। তিনি ডাকিয়া বলিলেন—"কে তুমি, বনমধ্যে বিপন্ন, কোথায় আছ, উত্তর দাও—আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" বিপন্ন উত্তর করিল—আঃ মশায়! ভগবান আপনার উন্নতি, করুন, আমি বৃন্দাবন যাইবার জন্য বাহির হইয়া পথে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাদের লগুড়াঘাতে আমার হস্তপদ ভগ্ন হইয়াছে, দারুণ পিপাসা—একটু জল দিতে পারেন? সম্মুখে বোধ হয় কূপ আছে, আমার উঠিবার ক্ষমতা নাই।

তুলসী। কে আপনি; কোথা হইতে আসিতেছেন?

বিপন্ন। কে আপনি, আমি জানি না—তবে আমার পরিচয় এই—আমি কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বম্ভর স্মার্ত্তবাগীশ—বৃন্দাবন

যাত্রার মনস্থ করিয়া রাস্তায় এইরূপ বিপদাপন্ন, জল! জল!! জল!!! বড় তৃষ্ণা।

তুলসী। অ্যাঁ কে আপনি, স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয়, বলেন কি? আমি আপনার দাসানুদাস তুলসীদাস। আমিও বৃন্দাবন যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি; হায় হায়! কোন্ পাষণ্ড আপনার এদশা কল্লে? কই, এ পথে ত কখন দস্যুর উপদ্রব শুনি নাই?

বিশ্ব। কে তুলসীদাস বাবাজী, আমার প্রাণের মহাত্মা তুলসীদাস! এতক্ষণে—এতক্ষণে বুঝলাম—আমি নিশ্চয়ই প্রাণ প্রাপ্ত হবো, এ যাত্রা আমার আর কোন ভয় নাই! বাবাজী! বড় তৃষ্ণা, কথা কহিতে অশক্ত, জল দাও!

"যে আজ্ঞা, প্রভু! এই আমি জল আনিতে চলিলাম" বলিয়া দয়া-প্রবণ-হৃদয় তুলসীদাস পণ্ডিতের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া নিজের ঝুলির মধ্য হইতে জলপাত্র বাহির করত শশব্যস্তে কূপ সন্নিধানে অগ্রসর হইলেন এবং পাত্রের গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া যেমন হেঁটমুণ্ডে জল উত্তোলন করিবেন। অমনি পশ্চাৎ দিক হইতে কে আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"যা শত্রু পরে পরে, বেটা, বড় নষ্টামী করে, আমাদের পশ্চাতে লাগিয়াছিলে—এইবার যমালয়ে যাও।" এই বলিয়া সে ব্যক্তি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—গুরুদেব! উঠুন, কর্ম্ম কেয়ালো করেছি, বেটাকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছি—এইবার আমরা নিষ্কণ্টক, চলুন গৃহে যাইয়া বাবা বিশ্বনাথের পূজা দিইগে।

ছলনার অবতার বিশ্বম্ভর গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—ভানু! আজ যথার্থ শিষ্যের কাজ করলি—তুই দীর্ঘজীবি হ।

পাঠক! ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা বুঝিলেন কি, বিশ্বম্ভরের মন

দস্যুতস্কর অপেক্ষাও নীচ নয় কি? পাণ্ডিত্য তাঁহার কোথায়, হৃদয়ে তাঁহার দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই, ইহা অপেক্ষা একজন মূর্খের হৃদয়ও যে অতি উচ্চ উপাদানে গঠিত, সেও যে উপকারীর প্রতি—এরূপ ধার্ম্মিকের প্রতি, এরূপ ভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেনা?

বৃন্দাবন যাত্রার ভাণ করিয়া গুরু-শিষ্যে এইরূপ ষড়যন্ত্র করত আজ তুলসীদাসের ন্যায় একজন পরমভক্তকে কিরূপ বিপন্ন করিল—তাহা দেখিলেন ত, এইজন্য বলিতে হয়—মন কলুষিত হইলে, তাহাকে সহজে ভাল করা যায় না; তা সে পণ্ডিতই হউক আর মূর্খই হউক!

বিশ্বম্ভর বলিল—দেখ ভানু! কাজ ত হাঁসিল হইল—এইবার এক কাজ কর, কতকগুলা লতা-পাতা আনিয়া কূপের মুখ বন্ধ করিয়া দাও—যদি বেটা চীৎকার করে এবং এই পথে কেউ যদি আসে, তাহা হইলে কেহ তাহার চীৎকার শুনিতে পাইবে না। এই বলিয়া তাহারা দুইজনে লতা-পাতা ছিঁড়িতে অগ্রসর হইল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, বনভূমির অন্ধকার আরও গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ভানুদত্ত ও বিশ্বম্ভর তুলসীদাসকে চাপা দিবার জন্য যেমন কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অন্ধকারে ঝোঁপের মধ্যে হস্তপ্রসারণ করিয়াছে। অমনি প্রথমেই ভানুদত্ত বিকট-স্বরে বলিল—গুরুদেব! হাত যে ছাড়াইতে পারা যাইতেছে না—কিসে যেন বাঁধা পড়িয়াছে, আমাকে রক্ষা করুন—ক্রমশঃ ভীষণ ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছি, একি হইল! বিশ্বম্ভর তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে দারুণ কষ্টজড়িত-স্বরে বলিল—"উহুঃ ভানু! আমারও যে তাই—হাত যে ক্রমশঃ টানিতেছে—প্রাণ যায়, আমাকে

রক্ষা কর!” তাহারা হাত ছাড়াইতে না পারিয়া বিষম টানাটানি ও চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে মরি মরি ওকি ও, কে ঐ যুবক, সুন্দর বরবপুধারী! তুলসীদাসকে কাঁধে করিয়া কূপমধ্য হইতে উপরে উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইল? তুলসীদাস তাঁহার জীবনরক্ষককে সেই অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না, এ কোনও দৈবশক্তি জানিয়া বলিলেন—দয়াময়, ভক্তের জীবন! অধম সন্তানকে দেখা দিলেনা, চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পেলেম না—কেবল অভয়প্রদান করিয়া বলিলে—“উঠরে বাছনী! কার সাধ্য তোকে বধ করে; তুই যে আমার হৃদয়ের ধন।” তবে কি প্রভু! শ্রীবৃন্দাবনে যাইলেই দেখা দিবে—এই কি তোমার অভিপ্রায়, আচ্ছা প্রভু! দাসানুদাস তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহে—তবে সেখানে রামজানকী মূর্ত্তি দেখিয়া যেন নয়ন সার্থক করিতে পারি! ভক্তবীর তুলসীদাস যেন শুনিতে পাইলেন—“বৎস! তাহাই হইবে—কাতর হইও না।”

তখন রজনী প্রভাত প্রায়! মনের আনন্দে তুলসীদাস যখন বনান্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিবেন—ঠিক সেই সময়ে দেখিতে পাইলেন, ভানুদত্ত এবং বিশ্বম্ভর নাগপাশে জড়িত হইয়া অসীম কষ্টভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল—তিনি নিকটে গিয়া বলিলেন—একি গুরুদেব! এ অবস্থা আপনাদের কে করিল?

তুলসীদাস পূর্ব্বের অবস্থা কিছুই জানেন না। ভানুদত্ত যে বিশ্বম্ভরের আদেশে তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এ বিশ্বাস তাঁহার সরল হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি মনে করিলেন—বৃন্দাবন যাইবার পথে বোধ হয়, এই বনের অন্ধকারে তাঁহারা নাগপাশে

আবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সত্বর নিকটবর্ত্তী হইলে বিশ্বম্ভর ভয়ে অভয় পাইয়া বলিল—মহাত্মন্! তুলসীদাস, আমরা আসিতে আসিতে অন্ধকারে বনমাঝে এইরূপে নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছি, কিছুতেই ছাড়াইতে পারিতেছি না; বৎস! তুমি মহাপুরুষ, দৈবশক্তি বলে আমাদের উদ্ধার কর, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি!

তুলসী। গুরুদেব! মহাত্মা বা মহাপুরুষ আমি নহি—সে আপনারা, তবে আমি যে শক্তিটুকু লাভ করিয়াছি, তাহা ঐ পদপ্রসাদে, আর শ্রীরাম কৃপাবলে। যাও সর্প দূরে যাও, ব্রাহ্মণদ্বয়ে ঘরে মুক্ত কর; ভগবান রামচন্দ্রের কৃপায় তোমাদের "জয়লাভ হউক"। বলিবামাত্র সর্পদ্বয় ভানুদত্ত এবং বিশ্বম্ভরের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। পাছে তাহারা কূপের মুখ লতাগুল্ম দ্বারা আবদ্ধ করে, এইজন্য ভগবৎ প্রেরিত হইয়া সর্পদ্বয় তাহাদের হস্ত বন্ধন করিয়াছিল, দংশন করিয়া ভবলীলা শেষ করায় নাই। তাহাদের কর্ম্মের ফল যে এখনও অনেক বাকী!

বন্ধন মুক্ত হইয়া বিশ্বম্ভর ও ভানুদত্ত তুলসীদাসকে বিবিধপ্রকারে আশীর্ব্বাদ করিল। তাঁহার প্রতি তাহাদের যে আক্রোশ ছিল, ক্ষণতরে তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তুলসীদাস শত্রু বা মিত্র কাহার তোষামোদ বা কাহার কৃপা ভিক্ষা করেন না। যাঁহার জন্য তিনি জগতে আসিয়াছেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য নিশিদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সাধিয়া বেড়াইতেছেন, সেই সাধনার ধন রাম রঘুনন্দনের কৃপা লাভই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য! তিনি জানেন—জগতে কেহ কাহার ভাল বা মন্দ করিতে পারেনা। ভগবান যাহা করান—জীব তাহাই করে, ভ্রমবশে

মনে করে বুঝি আমিই ইহার কর্ত্তা, কিন্তু কার্য্যের কর্ত্তা যে সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই।

উভয়ের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের প্রণাম করত তুলসীদাস অরণ্যের বাহির হইয়া রাম গুণগান করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন ধামের উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। বিশ্বম্ভর ও ভানুদত্ত বনের বাহির হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অভীষ্ট সিদ্ধি

শ্রীবৃন্দাবনের শোভা অতি রমণীয়—এমন নয়নানন্দদায়ক ধাম আর নাই। এখনও বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ভগবানের যে নিত্য লীলা, যে প্রকট প্রেমখেলা দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা অতি আশ্চর্য্য। একদিন ভগবান বলিয়াছিলেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" অধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে গেলে শ্রীভগবান ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবন কখনও ছাড়েন না, ছাড়িতে পারেন না, তাঁর ছাড়িবার ক্ষমতা নাই। এইস্থানে তাঁহাকে নিত্য রাস, নিত্য দোললীলা দেখাইয়া ভক্তকে নিত্যানন্দ দান করিতে হয়—এই হিসাবেও তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আবার বাহিরের এই শ্রীবৃন্দাবনধাম দেখিলেও ভক্তের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে; সেই শ্যামকুণ্ড, সেই রাধাকুণ্ড, সেই বংশীবট, সেই যমুনাতট, সকলই যেন এখনও শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণু-স্বরে মুখরিত—এখন যেন কুঞ্জের প্রত্যেক লতা-পাতা কালোরূপে মাখামাখি হইয়া কালীয়দমনের প্রেমলীলা প্রকট করিতেছে।

ভগবান শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন না বলিয়া যে সকলেই তাঁহার দর্শন পায়, তাহা নহে। এইজন্য একজন পরিব্রাজক শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করত যমুনাতটে বসিয়া সখেদে গাহিয়াছিলেন—

"যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও তোর বিমলতটে, রূপের হাটে, বিকাতো নীলকান্তমণি॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম, বলরাম, সুবোল, সুদাম;—
কোথা সে সুনীলতনুর ধেনু, বেণু, মা যশোদা রোহিণী॥
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,
ধরা-চূড়া-পরা কোথা ননী-চোরা;—
কোথা সে বসন-চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী,
কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী;—
কোথা সে বংশীধারী, রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী॥
কোথা সে নূপুর-ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিণী,
মধুর হাঁসি, মধুর বাঁশী, আর নাহি শুনি;—
ও যার মোহন সুরে, উজান ভরে, বইতে তুমি আপনি॥
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী;—
ও যার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইত ধরণী॥
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে! সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ-মাঝারে, পা দুখানি;—
(পরিব্রাজক বলে) চরণতলে লুটাত শির দিন যামিনী॥"

আমরা বলি—হাঁ ইহাই সেই যমুনা, ইহারই সুবিমল তটে গোপীকা পরিবেষ্টিত হইয়া যশোদার নীলমণি ক্রীড়া করিতেন। ভক্ত দেখে—রাধালতা জড়িত হইয়া বৃন্দাবনের সকল স্থানে শ্যাম-তরুর অপূর্ব্ব শোভা! এ তরু তমাল, পিয়াল বা হিন্তাল বৃক্ষ নহে, এ সেই সারাৎ-সার কল্পবৃক্ষ—শুধু রসনা তৃপ্তিকর ফলে ভরা নহে, ইহার আশ্রয় লইলে জীবের চতুবর্গ ফললাভ হয়—এই বৃক্ষ পুণ্যধাম বৃন্দাবনে ভক্তকে অভয় দিবার জন্য আপনার আধারে আপনি সর্ব্বক্ষণ দণ্ডায়মান—ভক্ত! ভয় কি, দেখ, ভগবান সর্ব্বত্র বৃন্দাবনের বনে বনে এখন ও ধবলী-শ্যামলী লইয়া গোচারণ করিতেছেন। হৃদয়ে চাহিয়া তারপর বাহিরে দেখ—সব ঠিক আছে, কিছুই যায় নাই—ভগবানের বাক্য সফল কিনা ভিতরে চাহিয়া দেখ যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহাই আছে দেহভাণ্ডে; এই দেহভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া নহে। হে ভক্ত এ দেহ আগে ভাণ্ডে ভগবানের রাস লীলার মহোৎসব দেখিয়া বৃন্দাবনে যাও—তবে লীলাময়ের লীলারসে রসিতে পারিবে। প্রাণ আগে ঠিক কর—তারপর তীর্থে যাইও, না যাও তাতেও ক্ষতি নাই, তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রই ত মহাতীর্থ, ইহাকে সকল তীর্থের সার ভাবিয়া তারপর বাহিরের তীর্থদর্শন কর—তাহা হইলে সকল স্থানেই তীর্থরাজের দর্শন পাইয়া চরিতার্থ হইবে।

তুলসীদাস বহুদিন পথ পর্য্যটন করিয়া বহু আয়াসে আজ সেই শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি গোপালজীর মন্দির দ্বারে কয়েকজন ভক্তকে নাম সংকীর্ত্তন করিতে দেখিয়া আনন্দ গদগদস্বরে কহিলেন—মহাশয়গণ! এই শ্রীবৃন্দাবনধামে আমার প্রভু কোন্ শ্রীমন্দিরে বিরাজ করেছেন—বল্‌তে পারেন?

ব্রজবাসীগণ তুলসীদাসকে একজন বিদেশাগত সন্ন্যাসী বুঝিয়া

বলিলেন—বাবাজী! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন; কোন প্রভুর মন্দিরে যাবেন।

তুলসীদাস অতি বিনীতভাবে বলিলেন—আমি কাশীধাম হইতে আসিতেছি; রামসীতার মন্দিরে যাইব; দয়া করে আমাকে বৃন্দাবন ধামের সেই মন্দিরটী দেখাইয়া দিন।

ব্রজ। বাবাজী! আপনি ভ্রমে পতিত হয়েছেন; এ মন্দির মদনগোপালজীর; এখানে রামসীতা মূর্ত্তি দেখ্তে পাবেন না। আপনি অন্যত্র যান—তাহা হইলে আপনার বাসনা পূর্ণ হবে!

তুলসী। মহাশয়! মদনগোপালের মন্দিরই আমার প্রভুর মন্দির, আমি স্বপ্নে দর্শন পেয়েছি। আপনারা দয়া করে দ্বার খুলে দিন, আমি প্রাণভরে আমার সাধনার ধনকে দেখে জন্ম সার্থক করি।

ব্রজ। বাবাজী! আপনি পাগল নাকি! আমরা প্রতিনিয়ত এখানে রয়েছি, এ রামসীতার মন্দির নয়, সে মূর্ত্তি এখানে নাই, তবে আমরা কেমন করিয়া আপনাকে সে মূর্ত্তি দেখাব?

তুলসী! ভক্তগণ! আপনাদের পদে আমার অসংখ্য প্রণাম, আজ অধমের প্রতি কেন এরূপ অসম্ভব কথা প্রয়োগ করছেন।

ব্রজ। অসম্ভব কি বাপু! তুমি কি আমাদের চেয়ে বেশী জান, আমরা প্রত্যহ এখানে ভগানের পূজা করছি!

তুলসী। মহাশয়! আপনারা নিত্য দেখিতেছেন—সত্য, কিন্তু আমার স্বপ্নদর্শনও ত অসত্য নয়, পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, নিত্য-নিরঞ্জন, ব্রহ্মরূপে চরাচরে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন—সকল স্থানেই সকলরূপে তিনি ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তবে আপনার কেন দাসকে

অবহেলা করছেন। নবদূর্ব্বাদল-রুচি, ধনুর্ব্বাণধারী আমার প্রভু এ মন্দিরেই আছেন, দয়া করিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বাসনা পূর্ণ করুন, আপনাদের পায়ে ধরি!

তুলসীদাসের কথা শুনিয়া ব্রজবাসীগণ কিয়ৎক্ষণ মুখামুখী করিয়া বলিল—এ ব্যাপার কি, সাধু বাবাজী পাগল না কি? আর এক জন বৃদ্ধ বলিল—দেখ, ভগবৎ প্রেমই মানুষকে পাগল কোরে তাঁহার যথার্থ সন্ধান বোলে দেয়, পাগল না হলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এ প্রেমিক সাধু বোধ হয়—সেই পাগল, ভাব দেখে আমার মন যেন ইঁহাকে মহা সাধু পুরুষ বলে বোধ কর্চ্ছে। তার পর বৃদ্ধ বল্লেন—সাধু বাবা! রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে রামসীতা দেখ্‌বেন—অকস্মাৎ আপনার অন্তরে এরূপ খেয়াল হলো কেন?

তুলসী। মহাশয়! আমি কল্য অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি—যে শ্রীবৃন্দাবনে মদনগোপালজী শ্রীরামরূপে বামে রাধারূপিণী জানকীদেবীকে লইয়া বসিয়া আছেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে, তাই স্বচক্ষে প্রভুর অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে দৌড়িয়া আসিয়াছি—দয়া করে দ্বার খুলিয়া দিন?

ব্রজবাসীগণ তুলসীদাসের সেই তপোক্লিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল—ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হইবেন ভাবিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; শশব্যস্তে মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিস্ময় পুলকনেত্রে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে বলিলেন—যা ভাবিয়াছিলাম—তাই, এই যে রামসীতার যুগলমূর্ত্তি! তাঁহারা শশব্যস্তে বলিলেন—আসুন, আসুন ভক্তবীর আজ আমাদের প্রভু আপনার জন্য অপরূপ রামরূপে সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছেন।

তুলসীদাস অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—মন্দির সিংহাসনে শ্রীরাম

সীতামূর্ত্তি বিরাজিত কিন্তু চূড়া ও বংশী ত্যাগ করেন নাই, তাই ভক্তি গদগদ ভাবে বলিলেন—

প্রভো! কহোঁ ছবি আজকী ভালেব্ নেছো নাথ।
তুলসী মস্তক তব্ নোয়ে ধনুসবাণ লেও হাত॥

হে নাথ ভক্তবৎসল! আজ আপনার অপূর্ব্ব এইরূপ বর্ণনার অতীত—কিন্তু হে প্রভো! চূড়া বংশী ত্যাগ করে, ধনুর্ব্বাণ ধারণ না করিলে তুলসী ত চরণে মস্তক নত কর্ব্বে না।

অভক্ত যাহা বিশ্বাস করে না, মনে ভাবিতেও পারে না, ভগবান ভক্তের সে অসাধ্য সাধ অচিরে পূর্ণ করেন। ভক্তবীর তুলসীদাসের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সেই তেজোময় মূর্ত্তি ধনুর্ব্বাণধারী রূপে বিরাজিত হইলেন—দৈবমায়া কে বুঝিতে পারে? আমি তুমি অভক্ত, ভগবানের এ অদ্ভুত লীলা বিশ্বাস করিতে না পারি কিন্তু যে ভক্ত, সে ভগবানের এ খেলায় কখন অবিশ্বাস করিবেন না। সকলে এই অপূর্ব্ব কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে গগনভেদী স্বরে চীৎকার করিল—

জয় রাধা মদন গোপাল জী কি জয়।
জয় শ্রীরামচন্দ্র জানকী মায়িকী জয়॥

তুলসীদাস করুণাময়ের এই অপূর্ব্ব করুণা খেলা দেখিয়া ভক্তিভরে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন:—

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

সীতার চরণেঃ—

দ্বিভুজাং স্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকন-তৎপরাং।
শ্রীরাম-বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥

তুলসীদাস কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—ভগবন্, ভক্তবৎসল! দাসের অপরাধ ক্ষমা কর, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য সাজ পরিবর্ত্তনে কত কষ্ট করলেন, দাস তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

দৈববাণী হইল—"বৎস! ভক্ত আমার প্রাণ, ভক্ত আমার সর্ব্বস্ব ধন—ভক্তের জন্য আমি দাহন যন্ত্রণা, বিষভক্ষণ, অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি অহরহ সহ্য করি—এমূর্ত্তি পরিবর্ত্তন ত কোন ছার! এজন্য তুমি কিছু মনে করো না, আজ তোর মত পরম ভক্তকে দর্শন করে কৃতার্থ হলাম।

সকলে তুলসীদাসের ভক্তিবল দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি যোড়হস্তে বলিলেন:—ভক্তবৃন্দ! আমি নরাধম, কেবল আপনাদের কৃপাবলে আজ আমার আরাধ্য পদ দর্শন হলো—এজন্য আপনাদিগকে কোটি কোটী নমস্কার করি! বলিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইতে উদ্যত হইলেন।

তাঁহারা "নমঃ নারায়ণায়" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর বলিলেন—মহাত্মন্। আপনার ভক্তির ইয়ত্তা নাই, আজ আপনার দর্শনে আমরাও কৃতার্থ হইলাম।

অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার পর তুলসীদাস আরও কয়েকদিন পবিত্র বৃন্দাবনে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রেমরসালাপে কালযাপন করিয়া সানন্দ-চিত্তে পুনরায় বারাণসী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আরোগ্য লাভ

সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহার সাফল্যে ভগবান সাহায্য করেন। সকলের ভাল করিব, দীনদুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়া অর্থের সদ্ব্যয় করিব—ছগনলালের এইরূপ সদিচ্ছা হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে বলিয়া তাঁহার সকল কার্য্যই সফল প্রসব করে। দুঃখীরামের অবস্থা যেরূপ সাংঘাতিক হইয়াছিল, যে ভীষণ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থল হইতে ছগন তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন—তাহাতে বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না। কেবল তাঁহার ও যশোদার ঐকান্তিক যত্নে ভগবান দুঃখীকে এ যাত্রা ফিরাইয়া দিয়াছেন। দুঃখী ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কবিরাজ বলিতেছেন—সমস্ত দুর্দ্দৈব কাটিয়া গিয়াছে, আর ভয় নাই।

দুঃখীরাম এখন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন—আহারে বেশ রুচি হইয়াছে। তিনি একদিন তাহার প্রাণদাতা ছগনকে বলিলেন—মহাশয়! আপনি বলেছিলেন—একটী পাগলী মেয়েকে আনিয়া ভাল করিয়াছি; তিনি আপনার বউদি হন কিনা, একদিন দেখাইব। এখন দয়া করে, একবার তাঁহাকে দেখান, সত্য সত্য যদি তিনি আমার বউদি হন, তাহা হইলে আমি সকল চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয়ে উঠি, নতুবা আপনার কৃপায় প্রাণ পাইলেও, তাঁহার দারুণ চিন্তা আমাকে জড়ীভূত করিয়া ফেলিতেছে।

ছগন। আচ্ছা! সেজন্য আর ভাবনা কি, অদ্য রজনী অধিক হইয়াছে, তিনি শিবালয়ে পূজা-জপে নিমগ্ন, এসময় বাধা দিব না; কল্য আহারাদির পর দেখা করাইয়া দিব। দুঃখীরাম আর কোন কথাই কহিলেন না—মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন আহারাদির পর ছগন যখন দুঃখীরামের কাছে আসিয়া বসিলেন, শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—দুঃখীরাম তখন বলিলেন—আজ্ঞে! হাঁ, খুব ভালই আছি আর কোনও গ্লানি নাই—তবে মনোমধ্যে কেবল ঐ এক চিন্তা।

"কিসের চিন্তা যুবক!" ভগবান তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনার ভক্তিভাব্ জ্ঞাপন কর! বলিয়া ছগনলাল দুঃখীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। "ভগবান ত মূলাধার" কিন্তু আপনি যাহা করিয়াছেন—তাহার প্রতিশোধ কি জীবনে কখন দিতে পারিব? একজন পথের ভিখারীর জন্য এমন নিঃস্বার্থভাবে উপকার, মানুষ কখনও করিতে পারিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমি চিরদিন আপনাদের পদে বিক্রীত থাকিব, এক্ষণে কল্যকার সেই সাধটা মিটাইয়া আমাকে দারুণ চিন্তার হাত হতে মুক্ত করুন।

ছগনলাল। কি সাধ যুবক, তুমি কি চাও?

দুঃখী। সেই যে আপনার আশ্রিতা পাগলিনী মেয়েটীকে একবার দেখাইবেন বলিয়াছিলেন। যাঁহার অন্বেষণে আসিয়া আমি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম—তিনি আমার বউদি কিনা একবার দেখিব।

ছগনলাল। ওঃ হাঁ হাঁ, তার জন্য আর চিন্তা কি, আমি এখনি ডাকিতেছি, বলিয়া তিনি কন্যা সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন —

মা! দেখো ত, পাগলী মায়ের পূজাদি এবং খাওয়া হয়েছে কিনা, তাহলে একবার তাঁকে সঙ্গে করে, এখানে নিয়ে এসো ত?

সরস্বতী আহারাদির পর, অপর একটী কামরায় বসিয়া তাহার সইয়ের জন্য কতকগুলি তুলসীর মালা গাঁথিতেছিলেন। পিতার কথা শুনিয়া উঠিলেন এবং শিবালয়ে যাইয়া তাঁহার প্রাণের সইকে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুঃখীরাম সেই মাত্র আহার করিয়া বালিসে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। পাগলিনীকে সঙ্গে লইয়া সরস্বতী পিতার নিকট আসিলে, তিনি পাগ্‌লী মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মা! এই ভদ্রলোক বহুদিন পীড়িত অবস্থায় এখানে রয়েছেন; কেবল তোমাকে দেখ্‌বার জন্য আমাকে অনবরত ব্যস্ত করেন—দেখতো, ইনি তোমার পরিচিত কিনা?

বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া যুবকের দেহের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়া গিয়াছে, সহজে চিনিবার উপায় নাই, তথাপি যাহারা বহুদিন একত্র কাটাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অচেনা থাকা যায় না। পাগলিনী ভাল করিয়া দেখিয়া অতীব আগ্রহের সহিত বলিলেন—"কে ও ঠাকুরপো! তোমার এ দশা করলে কে, হায়! হায়! আর যে চেনা যায় না?" দুঃখীর সেই অবস্থা দেখিয়া পাগ্‌লী মা কাঁদিতে কাঁদিতে ছগনকে বলিলেন—বাবা! বাবা! তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, আমার ঠাকুরপোকে বাঁচাও?

রোগজীর্ণ দুঃখীরাম তাঁহার নিরুদ্দিষ্টা বৌদিকে সুস্থ অবস্থায় দেখিয়া অতীব আগ্রহের সহিত বলিলেন—বউদি! পায়ের ধূলা দাও, চিন্তা করোনা—এই মহাপুরুষের কৃপায় আমি এখন বেশ সুস্থ

হয়েছি। বাঁচিবার আশা ছিল না; কেবল এই—বলিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুচ্ছন করিলেন।

ছগনলাল বলিলেন—যুবক! এত উত্তেজিত হইও না, এখনও তুমি ঠিক ভাল হইতে পার নাই; এই ঔষধটী খাও—বলিয়া কবিরাজ প্রদত্ত একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

দুঃখীরাম ঔষধ সেবন করিয়া বলিলেন—মহাত্মন্! যখন বউদিদিকে পেয়েছি, তখন আমার মরিলেও কোন ক্ষতি নাই। যার অন্বেষণের জন্য ডাকাতের হাতে আমার প্রাণ যাচ্ছিল—তাহাকে পেয়েছি, আর দাদার সন্ধানও পেয়েছি, তিনি কাশীতে আছেন, খুড়ীমাকে কাশীতে ভগবান দাস দোবের বাটীতে রেখে এসেছি, এইবার বৌদিকে তাদের কাছে পৌছে দিতে পারিলেই হয়।

ছগনলাল দুঃখীকে ঔষধ খাওয়াইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন—যুবক বেশী উতলা হইও না, আর তোমার জীবনের কোন ভয় নাই—যাহা ছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে ভগবান তোমাকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর তিনি গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া গৃহের বাহির হইলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—মা! তোমারা যুবকের নিকট কথাবার্ত্তা কও কিন্তু উঠিতে দিও না; আমি একবার আসি! এই বলিয়া শকটারোহণে কার্য্য স্থানে গমন করিলেন।

অপরিচিত স্থানে বহুদিনের পর কোনও আত্মীয়কে দেখিলে প্রাণের মধ্যে এমন একটা আনন্দ হয়, যাহা সহজে চাপিয়া রাখিতে পারা যায় না। রত্নাবলী স্বামীর অদর্শনে হতাশ হইয়া পাগল হইয়া ছিলেন; সে ভালবাসার পবিত্র স্মৃতি প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিয়া তাহাকে পাগল করিয়াছিল। ছগনলাল বহু চিকিৎসায় আরাম

করিয়া স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিবেন, আশা দিয়া তাঁহাকে আবার প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। এক্ষণে দুঃখীরামকে তাঁহার আলয়ে দেখিয়া, তাহার মুখে স্বামী ও শাশুড়ীর কুশল সংবাদ শুনিয়া রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুরপো! তোমাকে এমন করে মাল্লে কে, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে; বেশী উতলা হয়োনা, আস্তে আস্তে বল?

দুঃখী। বউদি! দাদার অন্বেষণে বাহির হয়ে,প্রথমে তোমাকে আন্‌তে তোমার বাপের বাড়ী গেছলাম—সেখানে গিয়ে শুনলাম, তোমার মাথা খারাপ হয়ে কোথায় চলে গেছো, তোমার মা, কান্নাকাটী কচ্ছেন; দেখে আর কি কর্ব্বো, খুড়ীমাকে সংবাদ দিয়ে বরাবর কাশী গিয়ে দাদার সন্ধান পেলাম। তিনি তখন সেখানে ছিলেন না—তবে তিনি একজন বড় পণ্ডিত এবং খুব ভক্ত হয়েছেন, অনেকগুলি ছাত্র রেখে টোল খুলেছেন শুনে—বাড়ী গিয়ে খুড়ীমাকে আন্‌লাম; পথে আসবার সময় কতকগুলি লোকের মুখে শুনলাম,—একটী সোমত্ত মেয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—গোঁসাইগঞ্জের ছগনলাল চৌবে তাঁহাকে নিয়ে গেছে, তাদের কথা শুনে তোমার কথা মনে হলো, তারপর খুড়ীমাকে কাশীতে রেখে, মনে করলুম—একসঙ্গে বউদিদি ও খুড়ীমাকে দাদার কাছে পৌছে দিবো, এই মনে করে—তাঁকে ভগবানদাস দোবের বাটীতে রেখে এসে, তোমার অন্বেষণে বাহির হয়ে, পথে এই দুর্দ্দশা, ভাগ্যে এই পরম দয়ালু মহাপুরুষের নজরে পড়েছিলাম, নতুবা আমার আর জীবন থাকতো না—আমি প্রায় জ্ঞানহারা হয়েছিলাম।

রত্না। ভগবান রক্ষে করেছেন, ঠাকুরপো! এখন তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?

দুঃখী। বউদি, এখন আমার আর কোন কষ্ট নাই—বেশ

আছি, একটু উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারলেই তোমাকে নিয়ে যাই; খুড়ীমা কি মনে কচ্ছেন জানিনা!

রত্না। ঠাকুরপো! ভগবান যখন তোমাকে এখানে এনে দিয়েছেন—তখন আর ভাবনা নেই, তুমি আর বেশী কথা কইও না, এই দুধটুকু খেয়ে একটু বিশ্রাম কর, আমি আবার রাত্রে আস্‌বো এখন। এই বলিয়া রত্নাবলী সরস্বতীর [illegible] অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর প্রাণ আজ হর্ষযুক্ত, হৃদয় আশায় ভরা!

আর দুঃখীরামও খুব আনন্দিত। যাহার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন—আজ ভগবান তাঁহাকে চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দিয়াছেন; ইহাতে কার না আনন্দ হয়? এইবার একটু উঠিতে পারিলেই, তিনি তুলসীদাসের সংসার-বিরাগ চূর্ণ করিয়া দেশে লইয়া যাইবেন। ভগবান রামচন্দ্র অনুকূল হইয়াছেন—আর ভয় নাই।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরিণয়

প্রাণের আবেগ-উদ্বেগ কাটিয়া গিয়াছে, দুঃখীরাম দিন দিন মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইয়া কান্তিপুষ্ট হইতে লাগিলেন। দুঃখীর দৈহিক সৌন্দর্য্য অতি পরিপাটী—এই অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ-জ্যোতি দেখিয়াই সৌন্দর্য্যপ্রিয় তুলসীদাস দুঃখীর এত বশীভূত হইয়াছিলেন—প্রাণের বন্ধু বলিয়া তাঁহার তিলেক অদর্শন অসহ্য বোধ করিতেন। তুলসী যেমন স্বরূপ—দুঃখীরামও তদনুরূপ, তাই তাঁহাদের প্রাণের ভালবাসা এত গাঢ় হইয়াছিল। অভাব গ্রস্ত

দুঃখীরামকে তাই তিনি মার পেটের ভাইয়ের মত অর্থাদিদানে প্রতিপালন করিতেন—কখনও কোনপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে দিতেন না নিজেও যেরূপ ভাবে থাকিতেন—দুঃখীকেও সেইরূপ ভাবে রাখিতেন। তাই দুঃখীরাম দাদা বলিতে অজ্ঞান হইত—প্রাণ দিয়াও তাহার উপকার করিতে ছাড়িত না, পাঠক! দুঃখীরামের কার্য্য কারণ দেখিয়া বোধ হয়, সে বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ করিবেন না, আজকাল জগতে এরূপ বন্ধুত্ব সুদুর্লভ!

রোগ সারিয়া গেলে—দৈহিক সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইতে কত দিন লাগে? দুঃখীরাম কয়েক সপ্তাহ মধ্যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, কান্তিবিশিষ্ট হইলেন। সে সৌন্দর্য্যজ্যোতি দেখিয়া দুঃখীরামকে সকলেই ভাল বাসিতে লাগিল। তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিল—দুঃখীরাম সামান্য দিনের মধ্যে সকলের এমন কি দাস-দাসীর পর্য্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। ছগনলালের ত কথাই নাই, তিনি যুবককে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়া, আজ এমন সৌন্দর্য্যশালী করিয়াছেন—ভগবান তাঁহার সৎকর্ম্মের ফলদান করিয়া মুখরক্ষা করিয়াছেন। ছগনলাল দুঃখীরামকে আর ছাড়িতে পারেন না, তিনি চলিয়া যাইলে পাগলী মাও আর থাকিবে না; এত মাথামাখী, এত একপ্রাণতা, হঠাৎ কেমন করিয়া ভুলা যায়?

দুঃখীরাম প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া যত যাইবার জন্য প্রার্থনা করেন, ছগন ও যশোদা তত বলেন—বাবা! এখনও ভাল করে অসুখ সারে নাই—আরও কিছুদিন থাক, জলে ত আর পড়ো নাই?

সে কথা শুনিয়া দুঃখীরাম কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বলিতেন—সে কি মা! জলে পড়া কি, আমি ঠিক স্বর্গে আছি; পিতামাতার আদর-ভালবাসা

আমি জীবনে কখন পাই নাই—তাঁহারা অতি শৈশবেই আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ভগবান আমাকে এক্ষণে সেই অজ্ঞানিত আদর-যত্নে সুখী করিতেছেন—আপনারা যে আমার পিতামাতা, ছেলে বাপ-মায়ের কাছে কি আবার কষ্ট পায়?

যশোদা ও ছগন দুঃখীরামের এই নম্রতায় গলিয়া যাইতেন—যাইবার কথা বলিলে—কাঁদিয়া ফেলিতেন। একদিন ছগন ও যশোদা রত্নাবলীকে ডাকিয়া কি পরামর্শ করিলেন—তখন সরস্বতী কার্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছিল। রত্নাবলী বলিলেন—খুব ভাল হয়, যুবক জাত্যাংশে যে খুব ভাল, সে বিষয় আমি জানি; আমাদেরই আত্মীয় তবে গরীব—আমাদের যজমানের আয়েই উহার ও উহার মামীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়, দরিদ্রতা ব্যতীত দুঃখীরাম সর্ব্বাংশেই সরস্বতীর উপযুক্ত।

যশোদা—বলিলেন মা! দরিদ্র বলিয়া কি হইবে, আমরা ত উহার কাছে কিছু আকাঙ্ক্ষা করি না বরং আমাদের এই বিশাল বৈভবের ঐ একমাত্র মালিক হইবে! আমাদের আর কে আছে মা; ছেলেটী দেখছি, সর্ব্বোতাভাবে সরস্বতীর উপযুক্ত!

রত্ন। সে পক্ষে সন্দেহ নাই, ইচ্ছা যদি হয় ত করুন না—ভালই ত!

ছগন। মা! ইচ্ছা খুব, তবে তোমাকে দুই জনের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা ত কিছু বলিতে পারিব না?

সে জন্য চিন্তা নাই—আমি সব ঠিক করিব। এই বলিয়া তিনি সরস্বতীর নিকট গমন করিলেন। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, প্রত্যহ তাঁহারা এই সময় পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে গমন করেন, ফুল তোলেন, তার পর গাত্র ধৌত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

আজও সেইরূপ করিবার জন্য রত্নাবলী সরস্বতীকে ডাকিলেন। সরস্বতী অন্যান্য দিনের মত সইয়ের সহিত বাগানে গমন করিয়া ফুল তুলিলেন।

রত্নাবলীর আজ আনন্দ ধরেনা। প্রিয়বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন, প্রাণের দুঃখী স্বামীর অন্বেষণ করিয়া তাহাকে লইতে আসিয়াছে। বহুদিন পরে প্রিয়দর্শন; ইহাতে স্ত্রীলোকের আনন্দ হইবে না ত কি? রত্নাবলী যে স্বামীকে হিতকথা বলিতে গিয়া বিপরীত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এক্ষণে কেমন করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবেন, এই চিন্তায় বিভোর হইয়া সতী আজ সরস্বতীকে ছাড়িয়া ভিন্ন দিকে চলিয়া আসিছেন। ক্রমশঃ যে রাত্রি হইতেছে, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই।

রত্নাবলীকে দেখিতে না পাইয়া সরস্বতী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—সই—সই—ও সই!

রত্নাবলী সাড়া দিয়া বলিল—কেন সই।

সরস্বতী। তুমি কোথা সই?

রত্ন। আমি প্রায় জলসই?

সরস্বতী বলিল—ভাই, গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো; আর উঁকি মেরে কি দেখছো?

রত্ন। কি আর দেখবো, দেখছি তোর বর!

সরস্বতী আহ্লাদে বলিল—তুই তবে মর।

রত্ন। কেন ভাই, তোর বর কি আমার পর?

সর। তবে যা খুসী তাই কর, আমি চলে যাই ঘর।

রত্ন। ভাই, হতে না হতেই এত, হলে না জানি কত হবে?

সরস্বতী একটু মুখভার করত সানবাঁধান ঘাটের চাতালে

আসিয়া ফুলগুলি রাখিয়া রত্নাবলীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় রত্নাবলীও সঞ্চিত ফুল লইয়া সেই গাদায় মিশাইয়া দিয়া বলিল—আজ অনেক ফুল হয়েছে! ঠাকুরের মালা খুব জবর হবে। এই বলিয়া দুইজনে মালা গ্রন্থণে লিপ্ত হইয়া রত্নাবলী তাঁহার মনের অভিপ্রায় ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিলেন। তাহাতে সরস্বতী বাহ্যিক রাগ দেখাইয়া রত্নাবলীর গাল টিপিয়া দিল বটে কিন্তু মনে মনে বলিল—এমন দিন কবে হবে, যে অমন ললিত ললামকান্তি পতি লাভ করিয়া ধন্য হব—সদাশিব কি আমার সে বাসনা পূর্ণ করবেন। যে দিন হইতে যুবক ভাল হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, সেইদিন হইতে ভগবানের নিকট ঐ প্রার্থনাই ত জানাইয়াছি, দেবতা কি তবে সত্য সত্যই বাসনা পূরণ কর্বেন? সই যখন এ কথাটা উত্থাপন করছে, তখন নিশ্চয়ই ও সমস্ত জানে, যুবক ওর আত্মীয় এবং বাবা মারও বোধ হয়—ইচ্ছে আছে নতুবা সই, আজ হঠাৎ এ কথা তুলিবে কেন? ভগবান তুমি সত্য!

মালা গাঁথিয়া শেষ করিতে এবং সরস্বতীর মনোভাব অবগত হইতে আজ অনেক রাত্রি হইয়া গেল। অন্যদিন সকাল সকাল তাঁহারা বাড়ী ফিরিয়া যান, আজ এখনও দেখা নাই দেখিয়া যশোদা ঘাটে আসিয়া ডাকিলেন—হ্যাঁগা মায়েরা, আজ কি এখনও গা ধোওয়া হয় নাই? এত রাত্রি অবধি জলে পড়ে থাকুলে অসুক কর্বে যে, উঠে এস।

যশোদাকে দেখিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি জল ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন এবং ঠাকুরের জন্য গাঁথা মালা দুই ছড়া লইয়া অন্দরাভিমুখে চলিলেন। সরস্বতী শীঘ্র বাড়ী গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আজ তাড়াতাড়ি শিবমন্দিরে প্রবেশ করিল। সদাশিবের চরণপূজায় আজ তাহার আগ্রহ কিছু বেশী।

সরস্বতীর মনোগত ভাব যশোদাকে জ্ঞাপন করিয়া রত্নাবলীও কাপড় ছাড়িতে নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। .

এখন দূতীগিরির অনেক বাকী, সবেমাত্র আজ সরস্বতীর মন জানা হইল। স্ত্রীলোকের মন সহজেই নরম করা যায়, বিবাহে স্ত্রীজাতিকে রাজী করিতে বেশী সময় লাগে না, যদি বর মনের মত রূপবান হয়, তাহা হইলে রমণী তাহাতে সহজেই মজিয়া যায়। দুঃখীরামের ন্যায় রূপবান পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে কে না রাজি হইবে?—এ পুরুষ রতনের পদসেবা করিয়া ধন্য হইতে কার না ইচ্ছা, কিন্তু এক্ষণে দুঃখীরামকে রাজী করা শক্ত; সে কি এ অবস্থায় আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে? দেখি ভগবান কি করেন।

দুঃখীরাম আজ রাত্রে কিছুই খাইবে না। বেলায় আহার করিয়া বেশী কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই—প্রকাশ করায় রত্নাবলী একবাটী দুগ্ধ লইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন—ইচ্ছা, এই সময় তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। যে দিন হইতে বউদিদির সহিত দুঃখীরামের দেখা হইয়াছে; সেইদিন হইতে তিনিই প্রায় তাঁহাকে জলখাবার প্রদান করেন। কেবল অন্ন ভোজনের সময় তিনি যশোদার নিকট জননীর আদরে আহার করিয়া থাকেন। •

দুগ্ধ হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিয়া রত্নাবলী বলিলেন—ঠাকুরপো! আজ এত কি খাইয়াছ যে, রাত্রে কিছু খাইবে না?

দুঃখীরাম বলিলেন—মা! আজ জেদ করিয়া দ্বিগুণ আহার করাইয়াছেন, তাই এখনও আহারে ইচ্ছা হয় নাই, বৌদি! যাহা হউক, মায়ের আদর বটে!

রত্নাবলী। তা আর বল্‌তে, এমন উদার-হৃদয়, পরদুঃখকাতর পরিবার আমি আর কোথাও দেখি নাই!

দুঃখী। নাই, তা দেখবে কি, আমিত এত দেশ ঘুরেছি, আমিই দেখি নাই—তা তুমি!

রত্নাবলী সময় বুঝিয়া বলিলেন—ভাই! আজ আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে?

দুঃখী। কি অনুরোধ বউদিদি, এখানে আমি তোমার কি অনুরোধ রাখ্‌তে পারি?

রত্নাবলী। সে এমন কিছু নয়—যদি রাখত বলি।

দুঃখী। সাধ্য হয় রাখ্‌বো—তুমি বলোনা!

রত্নাবলী সাহসে ভর করিয়া বলিলেন—দেখ, আজ সকালে বাবা (ছগন) বল্‌ছিলেন—সরস্বতীর এখনও বিয়ে হয় নাই—মনের মত পাত্র পাওয়া যায় না বলে, তাঁর বিয়ে দেন নাই। এখন আমার মুখে তোমার পরিচয় পেয়ে, তাঁরা তোমার সহিত সম্বন্ধ রাখ্‌তে ইচ্ছা করেন, তা হলে আমার সহিতও তাঁদের সম্বন্ধ চির অক্ষুণ্ণ থাকে—এক্ষণে তোমার সে বিষয়ে মত কি?

দুঃখী। বউদি! তুমিত জান—আমার অবস্থা, আমি একপ্রকার তোমাদের অন্নেই প্রতিপালিত, দাদা দয়া করে শিষ্য-যজমানের ভার দিয়েছেন—তাই চলে, তার উপর এমন একটী ধনীর কন্যা বিয়ে করে, আমি কেমন করে চালাব? আর আমার মত দরিদ্রের সহিত কি সরস্বতীর বিবাহ শোভা পায়, বউদি! তুমি এরূপ অন্যায় অনুরোধ করছো কেন?

রত্না। ভাই! ইহাঁরা ত ধনী-দরিদ্র দেখিবেন না, ইহাঁরা সৎপাত্র চান, এঁদের অর্থের অভাব কি? একমাত্র সরস্বতীরই সব—আর ইহাদের পুত্র-কন্যা নাই। তোমার স্বভাব চরিত্র দেখে বড় পছন্দ হয়েছে, তাই আমাকে বল্‌তে বলেছেন; তুমি ইহাঁদে

দ্বারা যেরূপ উপকার পেয়েছ—তাতে ইহাঁদের কথা ঠেলিয়া ফেলা উচিত নয়! আর আমিও সইয়ের বিয়ে তোমার সঙ্গে দিতে পারলে খুব খুসী হব, কারণ মেয়েটী নামেও যেমনী—গুণেও তেমনী, ভাই! তুমি আর অন্যমত করোনা—কৃতজ্ঞ প্রদর্শনের এই সুবর্ণ সুযোগ! এই বলিয়া রত্নাবলী আনন্দচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দুঃখীরাম শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—ইহাতে আমার কৃতজ্ঞপ্রদর্শণ করা কি হইল? এত আমার সৌভাগ্য, ছগনলালের ন্যায় মহাত্মার জামাতা হওয়া বহুভাগ্যের বিষয়; দাদা ও বউদিদির মিলন করিয়া কার্য্যটী সমাধা করিলেই ভাল হইত কিন্তু যেরূপ জেদ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় বিবাহ অগ্রেই হইবে—তথাপি একবার বলিয়া দেখিব, যদি বাধা দিতে পারি!

শ্বশুর শাশুড়ী প্রকারান্তরে জনক-জননী সমান-শাস্ত্র এই কথা বলেন। এমন মহৎহৃদয়ের ছায়াতলে থাকিলে যে জীবন ধন্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তারপর সরস্বতী, বউদিদি যখন বলিলেন—অমন মেয়ে আর হয়না, তখন আর কথা কি? জানিনা ভগবান আমাকে কোন দিক দিয়া কিরূপ কার্য্যে ব্রতী করিবেন—তবে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মানুষ আমরা তাঁহার কলের পুতুল—যেমন চালাইবেন, তেমনিই চলিতে হইবে—নিজস্ব ত কিছু নাই?

আনন্দে সমস্ত রাত্রি দুঃখীরামের নিদ্রা হইল না, কাঙ্গালের ছেলে আজ রাজা হইতে চলিয়াছে। ছগনলালের অতুল বিষয়ের উত্তরাধিকারী হওয়া বড় সহজ সৌভাগ্য নয়! দুঃখীরাম কিছুদিন পরে রাজজামাতা হইবেন—তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর ধার্ম্মিক যুবক, ভগবানের দিক হইতে গুণের ঠিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইল! ভাগ্য

যে কাহার কখন কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়—তাহা কে বলিতে পারে?

রত্নাবলীর মুখে উভয়ের মতামত শুনিয়া ছগনলাল সরস্বতীর বিবাহে মহা উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। একমাত্র কন্যা, অর্থেরও অভাব নাই—ইহাতে কিরূপ সমারোহ হওয়া উচিত পাঠক তাহা মনে মনে চিন্তা করুন। দুঃখীরাম উদ্যোগ আয়োজন হইতে দেখিয়া আপনার মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন—বউদিকে দাদার সহিত মিলাইয়া দিয়া এই কার্য্য করিলে ভাল হইত। তাহাতে ছগনলাল বলিলেন—বাবা! সে আর বেশী কথা কি? যখন সমস্ত সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তখন দুই এক সপ্তাহ বিলম্ব হইলে, আর ক্ষতি কি হইবে?

যে প্রাণ দান করিয়াছে—তাহার মুখের উপর কথা কহা যুক্তিসঙ্গত নয়। দুঃখীরাম আর কোন কথা কহিলেন না। চৌবেজীর বাড়ীতে বিবাহের খুব ধুম পড়িয়া গেল। আত্মীয়-স্বজন আসিয়া অট্টালিকা সরগরম করিল—নহবৎ খানায় নহবতের সাড়া পড়িয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জ গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সরস্বতীর বিবাহে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া খাটা-খাটুনি করিতে লাগিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল। সরস্বতী মনোমত পতি পাইয়া সুখিনী হইলেন—আর দুঃখীরাম আশার অতিরিক্ত লাভ করিয়া ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ছগনলাল ও যশোদা আজ মনোমত সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া জীবনের একটী মহা দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। আর রত্নাবলী তাঁহার সইকে আপনার করিয়া লইয়া প্রাণের ভালবাসা দানে কৃতার্থ হইলেন। সরস্বতী যেমন গুণবতী, দুঃখীরামও তেমনি;

"যোগং যোগ্যেন যুজ্যতে"। ভগবান আজ এ রাজযোটক মিলনের কর্ত্তা হইয়া পরম ধার্ম্মিক ছগনলালের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

এ বিবাহ-উৎসবের জের বহুদিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। যে ছগনলাল সামান্য একটী কার্য্য উপলক্ষে, বহু ব্যয় বাহুল্য করেন—আজ তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহে এরূপ আশাতীরিক্ত না হইলে মানাইবে কেন? বিবাহে যে যাহা চাহিল—ছগন কাহাকেও বিমুখ করিলেন না। জামাতা দুঃখীরামকে উপঢৌকন আর কি দিবেন, বলিলেন—বাবা! আজ হইতে এ বিষয়-বৈভব সমস্ত তোমাদের, তোমরা সুখে সংসার কর, আমরা এইবার উভয়ে পরকালের চিন্তায় নিরত হইব। আর কেন, সময় ক্রমশঃ ত নিকটবর্ত্তী হইতেছে?

"কার ভাগ্যে কি লেখা, লিখেছ হে সখা, না জায় চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়"। আজ আবার ভক্তের এই গানটী আমাদের মনে পড়িল; দুঃখীরামের ভাগ্যে যে এরূপ লেখা ছিল—তাহা কে জানিত? দুঃখীরাম অতুল ধনের অধিপতি হইয়াও নিজের দীনতা হারাইলেন না, তিনি যেরূপ নম্র প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিলেন—যেরূপ পূত-চরিত্রে তিনি সকলের উপকার করিতেন, এখন এ বিষয়-সম্পত্তি পাইয়া সে বিষয়ের খুব উন্নতি হইল। দীন দরিদ্র অতুল বিষয়-বৈভব পাইলে যেমন অহঙ্কারে মত্ত হয়, দুঃখীরামের তাহা হইল না তিনি—"যথা পূর্ব্বং তথা পরং" বরং তাহা অপেক্ষা আরও নম্রভাব ধারণ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পথিমধ্যে

প্রাণের প্রাণ প্রাণময়কে দর্শন করিয়া তুলসীদাস ভাবে গদ-গদ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কোন্ পথ দিয়া কোথায় আসিতেছেন—তাহার স্থিরতা নাই। মন উদাস হইলে, প্রাণ ভাবসাগরে ডুবিয়া পড়িলে—ভক্তের প্রাণ জগতের কোন বিষয় বুঝিতে পারে না—সব ভুলিয়া যায়। তুলসীদাস পথ ভুলিয়া গিয়াছেন; কোথায় যাইতে—কোথায় যাইতেছেন, তাঁহার চৈতন্য নাই—অনবরত চলিয়াছেন। ভক্ত জানেন—সকল স্থানেই যখন তাঁহার প্রাণের দেবতা বর্ত্তমান—তখন তাঁর স্থান-অস্থান কোথায়?

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন একটী পর্ব্বত সানুদেশে আসিয়া তুলসীদাস উপস্থিত হইলেন, রজনীর গাঢ় তিমির যখন চারিদিক অন্ধকার করিয়া সাধকের গমনে বাধা প্রদান করিল; পর্ব্বতবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী যখন তাঁহার সম্মুখে তরঙ্গের রঙ্গ দেখাইতে লাগিল, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—ভাবিলেন এ কোনদিকে আসিয়া পড়িলাম? দারুণ অন্ধকার ছাইয়া পড়িল, কই পথ ত নাই, এ যে দুর্গম গিরিসঙ্কট—দারুণ বন! রাত্রি উপস্থিত, যাই কোথায়? এ অচেনা স্থানে ত লোকালয় দেখিতেছি না, তবে আশ্রয় লইব কোথায়? আর ত অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, পর্ব্বত-পাদদেশ ধৌত করিয়া তরঙ্গিনী তরঙ্গ লম্ফনে ধাইতেছে। তবে কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করি! তুলসীদাস দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দিকভ্রান্ত হইয়া ভাবি-

তেছেন, এমন সময় একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পর্ব্বতের গহ্বর হইতে আলোক হস্তে বাহির হইয়া বলিলেন—বৎস তুলসি! দিকভ্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ভয় হতেছে কি? বৎস রে! প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় তোর সকল দিকই যে মুক্ত, তবে দিকভ্রান্তির ভাবনা কেন? আয় বাপ; তোর জন্য আজ আমিও এইস্থানে আসিয়া বাস করিতেছি।

পরিচিত স্বর শুনিয়া তুলসীদাস অগ্রসর হইয়া, যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া গেল, গল-লগ্নীকৃত-বাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, বলিলেন—গুরুদেব! আজ আপনার কৃপায় আমার অভীষ্টপূর্ণ হইয়াছে; এতদিন পরে স্বচক্ষে প্রভুর যুগল-মূর্ত্তি দেখিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছি; প্রভু পদধূলি প্রদানে দাসকে পবিত্র করুন। আজ হঠাৎ এখানে আপনার আগমন কি জন্য প্রভু?

বৃদ্ধ। বৎস! এই আমার আশ্রম; আমি প্রত্যহ এইস্থান হইতেই কাশীধামে রামায়ণ গান শুনিতে যাইতাম—এ অতি দুর্গম স্থান; তাই তোমাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, আজ বহুদিন পরে আনমনে এখানে আসিয়া পড়িয়াছ দেখিতেছি; সমস্তই প্রভু রামচন্দ্রের কৃপা। ভয় কিরে বাছনী! আয় গুহামধ্যে; তোর আসিবার আশা দেখিয়া আমি পূর্ব্ব হইতেই ফলজল সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, আয় পিপাসার শান্তি কর!

আজ বহুদিন পরে মহাবীর হনুমানের দর্শন পাইয়া তুলসীদাস ইষ্ট-দর্শন অপেক্ষাও আনন্দ লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই মহাবীরের দয়ায়, তাঁহারই অনুগ্রহে আজ তুলসীদাসের এইরূপ সৌভাগ্যদয়, পিশাচের কথায় তুলসী-

দাস যদি এই মহাবীর হনুমানের দেখা না পাইতেন, তাহা হইলে কি আজ তাঁহার শ্রীরামচন্দ্র হয়? ভক্তবীর মহাবীরের অব্যর্থ কৃপাই যে তুলসীদাসের সিদ্ধিলাভের একমাত্র কারণ, আজ সেই কারণরূপী গুরুদেবের সাক্ষাৎ পাইয়া তুলসীদাস আনন্দবিভোর প্রাণে গুহা-প্রবিষ্ট হইলেন এবং হনুমানের আদেশ মত ফল-জল খাইয়া ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলেন। সেদিন আর কোথাও যাইবার উপায় নাই। তুলসীদাস শ্রীগুরুর চরণ-ছায়ায় পড়িয়া রহিলেন।

মহাবীর জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! শ্রীবৃন্দাবনধাম হতে স্বচ্ছন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করেছো, দেব-দর্শনে কোনপ্রকার বাধা হয় নাই?

তুলসী। প্রভু! ভগবানের পরমভক্ত যাহার গুরু, দেবতার দর্শনে তাহার বাধা-বিঘ্ন কেন হইবে? তবে চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া, বাহ্যিক কথাবার্ত্তার আশা মিটিল না—পুত্র যেমন জনক-জননীর কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া আব্দার করে—কই, তাহা ত হইল না? তবে আসিবার কালে কাণে কাণে কে যেন বলিয়া দিল—বৎস! "সস্ত্রীক পাইবে দেখা স্বধামে তোমার" স্বর শুনিয়া দেহ কণ্টকিত; প্রাণ পুলকিত হইল—চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। প্রভু! সর্ব্বজ্ঞ আপনি—বলুন, কোন্ পাপে আমার মনোসাধ পূর্ণ হইতেছে না, যতবার প্রভুর দর্শন পাইতেছি—ততবারই অন্তরে, বাহিরে পাই না কেন?

মহা। বৎস তুলসীদাস! এখন ও পাপের ভয়? প্রভু আমার, যাহার অলক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, যাহার দৌত্যকার্য্যে তিনি সর্ব্বদা নিয়োজিত, এখনও তার পাপের ভয়? যাহার কথায়—মৃত শরীরে প্রাণ পায়, পাষাণে চেতনা সঞ্চার হয়, চির অন্ধ নয়ন প্রাপ্ত হয়—এখনও তার পাপের ভয়? এ বড় অসম্ভব কথা! কিন্তু বৎস!

একটী আশঙ্কা যেন আমার মনের মাঝে আসিয়া সন্দেহ জন্মা-ইয়া দিতেছে।

তুলসীদাস শশব্যস্তে বলিলেন—কি আশঙ্কায় সন্দেহ জন্মাইতেছে, বলুন প্রভু! যদি সেইজন্য কোন পাপ হয়ে থাকে, তাহা হইলে আমি এখনি তাহার প্রতিকার করিতে প্রস্তুত হই?

মহা। বৎস! প্রভুর মুখে শুনিয়াছ ত—"সস্ত্রীক স্বধামে তাঁহার দেখা পাইবে?"

তুলসী। হা! তাত বৃন্দাবন থেকে আস্‌তে আস্‌তে শুনেছি।

মহা। বৎস! শাস্ত্রে বলে—সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়। তোমার পতিব্রতা পত্নী রত্নাবলী—তোমার জন্য সকল সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্ম্ম-পত্নীর ধর্ম্মরক্ষা করা যে তোমার মহাধর্ম্ম—তাহাতে অবহেলা করেছো; আর তোমার বৃদ্ধ জননী, একমাত্র পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে কোথায় পড়ে রয়েছেন, তুমি তাঁহাকে ছেড়ে এসে অত্যন্ত অধর্ম্ম করেছ। তাঁহার উষ্ণ নিশ্বাসই বোধ হয়—তোমার সিদ্ধিপথ রোধ করেছে! পিতা মাতার সেবা, দেব-সেবা অপে-ক্ষাও মহৎ—পুত্রের কাছে পিতামাতা দেবতার চেয়েও বড়, অতএব তুমি তাঁহার সন্তোষ বিধান করে—সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ কর, প্রভু এই জন্যই ঐরূপ আদেশ করেছেন। বৎস! তুমি অচিরে ইহাঁদের অনুসন্ধান কর; তাঁহারা কেমন আছেন, তাহার সংবাদ গ্রহণ কর—তাহা হইলে প্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই দেখা দিবেন।

তুলসী। দেব! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য কিন্তু ভয় হয়, পাছে আবার সংসার-প্রলোভনে পড়িয়া পরমার্থ চিন্তা ভুলিয়া যাই; পাছে সার ছাড়িয়া অসার চিন্তায় আবার বৃথা সময় নষ্ট করিতে হয়?

মহা। বৎস! ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ পাপকার্য্য কিন্তু তুমি এখনও তাহা করিতেছ না? জননী ও পত্নীকে লইয়া ধর্ম্মের সংসার পাতিবে—ইহাতে আর ভয় নাই বরং ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া, তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করতঃ আশীর্ব্বাদ ভাজন হইতে পারিবে! জননীর ত কথাই নাই—ধর্ম্মপত্নীও কখন স্বামীর ধর্ম্মপথের কণ্টক হইতে পারে না, বা তাহার দ্বারা ধর্ম্ম-পথে কোন বাধা-বিঘ্ন উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আজ যে তুমি প্রভুর মহাভক্ত হইয়াছ, প্রভু যে তোমার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সে কার গুণে; কার গুণে তোমার মন প্রাণ এরূপভাবে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে? ভাবিয়া দেখিলে সতী রত্নাবলীই কি, তোমার অন্ধকারময় জীবনপথে আলোক প্রদানের সূত্রপাত করে নাই, প্রাণ কি সংসারের জঞ্জালজাল ছিঁড়িয়া তাহার প্ররোচনায় এত-দূর অগ্রসর হয় নাই? তবে বৎস! সহধর্ম্মিনী ধর্ম্মপথের কণ্টক কিসে? তুমি পুনরায় যাহাতে ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতিমান হইতে পার, কার্য্যক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পার—এইজন্য উহা প্রভুর আদেশ—এ কথা আমি অনেকবার তাঁহার নিকট শুনিয়াছি,—আজ সেই কথা আমার মুখ দিয়া শুনাইয়া প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্যই তিনি তোমাকে এমন করিয়া বিপথে আনিয়াছেন। রজনী প্রভাত হইয়াছে, যাও বৎস! তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করগে! তাহা হইলে অচিরে বাসনা পূর্ণ হইবে।

তুলসীদাস রামদাস হনুমানের চরণে প্রণিপাত করিয়া ও পদধূলি লইয়া সেস্থান হইতে বাহির হইলেন, এতদিন পরে তাঁহার ভ্রমসংশোধন হইল। বিবাহিত স্ত্রীকে ছাড়িয়া সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিবাগী হইলেই যে মহাধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় এবং তাহা হইলেই যে ধর্ম্ম-

পথে সাফল্য লাভ করা যায়—এ মহাভ্রান্তি এতদিনে তুলসীদাসের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল। তুলসীদাস ভাবিতে লাগিলেন বাস্তবিক রত্নাবলী যদি সেদিন তাহার চৈতন্য সম্পাদন না করিয়া দিত, তাহা হইলে ত এতদিন তাহার রূপ-গুণে মজিয়াই ত আমাকে মনুষ্যত্ব হারাইতে হইত, জীবনের শেষ দিন অবধি ত তাহারই বাহুমূলে আবদ্ধ থাকিয়া নিতান্ত পশুর মত জীবন যাপন করিতে হইত; আজ সে পশুত্ব ঘুচাইবার মূল কারণই ত রত্নাবলী। হায়! আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া কি কুকাজই করিয়াছি; সে এখন কোথায়? সেদিন দুঃখীর মুখে শুনিয়াছিলাম,—সে পাগলিনী হইয়া মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। মাও আমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়াছেন। বাস্তবিক আমি পুণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়া গোড়ায় কত মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি; আর সেইজন্য প্রভুর কৃপা লাভে বার বার বঞ্চিত হইতেছি, নতুবা তার দেখা পাই পাই—পাইনা কেন? এত কাছে কাছে, এত ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকিয়াও সে রাতুল চরণ দর্শনে বঞ্চিত হইবার কারণ নিশ্চয়ই এই সকল পুঞ্জীকৃত পাপরাশি! আহা! মা আমার, জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া, এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন! শেষদশায় আমি তাঁর কি করিলাম—হায়, দেবি! আজ তুমি কোথায়? হা প্রিয়ে রত্নাবলী, তোমার চমকপ্রদ-হিতকথায় আমার চৈতন্য হইল, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া জীবন ধন্য করিলাম কিন্তু এ হতভাগাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া তোমার কি হইল? কেবল দুঃখভোগই কি সার—আর কি তোমার দর্শনলাভ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষায় তোমার তুষ্টিসম্পাদন করিতে পারিব না?

তুলসীদাস যাহাকে এতদিন অসার ভাবিয়াছিলেন—যে সংসারের

শীতল ছায়াকে তিনি দারুণ মোহকর রৌদ্রতাপ সদৃশ মনে করিতেন—যে জননী-পত্নীর সংসর্গ তিনি ধর্ম্মসাধনার অন্তরায় বলিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন—আজ প্রবুদ্ধমনে তাহা একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া তুলসীদাস কাতরপ্রাণে আবার তাঁহাদের অন্বেষণে ছুটিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁহারা—আর কোথায় তিনি? আজ বহুদিন যে সে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের অনাথা-আশ্রয়হীন করিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছেন। হায়! এতদিন কি সে কোমলপ্রাণা রত্নাবলী কি আমার অমিত অত্যাচারে জীবিতা আছে? মা অন্ধ জীবন্মৃত হইয়া আছেন—দুঃখী বলিয়াছিল, তবে তাঁহাকে রাজাপুর হইতে সে কাশীর কোন স্থানে আনিয়া রাখিয়াছে; তাহার সন্ধানও কিছু জানিনা। দুঃখীরাম যে সেই চলিয়া গিয়াছে, কই আর ত দেখা করিল না; তবে কি অভাগার প্রতি প্রাণের দুঃখীও বিরূপ হইল? এতদিন পরে সংসারভাব আবার তুলসীর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া অশেষ দুঃখপ্রদান করিতে লাগিল, তুলসী দুঃখিত অন্তকরণে স্বধামে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাণ আজ তাঁর বড়ই ভাবমগ্ন, প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া হৃদয় আজ বড়ই মর্ম্মাহত! ক্রমশঃ দুইদিন পথ অতিবাহিত করিয়া যখন তিনি জৌনপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। পথশ্রান্তিহেতু পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আজিকার এ পরিশ্রান্তি তুলসীদাসকে বড়ই লাগিয়াছে। যে তুলসীদাস ক্ষুধা-তৃষ্ণা গ্রাহ্য করিতেন না—শরীরের কষ্ট যাঁহার নিকট কষ্ট বলিয়াই অনুভূত হইত না, আজ তিনি শারীরিক কষ্টে একান্ত মুহ্যমান হইয়া রাত্রি যাপন মানসে একটী অতিথিশালায় আশ্রয় লইলেন।

জনৈক ধনী ব্যক্তি পথিকদিগের সুবিধার জন্য এই অতিথি-

শালা খুলিয়া দিয়াছেন। তুলসীদাস তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মঠাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল—আজ আপনার কি আহার হইবে? তুলসীদাস বলিলেন—আমি কাহারও হস্তের পাক করা অন্ন গ্রহণ করিনা, আমার নিকট সমস্ত আছে, আপনি কেবল অদ্যকার মত একটু থাকিবার নিভৃত স্থান দান করুন। মঠাধ্যক্ষ অন্দরের নিকট একটী নিভৃত স্থান দান করিল এবং বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া দিল—সাধুবাবার কিছু আবশ্যক হইলে—তোমরা পুরণ করিও, এই বলিয়া তিনি অন্য কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

জৌনপুরে হিন্দুস্থানীদের বড় বড় কারবার এবং জমীদারী আছে, এখানে অনেকেই দান-খয়রাৎ করেন। বিদেশীয় পথিকদিগকে আশ্রয়দান করা ইহাদের একটী মহৎকার্য্য, এজন্য এখানকার সকলেই মুক্তহস্ত, পশ্চিমাঞ্চলে এখনও এসকল কার্য্যের জন্য অনেক দাতা আপনার ধনের সদ্ব্যয় করেন। তুলসীদাস তথায় আসিয়া প্রথমে স্নান করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করত রন্ধনকার্য্যে ব্রতী হইলেন। তুলসীদাস একার্য্যে বিশেষ পাকা না হইলেও একপ্রকার চলনসই গোছের রান্না রাঁধিতে পারিতেন, অনবরত রান্না করিয়া তাঁহার এ বিষয়ে একপ্রকার অভ্যাসও হইয়া গিয়াছিল।

তুলসীদাস রন্ধনকার্য্যে ব্রতী হইলে দুইজন সুন্দরী স্ত্রীলোক অধ্যক্ষের আদেশমত তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। মিটি মিটি করিয়া আলো জ্বলিতেছে—কিছুই ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না। একটী স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভুজী! আপ-নার কি কি দ্রব্য আবশ্যক—অনুমতি করুন? তুলসীদাস বলিলেন—আমার ঝুলিতে সমস্ত দ্রব্যই আছে, আমরা উদাসীন লোক—কখন কোথায় থাকি, কোথায় যাই, তাহার ত স্থিরতা নাই—এইজন্য

সমস্তই সংগ্রহ আছে। রমণী বলিলেন—লবণ-লঙ্কা আনিয়া দিব কি? তুলসীদাস বলিলেন—তাহাও আছে। তখন রমণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—যদি লঙ্কা-মরিচ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দ্রব্য আপনার ঝুলির মধ্যে আছে, তবে স্ত্রীকে সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই কেন, ইহাতে আপনার কি ক্ষতি হইত? কথাটী তুলসীদাসের মর্ম্মে আঘাত করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অনিন্দ্যসুন্দর রমণীর প্রতি চাহিয়া আবার চক্ষু নামাইয়া লইলেন, পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত যে সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরুদ্ধ কিন্তু একি! রমণীর সেই রমণীয়মূর্ত্তি তুলসীর নয়নপথে পতিত হইয়া একি ভাবান্তর করিল? তাহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। সেই একখানি মলিন সাড়ী পরা, দীনবেশা রমণীমূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে এত সুন্দর দেখাইল কেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া অবধি তুলসীর মন এত চঞ্চল হইল কেন? কোনও পোষাক-পরিচ্ছদ নাই, রমণী সধবা হইলেও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী, তথাপি রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। অপরটী তত না হইলেও যৌবন জুয়ারে অঙ্গ ঢলঢল, নদী যেন দুকুলভরা।

সন্ন্যাসী কিছু চাহিলেন না, কাজেই তাঁহারা আর অপেক্ষা না করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে সন্ন্যাসীকে দেখিবার সাধও তাঁহাদের মিটিল না। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই তুলসীদাস জৌনপুরের অতিথিশালা ত্যাগ করিয়া বারাণসী অভিমুখে ধাবিত হইলেন, আর কোথাও অপেক্ষা করিলেন না। জননী ও পত্নীর জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়াছে কিন্তু কোথায় তাঁহারা আর কোথায় তিনি, প্রাণের বন্ধু দুঃখীরামই বা কোথায়?

কাশীতে আসিয়া তিনি প্রাণের আবেগে দুই তিন দিন জননীর অন্বেষণে কাশী-সহরটা তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইলেন, কত লোককে

জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কোন সন্ধানই পাইলেন না, তুলসীদাস হতাশ হইয়া আশ্রমে ফিরিলেন। হায়! আর বুঝি জননীর সে পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার সেই চরণপদ্ম পূজা করিয়া আর জীবন সার্থক করিতে পারিব না? স্বর্গের নিধিকে কত অশ্রদ্ধা করিয়াছি, অবহেলা করিয়া কত দুঃখ-কষ্ট দিয়াছি, কোমলপ্রাণে মা আমার এত অত্যাচার সহ্য করিয়া কি জীবিত আছেন? প্রাণের একমাত্র আশাভঙ্গে বোধ হয়—দুঃখিনী আত্মহত্যা করিয়াছেন, সে পাপের ভাগী তিনি নহেন, অধম আমিই তাঁর এ শোচনীয় মৃত্যুর কারণ! দুঃখেভাই ত বলে গিয়েছিল—খুড়ীমা! কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছেন, বোধ হয় শীঘ্র তোমার দেখা না পেলে, আর বাঁচবেন না। হায়! তাই কি হইল? আর প্রিয়া রত্নাবলীর সংবাদ ত সে দিতেই পারে নাই, আমি গৃহত্যাগী হইবার পর সেও পাগল হয়ে কোন দিকে চলে গিয়াছে, জীবিতা কি মৃতা কেহ বলিতে পারেনা। নিশ্চয়ই মৃতা, কোমলপ্রাণা-হরিণী নিদারুণ ব্যাধের অত্যাচারে কি আর এতদিন জীবিত আছে? হায়! আমি কি করিলাম—পুত্র হইয়া নিজের পবিত্র বংশটাকে এমন করিয়া নষ্ট করিলাম; শেষে ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট হইয়া ভগবানের করুণা লাভে বঞ্চিত হইলাম।

প্রথম দুই একদিন ছাত্রবর্গ গুরুদেবকে এমন বিমর্ষভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। যিনি তিলমাত্র নিরানন্দ থাকিতেন না, শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার একি পরিবর্ত্তন হইল! কিন্তু কয়েক দিবস পরে আবার আত্মসংবরণ করিয়া তুলসীদাস শিষ্যবর্গের সহিত হাসিমুখে কথা কহিলেন,—তবে তাঁহার প্রাণের আগুন নিভিল না, তিনি ভিতরে ভিতরে জননী ও পত্নীর সন্ধান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পুত্রাবাসে

এখন কাশীর যেখানে অনাথ-আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অনতিদূরে লাক্‌সা নামক স্থানে ভগবানদাস দুবের বৃহৎ শান্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত ছিল—লোকে তাহাকে আরামবাগ বলিত, কারণ সেখানে তখন ভগবানদাসের সদাব্রত খোলা ছিল—দুঃস্থ নরনারী তথায় আসিলে আহার ও বাসস্থান পাইত।

ভগবানদাস অন্য দেশবাসী হইলেও এইস্থানে এই কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া কত লোকের যে আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন—তাহা বলা যায় না। ভগবানদাস খুব সাধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন; অর্থ যে তাঁহার খুব বেশী ছিল, তাহা নহে, তথাপি তিনি কাজকর্ম্ম যাহা করিতেন—অনেক বড়লোকেও তাহা করিতে সাহস করিত না। এ জগতে সাহসই মূলাধার, সৎকার্য্যে সাহস করিয়া লাগিতে পারিলে, অনেক সামান্য লোকের দ্বারা বড় বড় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে দেখা গিয়াছে, সৎকার্য্যে যে ভগবান সহায়—ইহার আর ভুল নাই।

ভগবানদাস এবার সামান্য দিনের জন্য কাশীতে আসিয়াছেন; জননীকে রাখিয়া আবার শীঘ্র চলিয়া যাইবেন কিন্তু তাহা হইতেছে না; তাহার কারণ কাশীতে আসিবার সময় তুলসীদেবী ও দুঃখী রাম তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল। এই পরদুঃখ-কাতর ধনী ব্যক্তির সঙ্গ না জুটিলে বৃদ্ধা তুলসীদেবীকে লইয়া দুঃখীরামের কাশী আগমন করা দুষ্কর হইত। ভগবান দাস পথে যান-বাহনের সাহায্য

করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা নিরাপদে এত শীঘ্র এখানে পৌছিয়াছেন এবং এখনও তাঁহারই আশ্রয়ে আছেন।

দুঃখীরাম কাশী আসিয়া ভগবান দাসের আশ্রয়ে হুলসীদেবীকে রাখিয়া আজ দুই মাস হইল, সেই যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন—তাহার আর কোন সংবাদ নাই! এদিকে বৃদ্ধা বড়ই কাতর হইয়াছেন, যত দিন যাইতেছে—তাঁহার কাতরতা যেন তত বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি ভাল করিয়া খান না—ভাল করিয়া নিদ্রা যান না, কেবল ক্রন্দনই সার করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে অতীব যত্নে, ঠিক জননীর মত আদর করিয়া রাখিয়াছেন—তথাপি তাঁহার শান্তি নাই—প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই, এমন কি পবিত্র কাশীধামে আসিয়া একদিনের জন্য তাঁহার দেব-দর্শনের ইচ্ছা হয় নাই, কেবল হা তুলসী; হা তুলসী বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। দুঃখীরামকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—হ্যাঁ বাবা দুঃখী! তুই যে কাশীতে আমার বাছার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিবি বলে আন্‌লি, তা না করে, তুই এই অচেনা জায়গায় আমায় একা ফেলে কোথায় পালালি বাপ? বউমার সন্ধান কর্ত্তে সেই যে গেলি, আর দেখা নাই—তবে কি তোর সমস্ত কথাই মিথ্যা? এই বলিয়া বুড়া কেবল কাঁদে—খায় না—শোয় না; কেবল মনমরা হইয়া একধারে বসিয়া থাকে।

ভগবানদাস ইহাঁকে লইয়া বড়ই বিব্রতে পড়িয়াছেন—দুঃখী না আসিলে বা তাঁহার পুত্রের সন্ধান করিয়া দিতে না পারিলে, কেমন করিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া যান? আর দুঃখীর অপেক্ষা না করিয়া ভগবানদাস এখন নিজেই তাঁহার পুত্র তুলসীদাসের সন্ধান করিতেছেন কিন্তু কাশীর মত জনাকীর্ণ বড় সহরে তুলসীদাস দ্বিবেদীর মত নগণ্য একজন যুবককে খুঁজিয়া বাহির করা কি সহজ? তিনি নানাস্থানে

সন্ধান লইয়াছেন কিন্তু তুলসীদাস দ্বিবেদী বলিয়া কোন লোকের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। তবে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে তুলসীদাস গোস্বামী বলিয়া একজন মহাপুরুষ আছেন, তিনি কখন কোথায় থাকেন—সহজে তাঁহার ধরা পাওয়া যায় না। আর বুড়ীর ছেলে তুলসীদাস কি এ তুলসীদাস হওয়া কখনও সম্ভব, ভগবানদাসের তাহা বিশ্বাসই হয়না। তিনি মস্ত সাধু, কাশীশুদ্ধ লোক তাঁহার নামে যোড়হস্ত—তিনি সাধুমহাত্মা; বুড়ীর ছেলে সামান্য একজন লোক, দুঃখে-কষ্টে পড়িয়া হয়ত সংসার ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে—ইনি কি কখন সে তুলসী হইতে পারে? কাজেই হতাশ হৃদয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া একদিন হুলসীকে বলিতেছেন—মা! দুঃখীরাম ত এলো না, আমি তোমার ছেলের জন্য অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু তুলসীদাস দ্বিবেদীর নাম কেউ বল্‌তে পারে না; তাকে কেউ জানেও না, তবে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন তুলসীদাস গোস্বামী আছেন—তিনি মহাপুরুষ, তিনি কি আপনার পুত্র হবেন?

হুলসী। তা কি জানি বাবা! তুমি যে সাধু-সন্ন্যাসীর কথা বল্‌ছো, সে কি অত বড় লোক হয়েছে; তবে দুঃখী বলেছিল,—সে নাকি কি "বেদনা" পড়ে খুব পণ্ডিত হয়েছে।

ভগবান। তাতো কই শুন্‌লাম না, তবে তিনি খুব সাধু—এমন কি মরা মানুষ জেন্ত কর্ত্তে পারেন, কত কাণা-খোঁড়াকে ভাল করছেন, কাশীতে তাঁর খুব নাম আছে; তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, সব বল্‌তে পারেন—একপ্রকার ঈশ্বরজ্ঞানিত লোক বল্লেই হয়।

হুলসী। না বাবা! সে যে আমার এতদূর হয়েছে, তা শুনিনি, তবে বাবা! তুমি যে তুলসীদাসের কথা বলছো, তিনি

যদি অমন গণ্‌তে পারেন, তা তাঁকে দিয়ে একবার গণিয়েই দেখোনা, যদি আমার বাছার কোনও সন্ধান বল্‌তে পারেন?

ভগবান। সে কথাও মন্দ নয়—কত লোক তাঁর কাছে যাচ্ছে, তিনি অসিনদীর কাছে থাকেন, আজ সন্ধ্যার সময় যখন বেশী ভিড় থাক্‌বেনা, সেই সময় না হয় একবার তোমাকে নিয়ে যাব—তোমারও কাজ হবে, আর আমারও সাধু দর্শনে মহাপুণ্য লাভ হবে, এমন সাধু দেখলেও ত পরম লাভ আছে?

তুলসী। হাঁ বাবা! সেই ভাল, এককাজে দু-কাজ হবে; বাঁচালি বাবা! তাই কর বাবা! আমাকে একবার তাঁর কাছেই নিয়ে চল, দুঃখী ত আর এলো না—যদি বাবা! তোর দ্বারা বাছার কোনও কিনারা হয়—বাবা! তোকে আর কি বলে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো?

ভগবান। মা! উতলা হবেন না, আজ সন্ধ্যার পরই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব; বেলা আর বেশী নাই, আপনি প্রস্তুত হন, আমি সন্ধ্যাহ্নিক সেরে আস্‌ছি।

তুলসীদেবী আনন্দে গদগদ্ হইয়া বলিলেন—এস বাবা! এস, আমিও জপ্‌টা সেরে নিই, আর বাবা! জপে কি মন লাগে; বাছাই যে আমার জপ তপ, বাছা যে আমার জীবন, আজ কতদিন হলো যে বাছার চাঁদবদন দেখিনি, তার মুখে মা-বলা শুনিনি, আমার বড় কঠিন যান—তাই এখনও বেঁচে আছি। এই বলিয়া তুলসীদেবী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া জপে বসিলেন। কিন্তু প্রাণ যার পুত্র-চিন্তায় অস্থির—ইষ্ট-চিন্তা তার কোথা? বাৎসল্য-প্রতিমা জননীর নিকট পুত্রের চিন্তা, তাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা যে ইষ্ট-চিন্তা অপেক্ষাও বেশী! বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি নিয়মকর্ম্ম প্রতি-

পালন করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং ভগবানদাসকে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতে দেখিয়া, তিনি যানারোহণ করিলেন। গাড়ী গন্তব্য স্থানে চলিল এবং কিছুক্ষণ পরে যখন তুলসীদাসের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল—তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে সাঁঝের বাতি জ্বলিয়াছে।

কাশী খুব বড় সহর। অজানা ব্যক্তি আসিয়া সহজে কাহারও বাসস্থান খুঁজিয়া লইতে পারে না। ভগবানদাস বৃদ্ধাকে গাড়ীর মধ্যে রাখিয়া আপনি পদব্রজে দুই একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁ মহাশয়! তুলসীদাস বাবাজীর আশ্রম কোথায়?

একজন দেখাইয়া দিল—ঐযে আটচালা দেখিতে পাইতেছেন, কতকগুলি ছাত্র বেদধ্যয়ন করিতেছে—উহাই বাবাজীর আশ্রম।

ভগবান। তিনি এখন আশ্রমে আছেন কি?

পথিক। তা বল্‌তে পারিনা, তবে সন্ধ্যার পর তিনি বড় একটা কোথাও যান না, কাশীর মধ্যে তিনি একজন সিদ্ধসাধক, যাহার কিছু আবশ্যক হয়—তিনি নিজেই আসিয়া জানিয়া যান, বাবাজী কাহার দ্বারস্থ হন না!

ভগবান আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না—আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—তারকাবেষ্টিত শশধরের ন্যায় ছাত্র পরিবেষ্টিত একটী সন্ন্যাসীমূর্ত্তি, ভগবানদাস অনুমানে তাঁহাকে তুলসীদাস জানিয়া প্রণাম করিলেন।

তুলসীদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আপনি, আবশ্যক কি?

ভগবান। মহাশয়! আমি তুলসীদাস বাবাজীর সহিত দেখা করিব—আপনিই কি তিনি?

তুলসী। সকলে দয়া করে আমাকে এই নামেই ডাকে।

ভগবান। আজ আমি ধন্য হলাম, আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শন লাভ করে চরিতার্থতা লাভ করলাম।

তুলসী। কি অভিপ্রায়ে আগমন হয়েছে?

ভগ। মহাশয় আপনি গুণী, জ্ঞানী ও পণ্ডিত চূড়ামণি, আপনার অপূর্ব্ব যোগ-প্রভাব-দর্শনে কাশীবাসী জনগণ বিমোহিত; আপনার দ্বারা যে কত লোকের কত মহৎ উপকার সাধিত হয়েছে তাহা বলা যায় না। আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রেও নাকি মহা পণ্ডিত, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নাকি আপনি সুন্দররূপে নির্দ্ধারণ করে দিতে পারেন—তাই শুনে একটী বৃদ্ধাকে সঙ্গে করে এনেছি, ইনি দেখিতে পান না, কৃপা করে এঁর দৃষ্টিশক্তি দান করুন, ইহার একমাত্র পুত্র নিরুদ্দিষ্ট—তারজন্য কেঁদে কেঁদে অভাগিনীর এই দশা হয়েছে, দয়া করে বলে দিন—ইহার সেই পুত্র জীবিত আছে কিনা এবং যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কোথায় আছে—দয়া করে বলে দিয়ে ইহাঁর জীবন দান করুন।

তুলসীদেবীকে দ্বারবান হাত ধরিয়া আনিল; তিনি আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বল্লেন—আর বাবা! বলে দাও আমি কবে মরবো—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই, পাঁচ বৎসর বাছাকে হারিয়ে কেবল আশায় বুক বেঁধে আছি কিন্তু আর পারি না—বাবা!

তুলসীদাস ভগবান দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়! ইনি কি আপনার কোনও আত্মীয়?

ভগ। না মহাশয়! তবে আমি ইহাকে জননী অপেক্ষাও ভক্তি ও মান্য করি; সম্প্রতি ইনি আমার ভবনেই আছেন। প্রতিবাসী কোন যুবকের সহিত ইনি পুত্রের সন্ধানে কাশীতে

আসিতেছিলেন—পথিমধ্যে উহার কষ্ট দেখিয়া আমি গাড়ীতে তুলিয়া লই। সেই অবধি ইনি আমার পোষ্যভুক্তই আছেন।

তুলসী। পূর্ব্বের কি কোন পরিচয় জানেন না?

ভগ। আজ্ঞে না! পথেই দেখা, পথেই আলাপ হয়, সেই যুবকটীও কিছুদিন আমার বাড়ীতে ছিল, ইহার পুত্রের সন্ধান করিয়া দিবে বলিয়া সেই যে আশা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, প্রায় একবৎসর হইল—তাহারও আর দেখা নাই।

তুলসীদাস বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা! আপনার ছেলে কি রাগ করে বাড়ী থেকে চলে গেছে, আপনাদের নিবাস কোথায়?

হুলসী। হাঁ বাবা! সে বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে, আমার বেহাইয়ের বড় ব্যায়রাম হয়েছিল, সেইজন্য বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে ছিলাম বলে—দুইজনে কি ঝগড়া করে চলে গেছে।

তুলসী। মা! আপনার ছেলের নাম কি, বাড়ী কোথায়; আপনাকে কে কাশীতে এনেছিল?

হুলসী। বাবা! আমার ছেলের নাম তুলসীদাস, রাজাপুরে আমাদের বাড়ী; দুঃখীরাম বলে একটী ছেলের সঙ্গে কাশীতে এসে এই ভগবানদাসের বাড়ীতে আছি! হ্যাঁ বাবা! আমি বাছাকে আর পাবো কিনা—গুণে বল বাবা! বলিয়া হুলসীদেবী বাবাজীর হাতে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস ভাবমগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—মা! মা!! মা!!! দাসের অপরাধ ক্ষমা করুন, এই অধমই আপনার নরাধম পুত্র বলিয়া তুলসীদাস তাহার চরণধুলি মাথায় লইয়া আমার সকল দোষ মার্জ্জনা করুন—আপনার প্রাণে ব্যাথা দিয়ে আমি যে পাপ সঞ্চয় করেছি, সেই

পাপরাশি আমার সাধনার পথে বাধা প্রদান কচ্ছে। মা জননি! এই মহাপাপী সন্তানের জন্য কেঁদে কেঁদে আপনার চক্ষু গিয়েছে, অহো কি নরাধম আমি, প্রভু, রামচন্দ্র! আমার জননীর দৃষ্টিশক্তি প্রদান কর ঠাকুর! এই বলিয়া মহাপ্রাণ সাধক জননীর চক্ষে হস্ত প্রদান করিবামাত্র বৃদ্ধা দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তুলসীদাস মাতৃ-চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হুলসীদেবী দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া—বাপ আমার,মাণিক আমার,এমনি করে কি মাকে কাঁদাতে হয়? এই বলিয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

তুলসী। মা! তোমার এ হতভাগ্য পুত্রের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, বলিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন।

তুলসীদাসের চক্ষের জল মুছাইয়া জননী বলিলেন—বাপ! তুলসীমণি আমার, চিরজীবি হও বাপ, আমি যেন তোর চাঁদ-মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই কাশীর গঙ্গাতীরে সুখে মরতে পারি।

তুলসী। মা! আমি যে তোমাকে এতদিন কষ্ট দিয়ে অসীম পাপ সঞ্চয় করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর।

হুলসী। বাবা! এতদিন আমার যা কষ্ট হয়েছিল—আজ তোকে নীরোগ শরীরে দেখে আমি সে সব কষ্ট ভুলে গেছি, পাপ কি বাবা! উঠ, আর পায়ে ধরে কাঁদতে হবে না—আমি তোমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিলাম।

তুলসী। আহা! আজ আমি ধন্য, দেবী কৃপা-লাভে কৃতার্থ হলাম

ভগবানদাস দোবে এতক্ষণ অবাক হয়ে মাতা পুত্রের দুঃখ-কাহিনী শুনিতেছিলেন এবং ভগবানের অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁহাদের এই অভাবনীয় মিলন দেখিয়া মনে মনে তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিতেছিলেন।

এইবার তুলসীদাস ভগবানদাস দোবেকে করযোড়ে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন—মহাত্মন ! আপনার ঋণ আমি জীবনে কখনও পরিশোধ কর্ত্তে পারবো না, আপনি এতদিন আমার বৃদ্ধা জননীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আমাকে অসীম ঋণ-জালে জড়িত করিয়াছেন,—প্রভু ! রামচন্দ্র আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন।

ছাত্রগণ মাতা-পুত্রের মিলন দেখিল। যেমনি পুত্র, জননীও তাঁহার তেমনি স্নেহবতী। তারপর মাতা-পুত্রের কত কথা—সে আর ফুরায় না, পাঁচ বৎসরের প্রাণের কথা কি দুই এক ঘণ্টায় শেষ হয় ? রাত্রি অধিক হওয়ায় ভগবানদাস সেদিন তুলসীদাসের ভবনেই আহারাদি করিয়া বিদায় হইলেন, তাঁহারা আজ উভয়ে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ! তুলসী বলিলেন—ভাই ! যে যুবকটী মায়ের সঙ্গে আসিয়াছিল—সে যদি আপনার বাটীতে আসে, অথবা তাহার যদি কোন সন্ধান পান—তাহা হইলে দয়া করিয়া আমাকে জ্ঞাপন করিবেন। "নিশ্চয়ই প্রভু ! আজ আমি ধন্য হলাম" বলিয়া ভগবানদাস গৃহাভিমুখে গমন করিল।

তারপর মাতা-পুত্রের সহিত ছাত্রগণের কত আদর-আপ্যায়ণ, কত আনন্দ-অভিনন্দন হইল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, হুলসীদেবী বলিলেন—বাবা ! আর পাগলামী করিস্ না—এইবার বউমাকে সন্ধান করে ঘরবাসী হবি চ, আহা ! মা আমার ভেবে ভেবে পাগলের মত হয়ে, কোথায় চলে গেছে, কে তার সন্ধান করে দিবে ? দুঃখী যে তাহাকে খুঁজ্তে গেলো, কই বাবা ! সেও ত আর আজও ফিরিল না তুলসীদাস বলিলেন—মা ! ভগবানের ইচ্ছায় আবার সব হবে—তুমি আশীর্ব্বাদ কর। সেদিন সকলের মনের আনন্দে সমস্ত রজনী বসিয়া বসিয়াই কাটিয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুসনে

একদিন দারুণ গ্রীষ্মের প্রাতঃকালে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না হওয়ায় দুঃখীরাম বাগানের বাঁধাঘাটে আসিয়া উপবেশন করতঃ নিদাঘ-যন্ত্রণা বিদূরিত করিতেছেন, সরোবর-সলিল-সংপৃক্ত সমীরণ স্পর্শে শরীর শীতল হইয়া একটু তন্দ্রার আবেশ হইতেছে। কিন্তু কাজ অনেক—এ সময় নিদ্রা যাইলে সমস্ত মাটী হইবে। চৈত্রমাসের এ সময় ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না? একা ছিলাম বেশ ছিলাম—কোন ঝঞ্ঝাটই ছিল না। আমি একা মানুষ, একা ছিলাম—যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যেতাম—যা ইচ্ছা হতো তাই করতাম, কোন দায়ীত্ব নিয়ে এমন করে আমায় বিব্রত হতে হতো না। বৌদিইত যত কাল করলেন। ঘাড়ে এমন একটা বোঝা চাপিয়ে দিলেন—যে জীবনে নামান দায়।

ছগনলাল বাবু অতি ভদ্র এবং ধার্ম্মিক লোক, তিনি আমার ও বৌদির জীবনদাতা, আমাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়া না হলে, এতদিন দুজনেই মারা যেতাম। কেবল তাঁর এবং মাতৃসমা যশোদার যত্নে আমরা এ যাত্রা প্রাণ পেয়েছি। এমন একজন ধার্ম্মিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করা মহা সৌভাগ্য, এইজন্য তাঁর অনুরোধেও এই বাঁধন সহ্য কর্ত্তে হলো, না করলে মনুষ্যত্ব থাক্‌তো না—ধর্ম্মে পতিত হইতে হইত, কাজেই সরস্বতীকে বিবাহ কর্ত্তে হলো। কিন্তু আমার যেন কেমন বাধা বাধা ঠেক্‌ছে, চিরকাল

একা থাকা অভ্যাস—এখন এত দায়ীত্বের মধ্যে থাকায় যেন কষ্টের এক-শেষ হয়েছে। আমার হাতে মেয়েটিকে সঁাপে দিয়ে কর্ত্তা-গিন্নিতে ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, চিরদিনের আশা তৃপ্তি করবার জন্য এতদিন ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া এইবার ধর্ম্মকর্ম্মে মজে পড়লেন—পরকালের পথ-মুক্ত করতে লাগ্‌লেন। এখন মর বেটা তুই, তোর ঘাড়ে সমস্ত চাপিয়ে দিলুম। এই সব নিয়ে আমি এত কাজে জড়িয়ে পড়েছি যে, দাদার কাছে একদিন দেখাও কর্ত্তে পারি না। বৌদির কাঁদ কাঁদ মুখ হাসিমাখা কর্ব্বো, তা আর হচ্ছে না, যতই মনে করি—আজ যাব, ততই যেন কাজ জড়িয়ে ধরে। এইজন্যই ভাললোকে বিষয়-আশয়ে এত মজ্‌তে যায় না—আর কি? এতে মজ্‌লে মানুষ একেবারে আত্ম-হারা হয়ে সব ভুলে যায়। যাই হউক, আজ যতই কাজ পড়ুক, আর থাকৃচি না—আজ দাদাকে দেখ্‌তে যাবই যাব। বৌদির দুঃখ আর দেখ্‌তে পারি না, আজীবন এত করে, শেষটা কি একেবারে গুলিয়ে ফেলবো,—তা কখনই নয়?

ওদিকে অনেকদিন হয়ে গেল, বুড়িকে আশা দিয়া, সেই যে ভগবানদাসের বাটীতে ফেলে এসেছি, তিনি পুত্রশোকে এতদিন বেঁচে আছেন কি মরেছেন—তারও ঠিক নাই—হায় হায়! আমি কি করছি? কর্ত্তা-গিন্নী এখানকার সমস্ত ভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে, সেই যে জৌনপুরে গিয়ে বসে রইলেন—আর আস্‌বার নামটী করেন না—সেখানে কেবল দেবসেবা-অতিথিসেবা নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। এই চৈত্রমাস, কাকে কি দিতে হবে—কোথায় থেকে কি আদায় কর্ত্তে হবে—তাও বলে গেলেন না। বৌদিকে ও নিজের মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন—পাছে আমার কষ্ট হয়—খাওয়া পরার অসুবিধা হয়—সেজন্য তাঁহাদের পাঠিয়ে দিলেন—

কিন্তু নিজেরা আস্‌বার নাম করেন না—এসময় কিন্তু আসা একবার দরকার—আজ একখানা পত্র লিখে, আস্‌তে বলি—তাঁরা আসুন। ইতিমধ্যে আমি একবার দাদার ও খুড়ীমার সংবাদ নিয়ে আসি।

দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় আসিয়া একখানি পত্র লিখিয়া লোকদ্বারা পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আজ দুঃখীরামের কাজ বড় বেশী। তিনি একবার কাশী যাইবেন শুনিয়া সরস্বতী শীঘ্র স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দুঃখীরাম আহারে বসিলেন—সরস্বতী স্বামীর কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। দুঃখীরাম আহারের সময় বড় তাড়াতাড়ি করেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া খাইতে তিনি কখনই পারেন না। আজ তাঁহাকে আহারে তাড়াতাড়ি করিতে দেখিয়া সরস্বতী বলিলেন—দেখ, সমস্তদিন কিছুই খাওয়া হবে না—আজ আহারে বেশী তাড়াতাড়ি করো না—বসে বসে খাও—কেন, বেলা ত আর বয়ে যাচ্ছে না? এই ত মোটে নয়টা, এখনও অনেক দেরি।

"দেরিত অনেক জানি সরস্বতি! কিন্তু কাজও যে অনেক;" বলিয়া দুঃখীরাম আহারাদি শেষ করিয়া এক বাটী দুগ্ধ পান করিলেন। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ত কাশী যাচ্ছ, বাবাকে আসিতে পত্র লিখে দিলে না কি? "হাঁ দিয়াছি" বলিয়া দুঃখীরাম আচমন করিয়া আসিলেন। সরস্বতী বলিল—না, লিখ্‌লেই হতো; কাজ-কর্ম্ম কি আর চালাতে পারতে না? কর্ম্মচারীরা সকলেই বিশ্বাসী, তাদের নিয়ে কাজ করলেই চল্‌তো, বাবা মাকে এখন আর এতে জড়ান কেন, তাঁরা জেনে শুনেই ত উপযুক্ত কর্ত্তা নিযুক্ত করে চলে গেছেন।

"কর্ত্তা যত উপযুক্ত হ'ক আর নাই হ'ক, গিন্নী ত পাকা ;" বলিয়া হাসিতে হাসিতে দুঃখীরাম স্ত্রীর গালে একটী মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। সরস্বতী হাসিতে হাসিতে বলিল—কর্ত্তা পাকা হলে গিন্নী আর কোথায় কাঁচা থাকে? তুমি না হয় আমাকে সহকারী করে—কাজ কর্ম্ম চালাও, দেখ পারি কি না পারি? "সরস্বতী কে বল্লে তুমি পার্‌বে না?" আচ্ছা! ফিরে এসে তোমাকেই না হয় সহকারী কর্ব্বো, তার আর ভাবনা কি? বলিয়া দুঃখীরাম কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির বাটীতে আসিলেন।

ইত্যবসরে রত্নাবলী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বউ! ঠাকুর পো কি চলিয়া গেলেন, তিনি কি আজ কাশী যাচ্ছেন নাকি?

সর। হাঁ, আজ আর তিনি কিছুতে বাধা মান্‌লেন না; আজ বড় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে—তবে অন্য কাজ; এই বলে বেরুলেন।

রত্ন। চলে গেলেন কি; না এখন দেরী আছে?

সর। কেন, তোমার কিছু দরকার আছে নাকি দিদি, ডেকে দেবো?

রত্ন। হাঁ, যদি না গিয়ে থাকেন, তাহলে একবার ডাক্‌তো বোন্।

বিবাহের পর হইতে রত্নাবলী ও সরস্বতী দুই ভগ্নীর মত কালযাপন করিতেছেন। রত্নাবলী বড়, সরস্বতী ছোট; দুইটী যেন মার পেটের বোন্—এতদিন এই ভাবে ছিল। বিবাহের পর বড় যা হইয়াছেন—রত্নাবলী আর ছোট হইয়াছেন সরস্বতী। রত্নাবলীর কথা শুনিয়া সরস্বতী পর্দ্দার আড়াল হইতে স্বামীকে ডাকিল—হ্যাঁগা! তুমিত এখনো যাও নাই?

দুঃখী। কেন, আবার পাছু ডাক্‌তে এলে?

সর। দিদি একবার তোমাকে ডাক্‌ছেন।

দুঃখী। তোমাদের জালায় আর কিছু হবে না দেখ্‌ছি যেমন পা-টী বাড়িয়েছি—অম্‌নি ডাক, শুভ কাজত এইজনাই পণ্ড হয়, একেত সহস্র কাজ ফেলে যাচ্ছি, তাতে আবার পা বাড়াতে না বাড়াতেই বাধা।

সরস্বতী বলিলেন—এতে কোন অমঙ্গল হবে না—"সাম্‌নে চেয়ে পিছু ভাল যদি ডাকে মায়" মাতৃসমা দিদি ডেকেছেন—আমি নয়—যে তোমার কর্ম্মপণ্ড হবে!

"সরস্বতী যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। মুখে খৈ ফুট্‌ছে, কথায়ত পারবার যো নাই"—এ বলিয়া নিভৃতে স্ত্রীর গোলাপী গণ্ডদেশ চুম্বনে রক্তাভ করত দুঃখীরাম গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকলেন—বৌদি! তুম কি আমাকে ডাক্‌ছো?

রত্ন। রাগ করোনা ঠাকুরপো! তুমি যে যাত্রা করে বেরিয়েছ—তা জানিনা; বউ বল্লে—এখনও তিনি বৈঠকখানায় আছেন—তাই ডাক্‌ছি!

দুঃখী। বার হই নাই বটে, তবে কি বলছো বল—আর দেরী কল্লে, আজ সেখানে পৌঁছাতে পারবো না!

রত্ন। ঠাকুরপো! আমি শুন্‌লাম, তুমি নাকি কাশী যাচ্ছ? আমি মনে করছি—তোমার সঙ্গে যাব, আর কতকাল এমন করে থাক্‌বো, আর যে থাকতে পারি না ভাই?

দুঃখী। তাতো দেখ্‌ছি বউদি! কিন্তু কি কর্ব্বো বলো, ভগবান যত দিন সদয় না হন, ততদিন কিছু হয় না, তা না হলে আমিই বা এমন করে দস্যুর হাতে পড়ে নাকানী-চোবানী খাবো কেন?

রত্ন। ভাই! তোমার শরীরের কষ্ট অনেক হয়েছে সত্য কিন্তু

এটা ও ভগবানের একান্ত দয়া বল্‌তে হবে—তা না হলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো 'কেমন করে ?

দুঃখী। সেকথা কি আর একবার করে বল্‌তে বউদি! তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে, আমার দারুণ রোগ-যন্ত্রণা কোথায় পালিয়ে গেলো; নতুবা কি আমার রোগ এত শীঘ্র ভাল হতো ?

রত্ন। ভগবান যে মুখ রক্ষে করেছেন—এই আমার ভাগ্য, ভাই! এখন আমায় সঙ্গে লইবার মত আছে কি বলো!

দুঃখী। বউদি! আজ অনেক দিনের পর যাচ্ছি; তিনি কোথায়—কিরূপ অবস্থায় আছেন, তাঁকে না দেখে, তার মনোগত ভাব না বুঝে, একেবারে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া কি ভাল ? তারপর খুড়ীমাকে সেই ভগবানদাস দোবের বাটীতে রেখে এসেছি—তাঁর কি হলো—না হলো, এসব না জেনে—শুনে, তোমাকে কোথায় নিয়ে যাব; আগে সমস্ত সন্ধান নিয়ে আসি, তার প তোমায় নিয়ে যাব; তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, যদি দেখা না পাই, বা কোনপ্রকার অমত করেন—তাহা হলে অনেক ফেরে পড়্‌তে হবে।

রত্ন। ফেরে আর কি পড়বো ভাই! এবার যদি তাঁর দেখা না পাই এবং যদি দেখা পেয়েও, তিনি অগ্রাহ্য করেন—তা হলে আমার থাকবার অনেক যায়গা আছে।

দুঃখী। কোথায় থাকবে বউদি! তবে কি তুমি বাপের বাড়ী যাবে ?

রত্ন। বাপের বাড়ী যাব কেন, আর সেখানেই বা কে আছে ? এবার মা-গঙ্গার-কোলে একেবারে স্থান নেবো; আর কত দিন এমন করে থাকবো ?

দুঃখী। বৌদি ! সেত শেষের কথা, সোজা পথ পড়ে রয়েছে, কিন্তু আমি কি সেইজন্যই তোমাকে এত কষ্ট করে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচালাম ; দেশ-বিদেশে ঘুরে দাদার এত সন্ধান করলাম, তারপর নিজের জীবনকে এরূপ সঙ্কটাপন্ন করলাম কি তোমাকে মা গঙ্গারজলে বিসর্জ্জন দিতে ? যে কোন রকমে হউক তোমাকে এবার দাদার সঙ্গে মিলন করে দেবোই দেবো ! তুমি ভেবোনা বউদি ! এতদিন সহ্য করেছ, আর দশ পনর দিন থাক, এবার আমি এর একটা কিনারা নিশ্চয়ই করে আস্‌বো।

রত্ন। তবে আজ কেন আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল না ?

দুঃখী। তাই বা কেমন করে হয়—আজ প্রায় বৎসরাবধি তাঁকে সেখানে রেখে এসেছি, তার সন্ধানটা না নিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে কোথায় নিয়ে যাব, যদি তিনি সেখানে না থাকেন বা একটা ভালমন্দ হয়ে থাকে ?

রত্নাবলী আর কোনও প্রকার জেদ না করিয়া বলিলেন—ঠাকুরপো ! তুমি যা ভাল বুঝ তাই কর, কিন্তু এটা যেন মনে থাকে, আমি আর বেশীদিন এমন করে থাক্‌বো না।

"না না—তুমি স্থির হও ; তোমার চিন্তা অপেক্ষা, আমার চিন্তা খুব বেশী" এই বলিয়া দুর্গানাম স্মরণ করতঃ দুঃখীরাম কাশী অভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

দুঃখীরাম কাশীতে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত স্থানে গমন করিলেন কিন্তু সেখানে এখন আর কোনও আশ্রম নাই দেখিয়া মনে করিলেন একি হইল ! তবে কি দাদা টোল তুলিয়া দিয়া কাশীধাম ত্যাগ করিয়াছেন, আমার এত চেষ্টা কি সমস্ত ব্যর্থ হলো, তবে কি আর তাঁকে পাওয়া যাইবে না ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তুলসীদাস এখন একজন কাশীর বিখ্যাত লোক—তাঁহার নাম জানে না, এমন লোক সেখানে কেহই নাই—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁর নামে পাগল। দুঃখীরাম যখন বিরসবদনে অসিঘাটের নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন, তখন একজন স্ত্রীলোক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে দুঃখীরামের মত একজন ধনী যুবককে তথায় ঐরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—হাঁ বাছা! তুমি এই অন্ধকারে এমন ভাবে বসে রয়েছ কেন, তোমার কি কিছু হারিয়েছে?

দুঃখী। না মা, কিছু হারায় নি, তবে হারানোর চেয়েও বেহদ্দ। প্রাণ হারালেও এত কষ্ট হয়না—আজ আমি তার চেয়েও বেশী জিনিষ হারিয়েছি।

স্ত্রী। কি হারিয়েছ বল—তুমি কি কাহাকেও খুঁজছো?

দুঃখী। হাঁ মা, এইখানে যে টোল ছিল, সেই টোলে এক বাবাজী থাকৃতেন, তাঁকেই খুঁজ্‌ছি! আমি বড় আশা করে, তাঁর কাছে এসেছিলাম।

স্ত্রী। তোমার বুঝি কিছু গণাতে হবে—তা সে গুণৎকার বাবাজী, এখন আর এখানে থাকেন না, তাঁর এখন খুব ভাল হয়েছে—তিনি এখন কাশীর মধ্যে একজন নামজাদা বড়লোক হয়েছেন। মরা মানুষ বাঁচাতে শিখেছেন, পাষাণকে প্রাণ দিতে পারেন—এখন তিনি একজন মহাপুরুষ, তবে এ বনের মধ্যে আর থাক্‌বেন কেন? এখন ঐ অগস্তকুণ্ডের ধারে তাঁর খুব বড় চতুষ্পাঠী হয়েছে; কত লোক যাওয়া-আসা করছে, তুমি যাওনা বাবা, এখনি দেখা হবে।

বৃদ্ধা সন্ধান বলিয়া দিলেন। দুঃখীরাম হরষিত-মনে সেই দিকে

প্রস্থান করিলেন এবং অচিরে তুলসীদাসের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—বাস্তবিকই তাঁহার অবস্থা ফিরিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় সে ভাঙ্গা বেড়া, দরমায় ঘেরা ঘর নাই—দিব্বি পরিষ্কার গৃহ হয়েছে; চারিদিকে ফুলের বাগান! দুঃখীরাম যখন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন দেখিলেন—ভগবানদাসও তথায় উপস্থিত আছেন—ভগবানদাসের সহিত এখন তুলসীর খুব ঘনিষ্টতা হইয়াছে। তিনি প্রায়ই এখানে আসেন—অবসরক্রমে তুলসীদাসও তাঁহার বাটী পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করেন।

দুঃখীরাম ভগবানদাসকে দেখিয়া দূর হইতে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক নমস্কার করিয়া বলিলেন—ভগবানবাবু! আপনি কেমন আছেন? ভগবানদাস দুঃখীরামকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং অতিশয় আগ্রহের সহিত নিকটে আসিয়া বলিলেন—আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন, আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া যখন বৃদ্ধা হতাশ হইলেন—কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প করিলেন—তখন আর কি করিব, আমি সহস্র কাজ ফেলিয়া অনবরত একমাস অন্বেষণ করত আজ কয়েকদিন হলো বৃদ্ধাকে তাঁহার পুত্রের নিকট আনিয়া দিয়াছি!

দুঃখীরাম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—দাদা, তাহাতে কোনপ্রকার দ্বিরুক্তি করে নাই?

ভগবান। না, বরং আমি তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছি বলিয়া, বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন, এত বড় একজন সাধু মহাত্মা হইয়া প্রায়ই আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতেছেন, আপনার জন্য তিনি এখন বড়ই কাতর হইয়াছেন, চলুন চলুন—আহা! আজ মহাত্মা আপনাকে

দেখে কত খুসী হইবেন। এই বলিয়া দুইজনে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

তুলসীদাস একাহারী, সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আহারাদি সমাপন করেন। ভগবানদাস ও দুঃখীরাম যখন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন—তখন তুলসীদাস সবেমাত্র আহার করিয়া চতুস্পাঠীতে আসিয়াছেন; ছাত্রগণ সকলেই পাঠ সমাপন করিয়া বাড়ী গিয়াছে।

যত দিনে চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করুক না কেন, প্রিয়বস্তুকে দেখিলে তাহাকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়! তুলসীদাস ইদানিং যোগক্লিষ্ট হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন—সহজে চেনা যায় না, আর দুঃখীরাম বড়লোকের জামাই হইয়া, খুব তোয়াজে থাকিয়া বেশ মোটা-সোটা হইয়াছেন—তথাপি তুলসীদাস তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া, অ্যাঁ একে, আমার দুঃখে ভাই! আয় আয় ভাই! তোকে দেখ্‌তে না পেয়ে আমি বড় কষ্টে আছি, কত স্থানে কত সন্ধান নিয়েছি, কিছুতেই দেখা কর্ত্তে পারি নাই—মনটা যে কিরূপ খারাপ হয়েছে—তা বল্‌তে পারিনা, আজ ভগবান আমাকে একটা মহা ভাবনার হাত থেকে মুক্ত করলেন—তা ভাই দুঃখী, কেমন আছিস্ ভাই!

দুঃখীরাম। থাকাথাকি আর কি দাদা! যা হয়েছিল, তাতে এ যাত্রা আর দেখা হবার আশা ছিল না—তবে ভগবান রক্ষা করেছেন, একটী পরম দয়ালু মহাত্মার সেবায় এ যাত্রা জীবন পেয়েছি, আমি অনেকদূরে গিয়ে পড়েছিলাম—তা দেখা হবে কি করে? সেই যে দিন তোমার সঙ্গে দেখা হলো, তার পরদিনই এই কাণ্ড; আজ মাস্‌খানেক সুস্থ হয়েছি। এই বলিয়া দুঃখীরাম

সমস্ত ঘটনা, তার পর তাহার বিবাহ, বিষয়াদি লাভ প্রভৃতি সমস্ত বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন—দাদা! আমার বিবাহ কর্ত্তে আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তবে কি কর্ব্বো—এমন উপকারী জীবনদাতার কথা ত ঠেলিয়া দেওয়া যায় না, কাজেই না করে থাকৃতে পারিলাম না। তবে অতিরিক্ত কষ্ট হয়েছে—এই বিষয়াদির ছেঁপাজাৎ লইয়া, গরীবের ছেলের এ সকল কি সাজে? দুঃখীরাম সমস্তই বলিলেন—কেবল রত্নাবলীর কথাটী গোপন রাখিলেন—মনে মনে কি মন্তব্য আছে—তাহা তিনিই জানেন।

তুলসীদাস বলিলেন—তাতে আর কি হয়েছে—বিবাহ করেছো, তাহার বিষয় লাভ করেছো, এত একপ্রকার ভগবানেরই দেওয়া—এতে নারাজ হলে চল্‌বে কেন? এমন সময় হুলসীদেবী আসিয়া দুঃখীকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—বাবা! তুই এতদিন কোথায় ছিলি দুঃখি! তোর জন্যই আজ আমি আমার তুলসীমণিকে আবার দেখ্‌তে পেয়েছি। তোর এত দেরী কেন হলো বাবা? দুঃখীরাম হুলসীদেবীকে সমস্ত বলিলেন—কিন্তু তাঁহার কাছেও রত্নাবলীর কোন সংবাদ দিলেন না।

হুলসীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—হারে দুঃখী! বউটী কেমন হলো—তাও একবার দেখ্‌তে পেলাম না, তোর শ্বশুর-শাশুড়ী কেমন মানুষ, তাও ত জান্‌তে পার্‌লেম না?

দুঃখীরাম বলিলেন—খুড়ীমা! সেইজন্যই ত তোমাদের নিতে এসেছি; দাদাকে, তোমাকে এবং ভগবানদাস বাবুকে সেখানে যেতে হবে—তোমাদের পায়ের ধুলা না পেলে, আমার যে কিছুই হবে না।

হুলসী। তা সেখানে গেলে বউমাকে এবং তোর শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখ্‌তে পাব তো?

দুঃখী। তার আর পাবে না কেন? কালই তোমাদের যেতে হবে!

তুলসী। হ্যাঁ বাবা। সব ত হলো, ভগবান শেষ দশায় সমস্ত করলেন—কিন্তু কই বাবা! আমার বউমার ত কিছু কিনারা হলো না—সে কি তবে নাই? এই বলিয়া বুড়ী চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন, বলিলেন—বাবা! আমার যাবার সময় হয়েছে—এইবার আমার মাকে পেলেই যে আমি সুখে মরতে পারি,—ভগবান রামচন্দ্র কি আমার শেষ আশাটী পূর্ণ করবেন না? বলিয়া বুড়ী চক্ষের জল মুছিলেন।

দুঃখীরাম দেখিলেন—দাদা জননীর এ কথায় কোনপ্রকার বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না—বরং তাহারও যেন মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, অপরে কেহ না বুঝুক—দুঃখীরাম বুঝিয়াছিল।

বহুদিনের পর প্রাণের বন্ধু দুঃখীরামকে পাইয়া তুলসীদাস বড়ই আনন্দানুভব করিলেন। সমস্ত রজনী আনন্দে কাটিয়া গেল। ভগবানদাস আজ এ আনন্দের অংশভাগী হইয়া সেইখানে রাত্রি বাস করিলেন। প্রাতঃকালে কথা হইল—দুই চারদিনের মধ্যে ভগবান-দাস তুলসীদেবীকে লইয়া গোসাইগঞ্জে দুঃখীর শ্বশুরবাটী যাইবেন—তুলসীদাস অবসর ক্রমে একাকীই তথায় গমন করিবেন। এইরূপ স্থির হইলে দুঃখীরাম তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় হইয়া জৌন-পুর গমন করিলেন—দুই একদিনের মধ্যে সে শ্বশুর-শাশুড়ীকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মফল

মান গেল—সম্ভ্রম গেল—তবে আর প্রাণ কিসের জন্য ; বলিয়া জনৈক ভট্টাচার্য্য কাশীর বাঙ্গালী টোলায় একটা গলির রাস্তা দিয়া রজনীর ঘোর অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রজনী প্রভাত হইতে আর বেশী বাঁকী নাই, কিন্তু অন্ধকার গাঢ়তররূপে তখনও সেই গলির মধ্যে রাজত্ব বিস্তার করিতেছে—লোকজন তখনও কেউ শয্যা ত্যাগ করে নাই, দারুণ শীতে তখনও লোক সকল গৃহে আবদ্ধ। এমন সময় একটী যুবক আসিয়া ভট্টাচার্য্যকে প্রণাম করিল। তিনি যুবককে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—কই, বৎস ভানু! এখন কতদূর ; গুণ্ডাদ্বয়ই বা কোথায় ?

প্রতিহিংসা মনে জাগিলে মানুষ পশুর অধম হয়ে পড়ে—ধর্ম্মাধর্ম্ম তখন আর তার জ্ঞান থাকে না, পাঠক! ভট্টাচার্য্যবেশী বিশ্বম্ভর আর ভানুদত্ত আজ কি ভীষণ কাজে লিপ্ত হইয়াছে, একবার দেখুন!

তুলসীদাসের অভ্যুদয়ে বিশ্বম্ভরের মান-সম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইয়াছে তাঁহাকে এখন আর কেহ বড় পণ্ডিত বলিয়া মানে না—তাঁহার ব্যবস্থাও আর কেহ গ্রাহ্য করে না, এখন তাঁহার দিন চলা একপ্রকার দায় হইয়াছে।

এইজন্য পণ্ডিতের মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে—কিসে তুলসীদাস নিপাত যায়—কিসে তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে পারেন—এখন

গুরুশিষ্যের কেবল সেই চিন্তাই প্রবল। অনবরত নানাপ্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করত বিফল মনোরথ হইয়া আজ আবার নূতন কৌশল বিস্তার করিয়াছেন। তুলসীদাস আজ ভোরের সময় গোঁসাইগঞ্জ যাইবার জন্য বাহির হইবেন শুনিয়া পাষণ্ড দস্যু দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিবেন—এই চেষ্টায় ভানুদত্তকে তাঁহার সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছিলেন।

ভানুদত্ত আসিয়া বলিল—বাবাজী বাড়ীর বাহির হইয়া এই পথেই আসিতেছেন। বিশ্বম্ভর বলিল—তবে গুণ্ডাদ্বয় কোথায় গেল, এর পর রাত্রি পোহাইলে যে আর কাজ হাসিল হইবে না! ভানু বলিল—প্রভু! আপনি ভাবিবেন না—আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। তাহারা গলির মোড়ে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে লুকাইয়া আছে। আপনি এইবার অন্তরালে যান—আমিও গা ঢাকা দিই—কেউ না জান্‌তে পারে।

"বাবা! ঠিক হবে ত, দু-দুশো টাকা ব্যাটারা হজম কর্ব্বে না ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস নেই—যতক্ষণ না কাজ হাসিল হয়।" এই বলিয়া বিশ্বম্ভর গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিলেন—মন কিন্তু তাঁর সন্দেহ পূর্ণ; যত সময় যাইতেছে, ততই তিনি বিষম সন্দেহাকুল হইতেছেন। দুই শত টাকা, ভট্‌চায্যি বামুন কত কষ্টে উপায় করেছে, এই দুঃখের সময় এ টাকার মায়া কি ছাড়া সহজ, যদি কার্য্যোদ্ধার না হয়?

ভানুদত্ত গুরুদেবকে আশা দিয়া বলিল—প্রভু! কোন চিন্তা নাই—আপনি সরে পড়ুন, এখনই কেহ দেখিয়া ফেলিবে, আমিও যাই। এই বলিয়া ভানুদত্ত গুণ্ডাদ্বয়কে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আপনি সরিয়া পড়িল। সন্দেহ যার হৃদয়ে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে, তাহার

শান্তি কোথায়? আজকাল বিশ্বম্ভর প্রাণের ছাত্র ভানুদত্তকেও আর তত বিশ্বাস করে না। সময় খারাপ হইলে, লোকের মতিচ্ছন্ন এইরূপই হইয়া থাকে, তখন জগৎ শুদ্ধ লোককে তাহার পর বলিয়া বোধ হয়, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি থাকে না। মৃত্যুর প্রাক্কালে এইভাব জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া প্রাণটাকে অশান্তির আগার করিয়া তুলে। বিশ্বম্ভরের আজ তাহাই হইয়াছে—এত কষ্ট, এত নিন্দা সহ্য করিয়াও যে ভানুদত্ত অটল অচলভাবে গুরুপদে আবদ্ধ রহিয়াছে, পাপ-পুণ্য কিছু গ্রাহ্য করে না; সদাই অনুগত দাসের মত ন্যায়-অন্যায় সমস্ত কার্য্য অম্লান বদনে প্রতিপালন করিতেছে, আজ সেই অনন্যশরণ শিষ্যের প্রতিও পাষণ্ডের সন্দেহ—সে টাকা দিয়া গুণ্ডার ব্যবস্থা করিয়াছে কি না! ভানু লোকলজ্জার ভয়ে যখন অন্ধকারে সমস্ত ঠিক করিয়া লুকাইয়া পড়িল। বিশ্বম্ভর তখন মনে করিল—একবার আগ্ বাড়াইয়া গলির মোড় অবধি দেখিয়া আসি—গুণ্ডারা আছে কি না, তার পর ঐ স্থানে লুকাইয়া পড়িব। এই বলিয়া ভানুদত্তের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন?

গুণ্ডাদ্বয় সেইখানেই লুকাইয়া আছে—তাহারা ত কাহাকেও চিনে না,—কে বিশ্বম্ভর, কে তুলসীদাস তাহা ত তাহাদের জ্ঞান নাই—পূর্ব্ব হইতে দেখেও নাই। অতএব বিশ্বম্ভর যেমন ভানুদত্তের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া গলির মোড় অবধি অগ্রসর হইয়াছে, গুণ্ডাদ্বয় মনে করিল—এই তুলসীদাস, তাহারা ত্বরিত পদবিক্ষেপে আসিয়া বিশ্বম্ভরের বুকে সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।

বিশ্বম্ভর বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া—ওঃ গেলাম, মলাম, জগদীশ

রক্ষা কর, যাই——"আর কথা বাহির হইল না—রক্তাক্ত কলেবরে সেইখানেই লুটিয়া পড়িল।"

"থাক বেটা" বলিয়া গুণ্ডাদ্বয় ধীরে ধীরে গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বে কাশীতে গুণ্ডার দ্বারা এইরূপ ভীষণ কার্য্য সকল সংঙ্ঘটিত হইত, অর্থ পাইলে তাহারা এইরূপ পবিত্র স্থানেও লোকের প্রাণসংহার করিত। ভানুদত্ত তাহাদিগকে অর্থের দ্বারা বশ করত তুলসীদাসের বধার্থে নিযুক্ত করিয়া ঐ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিল। তাহারা ত তুলসীদাস ও বিশ্বম্ভরকে পূর্ব্বে দেখে নাই, এই পথে তুলসীদাস আসিতেছে—আর কেহ বাহির হয় নাই—তোমরা সাবধানে থাকিয়া তাহাকে হত্যা কর। ভানু তাহাদিগকে এই কথা মাত্র বলিয়া গুরুদেবকে সাবধান করত আপনি অন্যস্থানে গা ঢাকা দিয়াছে, কিন্তু বিশ্বম্ভর যে তাহার প্রতি এত সন্দিহান হইয়া, তাহারা আসিয়াছে কিনা দেখিতে যাইবে—তাহা কে জানে? ইহা সেই চক্রীর চক্র, পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিতে গেলে, আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়্‌তে হয়—ইহা যে নীতি সঙ্গত কথা। অনবরত একজন মহাপুরুষের অনিষ্ট করিলে, ভগবান সহ্য করিবেন কেন? ধার্ম্মিককে পদে পদে অপদস্থ করিলে, তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা প্রদান করিলে—ঈশ্বরের ন্যায়-চক্র যে স্বভাবতই তাহার উপর পতিত হইবে? ধার্ম্মিক চূড়ামণী তুলসীদাস কতবার কত বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং আজীবন গুরুর মত মান্য করিয়া আসিতেছেন, তথাপি পাষণ্ডের এই প্রতিহিংসা কিসের? তুলসীদাস ভুলেও কখন বিশ্বম্ভরের অনিষ্ট চিন্তা বা অপবাদ ঘোষণা করেন নাই। তাঁহার অভ্যুদয়ে বিশ্বম্ভর ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইতেছেন, তাঁহার পসার প্রতিপত্তি কমিয়া যাইতেছে—স্বার্থের হানী হইতেছে, দেখিয়া তিনি আপনার

জীবনদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না. করিয়া বরং স্বার্থ-প্রণোদিত প্রতিহিংসার বশে আজ তাঁহার প্রাণনাশের সংকল্প করতঃ নিজেই প্রাণ হারাইলেন। উপরে যে একজন পাপ-পুণ্যের বিধান কর্ত্তা রহিয়াছেন—তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারেই আজ বিশ্বম্ভরের ন্যায় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত গুণ্ডা দ্বারা প্রাণ হারাইল। ভগবানের বিচারে আজ এই শোচনীয় অপমৃত্যু কাশীর সদর রাস্তার উপর সংঘটিত হইল। ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের ক্ষয় হইল, এতদিনে যথার্থ একজন গুপ্ত ধর্ম্মধ্বজীর বিনাশ সাধন হইয়া, ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান হইল।

ভানুদত্ত নিকটেই ছিল—সে প্রাণের অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিয়া "শত্রু নিপাত হইল" দেখিবার জন্য দৌড়িয়া আসিয়া অন্ধকারে এদিক ওদিক অন্বেষণ করিয়া যাহা দেখিল—তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল—সে চীৎকার করিয়া বলিল—হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ, গুরুদেব খুন, দুরাত্মাগণ! তোরা কি করলি—যাহার টাকা খেলি—তাহাকেই খুন করলি? এ কথা আমি এখনই চারিদিকে প্রকাশ করিয়া দিব। গুণ্ডাদ্বয় তখনও পলায়ন করিতে পারে নাই। ভানুদত্তের এইরূপ কু-অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিল না, গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে তাহারা ভানুদত্তের বুকে ছুরিকাঘাত করিয়া স্থান ত্যাগ করিল, ভানুও গুরুর সহিত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পাপীকে সাহায্য করিলেও তাহাকে সেই বা তদধিক ফল লাভ করিতে হয়।

তারপর প্রভাত হইলে ঘটনাস্থলে বহু লোকের আমদানী হইল। সকলেই সর্ব্বজন বিদিত বিশ্বম্ভর পণ্ডিত ও তাঁহার ছাত্রের অপমৃত্যু দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। ভগবানদাসের সহিত জননীকে

গোঁসাইগঞ্জে পাঠাইয়া দিয়া, মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রাতঃ-সন্ধ্যা সমাপন করত মহাত্মা তুলসীদাসের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। পথে অতিরিক্ত লোক সমাগম দেখিয়া তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্বম্ভর ও তদীয় শিষ্যের এই শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া যারপর নাই কাতর হইলেন। হায়! ঘণ্টাকর্ণ যোগীর পুরাতন শিষ্য বিশ্বম্ভরের আজ এরূপ শোচনীয় মৃত্যু কে করিল? ঘণ্টাকর্ণ দেহাবসান সময়ে বিশ্বম্ভরের সহিত তুলসীদাসের কোনপ্রকার মনোমালিন্য না থাকে—উভয়ে পরস্পর বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কালযাপন করে—এইরূপ সদ্ভাব সংবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তুলসীদাস গুরুদেবের অনুমতি আজীবন পালন করিয়া আসিতেছেন কিন্তু বিশ্বম্ভর তাহা করেন নাই, গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘনও যে এই মহাপাপের একটা প্রধান কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

বিশ্বম্ভরের হৃদয়ভাব তুলসীদাস একদিনও অবগত হন নাই, তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে বিষের ছুরি তুলসীদাসের জীবননাশের জন্য অহরহঃ লুক্কায়িত রহিয়াছে, উদার-হৃদয় তুলসী সে সন্দেহ একদিনও করেন নাই—করিবার কোন কারণও ছিল না। ভগবান যার রক্ষার জন্য পাছু পাছু ঘুরিতেছেন, এজগতে সে আবার ভয় করিবে কার?

তুলসীদাসের গমনে বাধা পড়িল। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া ইহাদের মৃত্যুর জন্য শোক-প্রকাশ করিলেন এবং যাহাতে সত্বর এই শোচনীয় দৃশ্য লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়—সেজন্য চেষ্টা করিলেন। সকলে মহাত্মার সাহায্য করিতে লাগিল, প্রায় দুই ঘণ্টা পরে কোতয়ালীর আদেশ অনুসারে শবদ্বয় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ হইল। তুলসীদাস দাহকার্য্যের জন্য লোকজনের ব্যবস্থা করিলেন—এবং

শব চিতাস্থ হইল দেখিয়া তিনি আন্‌মনে এই শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইহজন্মের কর্ম্মের ফলভোগ এখানেই পরিসমাপ্তি হইল—পরজন্মে কি হইবে—তাহা ভগবানই জানেন!

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গোঁসাইগঞ্জে

ছগনলাল ও যশোদাদেবী মহাত্মা তুলসীদাসকে দেখিবার জন্য, তাঁহার পদধূলি লইয়া দেহমন পবিত্র করিবার জন্য জৌনপুর হইতে নিজ বাটীতে আসিয়া আজ অতি প্রত্যুষ হইতে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যত বেলা হইতেছে, ততই নিজ জামাতা দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কই বাবা! মহাত্মা ত এখনও আসিতেছেন না; তোমার কাছে তিনি বাক্যদান করিয়াছেন ত? দুঃখীরাম বলিলেন—আজ্ঞে হাঁ! তা না হলে কি আর আমি আপনাদের লইতে তত্দূর যাই; তিনি কথা দিলে—তাহা কখন নড়চড় হইবে না, বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ কখন কথার অন্যথা করেন না। তবে কি জানেন—তিনি বাটীর বাহির হইলে, একবারে চলিয়া আসিতে পারেন না, কত পরিচিত ভক্তের সহিত দেখা হয়—তাহাদের সহিত কথা কহিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়, এইজন্য এইরূপ হইতেছে—পথে হয়ত কাহার সহিত দেখা হইয়াছে।

জামাতার যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া ছগনলাল আশাপথ চাহিয়া রহিলেন। আজ তুলসীদাসের ন্যায় মহাত্মার পদস্পর্শে তাঁহার বাটী

পবিত্র হইবে, তাঁহার কুল পবিত্র হইবে—তিনিও ধন্য হইবেন—এরূপ সাধুসমাগম কি সহজে লোকের ভাগ্যে ঘটে? আজ তাঁহার পাগলী মার একটা কিনারা হইবে—অভাগিনী আজ বহুদিনের পর পতিসুখে সুখিনী হইবে—শাশুড়ীর আদর-যত্ন পাইয়া বহুদিনের নিরাশ হৃদয় আশাসিক্ত হইবে—ভাবিয়া ছগন ও যশোদার আনন্দ আর ধরে না। সরস্বতীও আজ পূজনীয়া রত্নাবলীর পতি ও শাশুড়ীকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিবে বলিয়া, আশাভরা প্রাণে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বেলা নয়টার পর একখানি বৃহৎ অশ্বযান আসিয়া ছগনলালের দেউড়িতে লাগিল। দ্বারবানগণ শশব্যস্তে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। একজন আধাবয়সী হিন্দুস্থানী ও একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। গৃহস্বামী ছগনলাল অতি বিনীতভাবে গমন করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। ইহাঁরা ভগবানদাস ও তুলসীদেবী?

বৃদ্ধা অতিশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার দুঃখী-রামের শ্বশুর কই?

ছগনলাল অতি নম্রস্বরে করযোড়ে বলিল—এই যে মা, কি অনুমতি হয়!

তুলসীদেবী বলিলেন—তুমি বাবা, আমার দুঃখীর শ্বশুর—আহা বাবা! তোমার ঋণ আমি জীবনে কখন শুধিতে পারবো না, তুমি আমার বউমাকে বাঁচিয়েছো, আমার দুঃখীর জীবনদান দিয়ে তাকে জামাতা করেছো, আহা! এমন না হলে কি পরোপকারী দয়ালু হওয়া যায়!

ছগনলাল ততোধিক করযোড়ে বলিলেন—দেবি! এ সকল

আপনাদের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় মহিমাময়ী মায়ের আশীর্ব্বাদ, নতুবা আমার এমন কি ক্ষমতা আছে?

বৃদ্ধা ছগনলালের নম্রতা দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—বাবা! দুঃখী আমার কোথায়—তাকে ডেকে দাও। "আজ্ঞা হাঁ, বাবাজী! এখনি আস্‌বেন" বলিয়া ছগনলাল ভগবানদাসকে বসিবার জন্য আসনদান করিলেন এবং যারপর নাই নম্রতা স্বীকার করিলেন। ভগবানদাস এরূপ ধনীলোকের এরূপ সৌজন্যে একান্ত বাধিত হইয়া আসনোপবেশনে আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিলেন।

তারপর দুঃখী আসিয়া খুড়ীমার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন। তুলসীদেবী বলিলেন—বাবা দুঃখী! একবার আমাকে অন্দরে নিয়ে চ, আর যে বৌমাদের না দেখে—স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না।

দুঃখীরাম খুড়ীমার হাত ধরিয়া অন্দরে লইয়া গেলেন। বহুদিন পরে শাশুড়ী বৌয়ের মিলনে আনন্দের কান্না পড়িয়া গেল, বউ শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া কাঁদে, শাশুড়ী বউয়ের গলা ধরিয়া কেবল মুখচুম্বন করেন আর বলেন—দেবতার কৃপায় আর এই মায়ের কল্যাণে (যশোদাকে দেখাইয়া) আমার ঘরের লক্ষ্মীকে আবার ফিরে পেয়েছি। যশোদা স্বামীর অনুরূপা বিনম্র প্রকৃতিশালিনী, তিনি বৃদ্ধার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—মা! আমাদের কৃতীত্ব কিছুই নাই—সমস্তই ভগবানের। তারপর তুলসীদেবী দুঃখীর বউটীকে কোলে লইয়া বলিলেন—আহা! দিব্বি বউটি, সরস্বতীই বটে! চিবুক ধরিয়া চুমা খাইতে খাইতে বলিলেন—মা! জন্মায়ত্তি হও, পাকা চুলে সিন্দুর পর, দুঃখীর মত স্বামী বড় সৌভাগ্য না হলে হয় না,—আশীর্ব্বাদ করি দুই-জনেসুখে ঘরকন্না কর! সরস্বতী পদধূলি লইল।

কান্নাকাটী যখন থামিয়া গিয়াছে, আসনে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেইসময় দুঃখীরাম আসিয়া বলিলেন—খুড়ীমা! বউ পছন্দ হয়েছে, সরস্বতী লজ্জায় সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা বলিলেন—এমন বাপ-মায়ের মেয়ে যে, সে আর অপছন্দ হয় বাবা!

দুঃখী বলিলেন—দেখ খুড়ীমা! দাদা এলে আমি একটু চালাকী খেলিব, নতুবা বউদির কিনারা হইবে না, তুমি কিছু প্রকাশ করো না। হুলসীদেবী সেকালের স্ত্রীলোক, অত তত্ত্ব কিছুই জানেন না, তিনি বলিলেন—না-না বাবা! তা কেন কর্ব্বো, তুই যা ভাল বুঝিস, তাই করিস্—তবে তার মনোগত ভাব এখন বুঝেছিস ত?

দুঃখী। মনটা অনেক নরম হয়েছে, এখন বৌদিকে বোধ হয় আর ঠেল্‌তে পারবেন না, যদি ঠেলেন—সেইজন্য আগে থেকে একটা কৌশল কর্ব্বো, তাতে আর তিনি ভিন্নমত কর্ত্তে পারবেন না, এখন যে একবার এলে হয়!

হুলসী। সেত অনেকক্ষণ বেরিয়েছে—এত দেরী হচ্ছে কেন বল দেখি?

দুঃখী। এখন দাদা ত আর সে দাদা নেই, পথে বেরুলে কতলোকের সঙ্গে দেখা হবে, কতলোকে পায়ের ধূলা খাবে, তবে ত আস্‌বেন, এইজন্যই দেরী হচ্ছে।

হুলসী। আস্‌বে—ঠিক জানিস ত?

দুঃখী। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ কি কথার খেলাপ করে খুড়ী, এই দেখ না, এসে পড়লেন বলে! এই বলিয়া দুঃখীরাম বাহিরে গেলেন।

যশোদা বলিলেন—বাবাজীর আমার এত ফন্দীও আছে, দেখ না, আজ আবার একটা কি নূতন বুদ্ধি খাটায়।

হুলসী। মা! ওর গুণে কি নূন দিতে আছে, ওর জন্যেই আমি বেঁচে আছি এবং ওর জন্যেই আজ ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। বলিয়া সকলেই দুঃখীরামের তারিফ করিতে লাগিল। রত্নাবলী একধারে বসিয়া কেবল ইষ্ট চিন্তা করিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছিলেন। আজ মা জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা, অদৃষ্টে কি আছে—সতীর কেবল সেই চিন্তা।

সাধু মহাত্মার দর্শন জন্য সকলেই উদগ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন। তুলসীদাস ত আর যে সে লোক নহেন, তাঁহার দর্শন বহু ভাগ্য সাপেক্ষ। ছগনলাল একবার ঘরে যাইতেছেন, একবার বাহির বাটীতে আসিতেছেন, ভগবানদাসও আজ বিশেষ ব্যস্ত। যত বেলা বেশী হইতেছে, ততই সকলের মনে সন্দেহ হইতেছে—বুঝি বাবাজী আর আসিলেন না। কিন্তু দুঃখীরাম সকলকে আশ্বাস দিতেছেন—দাদার এখন যে অবস্থা, তাহাতে মিথ্যাকথা তাঁহার মুখ হইতে কখনই বাহির হইতে পারে না, আপনারা বিচলিত হবেন না, তিনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন।

বেলা যখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ, শীতের জড়তা কাটীয়া যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দেব মধ্য গগণে উদিত, ঠিক সেইসময় বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—বাড়ীময় একটা আনন্দের সোর-গোল পড়িয়া গেল। ছগনলালের শিবালয়ে গোঁসাইজীর জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বৃহৎ ঠাকুরবাড়ী, লোক সঙ্কুলনের অভাব হইবে না।

হুলসীদেবী আসিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, দুঃখীরাম অতি বিনীতভাবে আসিয়া দাদার অভ্যর্থনা করিতে ছাড়িলেন না। ছগনলাল আসিয়া প্রভুর পদে প্রণিপাত করিলেন। বহুলোক আজ এই মহাপুরুষকে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিল। রত্নাবলী ও সরস্বতী

গবাক্ষ হইতে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—দিদি! সেদিন জৌনপুরে তুমিই ত ইহাঁকে রাঁধিবার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছিলে—এবং বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলে—যদি ঝুলির ভিতর সমস্ত আছে, কিছুরই অভাব নাই—তবে নিজের পত্নীকে লইতেই যত দোষ, এ কিরূপ সাধুগিরি? সেকথা শুনিয়া উনি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, আমরা অন্দরে চলিয়া গেলাম, সেদিন সেকথা বলা ত তবে ভাল হয় নাই?

রত্নাবলী। ভাই! সেদিন আলোক-আঁধারে তত চিনিতে পারা যায় নাই; আর উনিই যে অমন করে আমাদের সেখানে অতিথি হবেন, তা কেমন করিয়া জানিব? চেহারার যে ঘোর পরিবর্ত্তন; পূর্ব্বেকার সঙ্গে তুলনাই হয় না—যাহা হউক, ভাই! ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন দাসী পুনরায় ঐ পদের অধিকারী হতে পারে। আজ যদি কোনপ্রকারে বিফল মনোরথ হই, তাহা হইলে আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না।

সরস্বতী। দিদি, অত উতলা হচ্ছো কেন, তোমার দেবরত বলেছেন, আজ যে রকমে পারি—দাদা-বউদির মিলন করিয়া দিবই।

রত্ন। হাঁ, কিন্তু অদৃষ্ট যে ভাল নয় ভাই?

সরস্বতী। প্রভু রামচন্দ্র কি চিরদিনই এই রকম রাখ্‌বেন, তিনি যে অনাথ নাথ!

রত্ন। তুই যা বল্লি সরস্বতী, এখন ভরসা কেবল তাঁর, তিনি ভিন্ন দাসীর দুঃখ দূর করিতে আর কেহই নাই।

সকলে সাধু দর্শন করিয়া গেল, ঠাকুরবাড়ী নির্জ্জন হইল। তারপর সন্ধ্যার সময় তুলসীদাস অন্যান্য দিনের মত স্নানাহ্নিক

সমাপন করিয়া ভগবান সদাশিবের পূজা ও আরতি করিলেন। তার পর আহারাদি হইল। নানাপ্রকার উপাদেয় আয়োজন হইয়াছে। হুলসীদেবী আজ পুত্রকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইলেন। তুলসীদাসের আহার হইলে অপর সকলে আহার করিলেন। আহারাদির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে তুলসীদাস দুঃখীরামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দুঃখে ভাই! কই, তোর বউ দেখালিনি, এই সময় বাহিরের লোক কেউ নাই—একবার আন্‌না—দেখি কেমন বউটী হলো?

দুঃখীরাম সাগ্রহে বলিলেন—হাঁ দাদা! এইবার আনিব; এখন ত আর অপর লোক কেহ নাই, যাই আনিগে। বলিয়া দুঃখীরাম চলিয়া গেলেন—সকলে এইবার ভগবানের নাম জপ করিতে বসিল। তারপর কিরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আজ রত্নাবলীকে দাদার নিকট লইয়া যাইবেন—দুঃখীরাম তাহা প্রকাশ করিলেন, সকলেই অবাক হইয়া রহিল।

দুঃখীরাম নূতন বউকে দেখাইবার ভাণ করিয়া রত্নাবলীকে সাজাইয়া লইয়া আসিতেছেন—সঙ্গে সঙ্গে জননী হুলসীদেবীও চলিয়াছেন। যশোদা ও ছগনলাল আজ কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—হে ভগবন্! আজ আমার চির-দুঃখিনী পাগ্‌লী মা যেন স্বামী কর্ত্তৃক গৃহীতা হন; হে মধুসূদন! দুঃখিনীর দুঃখ মোচন কর প্রভু! তুমি ভিন্ন অভীষ্ট ফলদানে দুঃখিনীর দুঃখমোচন করিতে আর কেই নাই।

রত্নাবলীর প্রাণ গুর গুর করিয়া কাঁপিতেছে, ভয়ে আত্মা-পুরুষ শুখাইয়া গিয়াছে, মনে মনে বলিতেছেন—দীনবন্ধু! আজ দাসীর প্রতি সদয় হও, প্রাণের ধনকে সম্মুখে পাঠাইয়া যেন হতাশ করিও

না—তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব না। হয় পতিপদে স্থান দান কর, না হয় জীবনগ্রহণ কর, আর এ দুর্ব্বহ যন্ত্রণা-ভার সহ্য করিতে পারিব না ঠাকুর!

তুলসীদেবী আগে আগে চলিয়াছেন, মধ্যে রত্নাবলী ঠিক নববধূটীর মত ধীর-পদবিক্ষেপে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ছগনলাল, তদপশ্চাৎ দুঃখীরাম! গৃহমধ্যে যশোদা ও সরস্বতী মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিতেছেন—যেন মনস্কামনা সিদ্ধি হয় প্রভু!

তুলসীদাস মন্দির দ্বারে কুশাসনে বসিয়া আছেন; সম্মুখে ভগবান দেবাদিদেব—মন্দির মধ্যে বিরাজিত। রত্নাবলী এতদিন কায়মনে তাঁহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কেবল পতিসন্দর্শন প্রার্থনা করিয়াছেন, কত কাঁদিয়াছেন, চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া কত আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন। আজ ভগবান সদাশিব সুপ্রসন্ন—তাই তাঁহার প্রাণের ধন আজ তাঁহারই মন্দিরদ্বারে; সতী আজ সেই পতিসহ মিলিতে যাইতেছেন—সতীপতি-বিশ্বনাথ! আজ অভাগিনীর মনোরথ পূর্ণ কর, আজ তুলসীদাসের মতি ফিরাইয়া দাও!

তুলসীদাসের সম্মুখে ভগবানদাস বসিয়া আছেন—নানারূপ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হইতেছে। এমন সময় জননীসহ অবগুণ্ঠনাবৃতা রত্নাবলী ও পশ্চাৎ ছগনলাল মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভগবানদাস একটু সরিয়া বসিলেন। তুলসীদেবী বধূমাতাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। আলোক-আঁধারের সংমিশ্রণে তখন দেবালয় তত উজ্জ্বলীকৃত নহে। রত্নাবলী প্রণাম করিল—তুলসীদাস নূতন বধূ মনে করিয়া, "চিরায়ুষ্মতী হও, স্বামীসহ সুখে কাল যাপন কর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দুঃখীরাম বলিলেন—দাদার, আমার অমোঘ আশীর্ব্বাদ, এ আশীর্ব্বাদ কখন অন্যথা হবার নয়।

রত্নাবলী আশীর্ব্বাদ বচন শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, বহু-দিনের আরাধ্যপদ সম্মুখে পাইয়া আর চুপ করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। একসময় এই আরাধ্যপদ তাঁহার নিত্য সেবার সামগ্রী ছিল, সতী নিত্য ইহার পূজা করিয়া ধন্য হইতেন; আজ বহুদিন পরে তাহা সম্মুখে পাইয়া আর কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন—অবেগভরে তাহা বক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"স্বামীন্! প্রভো! ক্ষমা করুন, দাসী আপনার চরণে চির অপরাধিনী! তার ফল যথেষ্ট ভোগ করেছি—আর সহ্য কর্ত্তে পারিনা, চরণে স্থান দিন।" বলিয়া রত্নাবলী তাঁহার বক্ষ আবরিয়া ধরিবামাত্র কি এক অসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

রত্নাবলীর মধুর অধরে অতুলনীয় ভক্তিমাখা "স্বামীন্-প্রভো!" সম্বোধন শুনিয়া তুলসীদাসের হৃদয় আকুল হইল, তিনি বলিলেন—ওহো এ কে এ, আমার সাধনপথের সাহায্যকারিণী, রত্নাবলী নাকি? দুঃখে ভাই, এ সমস্তই তোর চক্র দেখ্‌ছি?

দুঃখীরাম হাসিতে হাসিতে বলিলেন—দাদা! এ আমার চক্র নয়—এ সেই চক্রীর চক্র, যার চক্রে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, যাঁর চক্রে মানব-অদৃষ্ট নিরন্তর সুখ-দুঃখের বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজ সেই চক্রীর চক্রে দাদা, তুমি আমার বউদিকে অমোঘ আশীর্ব্বাদ করেছো; বাক্যসিদ্ধ মহাপুরুষ তুমি! এইবার নিজ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন কর।

রত্নাবলী চৈতন্যলাভ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—দেবতা আমার, ধর্ম্ম আমার, সহধর্ম্মিনীরূপে দাসীকে পদে স্থান দিয়া কেন আবার অধর্ম্মের পথে ঠেলিয়া দিতেছ প্রভু!

তুলসীদাস অতীব আগ্রহের সহিত বলিলেন—রত্নাবলী, দেবী-

প্রতিমা! তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই—সে পক্ষে আমিই ঘোরতর অপরাধী। তোমার অমূল্য উপদেশে আজ আমার জীবনের পথ মুক্ত, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত, মঙ্গলময়ী দেবি! আজ তোমারই কৃপায় আমার মানবজন্ম সার্থক হয়েছে, আমি ধন্য হয়েছি! আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর?

রত্ন। প্রভুকে ক্ষমা করিবার শক্তি দাসীর কোথায় দেব! এক্ষণে দাসীকে চরণে স্থানদানে কৃতার্থ করুন!

তুলসী। তুলসীমণি, আর আমার ননীরপুতলী বৌমাকে কাঁদাস্নে বাবা! আহা! বাছা আমার তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে কত কষ্ট পেয়েছে।

তারপর ছগনলাল অগ্রসর হইয়া করপুটে বলিলেন—সাধকবর! আজ আমি ধন্য হলাম, আজ এই শিবালয়ে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব শঙ্করের সম্মুখে পিতামাতার এই মহা মিলন দেখিয়া কৃতার্থ হলাম; আমার পাগলীমাকে আমি রাস্তা হইতে ধরিয়া আনিয়া বহুকষ্টে এবং বহু চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়াছি; আরোগ্যলাভের পর জ্ঞানোদয় হইলে উনি কেবল জীবনত্যাগ করিতে উদ্যতা হন "কিসের জন্য আর এ জীবনরক্ষা করিব—আমি স্বামীকে গৃহত্যাগী করিয়া কোন্ সুখে আর বাঁচিয়া থাকিব" বলিয়া কেবল জলে ডুবিতে যাইতেন, আমি কেবল নানাপ্রকার স্তোকবাক্যে, অতি সাবধানে ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। তারপর ভগবৎ কৌশলে জামাতা বাবাজী উহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া, ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত এবং মৃতপ্রায় অবস্থায় পথের ধারে পড়িয়া থাকেন, দেবতার কৃপায় তাঁহাকেও কুড়াইয়া আনিয়া আরোগ্যলাভের পর পাগলীমার অনুরোধে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় একমাত্র দুহিতা রত্নদান করিয়া আজ আপনার কুটুম্বস্থানীয় হইয়াছি।

এক্ষণে মাকে আমার পদাশ্রয়ে স্থান দিয়া ভগবানের শুভ উদ্দেশ্য সফল করুন!

তুলসী। মহাত্মন্! আপনি নরাকারে দেবতা, এ জগতে যে আত্মবিস্মৃত হইয়া পরের উপকার করিতে পারে—পীড়িতের পীড়ার শান্তি করিতে অজস্র অর্থব্যয় ও ত্যাগস্বীকার করিতে পারে—মর্ত্তে তিনিই ত দেবকল্প মহাপুরুষ! আপনার গুণের কথা, আমি শুধু দুঃখীরাম কেন, বহুজনের নিকট শুনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হইব—এইরূপ আশা করিয়াছিলাম, আজ প্রভু রামচন্দ্র আমার সে আশা পূর্ণ করিলেন।

ভগবান। সাধুবাবা! মাকে আমার অভয় দিন; তিনি সদাই সঙ্কুচিত হইতেছেন।

তুলসী। মহাত্মাগণ! বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ এবং কোন দ্রব্যে লোভ করাও বৈরাগ্যধর্ম্মের প্রতিকূল—একান্ত ত্যাগী না হইলে বৈরাগী হওয়া যায় না।

এই সময় অলক্ষিতে রমণীকণ্ঠে পশ্চাৎ দিক হইতে কে বলিল—এত যদি ত্যাগ, তবে ঝুলির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড কেন, সেদিন জৌনপুরে অতিথি হইয়া ঐ ঝুলির মধ্য হইতে সংগৃহীত সমস্ত দ্রব্য বাহির করিয়া পাকাদি করিলেন, কেমন করিয়া প্রভু? সকলে দেখিল—এ আর কেহ নহে—ছগনলালের বাক্‌চাতুর্য্য-পরায়ণা দুহিতা সরস্বতীদেবী। তুলসীদাস চিনিতে পারিয়া মস্তক নত করিলেন।

রত্নাবলী করযোড়ে বলিলেন—প্রভু! দাসী দাসীর মত থাকিবে, এ জীবনে আর অন্য কোনও সাধ নাই; আপনার ধর্ম্ম-কর্ম্মে সহায় হইয়া "সহধর্ম্মিণী" নাম সার্থক করিব, দাসীকে আর কাঁদাবেন না।

মন্দির মধ্য হইতে গুরু গম্ভীর স্বরে ধ্বনীত হইল—"যুগলে পাইবে

দেখা স্বধামে তোমার" তুলসীদাস! প্রভুর আদেশ অমান্য করিও না— সতী স্ত্রী কখনও ধর্ম্ম পথের কণ্টক নহে, রত্নাবলীর মত সতীর সাহায্যে তোমার যুগল মূর্ত্তি দর্শন সুনিশ্চিত। তুলসীদাসের চৈতন্য হইল, তিনি শির নত করিয়া ভগবান সদাশিবের আদেশ গ্রহণ করিলেন।

উপস্থিত জনমণ্ডলী ভগবান সদাশিবের প্রত্যাদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধন্য হইল। আজ সাধু তুলসীদাসের কৃপায় সকলে দেববাক্য শ্রবণ করিয়া গদগদ প্রাণে প্রভুর জয়নাদ করিতে লাগিল।

তুলসীদাস গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া বলিলেন—এই জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম—আজ আমি ধন্য, পরম ত্যাগী বৈরাগী মহাদেবের আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা ত্রিলোকে যখন কাহার নাই—তখন আমি কোন ছার! তুলসীদাস তদ্গতচিত্ত হইয়া জপে বসিলেন। আজ পরিজন সঙ্গে তুলসীদাস প্রভু ভোলানাথের মন্দির দুয়ারে তন্ময়। যে কয়টী ভক্ত আজ শিবালয়ে সমবেত— সকলেরই প্রাণ ভক্তিময়, সকলেই সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর, ইহার মধ্যে সকলেই দেবতা-পরায়ণ এবং পরোপকার ব্রতে জীবন পণ করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। তুলসীদাস সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, আর ছগনলাল প্রভৃতি বাহ্যিক কর্ম্মযোগ সাধনে সুসিদ্ধ, ভূত-ভাবন ভবানীপতি ইহাদের প্রতি চির সদয়।

তুলসীদাস আর কোনপ্রকার দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। ভগবান শিবের আদেশ, এবং কিছুদিন পূর্ব্বে প্রভু মহাবীরেরও এই আদেশ শিরধার্য্য করিলেন। "যখন প্রথমেই তিনি চির আয়ুষ্মতি হও। স্বামী সহ সুখে সংসার কর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন— তখন স্ত্রীকে লইতেই হইবে—নতুবা বাক্যের অন্যথা করিলে বাক্-সত্যতা থাকিবে কোথায়?

রত্নাবলী স্বামীকে বলিলেন—প্রভু! আমি আপনার সাধনার সাহায্যই করিব—আমার দ্বারা সাধন কার্য্যে আপনার কোনপ্রকার বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। এই অঙ্গীকার করিয়া সতী পতিপদে আশ্রয় লাভ করত ধন্য হইলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বদান্যতা

পাগ্‌লী-মা আজ পাগল বাবার সঙ্গে মিলিয়াছেন—দেখিয়া ছগনলাল ও যশোদার আনন্দের সীমা রহিল না। এই অপূর্ব্ব মিলনের পর তাঁহারা কিছুদিন তাঁহাদিগকে আপনার ভবনে রাখিয়া সেবা করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। ভক্তের ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না—তুলসীদাস তাঁহাদের এই পবিত্র দেবালয়ে কিছুদিন অবস্থান করিবেন—এই কথা প্রচার হইবামাত্র দলে দলে লোকসমাগম হইতে লাগিল, গোঁসাইগঞ্জের শিবাশ্রমে এই সাধক-দম্পতীকে দেখিয়া সকলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল।

দুঃখীরাম ও সরস্বতী আজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের নিকট পরমার্থ বিষয় উপদেশ লইয়া সংসারে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। রত্নাবলী এতদিন প্রাণ খুলিয়া কোন কথা কহিতেন না, সদাই যেন ম্রিয়মানভাবে কাল কাটাইতেন—তাঁহার সে বিরসভাব সকলের প্রাণে বিষম বিষাদ সমুৎপন্ন করিত, সকলেই কায়মনে দেবতার স্থানে প্রার্থনা করিত—ভগবান! দুঃখিনীর দুঃখ-রজনী অবসান কর, আহা! এমন সরলপ্রাণা সতীর মনোকষ্ট তুমি নষ্ট না করিলে আর কে দেখিবে প্রভু?

এতদিনে তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে—সতী স্বামীপদে আশ্রয় পাইয়া, আপনার স্বভাবপ্রফুল্ল ভাব প্রকাশ করিয়া সকলের সহিত কমনীয়ভাবে আলাপ-পরিচয় করিতেছেন।

ধর্ম্ম-কর্ম্মে এবং পরোপকারে ছগনলালের মত মুক্তহস্ত, তখন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। ভগবান তাঁহাকে যেরূপ ধনের অধিকারী করিয়াছিলেন—তাহার সদ্ব্যয় করিতেও তিনি তাঁহাকে সেই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ধনবানের এরূপ সৌভাগ্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন অনেকেরই থাকে কিন্তু সৎকর্ম্মে এরূপ মুক্তহস্ত হইয়া খরচ করিতে কয়জন ধনী অভ্যস্ত হইয়াছেন? ধনবানের অর্থ প্রায়ই অকাজে-কুকাজে খরচ হইয়া থাকে। ছগনলালকে ভগবান সেরূপ প্রবৃত্তি আদৌ প্রদান করেন নাই, এমন কি তিনি নিজের ভোগবিলাসের জন্যও বেশী কিছু খরচ করিতেন না। যাহা না হইলে নয়—ভদ্রগৃহস্থ যেরূপ ভাবে খরচ করিলে ভদ্রতা বজায় থাকে—ছগন তাহার অতি-রিক্ত কিছুই খরচ করিতেন না। স্ত্রীও কন্যাটীও ঠিক সেইরূপ ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া আপনাদের চরিত্র গঠন করিয়াছিল—বিলাসিতা তাঁহাদের মধ্যেও স্থান পাইত না; বেশভূষা দেখিলে সামান্য গৃহস্থের রমণী বলিয়াই অনুমান হইত।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে, ছগনলাল কাশীতে প্রভুর মঠ ও দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। তুলসীদাস বলিলেন—আমি সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছি—রাজ-অট্টালিকায় আমার আবশ্যক নাই। মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যদি তাহাতে রামসীতার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর—তাহা হইলে তাহাতে আমরা আজীবন দাসদাসীর মত সেবাইত রূপে অব-

স্থান করিতে পারি। নতুবা অনুরূপ বিলাস-বাসনা বা ঐশ্বর্য্য ভোগ আমাদের সাধন পথের কণ্টক হইবে—তাহাতে মজিয়া থাকিতে আর আমাদের ইচ্ছা নাই। তবে যদি তোমার ও দুঃখীর একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে—আমাদিগকে কাছে কাছে রাখা, তাহা হইলে ঐরূপ ভাবে সীতারামের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পার!

সাধকের ইচ্ছানুসারে তাহাই হইল। ছগনলাল ও দুঃখীরাম অজস্র অর্থব্যয় করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ভগবানের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন, মহাবীরের মূর্ত্তিও সেইস্থানে সংরক্ষিত হইল। মঠবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অতিথিসেবারও বন্দোবস্ত হইল। দেবালয় সম্মুখে গঙ্গার উপর একটী সুন্দর ঘাট "তুলসীঘাট" নামে নির্ম্মিত হইল। সমস্ত প্রস্তুত হইয়া গেলে তুলসীদাস পত্নী ও জননীকে লইয়া সেইস্থানে আগমন করত ইষ্টমূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রত্যহ হৃদয়ের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সাধকদম্পতী সেই রামসীতা মূর্ত্তিকে এমন সজাগ করিয়া তুলিয়াছিলেন—যে সহসা দেখিলে জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়াই অনুমান হইত। তুলসীদাস ও রত্নাবলী প্রত্যহ চর্ম্মচক্ষে রাম-জানকীর সেই অপূর্ব্বমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহাদের চরণে প্রাণের আবেদন-নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা পূর্ণানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তুলসীদাস পূর্ব্বে দৈববানীর দ্বারা শুনিয়াছিলেন—তোমার স্বধামে সস্ত্রীক আমার দেখা পাইবে। আজ তাহা সফল হইয়াছে দেখিয়া তিনি রত্নাবলীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন, তাহাকে প্রীতিচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে কামভাব আর তিলমাত্র বর্ত্তমান ছিল না—সাধকদম্পতীর প্রেম তখন স্বর্গীয় প্রেমে পূর্ণ হইয়াছিল। সামান্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য অকিঞ্চিৎকর ভোগ-

লালসা তাঁহাদের একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। এ সময় তাঁহাদের দেখিলে মূর্ত্তিমান দয়ার অবতার বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

রত্নাবলী সামান্যা স্ত্রীলোক নহেন। এতদিন স্বামী বিরহে কাতর হইয়া তিনি কেবল ইষ্টমন্ত্র জপে তন্ময় হইতেন, অনবরত প্রার্থনা করিতেন—দয়াময়! দয়া করিয়া আমার জীবনধনকে মিলাইয়া দাও—না বুঝিয়া কত অপরাধ করিয়াছি—তাই তিনি আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি স্ত্রী হইয়া তাঁহার অদর্শনে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব! জগৎ স্বামান্, প্রভু! দাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। দিবানিশি এই চিন্তায় বিভোর হইয়া রত্নাবলী পাগল হইয়া গিয়াছিলেন স্বামীর দর্শন জন্য গৃহ ছাড়িয়া কেবল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। সকলে মনে করিয়াছিল,—ছুড়ীর বয়স কাঁচা, তাই স্বামীর জন্য পাগল হইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছে; এইবার বোধ হয়—কুলের বাহির হইয়া পড়িবে। স্বামীও স্ত্রীর প্রণয়ের মধ্যে যে ভগবানের গূঢ় ভাব নিহিত রহিয়াছে, দাম্পত্য প্রেমই যে পাকা হইলে প্রেমিক সাধককে অনায়াসে প্রেমময়ের দরবারে পৌছিয়া দিয়া ধন্য করিতে পারে—যাহারা তাহা বুঝে না। পতি-পত্নীর প্রণয় কেবল আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য, এই প্রণয় কেবল ভোগ বাসনার প্রসমন করিবার জন্য যাহাদের এই ধারণা তাহারা মনে করিল—রত্নাবলী স্বামীর অদর্শনে, যৌবনের বিষম অনঙ্গ-তাড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বাস্তবিকই কুলে কালী দিল। কিন্তু রত্নাবলী স্বামীকে কি চক্ষে দেখিতেন—তুলসীদাস যে রত্নাবলীর নিকট কিরূপ দেবভাবে পূজিত হইতেন, তাহা প্রকৃত সতী না হইলে অপরে কেমন করিয়া বুঝিবে, কেমন করিয়া বুঝিবে রত্নাবলী কেন পাগল হইয়াছিলেন?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেইত প্রথমে প্রেমভক্তি শিক্ষার সূত্রপাত হয়। মনকে প্রেমভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া ভগবন্মুখী করিবার জন্যইত আমাদের বিবাহ! প্রথমে দুইটী স্বতন্ত্র প্রাণকে প্রেমভক্তির বিনাসূতে বাঁধিয়া এক করিয়া দিবার জন্যইত হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতি! দুইটী প্রাণ এক হইয়া যাওয়া, দুইটী আত্মা স্বাতন্ত্ররাহিত্য হইয়া একটীতে পরিণত হওয়া কেবল হিন্দু-বিবাহেই আছে—আর কোথাও নাই! এইজন্য একটীর বিরহে আর একটীর অস্তিত্ব থাকে না, তাই একটী আপন ভুলিয়া আর একটীতে আত্মসমর্পণ করে—ইহাতে স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। স্ত্রীও যেমনি, পুরুষও তেমনি কিন্তু আমরা স্ত্রীর পতিভক্তিকে পাতিব্রত্য বলিয়া সুখ্যাতি করি, আর স্বামীর স্ত্রীভক্তিকে স্ত্রৈণ্য বলিয়া নিন্দা করি। পুরুষ যদি স্ত্রীতে বেশী আসক্ত হয়—তাহা হইলে আমরা তাহা দোষ বলিয়া মনে করি কেন? যেখানে যথার্থ প্রেম-রাজ্য বিস্তার-লাভ করিয়াছে, প্রেমের অনুভূতি যেখানে ঠিকরূপে অনুভূত হইয়াছে—সেখানে পুরুষও এইরূপে স্ত্রীর প্রেম-সাগরে আপনা ভুলিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন দেয়। যে যথার্থ প্রেমিক, তাহার নিকট এইরূপ ভাবই হইয়া থাকে—এই ভাবই যথার্থ মজিয়া যাইবার ভাব। এইভাবে মজিলেই দাম্পত্য-প্রেমের সার্থকতা—আর এই সার্থকতাই একদিন ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের মত, সাধক চণ্ডীদাসের মত প্রেমিক সাধককে প্রেমময়ের প্রেমের দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়া ধন্য করিয়া দিবে!

সাধক তুলসীদাস যে আজ এত বড় সাধক, আজ যে তিনি ভগবানের এত প্রিয়পাত্র—সে কার গুণে? রত্নাবলীর প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিই কি তাঁহাকে এতদূর উন্নত করিয়া, সাধকত্বের শীর্ষসীমায় তুলিয়া রামসীতার পদারবিন্দে অর্পণ করেন নাই।

প্রেমের যথার্থ শিক্ষা তুলসীদাস রত্নাবলীর নিকটই শিক্ষা করিয়া-

ছিলেন। তারপর সাধনার দ্বারা তাহার গাঢ়তা সম্পাদন করত ভাবে পরিণত হইয়া আজ তাঁহাকে এতদূরে আনিয়াছে। নতুবা নিরস হৃদয়ে প্রেমভক্তি শিক্ষা করিয়া কি মানুষ এত শীঘ্র সেই মহাদেশের সীমান্তস্থিত ভাব-রাজ্যে ভাবের ঠাকুরের দর্শনলাভ করিতে পারে? তুলসীদাস এতদিনে তাহা বুঝিয়াছেন—তাই তাঁহার দিন দিন এত উন্নতি; স্ত্রীকে ছাড়িয়া তিনি সাধ্যবস্তুর দর্শন জন্য কত করিয়াছেন—কত ঘুরিয়াছেন—কত কাঁদিয়াছেন কিন্তু তাঁহার দয়া হয় নাই। আজ শক্তিস্বরূপিণী, প্রেমময়ী রত্নাবলীর সাহায্য লাভ করিয়া সামান্য দিনেই তাহা লাভ হইল। স্ত্রৈণ্য তুলসীদাস এতদিন পরে আবার বেশী করিয়া স্ত্রীর বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

ছগনলালের বয়স হইয়াছে; এতদিন অনুঢ়া কন্যাটীর জন্য তাঁহারা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ভগবানে চিত্ত স্থির করিতে পারেন নাই; কেবল শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের দ্বারা মনের মালিন্য দূর করিতেছিলেন। এইবার কন্যা পাত্রস্থ হইয়াছে; সরস্বতী আজ স্বামীসুখে সুখিনী হইয়াছে, তাহাকে যথার্থ সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছেন—দুইজনের মিলনে আর কোন বিঘ্ন উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তাঁহারা একদিন তুলসীদাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। তারপর কন্যা ও জামাতাকে তাঁহাদের বিপুল বিষয়ের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া জৌনপুরের নিভৃত নিবাসে পরমার্থ চিন্তায় কালাতিপাত করিতে গমন করিলেন। সংসারের কোলাহল হইতে দূরে যাইয়া মনে-প্রাণে ভগবানে আত্মনিয়োগ করাই—এ গমনের উদ্দেশ্য।

দুঃখীরামত চিরকাল তুলসীদাসের শিষ্য—এখন পতি-পত্নী উভয়ে সাধক তুলসীদাসের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব ধর্ম্ম কর্ম্মে

মনোযোগ দিলেন। তবে যখন সংসার কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহারা একান্ত অধীর হইতেন—সময়ে সময়ে একঘেয়ে সংসারভাব যখন বড় কষ্টদায়ক হইত, তখন একবার দাদা ও বউদির চরণতলে আসিলেই সমস্ত অধীরতা, সমস্ত মলিনতা, সমস্ত কর্ম্মক্লান্তি বিদূরিত হইয়া যাইত, তাঁহাদের হৃদয়-তৃপ্তিকর উপদেশে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইত! কিছুদিন এইরূপে গুরু ও গুরুপত্নীর সুশীতল চরণছায়ায় কাল কাটাইয়া আবার ছগন ও যশোদার মত তাহারা সংসারে আসিয়া পরোপকারে প্রাণ উৎসর্গ করিতেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সজ্ঞানে গঙ্গালাভ

শেষ রক্ষাই বড় রক্ষা। মনুষ্য জীবনের শেষে মনের আনন্দে, শান্তি সুখে কাল কাটাইতে পারিলেই পরম সৌভাগ্য, নতুবা যৌবন সময়ে যখন দেহে বল-বীর্য্য থাকে, অর্থ-সামর্থের ক্রটী থাকে না—সে সময় সহজেই কষ্ট সহ্য করিতে পারা যায়—তখন তত অসহ্য বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু যখন গণা দিন ফুরাইয়া আসে, জীবনের কালবেলায় যখন শরীর বার্দ্ধক্যের জড়তায় ম্রিয়মান হইয়া পড়ে—সে সময় দুঃখ ভোগ নিতান্তই অসহনীয়। এইজন্য বলে—"শেষ রক্ষাই বড় রক্ষা," আর এইসময় যে ব্যক্তি শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করিয়া পুত্র পৌত্রের কোলে সুখে নয়ন মুদিতে পারে—তাহারই জীবন ধন্য! সাংসারিক হিসাবে—সেই পরম সৌভাগ্যবান।

তুলসীদেবীর প্রথম জীবন স্বামী-সোহাগে, ধার্ম্মিক স্বামীর

আদর যত্নে খুব সুখেই কাটিয়াছিল। তারপর তুলসীদাসকে পাইয়া মনে করিয়াছিলেন—জীবন খুব সুখে কাটিবে কিন্তু তাহা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, পুত্রের গৃহত্যাগে কেবল হাহা করিয়াই অতি-বাহিত হইয়াছে, একদিনের জন্য মনের সুখে কাল কাটাইতে পারেন নাই। এখন শেষ জীবনে ভগবান আবার তাঁহার অবস্থা ফিরা-ইয়া দিয়াছেন—কুলপ্রদীপ তুলসীদাস আজ সাধনবলে বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, চারিদিকে তাঁহার সুখ্যাতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; এখন তুলসীদাস একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি এবং সাধক,—হুলসীদেবী তাঁহারই জননী—এইজন্য সকলেই তাঁহাকে রত্নগর্ভা বলিয়া কত আদর করিতেছে,—তুলসীদাসকে দেখিতে আসিয়া অগ্রে তাঁহার পদধূলি লইয়া সকলে কৃতার্থতা অনুভব করিতেছে। শেষ জীবনে তাঁহার সুখের অবধি নাই—কিন্তু সুখ ত চিরস্থায়ী নহে? যদি অদৃষ্টচক্র কোন-প্রকারে বিকৃতি লাভ করত আবার তাঁহাকে পাকচক্রে ফেলিয়া কষ্ট দেয়; তাই হুলসীদেবী আজকাল প্রত্যহ তাঁহার ইষ্ট-দেবতার নিকট আপনার মরন কামনা করেন, বলেন—প্রভু! আপনার কৃপায় আমার সুখের অবধি নাই—এত সুখে আবার যে দাসীকে আপ্যায়িত করিবে—তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এক্ষণে শেষরক্ষা কর ঠাকুর! স্বামী আমায় সহমৃতা হইতে দেন নাই। "তুলসীকে মানুষ করিয়া তবে তুমি আমার নিকট আসিও" বলিয়া অনুমতি করিয়াছিলেন। ঠাকুর! আপনার কৃপায় আমার তুলসী আজ যথার্থ মানুষ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া তোমার পদে স্থান পাইয়াছে। এখণে আর কেন, আমাকে আমার হৃদয় দেবতার চরণতলে পৌছিয়া দাও—আমি হাঁসিতে হাঁসিতে বাছার কোলে মাথা রাখিয়া সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে এ দেহের অবসান করি।

সতীর এ প্রাণের প্রার্থনা দেবতার কাণে পৌছিতে বেশী বিলম্ব হইল না। তুলসীদেবী অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছেন—বয়সও অনেক হইয়াছে, তবে আর কেন,—"জীব মাত্রেরই ত ইচ্ছা মৃত্যু" ইচ্ছা না করিলে কাহার মৃত্যু হয়? তুলসীদেবী এইবার পতি সদনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বামীর সেই সৌম্যমূর্ত্তি অহরহঃ তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি যেন আর একদণ্ডও পৃথিবীতে থাকিতে রাজী নহেন। সাংসারিক কোনপ্রকার দুঃখে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেছে না—তুলসীদেবী পুত্র ও বধুরযত্নে খুব সুখে আছেন, তথাপি তাঁহার দেহ যেন দিন দিন লাবণ্যবিহীন হইয়া পড়িতে লাগিল, আহারে আর তেমন রুচি নাই, বসিলে আর উঠিতে পারেন না। রত্নাবলী শাশুড়ীর ভাব গতিক দেখিয়া বলিলেন—মা! তুমি দিন দিন এরূপ হইয়া যাইতেছ কেন? কোন অসুখ হইয়াছে কিনা বল তাহা হইলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করি?

তুলসীদেবী বলিলেন—বউ মা! অনেকদিন আসিয়াছি, আর এক-ঘেয়ে সুখ-সৌন্দর্য্য ভাল লাগে না; আমি এখন তোমাদের গুণে অতি মাত্রায় সুখভোগ করিতেছি—এমন যে হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই—এইবার আস্তে আস্তে তোমাদের কোলে মাথা রেখে সরিতে পারিলেই বাঁচি; কি জানি মা, ভাগ্যের কথাত বলা যায় না? আমার এখন ঠিকই সময় হয়েছে, তুলসীমণি আমার অসংখ্য পরমায়ু নিয়ে তোমার সঙ্গে এইরূপ ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করুক, তোমরা রামসীতার পদতলে আত্মহারা হইয়া মানবজীবন ধন্য কর—আমি এই দেখিয়া মরিতে পারিলেই অক্ষয় স্বর্গলাভ করিব; মা! আমার কি এ বয়সে আর চিকিৎসা করাইবার সময় আছে? এখন প্রভু রামচন্দ্রের চরণামৃতই আমার পক্ষে একমাত্র ঔষধ, যে কয়দিন বেঁচে থাকি, তুমি আমাকে ঐ পরমৌষধ পান করাও।

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া রত্নাবলীর প্রাণ খারাপ হইয়া গেল; তিনি স্বামীকে এই সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন—তুলসীদাস জননীর পীড়ার কথা শুনিয়া বলিলেন—মা! তুমি দিন দিন এমন শুখাইয়া যাচ্ছ কেন, কি অসুখ হয়েছে বল?

হুলসীদেবী বলিলেন—বাবা! আমার এখন কোনও অসুখই নাই—মন শান্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে; তবে যে আমাকে একটু মলিন দেখিতেছ—সে কিছুই নয়, বাবা! এখন আমার কর্ত্তার কাছে যাবার জন্য মন বড় উতলা হইয়াছে।

তুলসী। যখন আসিয়াছ, তখন ত যাইতেই হইবে মা! তবে এত উতলা কেন?

হুলসী। বাবা! কর্ত্তার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি—তুমি আমার মানুষ হইয়াছ; আমাকে অতুল সুখে সুখী করিয়াছ; তাই এইবার তাঁর কাছে যাবার জন্য মন ছটফট করিতেছে, সর্ব্বদা যেন সেই সৌম্যমূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তিনি আমাকে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

জননীর মৃত্যু-ইচ্ছা যখন প্রাণের মধ্যে জাগিয়াছে,তখন আর তাঁহাকে রাখা যাইবে না। তুলসীদাস সেইদিন হইতে সাধন-ভজন ভুলিয়া আরাধ্য দেবী জননীর সেবায় তৎপর হইলেন। ইহার তুল্য সাধনা যে জগতে আর নাই—তুলসীদাস এতদিন পরে—তাহা বুঝিয়াছেন। তাই আজ তিনি মায়ামোহের অতীত, সংসার বিরাগী হইয়াও আহার নিদ্রা ত্যাগ করত জননীর শয্যাপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হুলসীদেবীর আর উঠিবার শক্তি নাই—পুত্র ও পুত্রবধূ যাঁহার একান্ত অনুগত, দেবার মত পূজায় রত, তাঁহার আর সেবার ভাবনা কি?

দুঃখীরাম খুড়ীমার অবস্থার বিষয় শুনিয়া সস্ত্রীক আসিয়া

সেবায় ব্রতী হইলেন। ছগনলাল ও যশোদা এখন তুলসীদাসের পরম আত্মীয়—শিষ্য ও শিষ্যানী, কাজেই হুলসীর পীড়ায় তাঁহারা আসিয়া প্রাণান্তকর সেবা করিতে লাগিলেন। ভগবানদাস কাশীতে নাই—তিনি হুলসীকে পুত্রের করে প্রদান করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন,—নতুবা তিনিও যে হুলসীদেবীকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত থাকিতেন—সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই!

তুলসীদাসের ন্যায় সাধকের জননী কিরূপ ধর্ম্মশীলা, মৃত্যুর জন্য কিরূপ প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন—তাহা সহজেই বিবেচ্য। মৃত্যু ভয় তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র নাই—তাহার যে কিরূপ যন্ত্রণা, একদিনের জন্য তাহা ভুগিতে হয় নাই। যাহারা আজীবন পাপকাজে রত, একদিনের জন্য যাহারা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণের ডাকে ভগবানকে ডাকে নাই—মরণের প্রাক্কালে তাহারাই মৃত্যু-বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠে; ভীষণ ভয়ে বিষম চীৎকার করিয়া থাকে, নানাপ্রকার প্রলাপ বকে কিন্তু যাঁহারা আজীবন ধর্ম্মজীবন অতি-বাহিত করিয়া জীবননদীর কূলে—মৃত্যুরদ্বারে আসিয়াছেন—তাঁহাদের ভয় কিসের, তাঁহারা ত এই দ্বার-অতিক্রম করিলেই একেবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আত্মারামের পদে মিশিবেন, হুলসীদেবীর পূজনীয় আত্মারাম যে আজ কয়েকদিন হইল—তাঁহাকে ডাকিতেছেন। এ ডাক—স্বামীর এ প্রীতির আহ্বান, সতীর কর্ণে পৌছিয়াছে, তবে তিনি আর কি থাকিতে পারেন? কর্ত্তব্যকর্ম্ম যখন শেষ হইয়াছে, তখন আর কেন—সংসারে মজিয়া থাকা, কলির গতই যে ধন্য!

ভবানীমিশ্র এতদিন গুরুর আদেশে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া-ছিলেন। আজ কয়েক দিন হইল, তিনিও আসিয়া উপস্থিত হই-

য়াছেন; প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তিনিও দেবীসদৃশা তুলসীদেবীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। আজ প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই তুলসী জানিতে পারিয়াছেন—আজ তাঁহার জীবনের শেষ দিন। তাই পুত্রকে বলিতেছেন—বাবা! এইবার চল গঙ্গাস্নানে যাই? জননীর অবস্থা বুঝিয়া, তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিকতা দেখিয়া, তুলসীদাস তাঁহাকে ভাগিরথীর সলিল-সন্নিকটে আনিয়া, তারকব্রহ্ম রামনাম শুনাইতে লাগিলেন। দুঃখীরাম খুড়ীমার শিয়রে বসিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। রত্নাবলী, যশোদা ও সরস্বতী আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তুলসীর চক্ষে জল নাই, তিনি কাঁদেন নাই—পুণ্যবতী জননীর শেষের এই অবস্থা, তাঁহার এই আনন্দময় ভাব দেখিয়া, রামসীতার পদে তাঁহার প্রগাঢ় আত্মনির্ভর দেখিয়া বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আজীবন সাধন করিয়া তিনি যাহা করিতে পারেন নাই, তুলসীদেবী ঘরের কোণে বসিয়া, অহরহঃ সংসারধর্ম্মে মজিয়া থাকিয়া, তাহা অপেক্ষা বেশী শিখিয়াছেন—মরি মরি, এ যে অতি রমণীয়! তুলসীদেবী শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"জয় জয় রাম, জয় জয় রাম, সীতাপতি রাম—" বলিতে বলিতে তাঁহার নেত্র উর্দ্ধে উঠিল—একবার করযোড়ে বলিলেন—"যাই প্রভু, যাই।" আর তাঁহার মুখে কথা সরিল না বৃদ্ধা নিজের প্রতিশ্রুতি মত, স্বজ্ঞানে মা গঙ্গার গর্ভে, সাধক পুত্র তুলসীদাসের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করত পরিণত বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। ভক্ত তুলসীদাস কিয়ৎক্ষণের জন্য নির্ব্বাক-নিস্পন্দ হইয়া জননীর পারত্রিক পরিত্রাণ হেতু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তার পর মণিকর্ণিকারঘাটে জননীর পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করিয়া সাধক সিদ্ধাসনে সমাসীন হইলেন। আজ তিনি

জগতের একটী প্রধান মায়ার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। জননীর ইচ্ছা-মৃত্যুতে তাঁহার শোক করিবার কিছুই রহিল না।

জননীর শ্রাদ্ধকার্য্যে তুলসীদাস কিছু আড়ম্বর করিবার মনস্থ না করিলেও—দুঃখীরাম, ছগনলাল প্রভৃতি শিষ্যবর্গ তাহা হইতে বিরত হইলেন না। অজস্র অর্থব্যয় করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় করত প্রেতের তৃপ্তি সাধন করিলেন।

ভক্ত এতদিনে মাতৃহারা হইলেন—জননীর অভাব যে কি তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি শোকদুঃখে অধীর না হইলেও বুঝিলেন—যাহারা মা আছে—তার সব আছে, জগতে যার মা নাই, তাহার বুঝি কেহই নাই। ঠিক এমনটী করিয়া, এমন প্রাণপুরা স্নেহ-ভালবাসা দিয়া, পুত্রের জন্য জননী যেমন করেন, জগতে তেমন আর কেহ করিতে পারে না।

জগতে জন্মাইলে সকলেরই এই গতি—এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত এই একই নিয়মে বাঁধা—তবে, কিছু অগ্রে আর কিছু পশ্চাতে। প্রভেদ মাত্র এই!

অনেকে হয়ত বলিবেন—তুলসীদাস মরা বাঁচাইতে পারেন, আর আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু-ভীতি নিবারণ করিতে পারেন না। এই কথার উত্তর এই যে—যাহারা মৃত্যুর জন্য ভয় পায়—তাহাদের জন্য সাধক রামনামে অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন কিন্তু যিনি মৃত্যুকে ভয়ের সামগ্রী না ভাবিয়া, কেবল বাল্য-যৌবন-জরার ন্যায় অবস্থান্তর ভাবিয়া, তাহাতে হাসিতে হাসিতে আত্মসমর্পণ করেন—তাহাদের জন্য আর উপায় উদ্ভাবন কেন, মরণ-বাঁচনত তাহাদের পক্ষে এক! এইবার তুলসীদাস আত্মচিন্তায় রত হইলেন—কলির প্রকোপ বাড়িতেছে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম একপ্রকার লোপ হইবার উপক্রম হইতেছে,

বিজাতীয় রাজার অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িতেছে; মুসলমান রাজাগণ ক্রমশঃ উদ্ধত প্রকৃতি হইতেছে—অতএব রাজ্যের আর শ্রেয় নাই। জননীর মৃত্যুর পর সাধক একাগ্রচিত্তে কেবল হৃদয় মন্দিরে ইষ্ট-দেবতার পদে আত্ম-নিবেদন করিতে লাগিলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জন্মভূমি দর্শন

তুলসীদেবীর মৃত্যুর পর তুলসীদাস কেমন বিমনা হইয়া পড়িলেন, সাধন-ভজন ভিন্ন আর কোন কাজে উদ্যম-উৎসাহ দেখাইতেন না। দুঃখীরাম এই সকল দেখিয়া প্রায়ই দাদার কাছে কাছে থাকিতেন। বৃহৎ জমীদারীর কার্য্য তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত থাকিলেও তিনি এ বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করিতে পারিলেন না। নায়েব গোমস্তাকে ঐ সমস্ত বিষয়ের ভার প্রদান করিয়া তিনি দাদার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাসও এখন দুঃখীকে এবং ভবানীকে প্রাণের প্রিয় বন্ধু বলিয়াই নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপাদেয় দোঁহাবলীর অধিকাংশই প্রায় এই সময় রচিত হইয়াছিল। ভবানী ও দুঃখীরাম কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি তাহার উত্তরে গভীর জ্ঞানের পরিচয় স্বরূপ অতি সরল হিন্দুস্থানী ভাষায় ঐ ধর্ম্মতত্ত্বের দোঁহা সকল প্রকাশ করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন।

এই সময় তিনি তুলসীঘাটে বসিয়া তাঁহার রচিত রামায়ণ এমন মনমোহন স্বরে পাঠ করিতেন—যাহা শুনিয়া বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত

মুগ্ধ হইয়া যাইত। শুনা যায়—মহাবীর হনুমানও মুগ্ধ হৃদয়ে ভক্তের রচিত এই ভক্তিমাখা রামগুণ গান অলক্ষিতে শ্রবণ করিতে আসিতেন, তুলসী তাঁহাকে দেখিলে আরও ভাব-বিভোর হইয়া রামায়ণ পাঠে তন্ময় হইতেন। তারপর পূজার সময় স্বামী-স্ত্রীতে তাঁহাদের প্রাণের দেবতার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কত মনের কথা, প্রাণের ভাষা ব্যক্ত করিতেন—যাহা মানবীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যায় না।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" একথা সকলেরই নিকট সমানভাবে সমাদৃত, বিশেষতঃ সাধক মাত্রেই দ্বাদশ বৎসর অন্তর এক একবার জন্মভূমি দর্শনে স্বর্গ দর্শনের সাধ মিটাইয়া লয়েন। বহু তীর্থ পর্য্যটন করিলে যে ফল—দ্বাদশ বৎসর অন্তর একবার জন্মভূমি দর্শন করিলে তদপেক্ষা সহস্রগুণ ফললাভ হইয়া থাকে—এইজন্য জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রচার করিয়াছেন। তুলসীদাসের একবার সেই জন্মভূমী দেখিবার সাধ হইল—দুঃখীরামকে তাহা ব্যক্ত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গী হইলেন। একদিন অতি প্রত্যুষে দুঃখীরাম ও তুলসীদাস বহুদিনের পর জন্মভূমি রাজাপুর দর্শনে চলিলেন। ভবানীর প্রতি মঠের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল।

একদিন যেমন দরিদ্রভাবে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন—ঠিক সেইরূপে আজ দুই বন্ধুতে রাজাপুরে দ্বিবেদীর সেই শ্যামশস্প-সমন্বিত, কোকিল-কুজন-কুজিত মনোহর শান্তি নিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—যেসকল ব্যক্তি তখন গ্রামের শোভাবর্দ্ধন করিত—সমাজ যাহাদের দ্বারা সুশিক্ষিত হইত—এখন তাহাদের অনেকেই কাল-কবলে কবলিত হইয়াছেন। কাজেই অনেকে

তাঁহাদের চিনিতে পারিল না—কেবল দুঃখীরামের মামী অতিশয় বৃদ্ধা হইলেও চিনিতে পারিলেন। তিনি একপ্রকার জরা-বার্দ্ধক্যের কবলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন তিনি ইহাঁদের দেখিয়া পরম পুলকিত চিত্তে আদর যত্ন করিলেন। আরও জন কয়েক বৃদ্ধা তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া কত দুঃখ করিতে লাগিল, বলিল—বাবা! তোরা সব বুনিয়াদী বংশ, এমন করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছিস বলে—রাজাপুর যেন বনালয় হয়ে গেছে। আগেকার শ্রী-সৌন্দর্য্য সব নষ্ট হয়েছে, তা বাবা! তোরা আবার আয়,এসে ঠিক করে নে না—সব ত ঠিকই আছে, কেবল লোক নাই—গ্রামকে দেখে এমন পুরুষমানুষ কেহ নাই; আর কি তুলসী! তোর বাপ্ আত্মারাম আছেন—না নৃসিংহদাস আছেন—যে গ্রামকে দেখবে—ভেঙ্গে চুরে গড়বে। আহা! তারা থাকতে কত কীর্ত্তিই এই গ্রামে হতো।

তুলসীদাস ও দুঃখীরাম সকলকে যথাযথ অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—যাহাতে গ্রাম আবার পূর্ব্বের মত হয়—আমরা তাহাই করিতে আসিয়াছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন। এতদিন যে যুবকটীর উপর দুঃখীরাম সমস্ত ভার দিয়া গিয়াছিলেন—সে অতি ভাল বংশের ছেলে—এতাবৎকাল দুঃখীর আদেশ মত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। কোন্‌প্রকার ত্রুটী করে নাই—লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন জমীজমা নষ্ট করে নাই।

দুঃখীরাম পাড়ার মণ্ডল মহাশয়কে ডাকিয়া তাঁহার এবং তুলসীদাসের যাবতীয় জমীজমার উপসত্ব হইতে একটী মঠ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। "দ্বিবেদীর মঠ" নামে একটী দরিদ্র-নিবাস স্থাপিত করিয়া যুবকটীর উপর তাহার তত্বাবধানের ভার দিলেন এবং মণ্ডল মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ করিয়া দিলেন—যাহাতে এই অনাথ-

আশ্রম ভাল করিয়া চলে। প্রতিবাসী সমস্ত লোক তাহার উন্নতির জন্য বদ্ধ পরিকর হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তুলসীদাস দুঃখীকে লইয়া এইবার ধর্ম্মপুরে গমন করিলেন। দীনবন্ধুর বিষয়-আশয় কি আছে, তাহার সন্ধান লইলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর কন্যার শোকে বহুদিন হইল, লক্ষ্মীদেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কন্যা-জামাতার বহু অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন-প্রকার সন্ধান করিতে না পারিয়া তিনি হতাশ হৃদয়ে কিছুদিন মনমরা হইয়া কালযাপন করেন—তারপর নানাপ্রকার পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বামীর যে সকল বিষয়-আশয় ছিল—তাহাতে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোনপ্রকার কষ্ট হয় নাই।

জনৈক আত্মীয় অসময়ে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল, বলিয়া তাঁহার বিষয়ের যাবতীয় উপসত্ব ভোগ করিবার ক্ষমতা তিনি তাহাকে দিয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়াছিলেন—যদি আমার কন্যা বা জামাতা জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া উহার গ্রহণ করে, তাহা হইলে তুমি বাহিরের বাগান ও জমী লইয়া সমস্ত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে, আর যদি তাহারা না আসে—তাহা হইলে এসমস্ত তোমারই রহিল—তুমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে উহার ভোগ-দখল করিও।

তুলসীদাস শাশুড়ীর দানে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলেন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে ঐ ব্যক্তিকে বাহিরের বাগান ও জমি ছাড়িয়া দিয়া, বাস্তুর উপসত্ব একজন লোককে প্রদান করিলেন এবং তাহার যাবতীয় আয় "দ্বিবেদীর মঠের" সাহায্যার্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

দুঃখীর মামী মনিয়াদেবীর কেহ ছিল না, দুঃখীই তাহার সব—তিনি মামীকে আর একাকিনী এখানে রাখিতে রাজী হইলেন

না, বলিলেন—মামী! আমি কখন কোথায় থাকি—তাহারই ত স্থিরতা নাই; আর তুমিও যারপর নাই বৃদ্ধা হইয়াছ, অতএব যদি আমার সহিত গোঁসাইগঞ্জে যাইতে চাও—তাহা হইলে চল, সেখানে বধূর সহিত একত্র থাকিলে—আর তোমাকে কোনপ্রকার কষ্ট পাইতে হইবে না; অন্তিমকালেও সদগতি হইবে। মনিয়াদেবীর স্বদেশ ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহার অবস্থা তাঁহাকে যাইতে বাধ্য করাইল—অগত্যা তিনি স্বীকৃতা হইলে—দুঃখীরাম ও তুলসীদাস আত্মীয়-স্বজনের আদর-আপ্যায়নে জন্মভূমির পবিত্র কোলে কিছুদিন বাস করিয়া মাতুলানী সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহাদের ব্যবস্থা গুণে এবং উপযুক্ত লোকের হস্তে পড়িয়া "দ্বিবেদীর মঠ" বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইয়া, বান্দা জিলার দীন-দরিদ্রগণের অভাব মোচন করিতে লাগিল। অনেক অনাথ, আতুর, দুঃখীরাম এবং তুলসীদাসের কল্যাণে সেই মঠে থাকিয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। এরূপ সুব্যবস্থায় পরিচালিত মঠ বান্দা-জেলায় আর একটীও ছিল না। এই অনাথ আশ্রম বহুদিন ধরিয়া তুলসীদাসের এবং তদীয় পিতার নাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। তার পর মুসলমান রাজত্বের শেষে তাহা উঠিয়া গিয়া সেইস্থানে নীলকুটী স্থাপিত হইয়াছিল। এখন যে তথায় কি হইয়াছে, তাহা কেহই অবগত নহে। তাহার নাম পর্য্যন্ত বোধ হয় আর নাই—তাহার নিকট রাজাপুর পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়া এখনও তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দেহত্যাগ

দুঃখীরাম আসিয়া শুনিলেন—জৌনপুরে তাঁহার শ্বশুর সাংঘাতিক-রূপে পীড়িত। তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না—মাসীকে রাখিয়া স্ত্রীর সহিত জৌনপুর গমন করিলেন। ছগনলাল আদর্শ কর্ম্মী, তাহার দানকার্য্যের তুলনা নাই, এরূপ একজন মহাত্মার অসুস্থ সংবাদ শ্রবণে দেশের অনেক লোক হায় হায় করিতে লাগিল—ভগবানের নিকট তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিল কিন্তু রোগ যখন বক্রগতি ধারণ করে, যখন মানুষের ইহ সংসার ত্যাগের সময় হয়, তখন চিকিৎসাদিতে তাদৃশ ফল হয় না।

ছগনলাল তাহার জন্য কাতর নহেন—মৃত্যুর জন্য তিনি এক-দিনের জন্য ভীত হন নাই। প্রাণ যার ধর্ম্মবলে বলীয়ান—মন যার, ভক্তিরসে আপ্লুত হৃদয় যার সদা সর্ব্বদা পরহিত ব্রতে রত—তাহার মৃত্যুর ভয় কোথায়?

একবার গুরুদেবকে দেখিবেন—তাঁহার পদে মাথা রাখিয়া ছগন ইহ সংসার ত্যাগ করিবেন—এক্ষণে এই তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে; অনবরত কেবল গুরুদেবের জন্য ব্যাকুল হইতেছেন দুঃখীরাম তুলসীদাসকে লইয়া যাইবার জন্য কাশী আসিলেন কিন্তু তুলসীদাসের তখন ভাবান্তর হইয়াছে, তিনি আর কোথাও যান না, কাহার সহিত কথা কন না—আহারাদির প্রতিও তত আস্থা নাই, সদা সর্ব্বদা কেবল যোগাসনে বসিয়া আপনার ইষ্ট-চিন্তায় রত; প্রত্যক্ষ দর্শনে দেবদেবীর পদে সদা অবনত,

তাঁহার কোথাও যাইবার ক্ষমতা আর নাই—যেন একপ্রকার স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন। দেবতার প্রবল শক্তি মানবহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলে মানুষ অসীম শক্তি সমন্বিত হয়—আবার সময়ে সময়ে আত্মভোলা হইয়া স্থবির হইয়া পড়ে, নশ্বরজগতের কিছুর প্রতি আর তহার আস্থা থাকে না।

দুঃখীরাম আসিয়া শ্বশুরের পীড়ার সংবাদ—তাঁহার বাঁচিবার আর আশা নাই, তিনি একবার তাঁহাকে দেখেতে চাহেন, ইত্যাদি বিষয় অবগত করাইলে, তুলসীদাস আর না যাইয়া থাকিতে পারিলেন না। জৌনপুর গমন করিয়া শিষ্যের অন্তিম অবস্থা দেখিয়া সাহস প্রদান করিলেন, বলিলেন—বৎস! তোমার মত মহাত্মার ভীত হইবার কোন কারণ নাই: যাহারা আজীবন অপকর্ম্ম করিরা জীবন কাটাইয়াছে—মৃত্যু তাহাদের নিকট ভীতিপ্রদ—অশেষ যন্ত্রণাদায়ক; আর যাহারা আজীবন ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিয়া, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে—মৃত্যু তাহাদের ভবাব্ধি উত্তরণের উপায়, ভব-সমুদ্রের সেতু স্বরূপ; এই সেতু পার হইলেই পরপারে শান্তির রাজ্য বিস্তৃত; বৎস! ঐ দেখ, তোমার জন্য পরপারে কত যাত্রী দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; তাহার মাঝে ঐ কে দেখিতেছ?

ছগনলাল বলিলেন—প্রভু! মহাবীর ঐ দলের নেতা হইয়া আমাকে ডাকিতেছেন, গুরো! এইজন্য আপনার সাক্ষাৎ আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম—আপনি যে আমার ঐহিক, পারত্রিক নিস্তার কর্ত্তা ভবার্ণবের নাবিক, পাদপদ্মে আশ্রয় দিন, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সত্বর ঐ স্থানে গমন করিয়া প্রভুর পদে লীন হইতে পারি।

তুলসী। বৎস! জগতের জন্য তুমি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অকা-

তরে পরোপকার করিয়াছ, তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, তুমি হেলায় এ দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে।

ছগনলাল সজ্ঞানে জপে বসিলেন—আর দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু অনন্তের অনন্তকোলে মিশিয়া গেল। তাঁহার ভাবে মৃত্যু হইল, কামনা-বাসনা কিছুই রহিল না;—ভবে আসা যাওয়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ছগনের পুণ্য-পূত আত্মা পরমাত্মায় লীন হইল। গুরুদেবের অন্তিম আশীর্ব্বাদ সফল হইল।

একে একে সব যাইতেছে দেখিয়া তুলসীদাস বড়ই আনন্দিত, জগতে আসা কেবল যাইবারই জন্য কিন্তু পুনরাগমন বন্ধ করিয়া যাইতে পারিলেই না যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ হয়, আর তাহাই না নির্ব্বাণ মুক্তি! তিনি জৌনপুরে আর বেশী দিন অপেক্ষা না করিয়া নিজ আশ্রমে ফিরিলেন। গুরুদেবের ভাব দেখিয়া প্রিয় শিষ্য ভবানী এখন কাছে কাছেই থাকেন—প্রায়ই সঙ্গ ছাড়া হন না। আজ কয়েকদিন হইল, জৌনপুর হইতে আসিয়া গুরুদেব যেন আরও উদাস হইয়া গিয়াছেন।

আহারাদি আর তত করেন না, অনবরত কেবল রামায়ণ পাঠ করিয়া প্রেমাশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে থাকেন, সে রামায়ণ পাঠ যে শুনিত, সেই মনে-প্রাণে তন্ময় ভাবের স্বর-লহরী যাহার কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই ধন্য হইত, সকলে মনে করিত—বোধ হয় বীণার স্বরও এত মধুর নহে, তুলসীদাস যে সুরে রামায়ণ পাঠ করিতেন, তাহা শুনিবার জন্য সিংহাসনে রামসীতার মূর্ত্তি যেন সজীব হইয়া ভক্তের সেই করুণ-কণ্ঠের সুধার ধারা পান করিতেন।

এইরূপে পূজা আরতি জপ এবং রামায়ণ পাঠ এখন তুলসীর নিত্যকর্ম্ম হইয়াছে। আরত কোন কাজ তিনি করেন না; সদা

সর্ব্বদাই এইভাবে বিভোর হইয়া থাকেন; রত্নাবলী স্বামীর ঈদৃশ ভাব দেখিয়া কাছ ছাড়া হন না, তিনিও আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভবানীমিশ্র তুলসীদাসের প্রিয়শিষ্য, তাহাকে তিনি অনেক প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সাধকের উপস্থিত যে ভাব হইয়াছে, যে ভাব-সমাধি অহরহঃ তাঁহার প্রাণে জাগিতেছে—ইহা আর ভঙ্গ হইবে না; এই ভাবের অবস্থাতেই তুলসীদাস লীলা সম্বরণ করিবেন।

ভবানী এ কথা কাহার নিকট প্রকাশ না করিলেও, তিনি নিজের প্রাণে বড় দাগা পাইতেছেন ভবানীর যে আর কেহ নাই, তুলসী যে তাঁহার জীবন সম্বল; তিনি না থাকিলে ভবানী আর কাহার তেজে তেজীয়ান হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন? কিন্তু যতদিন তিনি সংসারে আছেন—ততদিন হতাশ হইলে ত চলিবে না!

তুলসীদাসের এখনকার ভাব অতি রমণীয়। শরীরকান্তি দৈব-সুষমা-মণ্ডিত, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, সে সুন্দর বদন-প্রতিভা হইতে নয়ন ফিরান যায় না; তার উপর তাঁহার সেই মধুর বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে, অতি বড় ক্রুর স্বভাবও ক্রুরতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পদানত হইতে স্বীকৃত হয়, বুঝি মানব-কণ্ঠ এমন সুধা উদ্গীরণ করিতে পারে না।

তাঁহার গুণের বিশিষ্টতা এই যে, তাহার কাছে যে, যেভাবে আসিত, তিনি তাহাকে সেইভাবে উপদেশ দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন, শত্রু-মিত্র তাঁহার কেহ না থাকিলেও এ সময় তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন, সমস্ত দ্রব্যে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া তিনি ব্রহ্মভাবে মজিয়া গিয়াছিলেন। সামান্য বিড়াল কুকুরকেও তিনি আদর করিয়া কোলে বসাইতেন—মুখচুম্বন

করিতেন; আবার কিয়ৎক্ষণপরে ভগবান রামচন্দ্রের পূজা করিয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। সাধকের এই ভাবই যথার্থ বৈষ্ণবত্ব, সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শনই মুমুক্ষু সাধকের চরম জ্ঞান—ইহাতেই তাহার পরম পরিণতি। এ অবস্থায় মানুষ পাগল ভিন্ন আর কিছুই নয়, জগতের সাধারণ লোক ইহাকে পাগল ভিন্ন আর কি বলিবে?

তুলসীদাস এক একদিন বাবা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইতেন—পূজাদি না করিয়া কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সেই অনাদি লিঙ্গ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতেন। তারপর সমাগত যাত্রীবর্গের পদধূলি মাথায় দিয়া মন্দিরে গড়াগুটী খাইয়া চলিয়া আসিতেন। ভবানী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত—গুরুর এই ভাব দেখিয়া সে নিজে আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়িত মনে করিত—পূর্ব্বজন্মে কত সুকৃতি করিয়াছিলাম, তাই এমন মহাত্মার কৃপালাভ করিয়াছি।

তুলসীদাস অদ্বৈতবাদী ছিলেন—একমেবা দ্বিতীয়ম্‌ং তিনি শ্রীরামচন্দ্রকেই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া সর্ব্বজীবে তাঁহার সত্তানুভব করিতেন। তুলসীদাসের রামায়ণ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ,—তাঁহার রামায়ণ বাস্তবিকই অমৃতের প্রস্রবণ;—এই রামায়ণ ছাড়া তিনি যত দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন—তাহার অধিকাংশই এই সময় রচিত। এই ভাবের ঘোর তিনি দোঁহারছলে ভবানীকে অনেক কথা বলিতেন—তাই সেগুলি ভক্তি ও নীতিতে এত মধুর হইয়াছিল।

প্রথম যৌবনে তুলসীদাস পত্নী রত্নাবলীকে যত ভালবাসিতেন, এখন তাহাপেক্ষাও ভালবাসা অধিক—কিন্তু তাহাতে লালসার নাম গন্ধ ছিল না, কেবল ভক্তি-প্রেম-শ্রদ্ধায় তাহা হইতে স্বর্গের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত "রত্ন" বলিতে তুলসীর নয়নে প্রেমধারা প্রবাহিত হইত, এখন তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া মনে করিতেন।

একদিন তুলসীদাস সমাধীস্থ হইয়া সমস্ত দিনের পর গভীর রজনী-যোগে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন—মা! অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, পিপাসায় প্রাণ অস্থির। কাছে কেহ ছিল না, সিংহাসন হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া মা জানকী বলিলেন—বাবা! এই যে সমস্ত প্রস্তুত—নাও, আহার কর! তুলসীদাস সন্তান-বৎসলা ভগবতী সীতাদেবীর হস্ত প্রসারিত উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী আহার করিতে লাগিলেন।

এমন সময় রত্নাবলী আসিয়া বলিল—প্রভু! এই যে আমি তাড়াতাড়ি আসিতেছি, ভবানী এতক্ষণ কিছু খায় নাই—তাহাকে আহার দিতে গিয়াছিলাম।

তুলসীদাস বলিলেন—দেবি! এই তোমার প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্য পাইয়াছি, আজ আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিলাম—জীবনে কখনও তেমন তৃপ্তিলাভ করি নাই। রত্নাবলী এই আমার শেষ আহার।

ভবানী আহারাদি করিয়া আসিল। রত্নাবলীও কাছে বসিয়া আছেন, মন্দির মধ্যে সিংহাসনে ইষ্ট দেবতার যুগল মূর্ত্তি যেন সাধকের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন।

কোন পীড়া নাই—শরীরের কোন মালিন্য নাই—মনের কোন অবসাদ নাই—প্রাণের কোনপ্রকার চাঞ্চল্য নাই, সাধক বসিয়া বসিয়া রত্নাবলীর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন, সকলে মনে করিল—প্রভু বুঝি পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন—কিন্তু তাহা নহে, এই সমাধি তাঁহার জীবনের শেষ সমাধি—আর তাহা ভঙ্গ হইল না। সাধক ভাবের ঘোরে আত্মারামের সহিত আত্ম বিনিময় করিলেন—সংসার লীলা তাঁহার এইখানে শেষ হইল। বিশ্বজননী—ভগবতী সীতাদেবীর

প্রদত্ত আহারে তাঁহার ভবের ক্ষুধা মিটিয়া গিয়াছে, যাহার জন্য সাধনা ভজনা, তাহারও চরমলাভ হইয়াছে, তবে আর কেন?

১৬৮০ সালের শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে প্রাতঃস্মরণীয় ভক্তবীর সাধক চূড়ামণী তুলসীদাস ৺গঙ্গাতীরে অসি সঙ্গমে সেই ভাব-সমাধীতে ইহ-সংসার ত্যাগ করিলেন।

রামায়ণের অনুবাদক লিখিয়াছেন:—

সম্বৎযোরশেশি অসীগঙ্গকে তীরে।

শ্রাবণ শুক্লাসপ্তমী, তুলসী ত্যজৌ শরীর॥

তুলসীদাসের দেহত্যাগ বার্ত্তা প্রাতঃকালে যখন চারিদিকে প্রচারিত হইল, তখন সাধু ভক্ত সকল সেই মহাত্মার দেহ স্পর্শ করিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য দলে দলে তথায় সমবেত হইতে লাগিলেন।

সাধকের দেহত্যাগে কাশীধাম যেন শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। যে শুনিল—সেই কাঁদিয়া আকুল হইল—বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার মন্দিরও আজ শোক-সমাচ্ছন্ন। প্রিয় ভক্তকে স্বর্গে পাঠাইয়া তাঁহারাও যেন মর্ত্ত্য-বাসীরমত শোক-চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। তারপর দলে দলে সংকীর্ত্তনের দল আসিয়া প্রভুর নাম গান করিতে লাগিল। যে শুনিল—সেই সাধক চূড়ামনী তুলসীর শেষ দর্শন জন্য ছুটিয়া আসিল। দুঃখীরাম ও সরস্বতী আসিয়া রাস্তায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সতী রত্নাবলী আজ স্বামী কোলে করিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহার নয়নে শোকের চিহ্ন মাত্র নাই। যাহার বিরহের ভয় নাই—তাহার শোক কিসের? স্বামী যখনই চলিয়া গিয়াছেন—সতীর প্রাণ ত তখনই তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়া বহুক্ষণ হইল চলিয়া

গিয়াছে—তবে সকলে সে বর অঙ্গে সৌন্দর্য্য জ্যোতি দেখিয়া মনে করিতেছে—সতী বুঝি জীবিতা আছেন কিন্তু তাহা কি হইতে পারে—অর্দ্ধেক যাইলে অর্দ্ধেক কি থাকিতে পারে?

তুলসীদাসের মৃত্যু সংবাদে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সাতিশয় মুহ্যমান হইল,—যাহারা প্রত্যহ তাঁহার শ্রীমুখে নানাপ্রকার মধুর উপদেশ শুনিয়া সাধন পথের কণ্টক মোচন করিত,—তাহারা সকলে যেন পিতৃহারা—গুরুহারা, একজন মহা উপদেষ্টা হারা হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। একদিনের জন্য রোগভোগ হইল না—একদিনের জন্য শরীর কোনপ্রকার মলিনতা প্রাপ্ত হইল না, প্রভু এত শীঘ্র ধরাধাম হইতে চলিয়া গেলেন। মৃত্যু যাঁহার হাতে ধরা—ইচ্ছা করিলেই যিনি মৃত্যুর কবলস্থ হইতে পারেন—তাঁহার আবার সময় অসময় কি? তিনি বুঝিলেন—পৃথিবীতে আর থাকিবার আবশ্যক নাই—তাই সাধক নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। পতি-গত-প্রাণা সাধ্যা-সতী রত্নাবলীও স্বামীর অনুগমন করিলেন।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্বামী ও স্ত্রী একঅঙ্গে অভেদ আত্মা; স্ত্রী পুরুষের শক্তি, আর পুরুষ স্ত্রীর শক্তি। একটী যাইলে আর একটী থাকা অসম্ভব। কাশীবাসী সকলে এই আদর্শ দম্পতীর মহা প্রয়ানে বিষম শোকাকুল হইয়া হায় হায় করিতে লাগিল। যে শুনিল—সেই বলিল—কলিতে এমন তেজস্বী বৈষ্ণব সাধক আর জন্মগ্রহণ করিবে না। দেহরক্ষার সময়ে সাধকের বয়স প্রায় শত বৎসর হইয়াছিল। তিনি কলির পূর্ণ পরমায়ু পাইয়াছিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

দুঃখীরাম ও স্বরস্বতীদেবী আসিয়াছেন—তাঁহারাই সাধক দম্পতীর সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। প্রিয় শিষ্য ভবানী মিশ্র এতদিনে বাস্তবিক নিরাশ্রয় হইল। তিনি তুলসীদাসকে আশ্রয় করিয়া জগতের সমস্ত ভুলিয়াছিলেন,—বিবাহ করেন নাই—সমস্ত বিষয় আশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কায়ার ছায়ার মত তাঁহার পাছে পাছে ঘুরিয়াছিলেন-পরম যোগী তুলসীদাসের কৃপায় ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অদ্যাবধি তিনি শ্রীগুরুর আশ্রয়ে কাল কাটাইতেছিলেন,-তুলসীদাস তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া অকপটে সমস্ত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভবানী এখন যোগ মার্গে বেশ পাকা হইয়াছেন, গুরুর কৃপায় তিনিও অশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছেন, প্রাণের ডাকে তিনিও এখন দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন কিন্তু আরও কিছুদিন এই মহাপুরুষের সঙ্গে থাকিলে জীবন ধন্য হইত, পৃথিবীর যাওয়া-আসা হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইতেন—কিন্তু হায়! তাহা হইল না। আশার পরিতৃপ্তি হইতে না হইতেই গুরুদেব দেহরক্ষা করিলেন। এইখানেই ভবানীর সকল আশার মূলচ্ছেদ হইল। তবে তিনি আশা দিয়া গিয়াছেন—ভবানী সাধনা কর, উদ্ধার হওয়া না হওয়া সকলেই নিজের হাত, ভাল করিয়া সাধনা করিতে পারিলে, দেবতার আশীর্ব্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হইবে, কিছুরই অভাব হইবে না।

আত্মা ত অবিনশ্বর—তাঁহার ত মৃত্যু নাই, গুরুদেব পাঞ্চভৌতিক দেহই পরিত্যাগ করিয়াছেন—আমার অভাব হইলে সূক্ষ্ম শরীরে যে দেখা দিয়া তাহা পূর্ণ করিবেন না—তাহা কে বলিতে পারে? ভবানী আশ্বস্ত হইয়া গুরু ও গুরু-পত্নীর অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করিলেন। যুগল মূর্ত্তি তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটে তুলসী ঘাটে চন্দন কাষ্ঠের চিতায় দাহ করা হইল। ঠিক সেই সময়ে আর একটী সন্ন্যাসীমূর্ত্তিকে গঙ্গাগর্ভে আনিয়া তীরস্থ করা হইল—তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে দেখিতে ছুটিল। দুঃখীরাম গিয়া দেখিলেন—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—এ কে! এ যে আমার দাদার পালক পিতা—পরম গুরু নৃসিংহদাস গোস্বামী—হায় হায় তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন? তখনও সাধকের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া যায় নাই। দুঃখীরাম করযোড়ে নিকটাবর্ত্তী হইলে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—দুঃখি! যাহাকে প্রাণপাত করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম, তাহাকে কি এ ভীষণ ভবের কূলে এক ফেলিয়া যাইতে পারি—তাই তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া, যোগ-জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী দেখিতে সুদূর হিমালয় হইতে কাশীতে আসিয়াছিলাম—আজ তাহাদের দুইজনকে সঙ্গে করিয়া আমিও মহাযাত্রা করিলাম। সাধক আর কথা কহিলেন না, ভাবের ঘোরে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দুঃখীরাম বলিলেন—গুরু বটে; গুরু যে ঐহিক-পারত্রিক-চিন্তার কর্ত্তা, ভবার্ণব নাবিক—আজ নৃসিংহদাসের শেষ কথা গুলিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল।

আজ কাশীর শ্মশানে যে কয়েকটী জীব ভীষণ অগ্নিমুখে চিতা-ভস্মে পরিণত হইল; কাশীর গগনপবন যাহাদের শেষ নিশ্বাসে পবিত্রীকৃত হইল—তেমনটী বোধ হয় আর কাহার দ্বারা হইবে না।

যে পাইল, সেই চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া পবিত্র হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। দুঃখীরাম ও ভবানী গুরুদেবের অন্তেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া শূন্যপ্রাণে বাড়ী ফিরিলেন। কয়েকদিন তাঁহাদের প্রাণ এত খারাপ হইয়াছিল—মন এত উদাস ভাবাপন্ন হইয়াছিল যে, সে ভাব সামলাইতে তাঁহাদের বহুদিন লাগিয়াছিল—আমাদের বোধ হয়—এ অভাবের পূরণ তাঁহারা এ জীবনে কখন করিতে পারেন নাই। গুরুর অভাব কি শিষ্য কখন পূরণ করিতে পারে? এ যে মানবজীবনের দুর্লভ ধন—পূরণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে!

গুরু ও গুরু-পত্নী ত চলিয়া গেলেন. কিন্তু তাঁহাদের স্মরণার্থ ত কিছু করা চাই? ভবানী দরিদ্র সন্ন্যাসী, অর্থাদি তাহার ত কিছু নাই কিন্তু দুঃখীরাম যে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে আজ অতুল ধনের অধিশ্বর! তিনি গুরু ও গুরু-পত্নীর শ্রাদ্ধবাসরে বিশেষ ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করিলেন। দেশ বিদেশ হইতে সাধুসমাগম হইল। দুঃখীরাম আজ তাঁহারই আশ্রমে, তদীয় রামসীতার জাগ্রত মূর্ত্তির সম্মুখে গুরু ও গুরু-পত্নীর পারত্রিক উন্নতির জন্য অজস্র সাধুভোজন, বহু সংখ্যক কাঙ্গালী বিদায় করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন।

ভবানী এখন তাঁহার গুরু ভাই, তিনিও এখন একজন প্রকৃত সাধু, দুঃখীরাম গুরুদেবের নিকট ভবানী সংক্রান্ত যে সকল অভিনব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন—তাহাতে ভবানী যে একজন মহাভক্ত; রামনামে যে সে একজন প্রকৃত উদাসী—তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই গুরুদেবের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তদীয় আশ্রম ও দেবালয়ের ভার ভবানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। এজন্য অর্থের যখন যাহা আবশ্যক হইবে—তিনি অকাতরে তাহা সরবরাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভবানী এখন তাঁহার আপনার জন, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ অভাব অভিযোগের ভার তিনি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে নানা-প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া সাধন-পথে বিশেষভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে সাহস প্রদান করিলেন, বলিলেন ভাই! ভবানী আজ হইতে তুমি আমার ভাই, আমি যতদিন জীবিত থাকিব—তোমার কোন অভাব হইবে না। তুমি গুরুদেবের সময় যেরূপ ভাবে প্রাণ খুলিয়া ভগবদারাধনা করিতে, এখনও সেইরূপ কর,—কিছুরই অভাব হইবে না। যাহা আবশ্যক হইবে—আমাকে জানাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিব। দুঃখীরামের আশ্বাস বাক্যে ভবানী গুরুদেবের ক্রিয়া কলাপ সকল বজায় রাখিয়া সেই আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তুলসীদাসের জীবন-কাহিনী এইখানেই শেষ হইল—অতঃপর আমরা পরিশিষ্ট অধ্যায়ে তাঁহার মনোমুগ্ধকর দোঁহাবলী যথা সম্ভব প্রদান করিয়া এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিব।

পরিশিষ্ট

তুলসীদাস সাধকের অগ্রগণ্য ত ছিলেনই—কবিরও অগ্রগণ্য ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি—কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মিকী মুনি নিজের রামায়ণের প্রচারে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় তুলসীদাস রূপে জন্মগ্রহণ করত সে সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস কৃত রামায়ণ ভারতের যত লোক পাঠ করেন—অন্য কোন পুস্তকের পাঠক তত নাই; ভক্তকবি তুলসীদাসই এক সময় বলিয়াছিলেন—

সাধক সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী।
কবি কোবিদ বিমুক্ত সন্ন্যাসী॥
যোগী সুর অরু তাপস জ্ঞানী।
ধরম নিরত পণ্ডিত বিজ্ঞানী॥

বাল্মিকী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় ভক্তকবি তুলসীদাস তাঁহার রামায়ণে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। বাল্মিকী রামায়ণ কেবল কয়েকজন পণ্ডিতের ঘরে আবদ্ধ থাকে, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারেনা—এইজন্য কবি তুলসীদাস রূপে পুনর্জ্জন্ম লইয়া তাহা এত সরল ও সরস করিয়া গিয়াছেন যে অতি সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও সেই রস মাধুর্য্যময় সুললিত রামায়ণ পড়িয়া প্রাণে অপার শান্তি, অপরিমিত আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

এই রামায়ণ ব্যতীত ভক্তকবি সাধকবর তুলসীদাস আরও কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিযাছেন—তখন মুদ্রা যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন না থাকায়-ক্ষুদ্র ছয় খানি গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া না যাইলেও, তাঁহার

লিখিত কবিত্ব রামায়ণ, বিনয় পত্রিকা, গীতাবলী, পার্ব্বতী মঙ্গল, জানকী মঙ্গল, চৌপাই রামায়ণ, কুণ্ডলী রামায়ণ, কড়কা রামায়ণ, বৈরাগ্য সন্দিপনী ব্যতীতও দোঁহাবলী পশ্চিম ভারতের হিন্দুস্থানীদের গৃহে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহার মধ্যে সাধক-কবির দোঁহাবলীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালার মহাকবি চাণক্যের শ্লোক যেমন প্রসিদ্ধ, নীতি-পূর্ণ, এবং অত্যাবশ্যকীয়; সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের গান যেমন প্রাণারাম এবং ভক্তিভাব পূর্ণ, বলিয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচলিত—ইহার একটী না একটী জানে না, এমন লোক যেমন বাঙ্গালায় নাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তুলসীদাসের দোঁহাও তেমনি জানেনা—এমন লোক অতি বিরল, শুধু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কেন—তুলসীদাসের রামায়ণ ও দোঁহাবলী এতদঞ্চলেও বিশেষ পরিচিত—তাহার ধর্ম্মময় উপদেশপূর্ণ দোঁহাবলী, এত মধুর এবং সুনীতি পূর্ণ এবং এমন সহজ ও সরল ভাষা লিখিত; যে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে, তাহা না জানিলে প্রাণের পরিতৃপ্তি হয় না—বুঝি সাধনপথে অগ্রসরও হওয়া যায় না, তাই আমরা সেই সকল দুষ্প্রাপ্য দোঁহাবলী ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া তাহার সরল বাঙ্গালা ব্যখ্যা প্রদান করিতেছি—তুলসীদাস এই সকল নীতিপূর্ণ উপদেশ কথা ছলে সকল সময়ে তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেন। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া ধর্ম্মের সরল পন্থা অনুসরণ করুন।

কাঁহাকো ধন ধাম হেয়, কাঁহাকো পরিবার।
তুলসী আয়সে দীনকো, সীতারাম আধার ॥ ১ ॥

জগতে ধন-জন, গাড়ী-বাড়ী, পুত্র-পরিবার প্রভৃতি বিষয়ের সুখভোগেই সকলে আনন্দ উপভোগ করেন; আত্মীয়-স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া বিষয়-সুখ উপভোগ করাই জগৎবাসী সার সর্ব্বস্ব

জ্ঞান করেন কিন্তু তুলসীদাসের ন্যায় সাধক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করেন।

চম্পায় হেয় তিন গুণ, রঙ, রূপ আউর বাস।

এক অবগুণ হেয় যো, ভ্রমর না যাওয়ে পাশ॥ ২॥

চাঁপা ফুলের তিন ভাল গুণের মধ্যে রঙ, রূপ আর সুবাস কিন্তু উহার আস্বাদ এত কটু যে ভ্রমর ভুলেও ঐ ফুলে বসে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যতই গুণ থাক না কেন, একটী মহা-দোষেই সে সমস্ত গুণ নষ্ট করে।

তুলসী উহাঁ যাইয়ে, যাঁহা আদর না করে কোই।

মান্ ঘাটে মন মরে, রামকো স্মরণ হোই॥ ৩॥

মান বড় উপাদেয় জিনিষ—লোকে প্রাণাপেক্ষা মানকে বড় বলে কিন্তু সাধু সজ্জনেরা মান চাহেন না। তাই তুলসীদাস বলিতেছেন—যেখানে কেউ তোমাকে মানিবে না, সর্ব্বদা সেইস্থানে যাইবে। যেখানে আদর পাইবে—সেখানে যাইলে যদি মান না পাও, তাহা হইলে তোমার প্রাণ দুঃখসাগরে ডুবিয়া পড়িবে, মন ছোট হইয়া যাইবে—তাহা হইলে ভগবানের নাম তোমার স্মরণ পথে উদয় হইবে না।

বিজু বন্ মিলে না লকড়ি, সায়ের মিলে না নীর।

পড়ে উপবাস কুবের ঘর, যও বিপক্ষ রঘুবীর॥ ৪॥

বিজন বনে গমন করিলেও রন্ধনকাষ্ঠ পাওয়া যায় না, অগাধ জলধীতেও জল পাওয়া যায় না, কুবের সদৃশ বড়লোকের বাড়ী গেলেও উপবাস করে মর্ত্তে হয়—যদি রঘুবীর বাম হন, অর্থাৎ ভগবান প্রতিকূল হলে কোথাও সুখ পাওয়া যায় না।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, সাত সমুদ্দুর ভরপুর।

তুলসী চাত্‌ককে মতে, সোঁয়াৎ বিনে সব ধুর॥ ৫॥

জগতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি নদী এবং সপ্ত সমুদ্র বিদ্যমান—অগাধ জলে তাহা পরিপূর্ণ কিন্তু চাতক যেমন প্রাণান্ত হলেও তাহা পান না করিয়া জলদ-জলের আশা করিয়া বসিয়া থাকে। সেইরূপ ভক্ত-চাতক তুলসী ভগবানের প্রেম-জল ভিন্ন অন্য জলের আকাঙ্খা করে না। অর্থাৎ জগতে সে ভগবানের প্রেমবারি পান করিতে পারিলেই ধন্য হয়—অন্য সলিলের আশা করে না।

কলহ ন জানব ছোট করি, কঠিন পরম পরিণাম।
লাগত অনল অতি নীচ ঘর, জারত ধনিক ধন ধাম॥ ৬॥

সামান্য লোকের সহিত ঝগড়াকেও সামান্য বলিয়া মনে করিবে না, কালে সেই কলহই ভীষণ হইতে পারে—যেমন সামান্য কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগিলে সে ধনীর অট্টালিকাও ধ্বংস করিতে পারে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কখন ক্ষুদ্র মনে করিও না, কালে সেও বলবান হইয়া প্রবল হইতে পারে—ইহাই তাৎপর্য্য।

ধন-আরু যৌবনকো, গরব কবহু করিয়ে নাহি।
দেখ্ তহি মিট্ যত হেয়, যব বাঁদরকে ছাহি॥ ৭॥

ধন যৌবন নিশার স্বপনের মত ক্ষণস্থায়ী, কদাচ ইহার গর্ব্ব করা উচিত নয়। মেঘের ছায়া যেমন বেশীক্ষণ থাকে না—দেখিতে দেখিতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ধন-যৌবনও তদ্রূপ।

কই কুদ্‌কে সাগর উতারা, কোই কিয়া মিৎ।
কোহি ওখ্‌ড়া গিরি দরথৎ, কোহি শিখায়া নীৎ॥
ক্যা কহেঙ্গা সীতানাথকো, মেয়নে কিয়া চোরি।
সোহি কুল্ উদ্ভব মেরা, বেদিয়া খিঁচে ডোরি॥ ৮॥

কোন সময়ে একটা বেদিয়া একটা বাঁদরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে খেলা করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছিল বাঁদরটা

তখন অতিশয় দুঃখের সহিত কহিতেছে—হায়রে! একসময়ে এই আমারই বংশের কেহ লম্ফ প্রদান করিয়া সাগর পার হইয়াছে; কেহ বা ভগবান রামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিয়া জন্ম সার্থক করেছে, কেহ বা বাহুবলে বড় বড় পাহাড় উৎপাটন করেছে, আবার কেহ বা চির নীতিজ্ঞ ভগবানকে নীতি-শিক্ষাও প্রদান করিয়া আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু আমি সেই মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করে, সীতানাথকে বলি—হে রামচন্দ্র! আমি এমন কি কুকর্ম্ম করেছি যে অতি হীনজাতি বেদিয়া আমার গলায় দড়ি দিয়ে টানাটানি কর্চ্ছে? তাৎপর্য্য এই যে, একদিন উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিলেও অদৃষ্ট ক্রমে অধঃপতনের সময়—সামান্য ব্যক্তিরও লাথি সহ্য করিতে হয়।

চৌদহ চার আঠার হো, পড়ে শুনে ক্যা হোয়্।
তুলসী আপন রামকো, যব্ লগ্ লমে ন কোয়্॥ ৯॥

চতুর্দ্দশ শাস্ত্র, চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে কি ফল হইবে, যদি ভগবানের দর্শনলাভ করিতে না পারিল। তুলসীদাস বলিতেছেন—শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করার উদ্দেশ্য আত্মারামের দর্শন; যদি তাহা না হইল—তবে সমস্তই নিরর্থক। অর্থাৎ তুমি শাস্ত্র পড় আর নাই পড়, যদি মূর্খ হইয়াও ভগবানের দর্শনলাভ হয়, তাহা হইলেও জন্ম সার্থক হইবে।

যো পরবিত্ত হরে সদা, সো কহু দান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার হরে সদা, সো বহু তীর্থ গয়া ন গয়া॥
যো পর আশ করে সদা, সো বহু দিন জিয়া ন জিয়া।
যো মুহমে পর চুকলি ওগারত, সে মুহমে হরিনাম
লিয়া না লিয়া॥ ১০॥

যে পরের চুরি করে দান করে—তাহার দান করায়, না করায়

সমান ; যে সর্ব্বদা পরদার রত, তাহার পক্ষে তীর্থ ভ্রমণ করা আর না করা সমান। যে ব্যক্তি পর প্রত্যাশী হয়ে জীবন ধারণ করে, তাহার বেঁচে থাকা আর মরা সমান কথা। আর যে সর্ব্বদা পর নিন্দা করে—তাহার মুখে প্রভুর নাম সংকীর্ত্তন করা আর না করা একই কথা।

মন মঞ্জন হরদম্ করো, বয়ঠো সভা সৎ সং।
যো সৎ চাহে সোহ্ করো, সৎগুরু হেয় পরশং ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদা শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা চিত্তের ময়লা-মাটী ধৌত কর, সাধুজনের সহিত সভা করিয়া সৎসঙ্গে সৎকথায় কালযাপন কর, তাহারা যে পথে যাইতে উপদেশ দেন—সেই পন্থা অনুসরণ কর, তাহা হইলেই তোমার জীবন ধন্য হইবে—কারণ সাধু পুরুষই গুরুপদ বাচ্য।

জ্ঞানী মারে জ্ঞান্‌সো, ব্যাধ মারে তীর।
সদ্‌গুরু মারে শব্দসে, শালে সকল শরীর ॥ ১২ ॥

ব্যাধেরা যেমন ধনুকে শর সন্ধান করে পাখী মারে, জ্ঞানীরা তদ্রুপ জ্ঞান-শলাকা দ্বারা মনের মালিন্য দূর করিয়া থাকেন; সদ্‌গুরু উপদেশ পূর্ণ বচনাবলীর দ্বারা অঙ্গ সমূহ বিদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাতে ইন্দ্রিয় সমূহ পরাভূত হইয়া সংযমশালী হয়।

সব্‌মে রসিয়ে সব্‌মে বসিয়ে, সব্‌কা লিজিয়ে নাম্।
হাঁজি হাঁজি কর্ত্তে রহিয়ে, বসিয়ে আপন ঠাম ॥ ১৩ ॥

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের কথাই হউক না সমস্ত কথাতেই রস লাভ করিবে। যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউক, তাহার সহিত আনন্দে মত্ত হইবে—কাহাকেও পৃথক মনে করিবে না, ঈশ্বর উপাসনার ক্রম সমস্ত আলাহিদা হইলেও

মূলে কিন্তু সমস্ত এক, ভাবিয়া প্রীতিলাভ করিবে—কখন আত্মবিস্মৃত হইবে না।

অলি পতঙ্গ মৃগ মীন গজ্, ইয়াকো একই আঁচ।

তুলসী ওয়াকো ক্যা গৎ, যাকো পিছো পাঁচ্ ॥ ১৪।

ভ্রমর, পতঙ্গ, হরিণ, মৎস্য, হস্তী ইহারা ক্রমান্বয়ে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তুলসি! তাহাদের সঙ্গে এই সকল অনবরত থাকে—তাহাদের গতি কিরূপ হইবে বল দেখি?

দয়া ধরম কি মূল হেঁয়, নরক মূল অভিমান।

তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া, যও কণ্ঠাগত জান্ ॥ ১৫ ॥

দয়াই সকল ধর্ম্মের মূল, অভিমানই নরক গমনের একমাত্র কারণস্বরূপ, অতএব হে তুলসীদাস! তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও দয়া বিসর্জ্জন দিও না।

শাকট্ সুকট্ কুকরা তিন্কে মত এক।

কোটী ভাঁতি সমঝাও, তৌ ন ছোড়ে টেক্ ॥ ১৬ ॥

শূকর, কুকুর ও পাষণ্ড এই তিনের মত একই রকম। উহাদিগকে কোটী কোটী উপদেশপূর্ণ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ কর, তথাপি তাহারা কিছুতেই নিজের গর্ব্ব ছাড়ে না।

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।

আপ্‌না মন্‌কো বশ করে যো, সবকো সেরা ওই ॥ ১৭ ॥

রাজা রাজ্য শাসন করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ হয়—যোদ্ধা যুদ্ধ জয় করে, সকলের কাছে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে কিন্তু যে দুর্দান্ত মনকে আপনার শাসনাধীনে রাখিতে পারে—তাহার তুল্য বীরপুরুষ আর নাই, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ গৌরব লাভের উপযুক্ত।

শাকট সঙ্গ ন কিজিয়ে, দুরহি যাইয়ে ভাগ্।
বাস্ করো ন পাশিয়ো, তঁও কভু ন লাগে দাগ ॥ ১৮ ॥

পাপী ব্যক্তির সঙ্গ করিবে না, দূরে পলায়ন করিবে—কখনও বিশ্বাসও করিবে না। ঘটনাক্রমে যদি তাহার সহিত বাসই করিতে হয়—তাহা হইলে সাবধান, তাহাকে স্পর্শ করিও না—তাহা হইলে কলঙ্কিত হইতে হইবে।

ওছে নরকি পেট্‌মে, রহে ন কোটী বাৎ।
আধ্‌সের কি পাত্রমে, কৈসে সের সমাৎ ॥ ১৯ ॥

আধসের ধরিবার পাত্রে যেমন একসের জিনিষ রাখা যায় না, সেরূপ ভাবভার পূর্ণ বাক্য সামান্য লোকের উদরে কখনই ধরিতে পারে না। ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি কখনও কি বিজ্ঞ জ্ঞানীর বাক্য বুঝিতে পারে?

বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠকো, তলে তুলসীদাস।
ভারী যে সো ভূতল বসো, হাল্‌কা চড়্হো আকাশ ॥ ২০ ॥

বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠকে ওজন করিয়া তুলসীদাস দেখিয়াছেন—যেটী ভারি সেই নীচে পড়ে আছে, যেটী হাল্‌কা সেইটী উপরে উঠিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য যে, জগতে প্রেমভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—মুক্তি ইহার কাছে লাগে না।

তুলসী হয়ে সংসারমে, কাহাঁকো ভক্তি ভেট্।
তিন বাৎসে লাট্‌পাট্ হেয়, দামড়ি চামড়ি পেট ॥ ২১ ॥

জগতে শিশ্নোদর ও ধন এই তিনটী লইয়া সকলে দিন যামিনী চিন্তা করিয়া অস্থির হইতেছে, অতএব হে তুলসি! তুমি এই সংসারে থাকিয়া আর কতদিনে ভক্তি-ধনে ধনবান হইবে?

বাণে ভক্তি না হোতা হেয়, ছোড় দেহ চতুরাম্নি।
কাকাসে হংস না ছোড়া হ্যায়, দুগ্ধক্যা মিলাম্নি ॥ ২২ ॥

কাককে যেমন বহুবার দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলেও হংসের মত সাদা করিতে পারা যায় না—সেইরূপ কেবল বাক্যের দ্বারা ভক্তি পাওয়া যায় না, চতুরালি ছাড়িতে হয়।

তুলসী তাহাঁ না যাইয়ে, যাহা নাহি বরণ বিবেক।
রাং রূপা রুয় ভুয়া, শ্বেবৎ অশ্বেৎ সব এক্॥ ২৩॥

হে তুলসীদাস, সেইরূপ স্থানে যাইও না—যেখানে গুণের বিচার নাই, যেখানে রাং-রূপা, নিরেট-ফাঁপা, সাদা-কাল সব এক, সেখানে যাইলে পাত্রোচিত সম্মান লাভ করিতে পারিবে না।

বড়া বড়া সব কই কত্বা, বড়মে তাল আউর খজুর।
বয়ট্‌নেকো ছায়া নেই মিল্‌তা, ফল তো বড়ি দুর॥ ২৪॥

দেশের অনেকে বড়লোক বলে অহঙ্কার করে কিন্তু তাহারা বড় কিসে? তাহারা যদি বড় হয়—তাহা হইলে তাল আর খেজুর গাছও ত খুব বড়—যাহার কাছে বসিবার ছায়া পাওয়া যায় না—ফল পাওয়া ত দূরের কথা! তাহা কত উচ্চে তার স্থিরতা নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে টাকা থাক্‌লেই বড়লোক হয় না—দাতা না হলে।

বিন বিন মিলে লকৃড়ি, বিন সায়ের মিলে নীর।
মিলে আহার দরিদ্র ঘর, যও সপক্ষ রঘুবীর॥ ২৫॥

প্রভু রামচন্দ্র অনুকূল থাকিলে দরিদ্রের ঘরেও উৎকৃষ্ট খাদ্য পাওয়া যায়; মরুভূমে সলিল এবং বৃক্ষাদিশূন্য স্থলেও যথেষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি জগদীশ্বর প্রীত থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অনাটন হয় না, বরং অভাবেরই অভাব হয়।

রাম রাম সব কোই কহে, টক্ ঠাকুর কা চোর।
বিনা প্রেমসে রীঝৎ নহি, তুলসী নন্দকিশোর॥ ২৬॥

হে তুলসি! কি শান্ত কি দুর্দ্দান্ত সকলেরই মুখে রাম নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা সেরূপ নাম লইয়া তাদৃশ কোন ফল প্রাপ্ত হয় না। কেন না, প্রেমভক্তি ব্যতীত অন্য কিছু-তেই সেই নন্দ কিশোর শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারা যায় না।

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার।

সাধুন্‌কে দুর্ভাব নহি, যঁও নিন্দে সংসার ॥ ২৭ ॥

বাজার অর্থাৎ নগরের মধ্যে হস্তী গমন করিলে যেরূপ হাজার হাজার কুকুর তাহার পাছু পাছু শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হয়। কিন্তু হস্তী যেমন তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না, বরং অবিচলিত মনে নিঃশঙ্ক ভাবে, সাহসবদ্ধ হৃদয়ে গমন করে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তিকে সংসারের লোক একত্র হইয়া নিন্দা করিলেও তাহাতে তাঁহার মনের কিছুমাত্র বিকার জন্মে না বরং তিনি পূর্ব্ববৎ একভাবেই অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করেন।

সঙ্গত করিয়ে সাধুকি, অন্ত কয়ে নিবাহ।

শাকট্ সঙ্গ ন কিজিয়ে, অন্ত হোয় বিনাহ ॥ ২৮ ॥

নিরন্তর সাধুসঙ্গ করা উচিত, কারণ, সাধুসঙ্গ দ্বারা মন প্রাণ সংযমিত হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে, কোনরূপে কোনদিকেই নমিত হইয়া পড়ে না। পাষণ্ড সঙ্গ সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে, কারণ তাহাতে চিত্ত মন ক্রমশঃ প্রবল তরঙ্গে আকুল হইয়া শেষে পরম সুখেরও বিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

বুঁদ্ আঘাত্ সহে গির জ্যায়্ সে।

খল্‌কে বচন সন্ত সহে ত্যায়্ সে ॥ ২৯ ॥

প্রবল বেগবতী নদীর স্রোত পর্ব্বতে যতই কেন আঘাত করুক না, গিরি অনায়াসে তাহা সহ্য করে, কখনই তাহার অঙ্গ

বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় না, খলেরা যতই কেন বিষাক্ত বাক্যবাণ প্রয়োগ করুক না, সাধু ব্যক্তি সকলই সহ্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিকার জন্মিবার ভয় থাকে না।

সন্ত বড়ে পরমারথী, শীতল্ উনকি অং।

তপন্ বুঝাও ত আউর্‌কে, ধরাও ত আপ্‌না রং॥ ৩০ ॥

শান্তশীল সাধু ব্যক্তিই পরমার্থ তত্ত্ববেত্তা হইয়া থাকেন। তাহার দেহকান্তি সুন্দর সুস্নিগ্ধ, তাহাতে তাপের লেশমাত্র বিদ্যমান থাকেনা। তিনি জপ-তপ প্রভৃতির ফল অপরকে বুঝাইয়া তাহাকে নিজের মত সুশীল করেন ও নিজের ন্যায় কান্তিপুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন।

গুরু লোভী শিশ্ লালচি, দোনো খেলে যাঁও।

দেনো বপুরা ডুব মরে, চড়হে পথির্‌কে নাও॥ ৩১ ॥

যে গুরু অর্থলুব্ধ এবং যে শিষ্য সংসার-সুখে একান্ত অভিলাষী হইয়া দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করত ভবসাগরাভ্যন্তরে পাষাণবৎ দৃঢ়তর জ্ঞাননৌকাতে আরোহণ পূর্ব্বক পার হইতে যাচ্ছেন, তাহা হইলে দুইজনে ডুবিয়া মরিয়া যাইবেন, উহাঁদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।

সরেশ্ নিরেশ্ নর্ হোতে হেঁয়, সময় পায় সব কোই।

দিন্‌মে হোতো প্রকাশ্‌ রবি, চন্দ্র মন্দ দ্যুতি হোই॥ ৩২ ॥

দিবাভাগে দিবাকর যেরূপ অতীব তেজঃরূপে প্রকাশিত হন। আর চন্দ্রমা নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন, সেইরূপ নিজ নিজ সময় অনুসারে মনুষ্যেরা যাহার দুঃসময়, তাহাকে হীন এবং যাহার সুসময় তাহাকে মহৎ বলিয়া জ্ঞান করেন।

পণ্ডিত ও মশালচি, ইন্‌কি গত কহা না যায়।

পর্‌কে দিয়া দেখায়কে, আপ আঁধারে ধায়॥ ৩৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞান হীন ধর্ম্মার্থী ও দীপধারক ব্যক্তি এই দুইজনের দুর্দ্দশার কথা বলা যায় না, ইহারা উভয়ে কেবলমাত্র পরের জন্যই শাস্ত্রীয় শ্লোক ও দীপালোক দ্বারা বিষয়ী ব্যক্তিগণকে প্রদর্শণ করিয়া আপনারা অন্ধকারে ঘুরিয়া মরে।

রাগী বাগী পাখী, নাবী আউর্ নাব্।
এ পাঁচকো গুরু হেয় নৈ, উপজে অঙ্গ স্বভাব॥ ৩৪॥

সংগীত শাস্ত্রের রাগতাল ও লয় বিষয়ের অভিজ্ঞতা, কবিত্ব, স্বর্ণ রজতাদির পরীক্ষকতা, নাবিকতা ও তার্কিকতা এই পাঁচটী বিষয়ের শিক্ষা দেয়, এমন গুরু প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যাহার অদৃষ্টে থাকে, সেই এই পাঁচটীতে আপনাপনি সিদ্ধ হয়।

এমন্ রসনা সাফ্ করো, ধরো গরিবী বেশ।
এ শীতল বোলি লই চলো, সবহি তোমরা দেশ॥ ৩৫॥

হে মন! প্রথমে রসনাকে সংশোধন কর, পরে দীনবেশ ধারণ করত স্নিগ্ধ বাক্য সম্বল পূর্ব্বক যথেচ্ছা স্থানে গমন কর। এইরূপ করিলে বিদেশও স্বদেশবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ তৎকালে আর তোমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের অভাব বোধ করিতে হইবে না।

তুলসী ইয়ে সংসারমে, পাঁছোরতন্ হেয় সার।
সাধু সঙ্গ হরি কথা, দয়া দীন উপকার॥ ৩৬॥

হে তুলসিদাস! সাধুসঙ্গ, হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন, দয়া প্রদর্শন, দীনভাবধারণ ও পরোপকার, জগতে এই পাঁচটীই সাররত্ন বলিয়া জানিবে।

নথ বিন্ কাটা দেখে, শীশ ভারী জটা দেখে,
যোগী কান ফাটা দেখে, ছার লায়ে তন্মে।
মৌনী আন্বোল দেখে, সেওড়া জির ছোল দেখে,
কর্ত্তো কলোল দেখে, বলখণ্ডী থন্মে॥

বীর দেখে শূর দেখে, গুনী আউর স্ফূড় দেখে,

মায়াকে পুর দেখে, ভুল রহে ধন্‌মে।

আদি অন্ত সুখী দেখে, জনমহিকে দুখী দেখে,

পর্‌ওয়ে ন দেখে, জিন্‌কে লোভ নহি মন্‌মে ॥ ৩৭ ॥

জগতে নিরন্তর ভস্মাবৃত দেহ, নতনখ, দীর্ঘ জটা মণ্ডিত, বিদারিত কর্ণ যোগী দর্শন করিয়াছি, কেশ রহিত মৌন ব্রতধারী সন্ন্যাসীও দেখিয়াছি, বনখণ্ডী বনে বহু কৌশলবেত্তা ক্রীড়কও অবলোকন করিয়াছি, অনেকানেক শূর, বীর, বিদ্বান্ ও মূর্খ দর্শন করিয়াছি, ধনান্ধ হইয়া কামবশে ভবসংসারে ঘুরিতেছে, এরূপ মানবও দেখিয়াছি; চির সুখী ও চির দুঃখী ব্যক্তিও নেত্রপথে পড়িয়াছে; অধিক কি বলিব—জগৎ সংসারে সকল অবস্থার লোকই নেত্রপথে পড়িয়াছে; কিন্তু লোভহীন ব্যক্তি কখনও দেখি নাই।

বেহা বেহা সবকোই কহে, মেরা মন্‌মে এহি ভায়।

চড় খাটোলি ধো ধো লগড়া, জেহেল্ পর্ লে যায় ॥ ৩৮ ॥

সকল ব্যক্তিই আনন্দে "বিবাহ বিবাহ" এই কথা মুখে উচ্চারণ করে, কিন্তু যৎকালে বরকে চৌদোলায় চড়াইয়া বাদ্য সহকারে লইয়া যায়, তখন আমার মনে এই ভাব উদয় হয় যে, সে, যেন, ঐ ব্যক্তিকে আজন্ম বন্দী রাখিবার জন্যই প্রথম কারাগারে লইয়া যাইতেছে।

বোল্‌কেমোল্ নাহি, যো কহেনে জানে বোল্।

হৃদয় তরাজু তৌল্‌কে, তহ্ বোল্‌কে খোল্ ॥ ৩৯ ॥

যে কথা কহিতে জানে—তাহার বাক্য অমূল্য রত্ন স্বরূপ, সুতরাং প্রথমে পরস্পরের হৃদয় তরাজু অর্থাৎ পরিমাণ যন্ত্রে পরিমাণ করিয়া তৎপরে বাক্য প্রয়োগ করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরের

মনোগত ভাব না জানিয়া যদি কথা বলা যায়, তবে সে কথায় কোন ফল হয় না।

তোম্ জ্যায়্সা রাম পর, তোম্‌সে ত্যায়্সা রাম্।
ডাহিনে যাওতো ডাহিনে যায়, বামে যাওতো বাম্।। ৪০ ।।

তুমি যেইভাবে রামকে ভজনা করিবে, রামও তোমায় সেই ভাবে ভজনা করিবেন, অর্থাৎ যেরূপ ভক্তিতে তুমি তাঁহাকে ভজিবে, ভগবান সেই অনুসারে তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। যদি জ্ঞান চাও, ত তিনি তোমাকে জ্ঞান দিবেন, আর যদি বিষয় চাও, ত বিষয় পাইবে।

যো যাকো শরণ্ লিয়ে, সোরাখে তাকো লাজ্।
উলট্ জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায়্ গজরাজ । ৪১ ।।

একচিত্তে যে যাহার শরণাগত হয়, সেই আশ্রয়দাতা সেই শরণাগতের সেইরূপে লজ্জা নিবারণ করেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, জল জীবন মৎস্যেরা অবহেলে উজানজলে যাতায়াত করে, কিন্তু মহাবল হস্তী তাহা পারে না, স্রোতে পড়িলে ভাসিয়া যায়।

একরাহমে হোতে হৈঁয়্, তুলসী মূত্ আউর পুত্।
রাম্ ভজেতো পুত্‌হিঁ, নহিতো মূত্‌কা মূত।। ৪২ ।।

হে তুলসি! মূত্র আর পুত্র এক পথ হইতেই বাহির হয়। কিন্তু যে পুত্র সংসারে আসিয়া ভগবান্ শ্রীরামের আরাধনা করে, তাহাকেই প্রকৃত সৎপুত্র বলা যায়; নতুবা অধার্ম্মিক মূঢ় পুত্র মূত্রের ও মূত্র অর্থাৎ তাহাকে মূত্র অপেক্ষাও হীন বলিয়া জানিবে।

তুলসী পিঁদ্‌নে হরি মেলেতো, মেয়্ পেঁদে কুঁদা আউর ঝাড়্।
পাথর্ পূজনে হরিমেলেতো, মেয়্ পূজে পাহাড়্।। ৪৩ ।।

যদি কতকগুলি তুলসীর মালা কণ্ঠে ধরিলে পরাৎপর জগদীশ্বর হরিকে লাভ করা যায়, তাহা হইলে আমি কণ্ঠে তুলসীর একটা কুঁদা ধারণ করি কিম্বা তুলসী গাছের ঝাড় কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখি। যদি কেবল পাষাণের অর্চ্চনা করিলেই মহেশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি পর্ব্বতের অর্চ্চনা করিতেও প্রস্তুত আছি।

দুখ পাতয়ে তো হরিভজে, সুখে না ভজে কোই।
সুখ্‌মে যো হরিভজে, দুখ্‌ কাঁহাসে হোই॥ ৪৪॥

লোকে দুঃখে মগ্ন হইলেই ঈশ্বরের নাম জপ করে ও তাঁহাকে স্মরণ করে, সাধারণতঃ এইরূপই দেখা যায় কিন্তু সুখের সময় কেহই জগদীশ্বরকে স্মরণ করে না। পরন্তু সুখের সময়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিলে যে কাহাকেও দুঃখ পাইতে হয়না, ইহা কাহারও মনে উদিত হয়?

সুখ্‌মে বাজ্‌ পঁড় দুখ্‌কে বলিহারি যাই।
অ্যায়্‌সে দুখ্‌ আওয়ে যো, ঘড়ী ঘড়ী হরিনাম সোঁয়াই॥ ৪৫॥

জগৎপাতা হরিকে ভুলিয়া সংসারের সুখভোগে বজ্রপাত হউক, এরূপ অবস্থায় দুঃখেরই প্রশংসা করি। যাহাতে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে হরিকে স্মরণ করিতে পারি, এমন দুঃখ আমাকে নিরন্তর আক্রমণ করুক্‌।

হরিকে হরিজন্‌ বহুৎ হৈঁয়্‌, হরিজন্‌কো হরি এক্‌।
শশীকে কুমদন্‌ বহুৎ হৈঁয়্‌, কুমদন্‌কো শশী এক্‌॥ ৪৬॥

অসংখ্য যেমন কুমুদিনী শশধরের প্রিয়তমা, কিন্তু একমাত্র চন্দ্রমা ব্যতিরেকে কুমুদিনীর প্রিয়তম আর দ্বিতীয় নাই, তদ্রূপ সংসারে বহুসংখ্যক ভক্ত বিদ্যমান আছে, কিন্তু ভক্তের একমাত্র ধন, হরি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

চন্দ্র ছপে না তারক্ উজোর, সুরজ্ ছপে না বাদর্ ছাই।
রণ্ পড়ে কাঁহা রজপূত ছপে, দানী ছপে কাঁহা মাগন যাই।
নারীকে চঞ্চল নয়ন্ ছপেনা, নীচ ছপেনা বড়্ পণ্ গাই।
সিন্ধুকো ভিতর্ পাপ্ ছপেনা, দাস ছপেনা হরিগুণ গাই॥ ৪৭॥

সমুজ্জ্বল তারকাপুঞ্জমধ্যে চন্দ্রমা, বর্ষাকালীন দুর্দ্দিনে সূর্য্য প্রভা, সমরাঙ্গণে বীরপুরুষ, ভিক্ষুকের মধ্যে দাতা, অবগুণ্ঠনের মধ্যে রমণীর চপল নয়ন, সভাতলে আত্মাভিমানী অভদ্র-ভদ্র পরিচায়ক নীচতা, সাগরমধ্যে পতিত মল, এই সকল যেরূপ কদাচ ছাপা থাকে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি জগৎপাতা শ্রীহরির দাস, তিনি নীচ-উচ্চ চিহ্ন বিসর্জ্জন দিয়া গুপ্তবেশে থাকিলেও কদাচ অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন না।

সব্ কি ঘট্‌মে হরিহৈঁয়্, পহছানতো নাহি জোহি।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহি জানত ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই॥ ৪৮॥

মৃগ সমূহ যেরূপ আপনার নাভিস্থ সুগন্ধির উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ব্যাকুল অন্তরে এক অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে সেই গন্ধদ্রব্যের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ সকলের শরীরেই জগৎপাতা জগদীশ্বর পরমাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ লোকে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া যেখানে সেখানে নানাপথে পরিভ্রমণ করে।

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
তং কয়লাকি ময়লা ছোটে, যব আগ্ করে পরবেশ॥ ৪৯॥

কয়লার মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমস্ত মলিনতা বিদূরিত হইয়া যায়—তেমনি অদৃষ্টক্রমে সদ্‌গুরু পাইলে, তাঁহার দ্বারা ভালমন্দ কার্য্যাকার্য্যের ভেদ ভাব বুঝিতে পারিলে, তখন শিষ্যের সমস্ত চিত্ত বিকার দূরীভূত হইয়া মন মলিনতা শূন্য হয় এবং ঐশ্বরীক ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে।

তুলসী যব্ জগমে আয়ো, জগো হাসে তোম্ রোয়।
আয়সে কর্ণি করচলো কি, তোম্ হাসো জগো রোয় ॥ ৫০ ॥

হে তুলসীদাস! যখন তুমি জননীজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে—তখন তোমাকে দেখিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, হাসির তুফানে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়াছিল কিন্তু তুমি কেবল অনবরত রোদন করিয়াছিলে, এখন তুমি এইরূপ সৎকার্য্য সকল সম্পাদন কর, এবং সৎকীর্ত্তি সকল রাখিয়া ধরা হইতে অপসৃত হও, যাহা স্মরণ করিয়া লোকে সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতে থাকুক—আর তুমি হাসিতে হাসিতে এ জগৎ হইতে অপসৃত হও।

তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে, সব্ গোড়িয়াকি খেল।
যব্ প্রিয়সে সরবর হোয়ি, তো রামপেটারী মেল্ ॥ ৫১ ॥

জপ, তপ, পূজার্চ্চনা এ সমস্তই বালিকাদিগের সাংসারিক কর্ম্ম শিক্ষার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র, কিন্তু যখন ঐ বালিকা কুল বিবাহিত হইয়া পতির সহিত মিলিত হইবে—তখন ঐ সমস্ত পেটরার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া স্বামীর গৃহ-সংসার করিতে হইবে। হে তুলসি! যত দিন জগৎপতির সহিত তোমার সহবাস না ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি ঐ প্রতিমা পূজা দিতে রত থাক; তাঁহার সহিত মিলন হইলে ঐ সমস্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ ভগবানকে জানিতে পারিলে আর কিছুর দরকার নাই।

ভাট্কা ভালা বোলনা চল্না, বহুড়ীকা ভালা চুপ।
ভেক্কা ভালা বর্ষা বাদল, অন্ধকে ভালা ধূপ ॥ ৫২ ॥

ভাটের পক্ষে নানাপ্রকার কথা কহা এবং অধিক পথ চলা ভাল; কারণ অধিক কথা কহিয়া লোকের সন্তোষসাধন করিতে না পারিলে তাহাদের উপায় উপার্জ্জন হইবে না; বহু দূরদেশে যাইয়াও

তাহাদের এই কাজ করিতে হইবে। আর কুলবধূগণের পক্ষে চুপ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকাই ভাল—তাহা হইলে সকলেই তাহাদের সুখ্যাতি করিবে। ভেকের সম্বন্ধে বর্ষাবাদল—আর ছাগলের সম্বন্ধে রৌদ্র তাপ যেমন আনন্দদায়ক—ইহার তাৎপর্য্যও সেইরূপ।

যাকে যঁও হোতো বিধাতা বাম, তাকো ধনমেরু ধূরি সম।

জনক আদি যম্, তাহি ব্যাস সম দাম্ ॥ ৫৩ ॥

বিধি বাদী হইলে সুমেরুর তুল্য ধন থাকিলেও তাহা কোন কার্য্যকারী হয় না—ধূলির মত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তখন পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে যমের মত এবং সুন্দর পুষ্পমাল্যকেও সর্প বলিয়া ভ্রম হয়।

ভক্তি বীজ পল্‌টে নহি, যৌ যুগ যায় অনন্ত।

উচনীচ ঘর আওতরে, কেশ্ব সন্তকে সন্ত ॥ ৫৪ ॥

ভক্তের হৃদয় ক্ষেত্রে একবার ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইলে—তিনি প্রকৃত সাধক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। যুগ যুগান্তর অতীত হইলেও তাঁহার আর পরিবর্ত্তন ঘটে না, তিনি অনবরত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কখন নীচ কখন উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার হৃদয়ভাব পূর্ব্ববৎই থাকে—তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

তুলসী জগৎমে আইয়ে, সবমে মিলিয়া ধায়।

না জানে কোন ভেকসে নারায়ণ মিল যায় ॥ ৫৫ ॥

ভগবান কখন কোন বেশে আসিয়া যে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন—তাহার ত স্থিরতা নাই—এইজন্য হে তুলসীদাস! জগতে সকলের সহিত সমানভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর, অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় বা কোনও উপাসককে ঘৃণা বা নিন্দা করিও না।

ধন্‌মদ্ তনমদ রাজমদ বিত্তামদ অভিমান।

এ পাঁচকো আউটকে, পাওয়ে পদ নির্ব্বাণ ॥ ৫৬ ॥

ধনের গর্ব্ব, সুঠাম শরীর সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব, রাজ্যের গর্ব্ব, বিত্তার গর্ব্ব এবং আমিই সকলের প্রধান—আমার অপেক্ষা আর কেহ নাই—এইরূপ অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারিলেই জীব নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

কাহা কহোঁ বিধিকি পতি, ভুলে পড়ে প্রবীণ।

মুরখকে সম্পতি দেখি, পণ্ডিত সমপতি হীন ॥ ৫৭ ॥

ভগবানের বিচার বিধির গতি নির্ণয় করিতে গেলে অতি প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও ভ্রমে পতিত হইতে হয়। দেখ, তিনি মূর্খকে অজস্র ধন ধান্যের অধিপতি করিয়াছেন আর অশেষ শাস্ত্র-পাঠি পণ্ডিতকে কোনপ্রকার সম্পত্তি প্রদান করেন নাই—অতীব হীনাবস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।

কোন্ কাহু সুখ দুখকর দাতা, নিজকৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা।

জন্ম হেতু সব কহ পিতু মাতা, কর্ম্ম শুভাশুভ দেহ বিধাতা ॥ ৫৮ ॥

হে ভ্রাতঃ! জগতে সুখ-দুঃখ দাতা কেহ নাই, জীব নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, জন্ম হেতুই পিতামাতা নাম হইয়াছে—কিন্তু তাঁহারাও ইহার কারণ নহেন। কর্ম্মফল দাতা ভগবানই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলানুসারে জীবকে দুঃখ-সুখের অধিকারী করেন।

গোধন, গজধন, বাজীধন আউর রতন ধন খান।

যব হাওত সন্তোষ ধন, সব ধন ধুরি সমান ॥ ৫৯ ॥

মনোমধ্যে যখন সন্তোষ ধনের উৎপত্তি হয়—তখন গো, গজ, বাজী, এমন কি অসীম ধনরত্নও তাহার তুল্য বলিয়া বোধ হয়

না; অতএব সন্তোষ ধনের তুল্য ধন আর নাই—এই ধন ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন লাভ হয় না।

তন্‌কি ভুক তনক হৈঁয়, তিন পাওকে সের্‌।

মন কি·ভুক অনেক হৈঁয়, নিগ্‌লত মেরু,সুমের ॥ ৬০ ॥

দেহের ক্ষুধা অতি অল্প—তিন পোয়া বা একসের পরিমিত দ্রব্যেই তাহার নিবৃত্তি হয়—কিন্তু মনের ক্ষুধা এত বেশী যে সুমেরু পাহাড় প্রমাণ দ্রব্য পাইলেও তাহার আশা মিটে না।

উদর ভরণ্‌কে কারণে, প্রাণী ন করতহি লাজ্‌।

নাচে বাচে, রণ ভিরৈ, বাচে ন কাজ অকাজ ॥ ৬১ ॥

মানুষ উদর পোষণের জন্য কোনপ্রকার লাজ লজ্জা করে না—কেহ নানাপ্রকার হাস্যোদ্দীপক সাজসজ্জা করিয়া সভাস্থলে নৃত্য করিতেছে, কেহ ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্রে নৌকা লইয়া বাইচ খেলাইতেছে, কেহ বা দুর্ব্বল হইয়াও রণক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে, অতএব উদর পরিপোষণের জন্য মানুষ করিতে পারে না—এমন কাজ নাই।

যে প্রাণী পরবশ পরো, সো দুখ সহত অপার।

যুথপতি গজ হোই, সহে বন্ধন অঙ্কুশ অপার ॥ ৬২ ॥

পরের অধীন হইলে তাহার দুঃখের আর অবধি থাকে না—যেমন যুথপতি গজরাজ অসীম বলশালী হইয়াও সামান্য মানবের অধীনে থাকিয়া কত বন্ধন যাতনা—কত অঙ্কুশ আঘাত সহ্য করিয়া দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

যো যাকো পেয়ার লগে, সো তাকো করত বখান।

জায়মে বিষকো বিষমখী, মানত অমৃত সমান ॥ ৬৩ ॥

যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে কিছুতেই

বিরত হয় না। যেমন বিষ-মক্ষিকা দুরান্ত হলাহলকেও অমৃত তুল্য জ্ঞান করে—সেইরূপ।

জল বিচ কুমুদ বসে, চন্দা বসে আকাশ।

যো জন যাকে হৃদ্ বসে, সে জন্ তাকো পাশ ॥ ৬৪ ॥

কুমুদিনী জলে বাস করে—চন্দ্র আকাশে থাকে, তথাপি উভয়ের হৃদয় মধ্যে ভালবাসা যেমন বদ্ধমূল, কিছুতেই তাহার নড়চড় হয় না; তেমনি যে যাহাকে ভালবাসে, সে বহু দূরবর্ত্তি হইলেও নিকটবর্ত্তি বলিয়া অনুভব করে।

প্রীত্ ন টুটে অনমিলে. উত্তম মনকি লাগ।

সাত যুগ পাণীমে রহে, মিটে না চকমককে আগ্ ॥ ৬৫ ॥

চকমকির পাথর শত যুগ জলে নিমগ্ন থাকিলেও যেমন তাহা হইতে অগ্নি বিচ্যুত হয় না, সেইরূপ সাধু ব্যক্তির সহিত সাধু ব্যক্তির মনের মিলন হইলে তাহারা পরস্পর দূরদেশে থাকিলেও তাঁহাদের ভালবাসা কিছুতেই নষ্ট হয় না।

বিপদ বরাবর সুখ নহি, যো থোড়া দিন হোয়।

লোক বন্ধু মৈত্রতা, জান পড়ে সব কোয় ॥ ৬৬ ॥

যদি সামান্য দিন মাত্র বিপদে পতিত থাকিতে হয়—তাহা হইলে বিপদের মত সুখের অবস্থা আর নাই; কারণ এই সময় আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব এবং ভদ্র-অভদ্র বেশ চিনিতে পারা যায়—এই বিপদের অবস্থা হইতেই কে বন্ধু কে শত্রু বেশ চিনিয়া লইতে পারা যায়।

রাম ঝরোখে বয়েট্‌কর, সব্‌কো মজুরা লে।

জায়সা যাকে চাকুরী আয়্‌সা উস্কো দে ॥ ৬৭ ॥

সর্ব্বদর্শী ভগবান রামচন্দ্র জগৎরূপ গৃহের উচ্চ বাতায়নে বসিয়া

দিবারাত্র সকলের আচরিত কাজকর্ম্ম দর্শন করত যে যেরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহাকে সেইরূপ পুরস্কার প্রদান করিতেছেন।

সব তিথি সুতিথি হ্যায়, সব বার সুবার।
ওস্‌কা লাগে ভদ্‌রা, যো বিছরে নন্দকুমার ॥ ৬৮ ॥

সকল তিথিই সুতিথি এবং সকল বারই সুবার, নন্দকুমারকে স্মরণ করিলে তাহার পক্ষে কিছুই অশুভ নহে—কিন্তু যে তাহাকে ভুলিয়া কাজ করে, তাহার পক্ষে সমস্ত তিথি ও বার ভদ্রা দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে—অর্থাৎ তাহার কোন সময়ই সুসময় নহে।

বহুৎ ভালানা বোল্‌না চল্‌না, বহুৎ ভালা না চুপ্‌।
বহুৎ ভালানা বর্ষা বাদর, বহুৎ ভালানা ধূপ্‌ ॥ ৬৯ ॥

বেশী কথা কহা এবং বেশীদূর চলাফেরা করা ভাল নহে, এবং জন সমাজে থাকিয়া একেবারে নীরব থাকাও উচিত নয়, বেশী বর্ষা-বাদল ও বেশী ধূপ যেমন জীবগণের পক্ষে অসহ্য। সেইরূপ অতিরিক্ত কিছুই করিবে না, আর একেবারে কিছুই ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নয়।

পার্‌ গায়ে সো বুড়িয়া, বুড় গায়ে সো পার।
সমান্‌ বে ডুবে মজধার, জিন্‌ শির ভারি ভার ॥ ৭০ ॥

পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভবসমুদ্র পার হইয়া থাকে, আর পাপী নরকে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারভারাক্রান্ত, তাহার কোন উপায়ই নাই—সে মাঝখানে ডুবিয়া মরে।

আরব খরব লো লছমী, উদয় অস্ত লোঁ রাজ।
যো জাগে নিজ মরণ হঁয়, তো আবে কোওনে কাজ ॥ ৭১ ॥

যখন একদিন সুনিশ্চিত মরণ হইবে—ইহা সকলেরই জানা আছে, তখন অগণিত ধনে ধনবান হওয়া বা উদয়াস্ত কাল পর্য্যন্ত রাজা হইয়া লাভ কি?

তুলসী ইয়ে আয়কে জগ্, কোন্ ভয়ো সোমৃরত।
এক কাঞ্চন ও কুচন্কো, কিন্ন পসারা হত॥ ৭২॥

হে তুলসী! এ জগতে এমন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, যে স্ত্রীজাতির কুচ যুগলে অথবা কাঞ্চনাদির মোহে মুগ্ধ না হইয়াছে। অতএব কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা সহজ সাধ্য নহে।

মক্ষী বয়ঠী সাহদ পরো, পংখা গয়ে লপ্টায়।
মক্ষী ঝট্পটায়্ শির ধুনে, লালচ বুরি বালাই॥ ৭৩॥

মধু পানাশায় মধুকরগণ ফুলে বসিয়া যখন মধু আহরণ করে—তখন মধুতে তাহাদের পক্ষদ্বয় জড়াইয়া গিয়া সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অতি লোভে তাহাদের এই দুর্গতী, এইজন্য কোন বিষয়ে অতি লোভাভিভূত না হইয়া ভালমন্দ বিচার পূর্ব্বক কাজ করা কর্ত্তব্য—তাহা হইলে আর পতনের ভয় থাকে না।

মেয়ে লালোকে লালড়ি, মুহুমে মেরো রঙ।
কালা মুর্খ্ যব্তে ভেয়ো, তুলি নীচকে সঙ॥ ৭৪॥

মানুষ সৎ সংসর্গে সৎ এবং অসৎ সংসর্গে অসৎ হইয়া থাকে, সংসর্গের দোষ গুণ কিছুতেই যায় না। এইজন্য কুঁচ লোহাকে বলিতেছে—আগে আমার সমস্ত গাত্রই লালবর্ণ ছিল। কিন্তু তোমার সংসর্গে আসিয়া, তোমার সহিত একত্র তৌলিত হইয়া আমার মুখ পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে।

সাণা কহে সোণার কো, উত্তম মেরি জাত।
কাণে মুহকি ঘুঙচি, তুলি হামারে সাথ॥ ৭৫॥

একদিন সোণা স্বর্ণকারকে বলিতেছে যে—আমাদের জাতি জগতে অতি উত্তম, তুমি কখনও কৃষ্ণমুখ কুঁচের সহিত আমাকে

ওজন করিও না। সতের সহিত অসতের সম্মিলন সাধু ব্যক্তির কথন করা উচিত নয়—ইহাই তাৎপর্য্য।

তন্ সমুদ্র মন লহর হেয়, রূপ কাহুর দরিয়াও।
বেসর ভুজা সেকন্দরি, পন্থি ইহাঁ না আও॥ ১৬॥

দেহ সাগর মন তাহার তরঙ্গ এবং রূপ তাহার সলিল ও বেসর সেকেন্দরের বাহু সদৃশ—অতএব সাধু পান্থগণ এ পথে কখনও পদার্পণ করিও না—সাবধান হও, অর্থাৎ দেহ-সাগরে রূপের সুন্দর সলিলে, মনের তরঙ্গে নাচিয়া অস্থির হইও না—রূপ যৌবন তুচ্ছ জ্ঞান করিও।

তেরি বিরহ সাগর মে, জাহাজ ভয়ে একন্ত।
তন্ মন্ যৌবন ডুবিয়ো, প্রেম ধ্বজা যাহে রন্ত॥ ১৭॥

হে প্রাণকান্ত! তোমার বিরহ সাগরে আমি জাহাজ স্বরূপ হইয়াছি, তাহাতে তোমার চিত্ত, শরীর, মন ও যৌবন নিমগ্ন থাকিলেও প্রেম-পতাকা অদ্যাবধি মগ্ন হয় নাই।

প্রীত্ প্রীত্ সবকই কহত, কঠিন তাসুকি রীত।
আদি অন্ত নিব নাহি, বালুকি সি ভীত॥ ১৮॥

প্রেম প্রেম সকলেই মুখে বলিয়া থাকে—তাহা অতি কঠিন ব্যাপার। বালির বাঁদের ন্যায় ইহা একটু ধাক্কা পাইলে ভাঙ্গিয়া যায়—অর্থাৎ প্রেম চিরদিন সমান থাকে না—প্রকৃত প্রেম সুদুর্লভ।

মধুকর, চাহত কমল কোঁকি, বন্কো চাঁহত মোর।
দীপক্ রটত পতঙ্গকোঁকি, চন্দহি রটত চকোর॥ ১৯॥

ভ্রমর যেরূপ পদ্মের প্রতি আসক্ত, ময়ুর যেরূপ বনের প্রতি আসক্ত, পতঙ্গ যেরূপ দীপশিখার প্রতি আসক্ত, এবং চকোর যেরূপ চন্দ্রের প্রতি আসক্ত, সাধু ব্যক্তিগণ সেইরূপ সৎসঙ্গের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কো সুখ কো দুঃখ দেহে হেঁয়, দেত করম ঝক ঝোর।
উর্জ্জে সুরুধা হেয় আপহি, ধেবাজা পবন কি জোর ॥ ৮০ ॥

পতাকা যেমন পবনের জোরে এদিক ওদিক চালিত হইয়া থাকে—সেইরূপ মানুষ যে সুখ দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে—সে কেবল তাহার কর্ম্মফলের জোরে; নতুবা সুখ-দুঃখের কেহ দাতা নাই।

তিন টুক্ কপীনকো, আউর ভাঁজি বিন্ লোন্।
তুলসী রঘুবর উর বসেঁ, ইন্দ্র বাপুর কোন্॥ ৮১ ॥

হে তুলসীদাস! যদি ভগবান রামচন্দ্র সদা সর্ব্বদা হৃদয়ে বাস করেন, তাহা হইলে লবন হীন ভাজা খাইয়া এবং টুকুরা টুকুরা কৌপিন পরিয়াও সুরপতি ইন্দ্রের অপেক্ষাও আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করা যায়—অর্থাৎ ধর্ম্মকে ধরিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিলেও আপনাকে মহাসুখী বলিতে হইবে।

মাঘ পৌষকা দিনমে, আয়সে হো কবলাগি হোঁ।
তুলসীকে মন্ রাম, যেও গরীব কো ঘাম ॥ ৮২ ॥

মাঘ ও পৌষ মাসের রৌদ্র যেমন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রীতিকর এবং বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে, তুলসীদাসের হৃদয়ে রামনাম ও সেই প্রকার প্রীতিকর ও সদা বাঞ্ছনীয়।

তুলসী নবেসো আপকোঁ, পরকো নবেসা কোয়।
টাক্ তরাজু তোলিয়ে, লবেসো গড়য়া হোয় ॥ ৮৩ ॥

তুলাদণ্ডে যেমন বাটখারা আপনাকে নীচু করিয়াও অন্যকে উন্নত করে, হে তুলসী! তুমি সেইরূপ পরকে শ্রেষ্ঠ করিয়া আপনাকে অবনত মনে করিবে। এইরূপ করিলে সকলে তোমাকে গুরু বলিয়া মান্য করিবে।

দওড়ো কোশ হাজারো, বশে লছমী পাশ।

বিনা দিয়ে রঘুনাথকো, মেলে না তুলসীদাস ॥ ৮৪ ॥

হাজার হাজার ক্রোশ পথ পর্য্যটন কর—লক্ষ্মী সকলের কাছে কাছেই রহিয়াছেন, কিন্তু প্রভু রামচন্দ্র ধন না দিলে হে তুলসি! তুমি কেমন করিয়া ধন প্রাপ্ত হইবে—কমলা যে কমলা কান্তেরই আজ্ঞাকারিণী।

এক ঘড়ি, আধি ঘড়ি, আধি হুমে আধ।

তুলসী সঙ্গত সন্তকি, হবে কোটী অপরাধ ॥ ৮৫ ॥

একঘণ্টা, আধঘণ্টা, এমন কি অর্দ্ধেকেরও অর্দ্ধেক ঘণ্টা যদি সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে হে তুলসি! তাহার দ্বারা অসংখ্য অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

সঙ্গত কি জিয়ে সাধুকি, হয়ে আউর কি ব্যাধ।

সঙ্গত কি জিয়ে নীচ্‌কি, আঠো পহর উপবাস ॥ ৮৬ ॥

সাধু সংসর্গ সকল ব্যাধি হরণ করে—আর অসাধু সংসর্গে সুখে বা নির্ব্বাধী হইয়া থাকা ত দূরের কথা—অষ্টপ্রহর উপবাসী থাকিতে হয়। অতএব সাধুসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে করা উচিত।

রাম নাম আরাধি সে, তুলসী বৃথা ন যায়।

নর কায়িকো পয়ের সে, আগে হোতো সহায় ॥ ৮৭ ॥

হে তুলসী! রাম নাম করিলে সময় বৃথা নষ্ট হয় না তা—তুমি যেরূপেই তাহা সাধনা কর। যেহেতু পরকালে এইনাম সর্ব্বাগ্রে বন্ধুর মত সাহায্য করিয়া থাকে।

তুলসী বেরোয়া বাগ্‌মে, সিচ্‌তে কুম্‌ লায়ে।

রাম ভরোসে যো রহেঁ, সো পরবত পর হরি যায়ে ॥ ৮৮ ॥

হে তুলসীদাস! মনোহর সুরক্ষিত উদ্যানের কুমকুম ও সুগন্ধি

জলসিক্ত পাদপ কখনও তেজোহীন হইলেও হইতে পারে কিন্তু দৈব সহায় সম্পন্ন পর্ব্বতস্থিত বৃক্ষ নিস্তেজ না হইয়া বরং বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল পুরুষাকারে কোন কার্য্য হয় না—দৈবের সাহায্য একান্ত আবশ্যক, নতুবা কিছুতেই কিছু হয় না।

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু, চতুর নাম বপু এক।

ইন্‌কে পদরজ বন্দন কিয়ে, নাশত বিঘ্ন অনেক ॥ ৮৯ ॥

ভক্তি ভক্ত, ভগবান ও গুরু এই চারি পদার্থ এক এই সকলের মধ্যে যাহাকেই বন্দনা করিবে—তাহাতেই অনেকপ্রকার বিঘ্ন বিনাশ হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তুলসী জগ্‌মে আকর, কর্‌লে দেনো কাম্।

দেনে কো টুকুরা ভালা, লেনেকো হরিনাম ॥ ৯০ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি জগতে আসিয়া দুইটী কার্য্য অবশ্য প্রতিপালন করিবে—একটী দান, তাহা সামান্য হইলেও করিবে এবং গ্রহণ করিবার সময় অতি অল্প হরিনাম সংকীর্ত্তন মঙ্গলকর জানিবে।

অগর না করে চাকুরী, পঙখী না করে কাম।

তুলসীদাস কহ গয়ে, সবকো দাতা রাম ॥

অজগর সর্প কাহার দাসত্ব করে না, পক্ষীগণ ও কোনপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্যে রত নহে, তথাপি তাহাদের উদর পূর্ত্তির কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না—এইজন্য তুলসীদাস বলিতেছেন—ভগবান রামচন্দ্রই সকলের উপায় বিধান করিয়া থাকেন।

তুলসী আপনা রামকো, রিজ ভজো চায় খিজ।

ক্ষেত পরেতেঁ জামি হৈঁয়, উল্‌টে নিধে বিজ ॥ ৯২ ॥

হে তুলসি! তুমি ভক্তি বা অভক্তির সহিত বা শত্রু-মিত্র যে কোন ভাবেই হউক, ঈশ্বরের আরাধনা কর—তাহাতেই সুফল প্রাপ্ত

হইবে ; ক্ষেত্রে যেরূপ ভাবেই বীজ পতিত হউক, তাহার অঙ্কুর নিশ্চয়ই ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হইবে।

চিদানন্দ ঘটমে বসে, বুঝত তাঁহা নিবাস।
সৌ মৃগমদ মৃগনাভি মে, চরত ফিরত সুবাস ॥ ৯৩ ॥

মৃগের নাভিতে মৃগনাভি বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা বুঝিতে না পারিয়া যেমন চারিদিকে অন্বেষণ করে—সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য হৃদয়ে চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন ভগবান বাস করিলেও তাহারা ভ্রমান্ধ হইয়া তাঁহার অন্বেষণে কত তীর্থ ভ্রমণ করে, কত দেব দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে।

সুখমে ভষম পড়ে, যৌ হর হর হৃদসোঁ যায়।
বলিহারি উহ দুঃখকি, যো পল্‌পল রাম কহায় ॥ ৯৪ ॥

যে সুখ-সম্পদে ভগবানকে ভুলিয়া যাইতে হয়—তেমন সুখ-সম্পদে ছাই পড়ুক, আর যে দুঃখ-দৈন্যে সতত ঈশ্বরকে স্মরণ পথে রাখা যায়—সেরূপ দুঃখকষ্ট যে খুব প্রশংসনীয় এবং অতীব সুখের তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

তুলসী মিঠে বচন সেঁা, সুখ উপজত চঁহওর।
বশীকরণ মন্ত্র হৈঁয়, পরিহর বচন কঠোর ॥

হে তুলসীদাস! বশীকরণ মন্ত্রের মত মিষ্ট কথায় আশাতীত আনন্দ পাওয়া যায়—এইজন্য তুমি কঠোর বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিতেই তৎপর হইবে।

সবকো ব্যাকুল করত হৈঁয়, এক জঠর কি আগ।
পরৈ কিল্ কিলা জলধি, মথিলভ্ চরভর উত্তর ত্যাগ ॥ ৯৬ ॥

জলে বাড়বানল প্রজ্জলিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত জলচর গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে সেইরূপ জঠরাগ্নি প্রজ্জলিত হইলে

সকলকেই ব্যাকুল করিয়া থাকে, অতএব ক্ষুধার তুল্য মনকে চঞ্চল করিতে আর কেহ পারে না।

শোতে শোতে ক্যা করো ভাই, ওঠ ভজো মুরার।
আয়সে দিন আতে হেঁয়, লম্বা পা পসার ॥ ৯৭ ॥

ভাই শুয়ে শুয়ে আর কতদিন কাটাবে, উঠ, মুরারি ভগবানের ভজনা কর, কারণ এমন একদিন আসিতেছে, যেদিন পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইবে—সে দিনের ত আর বেশী দিন বাকী নাই—অতএব ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া পরকালের পথ মুক্ত কর।

কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ কি, যর লগ্ মনমে খান।
তব লগ্ পণ্ডিত, মুরখৌ, তুলসী এক সমান ॥ ৯৮ ॥

হে তুলসী! যতদিন কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুগণ হৃদয় রাজ্যে বাস করিবে—ততদিন পণ্ডিত মূর্খ সবই সমান। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই ষড় রিপুকে জয় করিয়াছে—সেই নরশ্রেষ্ঠ জানিবে।

জ্ঞান গরিবী হরি ভজন, কোমল বচন অদোখ।
তুলসী কভু না ছোড়িয়ে, ছমা শীল সন্তোখ্ ॥ ৯৯ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি কখনও জ্ঞান, দীনতা, হরিভজন, ক্ষমা, মধুর বচন, সৎপ্রকৃতি এবং সন্তোষ—এসকল পরিত্যাগ করিও না; ঈশ্বরের প্রিয় হইতে হইলে এই সকলই প্রধান এবং একমাত্র সহায়।

ধনকো শোভা ধরম হেঁয়, কুলকো শোভা শীল্।
জলকো শোভা কমল হেঁয়, দলকো শোভা পীল ॥ ১০০ ॥

ধনের শোভাই ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মে ধনের সদ্ব্যয় করিলেই তাহার শোভা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সৎ স্বভাবই কুলের শোভা বর্দ্ধন করে, অর্থাৎ সৎস্বভাব সম্পন্ন হইলেই তাহাকে সদ্বংশজাত বলিয়া

জানা যায়। পদ্ম সমূহ যেমন জলের শোভাবর্দ্ধন করে, এবং বালক বালিকা যেমন দলের শোভাবর্দ্ধন করে। অর্থাৎ ঘরে বহুলোক থাকিলেও যেমন ছেলেপীলে না থাকিলে তাহা শোভাহীন হয়।

আগম পনথ হেঁয় প্রেমকো, যাহা ঠাকুরারী নাহি।
গোপীন্‌কেঁ পাছে ফিরে, ত্রিভুবনপতি বনমাহি ॥ ১০১ ॥

যে প্রেমে চতুরালী নাই—সেই প্রেমই যথার্থ প্রেম—তাহাতে শ্রীভগবান বাধা পড়েন, বৃন্দাবনের গোপিনীদের প্রেমে ঠক চাতুরী কিছুই ছিল না বলিয়া ত্রিভুবনপতি ভগবান বনমালী সেখানে বাঁধা পড়িয়াছিলেন।

বড়ে বড়ে সোঁ রিশ করে, ছোটে সোঁ ন রিশায়।
তরু কোঠার তোরে পত্তন, কোমল তৃণ বাঁচি যায় ॥ ১০২ ॥

বড়লোকে বড়লোকের উপরই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে—ছোটর প্রতি সে ফিরিয়াও দেখে না। যেমন দুরন্ত পবন বড বড বৃক্ষ নিচয়ই ভগ্ন করে, ক্ষুদ্র তৃণদলের উপর কখনও কোন অত্যাচার করে না।

যেত্‌নে যাকে বুদ্ধি হেঁয়, ওতনি কহে বনায়্‌।
ভালি বুরিকো বুরি ন মানিয়ে, লেন্‌ কাঁহা সো যায় ॥ ১০৩ ॥

যাহার বুদ্ধিশক্তি যতদূর সে ততদূর সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে, ভগবানকে তত সে বুঝাবার জন্য যত্ন করে। কিন্তু সত্বের অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ বুঝান যায় না; তিনি বিদ্যাবুদ্ধি এবং বাক্যশক্তির অতীত বস্তু।

কাগা কাকোন্দেতে হেঁয়, কৈলি কাসো দে।
শীতল বোলি শুনায়কে, জগ্‌ আপনা করলে ॥ ১০৪ ॥

কাক সকল কর্কশ কাকা শব্দ করে কাহার কোন অনিষ্ট না করিলেও তাহার ঐ কঠোর স্বর সকলেরই অপ্রিয় কিন্তু কোকিলকুল কখন

কাহারও ইষ্ট করে না—তথাপি তাহার মধুরস্বর সকলেরই অপ্রিয় বলিয়া সকলেই তাহার আদর করে।

চল্‌না ভল্‌না ক্রোশভোর, দুহিতা শালা না এক।
মাঙনা ভালানা বাপসে, রাম যও রাখে টেক্‌। ১০৫ ॥

ভগবান যদি মানরক্ষা করেন, তাহা হইলে লাভের বশবর্ত্তী হইয়া কখন একক্রোশ যাওয়া উচিত নয়। সংসারে স্বীয় কন্যারও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তি নিমিত্ত জগদীশ্বরের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করা ভাল নয়।

চতুরাই চুলাই পর, জ্ঞানী জম্‌কো ধায়।
তুলসী হরিভক্তি বিনে, জড়মূল নাশ না পায়॥ ১০৬

যে ব্যক্তি জ্ঞানী এবং চতুর অথচ অন্তরে হরিভক্তির লেশমাত্র নাই—হে তুলসি! তাহার জ্ঞানে ও চতুরতায় কোন ফল নাই।

সব্‌ বন্‌ তুলসী ভেয়ো, সব্‌ পাহাড় ভেয়ো শাল্‌গেরাম।
সব্‌ পাণি গঙ্গা ভেয়ো, সব্‌ ঘটমে বিরাজে রাম। ১০৭ ॥

যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে; যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানের অস্থিত্ব দর্শন করেন, তাঁহার কাছে সব বনই তুলসী কানন, সকল প্রস্তর খণ্ডই শালগ্রাম শীলা এবং সকল জলই গঙ্গা জল বলিয়া অনুমিত হয়—তাহার নিকট কিছুই ভেদভাবে ভাবিত হয় না।

চারি জাত্‌ মিলে হরি ভজিয়ে, এক বরণ হো যায়।
(জ্যয়সা) অষ্টধাতুমে পরশ্‌ লাগায়ে, এক মূলকে বিকায় ॥১০৮॥

যেমন অষ্টধাতুতে স্পর্শ-পাথর লাগাইলে সব যেমন এক হইয়া সমান মূল্যে বিক্রীত হয়, সেইরূপ চারিজাতি মিলিয়া ঈশ্বর আরাধনা করিলে চতুর্ব্বর্ণ এক হইয়া যায়—আর কোনও ভেদাভেদ থাকে না।

জাত পাঁত গণিয়ে যাঁহা, হো যায় বরণ বিচার।

তুলসী কহে হরিভজন বিনে, চারিজাত চামার ॥ ১০৯ ॥

যেস্থানে লোকে সংসারী এবং ঈশ্বরাধনা বিহীন ও অভিমানী হইয়া পশুর মত সংসারে অবস্থান করত পুরুষ পরম্পরাগত জাতি সমূহকে উত্তম ও অধমরূপে শ্রেণীভেদে তৎপর হয়, তাহাদের কাছে তাদৃশ জাতি বা শ্রেণীর আদর করায় কোন দোষ নাই। কিন্তু সাধু তুলসীদাস বলেন—এই চারি জাতির মধ্যে কেহ যদি হরি-ভক্তি বিহীন হয়, তাহা হইলে সে চামারেরও অধম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

সবহি ঘট্‌মে হরি বসে, যেঁও গিরিস্থতমে জ্যোতি।

জ্ঞানগুরু চক্‌মক্ বিনা, কৈসে প্রকট হোতি ॥ ১১০ ॥

সকল প্রস্তরেই অগ্নি বিদ্যমান আছে এবং লৌহ দ্বারা আঘাত করিলে তাহা হইতে আগুণ বাহির হয়, সেইরূপ সব জীব-দেহেই জগদীশ্বর বর্ত্তমান আছেন, হৃদয়রূপ চকমকিতে গুরু উপদেশরূপ লৌহের আঘাত বিনা তাহা প্রকাশ হওয়া অসম্ভব—অর্থাৎ গুরুর উপদেশ ভিন্ন ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ হয় না।

অর্থ অনর্থ করহিঁ জগত মাহী, দেখহু মন স্থখলেশ নাহি।

যাকে ধন তাকে ভয় অধিক, ধন কারণ মারত পিতু লড়িক ॥

ধনতে পতিহিঁ বিঘাতহিঁ নারী, ধনতে মিত্র শত্রুতাকারী।

ধনমদ নর অন্ধের জগ্ কয়সে, দেখ নমিনহিঁ রাতৌঁধি জয়সে ॥১১১॥

জগতে অর্থই অনর্থের মূল; যাহার অর্থ আছে—সে সর্ব্বদা তাহার রক্ষার জন্যই ভীত হয়, কেননা ধনলোভে পুত্র পিতাকে, স্ত্রী স্বামীকে বিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত নহে; অর্থের জন্যই বন্ধু শত্রু হয়। যেরূপ রাতকাণা ব্যক্তি চক্ষুর কোন পীড়া বোধ করিতে

পারে না—অথচ রাত্রিতে কিছু দেখিতেও পায় না; মানবগণ সেইরূপ বিনা অসুখ বোধে ধনমদে মত্ত হইয়া থাকে।

মহাকষ্ট সোঁ হোত ধনরাখে কষ্ট সদায়।
নাশ হয়তো দুঃখ করে, খরচ করে পছতায়॥
তা সোঁ ধিক্ ধিক্ অর্থ হয় দুঃখ দেও জগমাহি।
অর্থ মহা অরি জানিয়ে করি বিচার মনমাহি॥ ১১২॥

এ জগতে ধন মহাকষ্টের কারণ, প্রথমতঃ ইহার উপার্জ্জনে বহু কষ্ট, রক্ষা করিতে অশেষকর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। কোন কারণে আবার ধন ব্যয় হইলে শোকের অবধি থাকে না—অতএব ইহার কিছুতেই যে সুখ নাই—তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত, এইজন্য ধনকে শত শত ধিক্কার দিতে হয় এইরূপ ধনাসক্তি পরিত্যাগ করা ধার্ম্মিক ব্যক্তির সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

আত্মাকো নদ মানিয়ে সংযম তোয় সামান।
সত্যবচন হ্রদ শীল তট, দয়া লহর করিজান॥
অয়সে নদকো সলিলমে করহু স্নান সুধিরাজ।
নহিন্না এজন হোত হয় শুদ্ধ চপল মনরাজ। ১১৩॥

এই জগত সংসারে ধর্ম্মানুশীলনে তৎপর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধির জন্য এবং দৈহিক পাপনাশের জন্য নদ্যাদির জলে স্নান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে স্নান করিলেই যে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়—তাহা কখনই নহে। যদি যথার্থ চিত্তশুদ্ধির ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি আত্মাকে নদী জানিতে পারিয়াছে এবং সংযমকে জল, সত্যবচন হ্রদ, শীলতা তাহার তট এবং দয়া তাহার লহরী সদৃশ জানিয়া সেই জলে অবগাহন করিবে—তাহাতেই চিত্তের মলিনতা দূর হইবে—অন্য উপায়ে নহে।

আহু জানি অজরামর বিদ্যাধন করিলেহু।
সমরথকো ধন হোত হৃয় লাগত যোকরি লেহু ॥
কর্ম্ম করহুঁ তব জানি মন কালগ্রাসিত বহু আপ।
করহুঁ ন করহুঁ কালতে হোত কঠিন মনতাপ ॥ ১১৪ ॥

নিজেকে অজর অমর এইরূপ চিন্তা করিয়া বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জন করিবে; শরীর ক্ষণবিধ্বংসী—ইহার স্থায়ীত্ব কিছুই নাই, এরূপ চিন্তা করিলে কখন ধন ও বিদ্যা অর্জ্জন করা হইবে না; কিন্তু ধর্ম্মোপার্জ্জনের সময় মনে করিবে যেন কাল শিয়রে বসিয়া রহিয়াছে, তাহার গ্রাসে পতিত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তুমি কিছু কর আর না কর, কাল উপস্থিত হইলে—সে কখনই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। এইরূপ চিন্তা করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইবে।

ধনতে হীন দেখি জন সখা শত্রু ইব হোত।
শরদি অম্বুবিহীন ঘনপবন খণ্ড করিলেন্ত ॥ ১১৫ ॥

শরৎকালের নির্জ্জল মেঘরাশিকে পবন যেমন খণ্ড খণ্ড করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেয়। সেইরূপ ধনহীন হইলে আত্মীয় বন্ধুগণও তাহার প্রতি শত্রুতাচরণ করে—তাহাকে দেখিতে পারে না। তাহাকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে।

ধনতে হোত ধর্ম্ম প্রভু তাই।
ধনতে হোত সুযশ সমুদাই ॥
যো কুলহীন লভত ধন কুলতে।
ধন বীমু রোওত রাতি দিন বীতে ॥ ১১৬ ॥

ধনে ধর্ম্ম, প্রভুত্ব সুযশ প্রভৃতি লাভ হয়। কুলহীন হইলে ধনের দ্বারাই কুলপ্রাপ্ত হয়। লোক যদি ধনহীন হয়—তাহা হইলে তাহাকে জীবিকার্জ্জনের জন্য অশেষ কষ্টভোগ করিয়া দিবারাত্র রোদনসার করিতে হয়।

ধনতে কুলবুদ্ধি ধনওন্তা, ধনতে হোত পণ্ডিত গুণবন্তা।
ধনতে হীন পুরুষ হয় কয়সে, জীবহীন দেহ সব জয়সে॥ ১১৭॥

ধনের দ্বারাই মানুষ কুলশীল সম্পন্ন, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং বহু গুণ সম্পন্ন করিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হয় কিন্তু ধনহীন পুরুষকে সকলে জীবনহীন মৃতদেহের ন্যায় ঘৃণা করিয়া থাকে।

মোটে বস্ত্র গৃহ ছোটে পঞ্চ ধেনু হর দোষ।
যাকো হয় সে সুখী গৃহী, দুহিতা যদি নাহি হোয়॥ ১১৮॥

মোটা কাপড়, ছোট ঘর এবং পাঁচটী দুগ্ধবতী গাভী যাহার আছে অথচ যাহার কন্যা লাভ হয় নাই—এ জগতে তাহার তুল্য সুখী আর কেহ নাই। কারণ মোটা কাপড় শীঘ্র ছিন্ন হয়—ছোট ঘর হইলে অল্প-ব্যয়ে সংস্কৃত হয়—আর দুগ্ধবতী গাভী থাকিলে কখন সুখাদ্যের অভাব হয়না কিন্তু কন্যা থাকিলে বিবাহের জন্য তাহাকে অন্যের নিকট মাথা হেঁট করিতে হয়—অজস্র অর্থ দিয়া কতলোকের তোষামোদ করিতে হয়। এইজন্য দুহিতাই একমাত্র দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে।

যেতে জীব চরাচর মাহি, মম মায়া কৃত জানহুঁ তাহি।
সব জীবন কো জনক গোঁসাই, হম বি হু অতুর কোউ প্রভু নাহি॥
যদ্যপি সবময় প্রিয়তম ছোরা, সবমে অধিক প্রিয় নরগণ মোরা।
চারি বরণ নরগণকে মাহী, প্রিয়তম অধিক বিপ্রতেহি মাহী।
ততো অধিক বেদজ্ঞ দ্বিজ মোরা, কর্ম্ম চরহি সো অধিক ঘনেরা।
ততো অধিক জ্ঞানী মম প্রিয়বর, বিজ্ঞানী তাতো শ্রেষ্ঠতর॥
ততো অধিক প্রিয় ভক্ত মম যেই, যাকে হমবিনু আশন কই।
হম বিনু স্বপনে অন্যনহুঁ হিজাকো, হম হুঁ রহোঁ বশ তাকো॥
পুনি পুনি সত্য কহোঁ তোহিঁ পাহাঁ, মোহী সেবকসম প্রিয় কইনাহী।
ভক্তি কভু অতি নীচ প্রাণী, মোহি পরম প্রিয় শৃণু মমবাণী॥ ১১৯॥

ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বে জীব সকল আমার মায়ায় উদ্ভূত, সকল প্রাণীর জনকই আমি, অতএব জীবগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়, জীবসমূহের মধ্যে মানুষ এবং চতুর্ব্বর্ণ মানবদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রিয়তম, তাহার মধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার পরম প্রিয়, আবার বেদোক্ত ক্রিয়ানুরাগী বিপ্র তাহাদের অপেক্ষাও আমার প্রিয়। তদপেক্ষা জ্ঞানবান, তদপেক্ষা বিজ্ঞানবান কিন্তু এসকল অপেক্ষা আবার ভক্তই আমার অতীব প্রিয়পাত্র, কারণ যে আমার ভক্ত সে আমাকে ভিন্ন অন্যকে জানে না বা অন্য কাহারও প্রত্যাশা করে না; স্বপ্নেও আর কোন চিন্তা করে না, এইজন্য আমি ভক্তাধীন। ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—ভক্তের তুল্য আমার প্রিয় এ জগতে কেহ নাই; ভক্ত যদি অতি নীচ হয়—তাহা হইলেও সে আমার প্রাণের ধন এবং আমি সর্ব্বদা তার কাছে কাছে থাকি।

প্রভু সেবক হি ন ব্যাপে অবিদ্যা,
প্রভু প্রেরিত তেহিঁ ব্যাপে বিদ্যা,
তাতে নাশন হোই দাস কর,
ভেদ ভক্তি বাঢ়ে বিহঙ্গবর॥ ১২০॥

তুলসীদাস কৃত রামায়ণে আছে—হে বিহঙ্গবর! যে ভগবানের সেবা-পরায়ণ ভক্ত, সে কখন অবিদ্যা আচ্ছন্ন হইতে পারে না, ভগবান দয়া করিয়া যে জ্ঞান দান করেন—তাহা সদা সর্ব্বদা তাহার মনে দীপশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত থাকে—তজ্জন্য তাহার কখনও কোন কাজে ভুল হয় না। অর্থাৎ সে কেবল সংসার পঙ্কে নিমর্জ্জিত না থাকিয়া ভগবানে চিত্ত দৃঢ় করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়।

রাকা শশী ষোড়ষ উগহিঁ তারাগণ সমুদায়।
সকল গিরিনদী বলাইয়ে রচি বিনু রাতি ন যায়॥

অয় সই বিনু হরি ভজন খগেশা।
মিটে ন জীবন কের কলেশা ॥ ১২১ ॥

ইহাও রামায়ণের কথা—হে খগপতে! পূর্ণিমা রজনীতে রাকা শশী ও নক্ষত্র সমুদয় উদিত হইয়া থাকে। পর্ব্বত নদী প্রভৃতি পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ নিকর দর্শনে সমুৎসাহিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ পূর্ণ চন্দ্রকে সূর্য্য ব্যতীত কেহ উদিত হইতে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। সেইরূপ হরিভজন ব্যতীত জীবগণের কষ্ট নিবারণে অন্য উপায় নাই।

যদ্যপি প্রথম দুখ পাওয় রোত্র বাল অধীর।
ব্যাধি নাশ হিত জননীগণে সোশিশু পীর ॥
তিমি রঘুপতি নিজ দাস কর হরহি মানহিত লাগি।
দেহ গেহ অভিমান গয়ে, ভজত সদা দৃঢ় লাগি ॥
সংসৃতি মূল শূলপ্রদ নানা, সকল শোক দায়ক অভিমানা।
জিমি শিশুতন ব্রণ হোহিঁ গোসাঞী,
মাতৃ চিরাও কঠিন কি নাঞী ॥ ১২২ ॥

তুলসীদাস কৃত রামায়ণে আছে—নিজের দেহে, পরিজনবর্গে এবং গৃহাদিতে যে আমার আমার ভাব—উহা সংসার বন্ধনের মূল, কারণ এবং উহা হইতেই নানাপ্রকার কষ্ট ও শোক সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন জননী পুত্রের ব্যাধি নাশের জন্য অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তাহার ব্যথা নষ্ট করিবার জন্য ব্রণাদি কাটিয়া দেন, কিন্তু ব্রণ কাটার জন্য কষ্ট হইবে—ইহা যেমন মনে করেন না—রোগনাশ হইলে পুত্রের কুশল হইবে—ইহা যেমন তাঁহার স্থির বিশ্বাস, সেইরূপ পরমেশ্বর ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য প্রথমে তাহাদের অভিমান নষ্ট করিয়া থাকেন। সংসার ভাব অর্থাৎ আমার গৃহ, আমার পুত্র, আমার ধন—

ইত্যাদি ভাব নষ্ট হইলে ভক্ত যখন ভগবানে অনুরক্ত হয়—তখন এই দুস্তর ভবসাগর পারের জন্য আর তাহাদের ভাবনা থাকে না।

নিজ দাসনকে ওরু প্রভু করত কৃপা অতি ভুরি।
ভক্ত কৃপা বৎসল হরি জানত হয় কবি শুরি ॥ ১২৩ ॥

ভগবান ভক্তগণের প্রতি সদাই কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন—তিনি চিরদিন যে ভক্তের প্রতি প্রসন্ন—তাহা পণ্ডিত এবং কবিগণ বিশেষরূপে বিদিত আছেন।

নিগুণ রূপ সুলভ অতি, সগুণ জানে কোই।
সুগম আগম নানা চরিত শুনি মুনি মন ভ্রম হোই ॥ ১২৪ ॥

নিগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা অতি সহজ, কারণ তাহার ত ঐ এক ভিন্ন অন্য স্বরূপ নাই। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব নির্ণয় করা কাহারও সাধ্য নহে; তিনি কখন কিরূপ রূপ ধারণ করেন তাহা কে নিদ্ধারণ করিতে পারে? ইহাতে মুনিগণেরও যখন মতিভ্রম হয়—তখন অন্য পরে কা কথা!

ভক্ত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরে তনু ভূপ।
কিয়ে চরিত্র পাওল পরম প্রকৃত নর অনুরূপ ॥
যথা অনেক ভেকধরি নৃত্য করে নট কোই।
যোই সোহ ভাও দেখাওয় আপন হোয় সোই ॥ ১২৫ ॥

যেমন বাজীকর নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূতভাবন ভগবান ভক্তগণের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নানাপ্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লীলাখেলায় মত্ত হন—কিন্তু সেই ধৃত রূপ তাঁহার একটীও প্রকৃত নহে, সকলেই কল্পনা মাত্র জানিবে।

ব্যাপি রহো সংসার মহামায়া কটক প্রচণ্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভক পট পাখণ্ড ॥

সোদাসী রঘুবীর কি সমুঝে মিথ্যা সোপি।
ছুটেন রাম কৃপা বিনু নাথ কহোঁ পুনরোপি ॥ ১২৬ ॥

মহামায়া রূপ প্রচণ্ড বানর কটক এই সংসার ঘেরিয়া রহিয়াছে, এবং কামদম্ভাদি পাষণ্ডগণ তাহার চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু এই মহামায়া রামচন্দ্রের দাসী, জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা তাহাকে বিদিত হওয়া যায়। সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়াকে কেহ কখন বশ করিতে পারেনা; তাহার প্রতাপ এতই দোর্দ্দণ্ড কিন্তু ভগবান কৃপা করিলে সহজেই তাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

চিন্তা সাপিনী কাহিন খাওয়া, কো জগ যাহিন ব্যাপী মায়া।
শিব চতুরানন যাহি ডেরাহীঁ, অপর জীব কোহি লিখে মাহীঁ ॥১২৭

এ জগতে চিন্তা ভুজঙ্গিনীর দ্বারা দংশিত হইয়া কষ্ট না পাইয়াছে, এমন কেহ নাই, আর মায়ার দ্বারা মোহিত না হইয়াছে এমন লোক পাওয়াও দুষ্কর। যখন শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তাহাতে মুগ্ধ—তখন অন্যের কথা আর কি বলিব?

শ্রীমদ বক্রন কীন্হ কোহি প্রভূতা বধিরণ কাহিঁ।
মৃগ নয়নীকে নয় শরকো অসলা গুণ যাহি ॥ ১২৮ ॥

পৃথিবীতে ধনমদে কাহার চিত্ত না মত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধনের লালসা কে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, প্রভুত্বশালী নরগণ ধনের অহংকারে বধির হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়ে, মন্দ বিষয়েই তাহাদের মন ধাবিত হয়—মৃগনয়না রমণীর নয়নবাণে কেনা বিদ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছে?

জ্ঞানী তাপস শূর কোবিদ গুণ আগার।
কোহিকে লোভ বিড়ম্বনা কিন্হু ন হই সংসার ॥ ১২৯ ॥

যখন জ্ঞানী, গুণী, তাপস, বলবান, গুণশালী এবং কবিগণ লোভ

ছাড়িতে পারেন না—তখন সামান্ত ব্যক্তির সাধ্য কি যে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে ?

বিনু বিশ্বাস ভক্তি নহি তোঁহি বিনু দ্রবহিঁ ন রাম।
রাম কৃপা বিনা স্বপনোহঁ মনকি নহে বিশ্রাম ॥ ১৩০ ॥

বিশ্বাস ব্যতীত কখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি হয় না এবং ভক্তি না পাইলে ভক্তবৎসল কখন ভক্তের প্রতি সদয় হন না, তাহাকে দয়া করেন না ! করুণাময়ের করুণা কণা ব্যতীত মন সুস্থির হয় না—অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপা হইলে জীব অতুলানন্দ উপভোগ করিতে পারে।

কোউ বিশ্রাম কি পাও তাত সহজ সন্তোষ বিনু।
চলে কি জল বিনু নাও, কোটী যতন পচি পচি মরে ॥ ১৩১ ॥

সন্তোষই সুখের মূল, সন্তোষ ব্যতীত কেহ শান্তি অনুভব করিতে পারে না, সকল বিষয়ে যে সন্তুষ্টচিত্ত, তাহার আনন্দের অবধি নাই। যেমন অশেষ যত্ন করিলেও জল ছাড়া নৌকা চলে না, সেইরূপ সন্তোষ ব্যতীত মন সুস্থির হইতে পারে না।

সগুণ উপাসক পরম হিত নিরত নীতি দৃঢ় নেম।
তে নর প্রাণ সমান মোহি জিনকে দ্বিজপদ প্রেম ॥ ১৩২ ॥

ভগবান বলিয়াছেন—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা পরম হিতকর বলিয়া যে তাহাতে দৃঢ়ভাবে রত থাকে এবং ব্রাহ্মণ চরণে যাহার অচলা ভক্তি বর্ত্তমান আছে—আমি তাহাকেই অত্যন্ত ভালবাসি।

বিন সৎসঙ্গ ন হরিকথা তঁহি বিনমোহন ভাগ।
মোহগয়ে বিধু রামপদহে ইন্ দৃঢ় অনুরাগ ॥ ১৩৩ ॥

সাধু সঙ্গ ব্যতীত হরিকথা শ্রবণ করা হয়না এবং হরিকথা ব্যতীত সংসার-মোহ কিছুতেই কাটে না এবং তজ্জন্ত ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগও বদ্ধমূল হইতে পারে না।

জননী জনক বন্ধু সু[illegible]তনু ধন ভবন সুহৃদ পরিবারা।

সব্যক মমতা ত্যাগ বটোয়ারী, মমপদ মনহি বান্ধো বাটী ডোরী।

সমদরশী ইচ্ছা কছু নাহা, হর্ষ শোক ভয় নাহি মন মানী,

অসজ্জন মন উর বসে কয়সে।

লোভী হৃদয় বসত ধন যেয়সে ॥ ১৩৪ ॥

পিতামাতা, বন্ধু পুত্র-কলত্র, তনু ধন সুহৃৎ পরিবারবর্গ এই সকলের মায়া পরিত্যাগ করত মনোরজ্জু দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম বন্ধন করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হও এবং ভগবানের চরণ ব্যতীত অন্য বস্তুর আশা ত্যাগ কর। ভগবান বলিয়াছেন—সুখ, শোক, ভয় প্রভৃতি যাহার মনে উদয় হয় না, সেইরূপ ভক্তকে আমি নিরন্তর হৃদয়ে স্থানদান করিয়া সুখী হইয়া থাকি, অর্থাৎ তাহার চিন্তা আমার মনে সদাই জাগিয়া থাকে।

পন্নগারি অসনীতি শ্রুতি সম্মত সজ্জন কহহিঁ।

অতি নীচ হঁসন প্রীতি করিয়ে জানি নিজ পরম হিত॥

পাট কীটতে হোয় তাতে পাটম্বর রুধির।

ক্রিমিপালে সবকোয় পরম অপাওন প্রাণসম ॥ ১৩৫ ॥

ভূষণ্ডি কাক একদিন গরুড়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—যে হে পন্নগারে! সুধীজন বলিয়া থাকেন,—অতি নীচজনের সহিত বন্ধুত্ব করাও নিজের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করিবে। যেমন পাঠ কীট অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার দ্বারা বহু মূল্য পট্টবস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া লোকে ব্যবহার করে। অতি নীচ লোক হইলেও সময়ে তাহার দ্বারা উত্তম ফল লাভ হয় বলিয়া তাহাদের সহিত সম্প্রীতি রাখা উচিত। তুলসীদাস কৃত রামায়ণে ইহা লিখিত হইয়াছে।

দয়া ধরমকা মূল হ্যায়, নৃগকা মূল অপমান।
তুলসী দয়া মৎ ছোড়িয়ে, যেৎনা ঘটবে পরাণ ॥ ১৩৬ ॥

দয়াই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি জানিবে, নির্দ্দয়তা ও হিংসা অপমানের একমাত্র কারণ। অতএব হে তুলসী, যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে ততদিন দয়া পরিত্যাগ করিও না, দয়াই পরম ধর্ম্ম।

গোউয়া দোকে কুত্তা পালে ওস্কি বাছুর ভুকা।
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপনা পাওয়ে রুখা ॥
ঘরকা বহুরি পিরীত না পাওয়ে চিত চোরারে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা, দুখ লাগে আর হাসি ॥ ১৩৭ ॥

হে কলি! ধন্য তুমি, তোমার তামাসা দেখে হাসিও পায়—দুঃখও ধরে। কারণ লোকে তোমার মোহে মত্ত হইয়া গাভী দোহন করত কুকুরকে প্রতিপালন করে, কিন্তু তাহার বৎস দুগ্ধ-পান করিতে পায় না। পরম পূজনীয়, সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ পিতাকে উপবাসী রাখিয়া শ্যালককে চুব্যচূষ্য আহার প্রদান করে। এবং নিজ বিবাহিত পত্নীকে প্রেমদান না করিয়া বারাঙ্গনার প্রেমে লোক মোহিত হইয়া কত মজা করে। তুলসী কৃত রামায়ণের উপদেশ।

সাচ্চা কহে ত মারে লাট্টা, ঝুটা জগৎ ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকাই ॥
চোরকো ছাড়ে সাধকো বাঁধে, পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুঃখ লাগে আর হাসি ॥ ১৩৮ ॥

যে সত্যকথা কহে—এ কলিযুগে তাহার মাথায় লাঠি পড়ে, কিন্তু যে মিথ্যাকথা কহে—লোকে তাহার জয় ঘোষণা করে—লোকে তাহার প্রতারণা বাক্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। গোদুগ্ধ গলি গলি ফিরি করিয়াও বিক্রয় হয় না কিন্তু অস্পর্শীয় সুরা একস্থানে বসিয়াই কত বিক্রয়

হইতেছে—তাহার স্থিরতা নাই। এ যুগ চোরকে ছাড়িয়া সাধুকেই বন্ধন করে, এবং নির্দ্দোষী পথিককে ধরিয়া ফাঁসি দেয়; অতএব হে কলি! তোমার গুণের কথা আর কত কহিব—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়, সময়ে দুঃখেও প্রাণ ফাটিয়া যায়।

কোউ নহি চীহ্নত রামকো জগতি মত্ত নর নারী।
অন্তর্যামী রূপ মে, রাজত মহিমা ভারী।
ঘটকি সৃষ্ঠকো কাম যশ, কুম্ভকার বিনু নহি।
কর্ত্তা এক কোউ চাহিয়ে, রচত অপূর্ব্ব জগমাহি ॥ ১৩৯ ॥

এই মায়াময় সংসারের নরনারী আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া বিপুল মহিমাময় ভগবান রামচন্দ্রকে চিনিতে পারে না—তাহাতে যে কত মহিমা মণ্ডিত রহিয়াছে—তাহা দেখিয়াও দেখে না। যেমন ঘটের সৃষ্টিকর্ত্তা কুম্ভকার, তাহাকে কেহ দেখে না—সেইরূপ এই জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা বর্ত্তমান আছেন, কেহ তাহার প্রতি একবার লক্ষ্যও করে না।

দিবস রজনী নিত জাত হায়, ক্ষীণ হোত পরমাই।
নানা কারজ হোহিঁ রত, কাল বিগত হিয় নাই ॥
দেখত শোক রোগ সব নরকো।
মরত দেখি কিছু ডর নাহি হিয়কো ॥
সেইরূপ মদ করি জলপানা।
নাহি শোচত সব ভয়ে দেওয়ানা ॥ ১৪০ ॥

দিবাযামিনী নিদ্রাগত হইয়া পরমায়ু ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, নানাবিধ সংসার কার্য্যে মত্ত হইয়া দিনে দিনে যে দিন গত হইতেছে—ইহা কেহই দেখিতেছে না। মানুষের শোক রোগ দেখিয়া এবং

নিরন্তর লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে দেখিয়াও কেহ কালভয়ে ভীত নহে। মোহ মদিরা পানে মত্ত হইয়া জীব এই জগৎকেই চির বাসস্থান এবং অতীব রমণীয় স্থান বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু একদিন যে এসকল নিশ্চয় ছাড়িতে হইবে—সে বিষয়ে কাহার চৈতন্য নাই।

হম যাকে চিন্তন করে, সো মোহি মানত নাহি।
সো চাহতো জন অন্যকা, সো নাহি মানত তাহি॥
হমকো চিন্তত হয় অরু নারী।
ধিক হয় কাম ধিক ধিক নরনারী॥ ১৪১॥

আমি যাহাকে চিন্তা করি, যাহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেছি, সে আমাকে মানে না—আমার জন্য চিন্তা করে না। সে অন্য লোককে চাহে—অন্য জনের চিন্তা করে—কিন্তু সেও আবার তাহাকে চাহে না, তাহাকে মানে না। আমার স্ত্রী আমার প্রতি আসক্তা নহে—অন্যের স্ত্রী আমার প্রতি আসক্তা; অতএব এরূপ কামকে ধিক, এবং এইরূপ কামের অধিকারী নরনারীকেও শতধিক।

যো নর নষ্ট হোত জগমাহী, তাকো আট দোখ উরমাহী।
হোয় নিমিত্ত শুচা ওহিঁ তাকো, দুষণকো গুণ মানত হিত কো॥
কহত বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরেশা, কছু যামে নাহি সংশয় লেশা।
প্রথম করত দ্বিজ দ্বেষ গোসাঁই, জানত হীন করি মানত নাহি॥
ব্রাহ্মণ সঙ্গ বিরুদ্ধ তব করহিঁ, নাহি লাভ কছু লেখত নাহি।
দ্বিজকো বিত্ত হরত হঠ করিকে, কটু উচ্চারি লেহিঁ শঠ করিকে॥
ব্রাহ্মণ ঘাত করাহিঁ মনহি তে, সংশয় ভীতি নাহি হোত মনাহঁতে।
জানহি দ্বিজগণ বঞ্চক হোতে, আপ বড় পন্ন আপন মুখেতে॥
করহি বিপ্র লিখি বেদ পুরাণা, তাতে ঘাঁতহি করি অপমানা।
নিন্দ দ্বিজকো করিহি সদাই, গারি দেত হিত ছাড়ি বেড়াই॥

যো কোউ দ্বিজকো করহি প্রশংসা, তা মে দ্বেষ করত নহি সংশা।
যো কুছ কাম করতো শুভ তাকো, গৃহ ঔচিত্য কার্য্য সো জগকো ॥
তা মে নহিঁ বোলও হিঁ দ্বিজকো, জানত দ্বিজ অতি হিন জগৎকো।
যো যাচক দ্বিজ মাগন গয়েউ, করত দ্বেষ হঠি ভগাওত ভয়েউ।
মান্কতা দ্বিজ কহি করত অতি দ্বেষা,
করত অসূয়া নহি দেন কছু লেশা,
অয়সে যো পর হোত জগমাহি।
তুরত নাশ সো হোত গোসাঁই। ১৪২॥

একদিন পরম বৈষ্ণব বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, যে যে ব্যক্তি দেব দ্বিজের প্রতি অভক্তি প্রকাশ করে, বিপ্রগণের সহিত কলহ করে, ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে, ব্রাহ্মণের হিংসা করে এবং তাহাদের নিন্দা করিয়া সুখ বোধ করে ও প্রশংসা শ্রবণ করিলে দুঃখ বোধ করে, নিত্য নৈমিত্তিক—কাম্যকর্ম্মে তাহাদিগকে আহ্বান করে না, ব্রাহ্মণ কিছু চাহিলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে—একপয়সাও দেয় না,—যাহার বুদ্ধি এইরূপ হইয়াছে—তাহাকে অচিরে নাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।

নিত্য হোয় ধন রোগ হত, প্রিয়বাদিনী গৃহমাহী।
তাকো প্রিয় অতি করত হয়, শোচ করহুঁ হিয় নহি॥
অনুগামী সুত সর্ব্বদা, পিতৃভক্তি যুক্ত হোত,
অয়সে বিদ্যা পড়ত হয়, জামে অর্থ নিত হোত।
ছই ষড়্‌গুণ ইহলোকমে, সুখ কারণ নৃপ হোত।
তাকো জীবন ধন্য হয়, পুণ্যবন্ত নরপোত॥ ১৪৩॥

এই সংসারে যাহার ধনবাসনা রূপ রোগ নিরাময় হইয়াছে, এবং যাহার দেহ সর্ব্বদা রোগশূন্য ও যাহার ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী,—তাহার

কোন চিন্তা নাই। পুত্র যদি পিতৃভক্ত এবং বিদ্যা অর্থকরী হয়, তাহা হইলে আর অসুখ কোথায়? এই ছয়টী যাহার বর্ত্তমান আছে—এ জগতে সেই পরম সুখী—তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরুষণ কো গুণ ষষ্ট হয়, নহি ছোড়াহিঁ হিত জাপ।
অনালস্য, অনুসূয়া ক্ষমা, ধৃতি অরু সত্য সুদান ॥ ১৪৪।

কোন পুরুষের এই ছয়টী গুণ কখন পরিত্যাগ করা উচিত নয়—যথা অনালস্য, অনুসূয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য সত্য ও দানশীলতা।

ছোড়হুঁ ছয় দোষ সদা যো চাহ কল্যাণ।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ ভয় অলস দীর্ঘ গুমান। ১৪৫ ॥

যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করেন—তাহাকে নিদ্রা, তন্দ্রা, রাগ, ভয়, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা এই ছয়টী দোষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে—নতুবা মঙ্গলের আশা নাই।

শুচি সুশীল বসুমতী কহুঁ প্রিয় কাহিন লাগ।
শ্রুতি পুরাণ কহ নীতি যশ, সাবধান শূনু কাগ ॥
এক পিতা কহ বিপুল কুমারা, হোই পৃথক গুণশীল আচারা।
কেউ পণ্ডিত কেউ তাপসজ্ঞাতা, কেউ ধনবন্ত শূর কেউ দাতা ॥
কেউ সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মরত কোই, সব পর পিতাই প্রীতিসম হোই।
কোউ পিতৃভক্ত বচন মনকর্ম্মা, স্বপনেহুঁ জানেনা দুসর ধর্ম্মা।
সো প্রিয় সুত পিতু প্রাণ সমানা, যদ্যপি সো সমভাতি অয়ানা ॥১৪৬

শুদ্ধমতি, ধীর, সেবক, বুদ্ধিমান লোক জগতে কাহার না প্রিয় হয়? এক পিতার অনেক পুত্র জন্মে, কিন্তু সকলে সমান গুণ সম্পন্ন হয় না; কেহ পণ্ডিত, কেহ জ্ঞানী, কেহ তপস্বী, কেহ ধনবান, কেহ বলবান, কেহ সর্ব্বজ্ঞ, কেহ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া থাকে; কিন্তু যে বেশী পিতৃভক্ত হয়, ইহার মধ্যে সেই পিতার প্রাণ তুল্য

প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ যে জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তিমান—সেই তাহার একান্ত প্রিয়। (রামায়ণ)

জয়সে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নারী।
অস্থি নাড়ী মলমূত্রময় যন্ত্রিত নিন্দিত তারী॥ ১৪৭॥

যেমন কাঠের পুতুল, নারীগণও সেইরূপ অস্থি, নাড়ী, মলমূত্র, মাংসময় কাঠের পুতুলের মত, কোন শোভা নাই—বিবেকশালী ব্যক্তিগণ এইজন্য রমণী সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়েন।

মেরে মায়া প্রবল হয়, যুবতী রূপ জগমাহী।
দেখহু তাকো অপূর্ব্ব বল, তোহি কোও পাওত নাহি॥
দিগ্বিজয়ী যো শূর হয়, বহু গুণ সাগর তাহি।
ভ্রূকটাক্ষ নো করত হয়, তাকো পদতল মাহি॥ ১৪৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন—আমার মায়ার ক্ষমতা কতদূর দেখ: অতি বড় বলশালী পুরুষকেও আমার মায়ার আধার রমণীগণ অনায়াসে পদানত করিয়া রাখিতে পারে।

নারী সংসৃতি মূলিকা, অর্গল স্বরপুরকের।
চিত্রিত মপি নহি দেখহিঁ, বুদ্ধিমন্তজনের॥ ১৪৯॥

সংসারধর্ম্মে নারী জাতিই মূল কিন্তু মোক্ষপথের কণ্টক; চিত্রের সুচিত্রিত নারীমূর্ত্তিও পুরুষের চিত্ত চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে পারে। এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না।

পুত্র লিয়ে পিতু মাতু সদা তলফৎ হই জগমাহী।
পুত্র মহা রিপুরূপ হয় কারু বিচার মনমাহি॥
জব নহি হোত পুত্র নরকেরে, মাতু পিতু মনদুঃখ মনেরে।
যো পুত গর্ভ মধ্যগত হেরা, গর্ভপাত সুতিকা কেরা॥

জায়ে গ্রহ ভয় মুক কুমারা, হোয় জনেউ মুরখর ভোরা।
যো সুত পণ্ডিত হোয় সুবাণী, পাছে বিহাত্তন হোয়ে পছতানি ॥
যুবা রূপ সুত হোতহিঁ জবহিঁ, পর নারী দুঃখ ঘেরহি তবহি।
বহু কুটুম্ব পরিবার সমেতা, হোয় দরিদ্র পিতা পছিতাতা ॥
যো গুণবন্ত হোত সুত, ধন কুটুম্ব পরিবার।
নহি কিছু দুঃখ স্বপনেউ সহ মৃত্যু শঙ্ক অনিবার ॥
মাতু পিতা পছিতান কভু, ন মিটে জগবীচ মহ।
জানহুঁ সর সুশায়ন, দুঃখরূপ সুত জগৎকে ॥ ১৫০ ॥

জনক জননীর পক্ষে সন্তানই তাহাদের দুঃখের প্রধান কারণ—এই হেতু পুত্র তাহাদের শত্রু ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রথমে পুত্র না হইলেও পিতামাতার কষ্ট, জননীর গর্ভসঞ্চার হইলে পাছে তাহা নাশ হয় এবং প্রসব সময়ে যাহাতে পুত্র কষ্ট না পায়—এই ভয়ে তাঁহারা ভীত হন। তারপর জননী সন্তান প্রসব করিলে তাহাতে কোন গ্রহদোষ আছে কিনা সন্দেহ করিয়া কত কষ্ট পান, তারপর পুত্র বোবা হইল কিনা—ইত্যাদির ভয়; উপনয়নাদির পর বিদ্যারম্ভে পুত্র শিক্ষিত না হইলেও মনে বিষম দুঃখ; তারপর বিদ্বান হইলে বিবাহ হয় কিনা, যৌবনকালে পরদার আশক্ত হইবার ভয় রহিয়াছে। পুত্র যদি ঐ সকল দোষে দুষিত না হয়—তাহা হইলে যদি দরিদ্র হয়—তবে সংসার কেমন করিয়া চালাইবে—বহু গুণশালী হইলেও বেশীদিন বাঁচিবে কিনা, তাহারও ভয় আছে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, পুত্র পিতামাতার কিছুতেই সুখের কারণ নহে—বরং দুঃখেরই আস্পদ।

যো নর ধর্ম্ম করে নহি, মানুখ পাই শরীর।
জরা ভয়ে নহি হোত কছু, চিন্ত হোত অধীর ॥ ১৫১ ॥

অন্তিমকালে জীবের ধর্ম্মই একমাত্র সহায়—যে ব্যক্তি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন না করে, সে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু ভয়ে ভীত হইতে থাকে, এবং অনুতাপে অহরহঃ পুড়িয়া ছারখার হয়।

অর্থ যথা পদধূলি হয়, যৌবন নদী কর বেগ।
মানুখ জলথে বিন্দু হয়, জীবন ফেন করি লেখ॥ ১৫২ ॥

ধন অতি তুচ্ছ পদার্থ, পদরজের ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর, যৌবন জুয়ারের জলের মত এই আছে—এই নাই, শরীর ক্ষণভঙ্গুর, অতএব এই অচিরস্থায়ী পাঞ্চভৌতিক দেহের জন্য সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দে মত্ত হইয়া মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ ধর্ম্মোপার্জ্জনে বিরত থাকা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

রামনাম মণি দীপ ধরু, জীহ দেহরি দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহিরো যো, চাহসী উজী আর॥ ১৫৩ ॥

ঘরের মাঝখানে প্রদীপ রাখিলে যেমন ভিতর-বাহিরের অন্ধকার তিরোহিত হইয়া আলোকজ্জল হয়। ভক্তবীর তুলসীদাস বলিতেছেন—দেহের দ্বার সদৃশ জিহ্বাতে সেইরূপ রামনাম—বাতি জ্বালিয়া রাখিলে বাহ্যান্তরের দারুণ অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানালোকে দেহ-প্রাঙ্গণ আলোকিত হয়।

যাকো মন হরিচরণ মে হোত লীন দিন বাতি,
করত কাম বিষয়াদি সদা তদপি ন হোত বিঘাতি।
বয়সে নারী হোত হয় ব্যভিচারী মনমাহি,
ভজত কই পর পুরুষকো যদপি কাম গৃহমাহি।
গৃহ কারজ ক্রিয়মানপি চিন্তত নাগর লেহ।
ছুটন্ত নহি গুণ মাত্র অপি নর নাগর পর স্নেহ।

নটনারী শির কুম্ভ ধরি চড়ি বিমান চলি যাঁহি,
যয়সে মন শির কুম্ভ পর রহহিয়ে কটক মাহিঁ।
তয়সে কারজ করহিঁ সর ছাড়ত নহি প্রভু লেহ।
অর্পণ করত মনবাসনা হরিচরণ পর দেহ ॥ ১৫৪ ॥

যাহার মন ভৃঙ্গ দিবারাত্র হরিচরণ পদ্মের মধুপানে রত, সংসারে কার্য্যে বিব্রত থাকিলেও তাহার হরি আরাধনার ব্যাঘাত হয় না। যেমন ব্যাভিচারিনী সংসারের কাজকর্ম্মের মধ্যে ব্যাপৃতা থাকিয়াও পর পুরুষের প্রতি মনটী নিবিষ্ট রাখিয়া দেয়, অথবা নর্ত্তকী মস্তকের উপর কুম্ভ স্থাপন করিয়া উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া চলিয়া যাইলেও যেমন তাহার কুম্ভ পতিত হয় না—সেই একাগ্রচিত্ত হইলে তুমি যেখানে থাকে এবং যাহাই কর—কিছুতেই তোমার সাধনার ব্যাঘাত হইবে না।

যো নর ভজহিঁ সগুণকো অতি প্রসন্ন মনমাহিঁ।
নিস্কামী ভজমান পর করহিঁ কৃপা প্রভু তাহিঁ॥
অনুভব রূপ ভক্তি বৈরাগা, দেত কৃপা করি সো মহাভাগা।
তিনপ্রকার চিত উপজত তাকো,
বিনু প্রয়াস সহজহিঁ উর ওয়াকো ॥
জয়সে ভোজন করতহিঁ, হোত তিন গুণ তাহি।
বল সন্তোষ অরু মিটহঁ, ক্ষুধা গ্রাস গ্রাস পরমাহি ॥ ১৫৫ ॥

যেরূপ ক্ষুধাতুর ব্যক্তির প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া সন্তোষ ও বলের উৎপত্তি হয়—সেইরূপ একান্তমনে যে ব্যক্তি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে—ভগবানের কৃপায় অনায়াসে তাহার চিত্তে জ্ঞান ভক্তি ও বিবেক বৈরাগ্য আপনি উপজিত হইয়া থাকে।

যো করি জ্ঞান গুমান ভজন করহি জগদীশকো।
সো হয় অতি অজ্ঞা ন অন্তর কলুষ করি মানিয়ে॥

করি কলেশ বহু ভাঁতিতে ছোড়ি বিমান পর যাই।
চড়ত পরমপদ পায়কে সগুণ নিরাপদ তাই ॥
বিনু আশ্রয় গির পরহিঁ তব টুটিযাহিঁ পণ দেহ।
অধঃ পরহিঁ নহি নহহিঁ সুখ পছিতাওহিঁ ত্যজিলেহ ॥ ১৫৬ ॥

যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমি জ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ, আমি আবার কাহার ভজনা করিব বলিয়া সগুণ ব্রহ্মের নিন্দা করে—সে কলুষ কালিমায় মলিন হইয়া পরমপদারূঢ় হইলেও পতিত হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি বহুকষ্টে বিমানে উঠিয়া বিঘ্নবশে নিম্নে পতিত হইয়া আঘাত বশতঃ বহু দুঃখভোগ করে, সগুণ ব্রহ্মের নিন্দকারী জনকেও সেইরূপ সংসারে বহু কষ্টভোগ করিতে হয়।

সগুণ উপাসকগণ সুখ পাহঁ, নির্গুণমে তলফত দিন যাহিঁ।
মহাকষ্ট নির্গুণ ভজি নাহি, কেওল করমী যত পছ তাহিঁ।
যো পুণি সগুণ ভক্তি নহি করহিঁ, কেবল ব্রহ্ম স্বরূপকো ভজহিঁ।
ওয়াকো হোতি কলেশ সদাহিঁ, তুষ কুটি কোউ চাউল পাঁহিঁ ॥১৫৭॥

সাধকশ্রেষ্ঠ তুলসীদাস সগুণ ব্রহ্মের উপসনা সম্বন্ধে কত উচ্চমত প্রদান করিয়াছেন—দেখুন। তিনি বলেন—নির্গুর্ণ ব্রহ্মের উপাসন করা কষ্টপ্রদ, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাতেই সাধক সুখলাভ করিয়া থাকেন যেমন তুষ কুটিয়া কেহ তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ সগুণ ফেলিয়া নির্গুণে মজিলে কোনই ফল হয় না—অতএব সগুণের উপাসনাই মনোরম ও সুখপ্রদ জানিবে।

যদ্যপি নিগুণ ব্রহ্ম কি নাহি স্বরূপ কো লেশ।
অয়সে রূপ কায় জানি, কোনহি প্রবিশত মনলেশ ॥
তানক কেউ মনবুদ্ধিকো বিদ্যমান করি মান।
ছাড় মন অবিবেকতা অহমাদিক ত্যজি মান ॥

লক্ষ্যরূপ মনগহত হয়, চিদানন্দ সুখরূপ।
নেতি নেতি করি ত্যজহু জড় অপর হত অপরূপ ॥
মেরে সহমেজীহ নহি আশনহি জানত কোই।
তয়সে নিজকোরূপ চিত ছাড়ি শকে নাহি কোই ॥ ১৫৮ ॥

নির্গুণ ব্রহ্মের কোন রূপ নাই, এইজন্য আমাদের মন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না,' তবে বেদবাণী, গুরু উপদেশও যুক্তি-সতর্ক দ্বারা চিত্ত প্রকাশক চৈতন্য স্বরূপ কোন বস্তু যে আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছেন—এটা ঠিক, তাহাতে বাসনাস্বরূপ বৃত্তিকে প্রকাশিত করে। সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপ জগৎ প্রকাশক চিরদন ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, বিচার করিলে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ নশ্বর হইলেও নিষেধ কর্ত্তার অভাব কি জানিতে পারা যায়? আমার জিহ্বা নাই বলাও যা, আর আমি নাই বলাও তাই—অতএব নিষেধ বিষয়ে কেহই আপনাকে ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং নিখিল প্রকাশক চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে বেদোক্ত উপাসনাও একান্ত কর্ত্তব্য।

যো কহ নির্গুণ ব্রহ্ম হয় ভজন করত শকতাহি।
আলম্বন বিনু মানসিক ধ্যান করে নর নাহি ॥
নির্গুণ ব্রহ্ম ভজহি নর কয়সে, নামরূপ নহি আলজ তয়সে।
মন অবলম্বত রূপ লোভাই, নির্গুণ রূপ রহিত সদাই ।।
বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বত কাকো, যো নহি হোত আবয়ব তাকো।
নির্গুণকো ভজহিঁ যো জ্ঞানী, তাকোভি ভ্রম করি মন মানী ॥
বেদান্তিগণ কহত হঁয়, শব্দাদি ভ্রম তাহি।
মণিকে জ্যোতিমে মণি মিলে, যদ্যপি ভ্রম জগমাহি ॥
দীপ শিখাকো জ্যোতিমে মণি ভ্রম মানত যোই।

ধায় জায় নহি পাত মণি বিসম্বাদি ভ্রম সোই ॥

দোউ যদ্যপি হয় ভ্রমরূপা, প্রিয়বর শুনহঁ হই যুক্তি অনুপা ॥১৫৯॥

ব্রহ্মের উপাসনা ভ্রমমূলক হইলেও ফলপ্রদ। মণির প্রভাকে দেখিয়া যেমন দূরস্থিত ব্যক্তি তাহাকে বিদিত হইবার জন্য নিকটে আসিয়া তাহাকে লাভ করে। সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ না জানিয়া গুরুর উপদেশে শ্রবণাদির উপাসনায়ও ব্রহ্মলাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু মৃত্তিকা কিম্বা প্রস্তরাদির উপাসনা করিলে ব্রহ্মলাভ করিতে পারা যায় না। প্রদীপের শিখা দেখিয়া যদি মণি মনে করা যায় এবং মণির আশায় নিকটে যাওয়া যায়—তাহা হইলে মণিলাভ হয় কি? এইজন্য এইরূপ উপাসনাকে শাস্ত্র বিসম্বাদি দোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পর ইচ্ছা যো করত হয় কারজ দুখকো যোই।

কর্ম্মরূপ বলবন্ত হয় ইষ্ঠ করি ভোগত সোই ॥ ১৬০ ॥

আপনার ইচ্ছা ব্যতীত পরের কাজ করিয়া যে কষ্টভোগ করে, তাহাকে পরেচ্ছাপ্রারব্ধ বলা যায়।

রোগভোগ যো করত হয় নহি ইচ্ছা হয় তাহি।

হোত মহা অনরথ সদা বিগত হোত কভু নাহি ॥ ১৬১ ॥

জগৎ সংসারে কাহারও পীড়াভোগ করিতে ইচ্ছা হয় না—অথচ রোগভোগ সকলকেই করিতে হয়। এইরূপ ভোগকে অনিচ্ছা প্রারব্ধ বলা যায়

জয়সে অনরথ জানিকে রাজদারগত হোয়া।

ইচ্ছারূপী কর্ম্ম হয় মিটে শকে নহি কোয় ॥ ১৬২ ॥

কুকর্ম্মের ফল মন্দ জানিয়াও যাহারা নৃপ পত্নীর অনুগমন করে, অথচ তাহাকে নিবারণ করিতে কেহ সমর্থ হয় না—তাহাকে ইচ্ছা প্রারব্ধ কহে।

কর্ম্মরূপ প্রারব্ধ যোনো হয় তিনপ্রকার।
ইচ্ছা অনিচ্ছা পরেচ্ছা কহত শাস্ত্রমত সার ॥ ১৬৩ ॥

শাস্ত্র বলিতেছেন—কর্ম্মরূপ প্রারব্ধ তিনপ্রকার যথা—ইচ্ছা, অনিচ্ছা আর পরেচ্ছা।

জ্ঞানী যা জগ বীচমে মহাপুরুষ করি জান।
প্রেম ভক্তি হয় যাকো জ্ঞানী ভুল্য সো জন ॥
শ্রবণাদিক সাধনা করহিঁ ছাড়ি সকল সংসার।
তিন সাধন রত অনুভুত হয় ব্রহ্ম পরম বিচার ॥
নিজানন্দ অনুভব করে, ব্রহ্মরূপ নিত হোয়।
দেহন নাশে স কহিঁ কভু কর্ম্ম কঠিন অতিশোয় ॥
কুম্ভ কারকো চক্র যেঁও ঘুমত আপহিঁ আপ।
কর্ম্ম চক্র তেঁও জানিয়ে ভোগ বিনা নাহি যাত ॥১৬৪॥১৬৫॥

জ্ঞানী লোককে এই সংসারের মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করিবে। তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রেম ও ভক্তির উদয় হয়। তিনি পরম-ব্রহ্মে বিচরণ করেন, এবং নিত্য সাধন রত থাকিয়া সংসারের মায়া মোহ পরিত্যাগ করত নিত্য ব্রহ্মময় হইয়া চিদানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন এবং তিনিই পরম জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হন। কুম্ভকারের চক্র যেমন একবার ঘুরাইয়া দিলে আপনাপনি বহুক্ষণ ঘুরিতে থাকে, কর্ম্মচক্র সেইরূপ জানিবে। অতএব কর্ম্মফল ভোগ শেষ না হইলে মোক্ষলাভের আশা সুদূর পরাহত।

ত্রিবিধ হোহিঁ কর্ম্ম সব নরকো।
সঞ্চিৎ আরব্ধ ক্রিয়মাণ করিকো ॥
তাসে সঞ্চিত ক্রিয়মাণ যো হোঁহিঁ।
ভক্তি জ্ঞান প্রায়শ্চিত্ত যো করহি ॥

তাসে নাশ হোঁহি দেউ কর্ম্মা।
নিশ্চয় ইহ জানহ শুভ ধর্ম্মা ॥
প্রারব্ধ কর্ম্ম কঠিন জগমাহী।
ভোগ বিনা ক্ষয় হোত কভু নাহিঁ ॥ ১৬৫ ॥

কর্ম্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ, ইহার মধ্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ-কর্ম্ম ভক্তি, জ্ঞান ও প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রারব্ধ-কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত কখনই ক্ষয় হইতে পারে না।

হো ন্‌দার সো হোত হয়, তন্মোচক কোই নাহিঁ।
ব্রহ্মা হরিহর নিয়ত কো, নহি মেটত জগমাহী ॥
তকো ভেদ শুনহ মন লাই, বৈদ্য পুরোহিত কো প্রভু তাই।
কোউ রোগী কোহী জগমাহী, ভোগত রোগ সদা তনমাহিঁ ॥
দোখজ কর্ম্মজ গ্রহগণ জনিতা, তিনপ্রকার রুজ সবকো হোতা।
করম হোহিঁ মত তিন সবনকো,
যা মে সংশয় নাহিঁ কছু তনিকো ॥ ১৬৬ ॥

যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে—তাহার রোধ করিতে কেহ পারে না। অপরের কথা দূরে থাকুক—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও ইহার হস্ত অতিক্রম করিতে অসমর্থ। মানবগণ কর্ম্মজ, গ্রহজ ও দোষজ এই তিনপ্রকারে জগতে কষ্টভোগ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে গ্রহজ দোষ পুরোহিত দ্বারা শান্তি করাইলে নষ্ট হয়; দোষজ রোগ বৈদ্যাদির দ্বারা চিকিৎসা করা হইলে আরোগ্য হয় কিন্তু যাহা এইরূপ কোন উপায় দ্বারা প্রশমিত না হয়—তাহাকে কর্ম্মজ দোষ জানিবে—ভোগ ব্যতীত ইহা নষ্ট হইবার নহে।

পরো কোই নদী বীচমে জলতরঙ্গ মহঁ যাহিঁ।
বুড়ো জানি পয়রত তঁহু, যো কছু আশ্রয় নাহি ॥

নাও পাই আশ্রয় করে, সো সুচতুর মতিমন্ত।

যত্ন করে বঠি বেগতে, সমঝহু ভেও সুধীমন্ত ॥ ১৬৭ ॥

নদীর প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া যদি কেহ সন্তরণ দেয়—অথবা যদি গমনশীল কোন জলযানের সাহায্য অবলম্বন করে—তাহা হইলে সে যেমন ভীষণ তরঙ্গ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়—সেইরূপ এই ভীষণ সংসার সমুদ্রে যত্ন করিলে কিনা হইতে পারে? চেষ্টা ও যত্ন করিলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিধ কষ্ট হইতে জীব অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

যো নহি হোত কর্ম্ম বলবন্তা,
নল আরু রামচন্দ্র বলবন্তা,
করু কুলরাজা যুধিষ্ঠির নৃপহি,
দুঃখভোগ কো দিহু নিত নিতহি।
যো নহি মিটে কর্ম্ম নিত ভাই।
বৃথা হোত নরকো প্রভু তাই।
ভব কারজ সব করহি বৃথাহি।
বেদ পুরাণ উপদেশ কভু নাহি।
হোয় আদৃষ্ট সো হোই হঠ করিকে।
করহি কাম নর বৃথা শ্রম করিকে।
বৃথা হোহি ঋষিগণকো রচিতা।
বৃথা হোহি তও ভাগবত গীতা।
যাকো ভেদ শুনহ মন লাই।
যত্নপি হয় কর্ম্মণ কো প্রভু তাই ॥
কর্ম্ম হোত অদৃষ্ট জগমাহী।
যতন বিনা সমরকে কছু নাহি ॥

জীব যত্ন সব করহি, তব কর্ম্ম দেত ফল তাহি,
জীব সাধ্য কারজ সব, যামে সংশয় নাহি ॥ ১৬৭ ॥

কর্ম্মফল সকলের মূল না হইলে মহারাজ নল, প্রভু রামচন্দ্র ও পাণ্ডবরাজ ধার্ম্মিকপ্রবর রাজা যুধিষ্ঠিরকে এত ক্লেশভোগ করিতে হইত না। এইপ্রকার সন্দেহে বশবর্ত্তী হইয়া যদি বল—মানব ও মানবশরীরের প্রভুত্ব কিছু নয়, বেদ পুরাণ কিছু নয়, ঋষিবাক্য কিছু নয়, ভাগবত গীতাদির পাঠও বৃথা—যখন কর্ম্মই প্রবল তখন এসকল মানিবার আবশ্যক কি? ইহার উত্তর—কর্ম্মই প্রধান বটে কিন্তু সেই কর্ম্ম অদৃশ্যরূপ জড়, মানবের যত্ন ভিন্ন কোনপ্রকার ফল প্রদানের ক্ষমতা তাহার নাই। যেমন যত্ন করিয়া কৃষিকর্ম্ম না করিলে তাহাতে চাষ-আবাদ ভাল হয় না; অযত্নে যেমন তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ যত্ন করিয়া কাজ করিলে তাহার ফল অনিবার্য্য।

সব জীবনকো কর্ম্ম হয়, অতি প্রচণ্ড জগমাহী।
নর কিন্নর দেবতাদিকে, ছাড়ত কহু নাহি ॥
ব্রহ্মাকো জিহ্নকা রজ দিহ্না, বিশ্ব সৃষ্টিকর্ত্তা জিন বিহ্না।
বিষ্ণুকো পরিপালকো কিহ্না, দশ অবতার রূপ হরি লিহ্না ॥
শিবকো নাশক কিহ্ন জগমাহী, ভিক্ষাসন কপাল কর ম্যাহী।
সূর্য্য নিতহি ভ্রমত গগনমে, তথৈ নিত্যং নমহঁ কর্ম্মণে ॥
দেবনকো সেহ কিহ্ন বস, গন্তি জীব কভু নাহি।
কর্ম্মণকো যো মিটত হয়কো, মর সশ জগমাহী ॥ ১৬৮ ॥

কর্ম্মই সকলের প্রবল নিয়ামক—সকলের পক্ষে কর্ম্মই প্রধান। এই কর্ম্মশক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড রচনা কার্য্যে ব্রহ্মা নিয়োজিত, বিষ্ণু পালনকার্য্যে রত হইয়া সময়ে সময়ে নানা অবতার গ্রহণ করিয়া

থাকেন। এবং অবশেষে সকলের নিধনকার্য্যে কপালগুণে ভিক্ষুক বেশে রুদ্রদেব নিযুক্ত, আকাশপটে আলোক প্রদানের জন্য রবি-শশী নিয়োজিত,—অতএব এই প্রবল কর্ম্মরূপী নারায়ণকে প্রণাম করি। যে কর্ম্মে সুবাসনা রক্ষা করিয়া, সেই সকল ফল হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করে, এরূপকর্ম্মী মানবের কথা আর কি বলিব?

শুনহ ভরত ভাবী প্রবল, বিলখি কহে উ মুনিনাথ।
হানিলাভ জীবন মরণ যশ অপযশ বিধি হাথ ॥ ১৭০ ॥

মহামুনি বশিষ্ঠদেব রাজা ভরতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে রাজন! আমার কথা শ্রবণ কর। আমি সবিশেষ বিচার করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে কর্ম্মই জীবকুলের ভাবী ফলদান করিয়া থাকে। যাহা অদৃষ্টে ঘটিবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে—তাহা অবশ্যই ঘটিবে—কেহই তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। জীবন, মরণ, যশ, অপযশ সকলেই সেই নিয়ন্তার নিয়ম, কর্ম্মফল অনুসারে তিনি সকলকে উহার ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

কর্ম্ম বচন মন ছাড়ি ছল, জন্মলাগি জনম ওদ্ধার।
তব লগি সুখ স্বপনেহু, নহি কিয়ে কোটী উপচার ॥ ১৭১ ॥

মানুষ যতদিন না কপটতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মদ্বারা, মনদ্বারা এবং বাক্যদ্বারা শ্রীভগবানের পদাশ্রয়ে আশ্রয়গ্রহণ না করিবে—ততদিন কোটী কোটী উপায় অবলম্বন করিলেও কোন প্রকার সুখলাভের আশা নাই। ঐরূপ না করিলে ইহকাল ও পরকালের উভয়রূপ সুখ বিনষ্ট হইবে।

পতিপ্রিয় নারী পতিব্রতা, ছাড়ত নহি পতিলেহ।
সেও ত মন বচ কর্ম্মতে, পতিচরণ ন অতি স্নেহ ॥
জয়সে তনু ত্যজি ছায় নহি, প্রভাতজহি নহি ভানু।
চন্দ্র ত্যজহি নহি চন্দ্রিকা, পতিব্রতা তিয় জনু ॥ ১৭২ ॥

পতিব্রতা নারী কায়মনোবাক্যে অকপটে স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, এবং স্বামীপদে একান্তমতি হইয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহারা স্বামীকে একমুহূর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। যেরূপ দেহ ছাড়া ছায়া থাকেনা, সূর্য্য ছাড়া প্রভা থাকে না, চন্দ্র ছাড়া চন্দ্রিকা থাকে না, সেই পতিব্রতা নারী কখন স্বামী ছাড়া থাকিতে পারে না।

সম্ভাবিতজন নিকরকে, অবশ কঠিন ভুবি মাহ।
তাতে কোটী দুঃখ মর্ম্মমহ, মরণ শ্রেষ্ঠ সুর নাহ ॥ ১৭৩ ॥

মাননীয় ব্যক্তিগণের মান নাশ অতীব দুঃখদায়ক—এই দুঃখ তাহাদের হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে—এইজন্য সকলে বলিয়া থাকেন—"যাক প্রাণ থাক মান;—মান না থাকিলে প্রাণ লইয়া ফল কি? মানই ত প্রাণীর পক্ষে প্রাণোপম দ্রব্য—মানক্ষয়ে প্রাণক্ষয় হওয়াও ভাল।

মোহনিশা সব সো অনিহারা।
দেখহি স্বপ্ন অনেক প্রকারা ॥
ইহি জগযামিনী জাগহি যোগী।
পরমারথ পর পঞ্চ বিয়োগী ॥
জানিয়ে তবহি জীব জগজাগা।
যব সব বিষয় বিলাস বিরাগা ॥
হোই বিবেক মোহ ভ্রম ভাগা।
তব রঘুবীর চরণ অনুরাগা ॥ ১৭৪ ॥

ইহ সংসারের জীবগণ মোহঘোরে শয়ন করিয়া নানাপ্রকার সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। আর যোগী বিবেকী ঈশ্বরান্বেষিগণ এই সংসারনিশায় জাগিয়া কাল কাটান। যখন জীবসকল বিষয়বাসনা

পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন—তখন তাহারা সংসারনিশায় জাগিয়া কাল কাটান। এইজন্য যখন মানব হৃদয়ে বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হইয়া মোহজাল বিদূরিত হয়—সেই সময় তাহাদের হৃদয়ে অনুরাগ ও ভক্তির উদয় হয়—অন্য সময় মন ঈশ্বরমুখী হয় না।

স্বপ্নে হোই ভিখারী নৃপ, রঙ্ক লোকপতি হোই।
জাগে লাভ ন নাহি কছু, তিমি প্রবঞ্চজিয় সোই॥ ১৭৫॥

সংসার অনিত্য—ইহার সকলেই ভ্রমমাত্র। স্বপ্নাবস্থায় যেমন ভিখারী ভূপতি হয় এবং ভূপতি ভিখারী সাজেন কিন্তু স্বপ্ন অবসান হইলে যেমন কাহার কোন লাভ বা ক্ষতি হয় না, যিনি যেমন তেমনি থাকেন। সংসারও সেইরূপ জানিবে—ইহার সমস্ত মায়াময় অসত্য।

কেউ না কাহু দুঃখ সুখ করদাতা।
নিজ কৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা॥
যোগ বিয়োগ ভোগ ভালমন্দা।
হিত অনহিত্য মধ্যম ভ্রমকন্দা॥
জন্ম মরণ জহ লাগি জগজালু।
সম্পতি বিপত্তি কর্ম্ম অরু কালু॥
ধরণি ধাম ধন পুর পরিবার।
স্বর্গ নরক জগ লাগি ব্যবহার॥
দেখিয়া শুনিয়া গুনিয় মনমাহী।
মোহমূল পরমারথ নাহী॥ ১৭৬॥

জগতে কেহ কাহাকে সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না। মানব নিজকৃত কর্ম্মফলে এ সমস্ত ভোগ করে। প্রিয়ব্যক্তি সংযোগ বিয়োগ, ভালমন্দ ভোগ, হিতাহিত কর্ম্ম, উদাসীন্য—এ সমস্তই ভ্রম হইতে

উৎপন্ন। জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার, ধন-সম্পত্তি, কার্য্যকাল গৃহাদি, ভূমি, গ্রাম, পরিবার, স্বর্গ, নরক যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায় এবং মনে করা যায়—এ সমস্তই ভ্রমাত্মক—পারমার্থিক সত্য ইহার একটীও নহে।

সহজ সরল সাধুকর বচন, কুমতি কুটীল করি জান।
চলে জোঁক জিমি বক্রগতি, যদ্যপি সলিল সমান॥ ১৭৭॥

সাধু ব্যক্তিগণের বাক্য স্বভাবতই সরল ও সহজ বোধ্য কিন্তু কুটীল ব্যক্তি সে সকল বাক্য কিছুতেই সহজ বলিয়া বোধ করে না। যেমন সলিল সরলভাবে থাকিলেও জোঁকের গতি বক্র হয়—কুটীল লোকের মনও তদ্রূপ।

তৃষিত বারি বিনু জেও তনুত্যাগা।
মুত্র করে কা সুধা তড়াগা॥
কা বর্ষা যব কৃষী সুখানে।
সময় চুকি পুনি কা পুছতানে॥ ১৭৮॥

ঠিক সময়ে কার্য্য করিতে ভুল হইলে যেমন অনুতাপ করিলে কোন ফল হয় না—এবং তাহা সমাধা করাও কঠিন হইয়া পড়ে। পিপাসাতুর ব্যক্তির পিপাসায় দেহত্যাগ হইলে পরে তাহাকে যেমন অমৃত-সাগরে ডুবাইলেও কোন ফল হয় না, বারিবর্ষণ বিনা শস্যাদি ধ্বংস হইলে যেমন পরে জলবর্ষণে কোন উপকার হয় না; সেইরূপ যথাসময়ে কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া অসময়ে কার্য্য সম্পাদনে কোন ফল নাই। এইজন্য যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনে বিস্মৃত হওয়া কাহার উচিত নহে।

মন্ত্র পরম লঘু যাশু বশ, বিধি হরি হর সুব সর্ব্ব।
মহামত্ত গজরাজ কঁহ, রক্ষা করু অঙ্কুশ খর্ব্ব॥ ১৭৯॥

দ্ব্যক্ষর যুক্ত রাম ও কৃষ্ণ মন্ত্র অতি ক্ষুদ্র কিন্তু তাহার দ্বারা

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও বাঁধা রহিয়াছেন—বাস্তবিক ইহা বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন অতি ক্ষুদ্র লৌহের অঙ্কুশ দ্বারা মদমত্ত হস্তী বশীভূত হয়, তখন এই ক্ষুদ্র মন্ত্র দুইটীর দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ যে বশীভূত হইবেন—ইহার আর অশ্চর্য্য কি ?

উদিত উদয়গিরি মঞ্চপর।
রঘুপতি বাল পতঙ্গ ॥
বিকশে সন্ত সরোজ সব।
হেরখে লোচন ভৃঙ্গ ॥ ১৮০ ॥

জনক নন্দিনী জানকীর পরিণয় সভায় শ্রীরাম লক্ষণ দিব্য মঞ্চপরি উপবেশন করিয়াছিলেন। ভক্ত কবি তুলসীদাস সেই শোভা বর্ণনা করিবার ছলে বলিতেছেন—উদয়াচলে সূর্য্য উদয় হইলে যেমন পদ্ম সকল বিকশিত হইয়া বিহার করে এবং তাহার চারিধারে ভ্রমর সকল গুণগুণস্বরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়—সেইরূপ সেই উচ্চমঞ্চের উপরে রামরূপ দেখিয়া ভক্ত সাধুগণ প্রফুল্লানন হওয়ায় তাহাদের প্রফুল্ল নয়ন সকল ভ্রমরের ন্যায় সেই অপরূপ রূপ মাধুরী দেখিবার জন্য বিব্রত হইয়াছিল। ভক্ত কবি নিজকৃত রামায়ণে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রিপু তেজস্বী অকালে অপি, লঘু করি গনিয়ে না তাহু।
অজহু দেত দুখ রবি শশিহিঁ, শির অব শোষিত রাহু ॥ ১৮১ ॥

শত্রুকে যদি একাকী এবং হীনবল দেখ এবং নিজেকে তাহার অপেক্ষা তেজস্বী এবং ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে কর—তথাপি তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। যেমন রাহু অতি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রহণ কালে চন্দ্র-সূর্য্যকেও যন্ত্রণা প্রদান করে। রাহু কত ক্ষুদ্র এবং চন্দ্র-সূর্য্য কত বৃহৎ এবং তেজস্বী তথাপি রাহু সময়ে সময়ে—তাহাদের শত্রু হয়। এজন্য শত্রু ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষার বস্তু নহে।

সুখ হাড় লে ভাগু শঠ,
শ্বান নিরখী মৃগরাজ ॥
ছিনি লেই জিনি জান বড়।
তিমি সুর পতিহি ন লাজ ॥ ১৮২ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বদাই সাম্রাজ্য লোভে ব্যস্ত—এইজন্য তুলসীদাস বলিতেছেন—কেহ যদি কখন তপস্যা করিতে অগ্রসর হয়—ইন্দ্র অমনি মনে বুঝেন সেই তপস্বী তাঁহারই ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য তপস্যা করিতেছে। এইভয়ে তিনি সেই তপস্বীর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তপস্বীরা যে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বকে কাকবিষ্টার ন্যায় জ্ঞান করে—তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যেমন একটা কুকুর সিংহ দর্শনে ভীত চিত্ত হইয়া আপনার মুখের শুষ্ক মাংস লইয়া পলায়ণ করে—মনে করে, বুঝি সে তাহার মুখের এই মাংস কাড়িয়া লইবে। বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়ের জন্য এইরূপই করিয়া থাকে—বিষয় ছাড়া তাহারা আর কিছুই চায় না—কিন্তু যাহারা ভগবানে চিত্ত দৃঢ় করিয়াছে, তাহারা কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাহ্য করে?

ইহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহই।
যদপি অসত্য দেত দুঃখ অহই ॥
যো স্বপনে শির কাটে কোই।
বিনু জাগে দুঃখ দুর ন হোই ॥
যাসু কৃপা অস ভ্রম মিটায়াই।
গিরিজা সোই কৃপালু রঘুরাই ॥
আদি অন্ত কোউ যাসুন পাভা।
মতি অনুমান নিগম আস গাভা ॥ ১৮৩ ॥

ভগবানের সত্যতা লইয়াই এই জগতের সত্যতা উপলব্ধি হয়,

তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই চরাচর অবস্থিত। যদি এই জগৎ অসত্য এবং দুঃখদায়ক হয়। যেমন স্বপ্নাবস্থায় কেহ কাহার মাথা কাটিলে তাহার কষ্ট হয়, কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সে দুঃখ আর থাকে না। সেইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে জগৎ সম্বন্ধে জীবের সকল ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। ভগবানের কৃপা না হইলে জীবের এই জ্ঞানলাভ হয় না—তিনি কৃপা করিয়া জ্ঞানদান করিলে তখন স্বপ্ন দূর হয়—জাগরণ আসিয়া জীবকে জ্ঞানী করে এবং সেইসময় সে সংসার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ভগবানের আদি অন্ত কেহই নিরাকরণ করিতে পারে না, তবে সসীম মানব নিজের বুদ্ধি অনুসারে সেই অসীমের একটা রূপ নিদ্ধারণ করে মাত্র।

রজত সীপ পল ভাষয়িশি যথা ভানু করবারি।
যদপি মৃষা তিহুঁ কাল, সোই ভ্রমণ সকে কোউটারি॥ ১৮৪॥

শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম, সূর্য্য কিরণে বা মরুভূমে যেমন জলভ্রান্তি—ইহা যেমন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিরদিন চলিয়া আসিতেছে; মিথ্যা হইলেও যেমন তাহা নিরাকরণে কেহ সমর্থ হয় না, সেইরূপ এই জগৎ বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও ভ্রম বশত সকলেই সত্য বলিয়া মনে করে।

জগত প্রকাশ্য প্রকাশক রামু, মায়াধীস জ্ঞান গুণধামু।
যাসু সত্যতাতে জড় মায়া, ভাস সত্য ইব মোহসহায়া॥ ১৮৫॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই এই জগৎ প্রপঞ্চের প্রকাশক—তাঁহারই মায়ায় এই জগৎ প্রকাশ হইয়াছে; তাঁহারই আদেশে মহামায়া এই জগত কার্য্য পরিচালনায় ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। সেই রামচন্দ্র জ্ঞানস্বরূপ, সত্যাদি গুণ সমূহের আশ্রয়—তাহারই সত্যতায় এই মিথ্যাময় জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

বিবসহঁ জাসু নাম নরক রহীঁ,
জন্ম অনেক সঞ্চিত অঘ দহহীঁ।
সাদর সুমিরণ যো নর করহীঁ,
ভববারিধি গোপদ ইব তরহীঁ ॥১৮৬॥

অনিচ্ছা বশে রামনাম উচ্চারণ করিলেও যখন বহু জন্মার্জ্জিত পাপরাশির ধ্বংস হয়—তখন যে ব্যক্তি পরমানন্দে সেই রামনাম উচ্চারণ করিবে—সে যে এই ভব জলধী গোষ্পদের ন্যায় অবহেলে উত্তীর্ণ হইবে—তার আর বিচিত্র কি?

রামনাম কর অমিত প্রভাবা।
সন্ত পুরাণ উপনিষৎ গাওয়া ॥
সন্তত জপত শম্ভূ অবিনাশী।
শিব ভগবান-জ্ঞান গুণরাশি ॥
আকরচারী জীবজগ অহ হাঁ।
কাশী মরত পরমপদ লহ হাঁ ॥ ১৮৭ ॥

সকল সাধুগণ, পুরাণ, বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে রামনামের প্রবল প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। অবিনাশী শিবশম্ভু এই নামের গুণকীর্ত্তন করিয়া সকল গুণের আধারস্বরূপ হইয়াছেন। ৺কাশীধামে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ যে কোনপ্রকার জীবই পঞ্চপ্রাপ্ত হউক না কেন, শিব তাহার কর্ণে এই তারকব্রহ্ম রামনাম শুনাইয়া দেন—তাহাতেই জীব মোক্ষপদপ্রাপ্ত হয়।

কুপথ কুতর্ক, কুচালি, কপটদম্ভ পাষণ্ড।
দহন রাম গুণগ্রাম ইমি ইন্ধন অনল প্রচণ্ড ॥ ১৮৮ ॥

কলিকালের মানব অতীব অনাচারী, দাম্ভিক, কপট, পাষণ্ড, সুপথ ছাড়িয়া তাহারা অহরহ কুপথে গমন করে। কিন্তু তাহারা

এত কুকর্ম্ম করিয়াও যদি প্রাণ ভরিয়া রামনাম উচ্চারণ করে—তাহা হইলে অগ্নিতে যেমন শুষ্ককাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়—তাহাদের পাপও তদ্রূপ এই রামনাম আগুণে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই :

ব্রহ্মরামতে নাম বড় বরদায়ক বরদানী।
রামচরিত শতকোটী মহলিয় মহেশজীয় জানি ॥ ১৮৯ ॥

ব্রহ্ম হইতে রামনাম বড় এবং বরাভয় প্রদায়ক, এইজন্য ভগবান সদাশিব শতকোটী রামায়ণ অপেক্ষাও রামনামের মহিমা বড় বলিয়া পঞ্চমুখে গান করিয়া থাকেন।

রাম এক তাপস তিয়তারী।
নাম কোটী খল কুমতি সুধারী॥
ভঞ্জেউ রাম আপ ভববাপু।
ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপু॥
নিশিচর নিকর-দলে রঘুনন্দন
নাম সকল কলিকলুষ নিকন্দন।
নামলেত ভবসিন্ধু সুখাহীঁ।
করহুঁ সুজন বিচারী মনমাহি।। ১৯০

ভগবান রামচন্দ্র পদধূলি দান করিয়া তাপস প্রবর গোতমের পত্নী পাষাণময়ী অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামনাম অনেক কুকর্ম্মী জীবকেও দুষ্পার সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছে। তিনি শিব-ধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন—তাঁহার নামে জীবের ভব বন্ধনমোচন হয়; রামচন্দ্র রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন—তাঁহার নাম করিলে যাবতীয় পাপনাশ হইয়া থাকে। ভগবান রামচন্দ্র যদিও অনেক বানর কটক সহায় করিয়া সাগর বন্ধন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নাম

করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ এই দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়।

(তুলসীকৃত রামায়ণ)

নিগুর্ণেতে হই ভাতি বর্ত্তনাম প্রভাব অপার।

কহউ নাম বড় রামতে নিজ বিচার অনুসার। ১৯১ ॥

রামনামের প্রভাব অত্যন্ত অধিক, এবং তাহা নিগুর্ণ ব্রহ্ম হইতেও বড়, সাধককবি তুলসীদাস ইহা নিজকৃত রামায়ণে বহু বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন।

গ্রহভেখজ জল পত্তন, পট পাই কুযোগ সুযোগ।

হোই কুবস্তু সুবস্তু জগ, দেখহিঁ সুলক্ষণ লোগ। ১৯২।

কুসংসর্গে সুও কু হয়। পাপগ্রহের সংসর্গে সুগ্রহও পাপগ্রহ হয়, ভাল ঔষধও কু-দ্রব্যের সংযোগে গুণহীন হইয়া উঠে, কুবস্তুর মিলনে ভাল জলও নিন্দনীয় হয়, আবার ভালবস্তুর মিলনে ভাল হয় কাপড় উৎকৃষ্ট বর্ণে রঞ্জিত হইলে উত্তম হয়—নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত মিলিত হইলে তাহা একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে—বাতাসও ঐরূপ হইয়া থাকে

জড় চেতন গুণ দোষময়, বিশ্ব কিছু করতায়।

সন্ত হংস গুণ গহহি পয়, পরিহরি বারি বিকার ॥ ১৯৩ ॥

এই জগতে জীবমাত্রেই দোষ-গুণযুক্ত কিন্তু রাজহংস যেমন জলীয় অংশ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধের সারভাগটুকু গ্রহণ করে। সাধু-গণও তেমনি জীবগণের অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সারভাগ যে গুণ, তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অতি মঙ্গলময় জানিয়ে সাধুসমূহ সমাজ।

জয়সে জগকে বীচমে তীরথ তীরথরাজ ॥

রামভক্তি যঁহ স্বর্ধুনী বাণী ব্রহ্ম বিচার।

বিধি নিষেধময় কলিমলহরণী যমুনা কর্ম্মপ্রচার ॥

জ্ঞান অক্ষয় বট সুভগজন অচল ধর্ম্ম বিশ্বাস।
পরহিতকারী সাধু জন অটল ভক্তি নির্য্যাস।।
শুনি সমুঝহি জনমুদিত মন মজ্জহি অনুরাগ
লাহহিঁ চারিফল আচ্ছ তনু সাধু সমাজ প্রয়াগ।। ১৯৪ ।।

সাধু সমাজ অতি মঙ্গলময় জানিবে, যেমন জগৎ মধ্যে তীর্থরাজ বর্ত্তমান—উহাও সেইরূপ। রামভক্তিই সাধু সমাজের গঙ্গাধারা ব্রহ্ম-বিচার, সরস্বতী এবং নিষ্কাম কর্ম্মকাণ্ডের কথাই যমুনা নামে অভিহিত, এবং সাধুগণের বিচাররূপ অমর বৃক্ষই অক্ষয়-বটস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই সাধুসমাজে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে হরিকথা শ্রবণ করিয়া দৃঢ়চিত্তে তাহাতে নিমগ্ন হয়—তাহাই প্রয়াগক্ষেত্রের স্নান বলিয়া মনে করিবে। মানুষ প্রয়াগে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের আশায় ছুটাছুটী করে কিন্তু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিলেই যে ঐ ফললাভ হইয়া থাকে। এইজন্য ভক্ত সাধক তুলসীদাস বলিতেছেন—সাধুসমাজ প্রয়াগ তীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

কাম আদি মদ দম্ভ নহি যাক উরমে আই।
যত নিরন্তর হোত হয় বসতাকে রঘুরাই।। ১৯৫ ।।

যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে কামাদি বাসনা, মদ, অহঙ্কার প্রভৃতির উদয় না হইয়া চিত্ত অহরহঃ জগদীশ্বরের অনুরাগী থাকে; তাহার নিকট ভগবান সদা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার হিত সাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রবণাদি নবভক্তি তব উপজত হয় উর আই।
হরলীলা রতি হোত হয়, ভক্ত সঙ্গ মন ভাই।। ১৯৬ ।।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ বদ্ধমূল হইলে চিত্তে স্বভাবতই নবধা-ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। তাহাতে ভগবানে বিশ্বাস অটল হয়

এবং সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে বাস করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। নবধাভক্তি যথা—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণু চিন্তয়া, পাদসেবনং অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং।

সাধন ভক্তিকে শুনহুঁ অব কহোঁ বখানি বিধান।
প্রথম বিপ্রগুরু সন্ত রতি স্বীয় ধর্ম্ম বিধি মান ॥
তাতে যব্ জন জানিএ উপজে বিষয়-বিরাগ।
তব্ হরিচরণ কমলপর উপজত হয় অনুরাগ ॥ ১৯৭ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—সাধন ভক্তির গুণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর—প্রথমে ব্রাহ্মণ, গুরু এবং সাধু ব্যক্তি প্রতি অনুরাগ দেখাইবে, তারপর আপনার আশ্রমোচিত বেদবিহীত ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করতঃ যখন হৃদয়ে বিষয় বৈরাগ্যের উদয় হইবে—তখন বুঝিতে হইবে—হরি পাদপদ্মে রতিমতি স্থির হইয়াছে।

সন্ত সঙ্গতে হোত হয় ভক্তি মুক্তিকর মূল।
তাহি সুলভ বারি মানিয়ে মিলে যা সাধু অনুকুল ॥ ১৯৮ ॥

"সকলের মূল ভক্তি মুক্তি হয় মন তার দাসী," সাধুসঙ্গ হইতেই ভক্তি ভাব জাগিয়া উঠে। প্রথমে সাধুসঙ্গ করিলে তাহাদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়, তারপর তাঁহাদের কার্য্যে শ্রদ্ধা জন্মিলে ভগবানে অনুরাগ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য সাধুসঙ্গই হরিভক্তিলাভের একমাত্র উপায় জানিবে।

ঈশ ভক্তিতে হোত হয় সুলভ জ্ঞান বিজ্ঞান।
ভক্তি মহৎগুণ ধরত হয়, অনুপম সুখ সুনিদান ॥ ১৯৯ ॥

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হইলেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকে, ভক্তি মহদ্গুণ ধারণ করিলে তাহাই জীবের সুখের নিদান হইয়া থাকে।

জাতে বেগি প্রভু দ্রবত হঁয় সো প্রভূভক্তি প্রভাউ।
ভক্তি স্বতন্ত্র করি জানিয়ে অবলম্বন নহি কাউ॥ ২০০॥

যাহাতে অতি সত্বর ভগবানের দয়া লাভ করিতে পারা যায়—সে উপায় ভক্তি ভিন্ন আর কিছুতে নাই। ভক্তিবলে ভগবান দ্রবীভূত হন এবং ভক্তকে কৃপা করিয়া থাকেন; ভক্তি এক স্বতন্ত্র জিনিষ—ভক্তি ভিন্ন মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।

বিরতি ধর্ম্মেতে হোত হয় জ্ঞানযোগেতে হোয়।
মোক্ষ জ্ঞানেতে হোত হয় বেদ প্রমাণ ন গোয়॥ ২০১॥

যাবতীয় কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করত জ্ঞানযোগ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসার-বিরাগ জন্মে এবং তাহা হইতে তত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, ইহা কেবল মুখের কথা নহে—বেদবাক্য।

মায়া ঈশন আপু কহঁ জানি কহে সেহ জীব।
বন্ধ মোক্ষপ্রদ সর্ব্বপর মানা প্রেরক শিব॥ ২০২॥

যে ব্যক্তি মায়া, ঈশ্বর ও আপনাকে জানিতে পারিয়াছে—তাহাকে জীব বলে। মায়া-বন্ধন ছিন্নকারী মোক্ষপদপ্রার্থী পুরুষই ঈশ্বর-স্বরূপ।

গো গোচর জহঁলগি মন যাই।
সো সব মায়া জানহুঁ ভাই॥
তেহিকর ভেদ শুনহুঁ তুম্ সোউ।
বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ॥
এক কষ্ট অতিশয় দুঃখরূপা।
সা বশ জীব পরাভব কুপা॥
এক রচয় জগ গুণ বশ যাকে।
প্রভু প্রেরিত নহি নিজ বল তাকে॥

জ্ঞানমান জহঁ একো নাহি।
দেখত ব্রহ্মরূপ সব মাহী ॥
কহিয়ে তাতে সো পরম বিরাগী।
তৃণময় সিদ্ধি তিনগুণ ত্যাগী ॥ ২০৩ ॥

শব্দও তাহার বিষয়ীভূত বস্তুকেই মায়া বলে। ঐ মায়ার মাত্রা ভেদে নামভেদ হইয়াছে—একবিদ্যা অপর অবিদ্যা, অবিদ্যা দুঃখের নিদান—জীব ঐ অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া কূপপতিতের ন্যায় অন্ধ হইয়া থাকে; ঐ অবিদ্যা এই জগৎকে আপনার বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু জীবগণ যদি ঈশ্বরকৃপায় একবার উহার মায়াপাশ ছেদন করিয়া বিদ্যার আশ্রয়গ্রহণ করে—তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মান-অভিমান ও বিষয়জ্ঞান দূরে ফেলিয়া সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সত্বা উপলব্ধি করিয়া থাকে। যোগীগণ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করত কামনাবিহীনচিত্তে প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্মদর্শণ করিয়া ধন্য হন।

ময় অরু মোর তোর তঁয় মায়া কহিয়ে তাহি।
মোহ বিনা কিহো জীব সব ভ্রমত চরাচর মাহি ॥ ২০৪ ॥

জাগতিক বস্তুতে আমি—আমার ইত্যাদি জ্ঞানই মায়ার কারণ, যাবতীয় জীব এই মায়ার বশে বশীভূত হইয়া জগতে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সচীব বৈদ্য গুরু তিন যো প্রিয় বোলহিঁ ভয় আশা।
রাজধর্ম্ম তন তিনকর হোই কাহিঁ নাশা ॥ ২০৫ ॥

মন্ত্রী, বৈদ্য ও গুরু এই তিনজনই রাজধর্ম্মের স্বরূপধারী—যাহারা এই তিনজনের প্রতি ভীত না হইয়া বিরুদ্ধ উপদেশ প্রদান করেন, তাহারা রাজ্যধ্বংসকারী বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত জানিবে।

তবত স্বর্গ অপবর্গ সুখধরী তুলা এক অঙ্গ।

তুলয়ন তাহি সকল মিলি যো সুখ নর সৎসঙ্গ ॥ ২০৬ ॥

তুলাদণ্ডের একদিকে স্বর্গ ও অপবর্গ আর একদিকে সৎসঙ্গ দিয়া যদি ওজন করা যায়—তাহা হইলে সৎসঙ্গ ভারি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইবে। অতএব সৎসঙ্গের সুখ অতুলনীয়।

জনপদহিত করহিঁ যো ভূপতি কোন সোহায়।

নরপতি হিত করহিঁ যো নিন্দহি নরগণ তায় ॥

দোনোকো হিত করহিঁ যো, মুন্ত্রীবর গুণমান।

অযশে সচিবন মিলহি, জগ দুর্ল্লভ করিসো মান্ ॥ ২০৭ ॥

যে মন্ত্রী প্রজাবর্গের হিতসাধন করিয়া থাকেন—তিনি রাজার অপ্রিয় হইয়া থাকেন—কারণ প্রজাপীড়ন না করিলে ধনলাভ হয় কই? আবার প্রজাপীড়ন করিলেও মন্ত্রী প্রজাগণের বিষনয়নে পড়েন কিন্তু যে মন্ত্রী এই উভয়ের হিতকর কার্য্য করিতে পারেন—তিনিই যশস্বী হন কিন্তু এমন মন্ত্রী পাওয়া কঠিন।

বিনা মাঙ্গে যশ হোত হয়, দুঃখ জগত নরমাহি।

তথা হোত হয় সুখ নরনকো, আপ দৈববল তাহি ॥ ২০৮ ॥

রাত্রি-দিবা যেমন পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত করে—যেমন তাহাদের উপাসনা করিতে হয় না—সেইরূপ কেহ দুঃখকে প্রার্থনা করে না কিন্তু সে আপনা হইতে আসে, সুখও সেইরূপ প্রার্থনা করিলেই পাওয়া যায় না—যখন আসিবার সময় হয়—আপনি আসে। এইজন্য মানিতে হইবে—ইহাদের প্রেরণকর্ত্তা নিশ্চয়ই কোন দেবতা আছেন।

জয়সে রবিকর তুল্যতা, নীচোত্তম জগমাহি।

পেচক সো কর গহত নহী, বিচরত নিশিত মমাহি ॥

তয়সে নীচ গুণ গহত নহি, যদ্যপি পাত সমীপ।

যো উত্তম সো নহত হয়, সদ্‌গুণ পায় সমীপ ॥ ২০৯ ॥

সূর্য্যের কিরণ যেমন ছোট বড় মানে না—সর্ব্বত্রই সমানভাবে পড়িয়া থাকে—এবং ঐ কিরণ দ্বারা জীবগণ সুখী হয় কিন্তু পেচকেরা উহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকারে গমন করে। সেইরূপ নীচ লোকসকল নিকটে সদ্‌গুণ পাইলেও পেচকের মত তাহা গ্রহণ করে না কিন্তু উত্তম ব্যক্তিগণ তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়।

জয়সে জব সরবীচমে রহত ভেক অরু ভৃঙ্গ।

ভেক ন পায়ে ভেদ কছু, ভৃঙ্গ পিওত সারঙ্গ ॥

যদ্যপি সাধু অসাধুজন, রহত একহী ঠাঁই।

সজ্জন গহত সারাংশতম নীচ গহত কছু নাহিঁ ॥ ২১০ ॥

যেমন ভেক ও ভৃঙ্গ সরোবরের কাছেই থাকে; অথচ কমলের মধু কেবল ভৃঙ্গই পান করে—ভেক পান করেনা, সেইরূপ সাধু-অসাধু একত্র থাকিলেও সাধু সকলের সারভাগ গ্রহণ করে—অসাধু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

গজমুক্ত বনমাঝে মহ দেখি কোলকে নারি।

শুভ্র কঠিন তম পেখিকে, দিহু দূরমে ডারি ॥

তয়সে নীচ গৃহ জায়তে, শান্ত নিরাদর হোয়।

সন্তনকে গুণ নীচ নরকা, জানে প্রভু কোয় ॥ ২১১ ॥

কিরাত রমণীগণ বনমাঝে গজমুক্ত পতিত দেখিলে যেমন তাহার আদর করে না, শুভ্র কঠিনতম পদার্থ বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, তাহারা চিনিতেও পারে না যে ইহা অতি মূল্যবান দ্রব্য। সেইরূপ ভাল লোক নীচ লোকের গৃহে যাইলেও তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়া থাকে—তাহাকে কেহ চিনিতে না পারায় অতি হেয়

জ্ঞান করে, এইজন্য হীন ব্যক্তির নিকট সাধুজনের গমন করা উচিত নহে।

মমতা তিমির তরুণ আধিয়ারী।
রাগ দ্বেশ উলুক খুখকারী ॥
তব্ লাগী বসত জীব উরমাহী।
যব্ লাগি প্রভু প্রতাপ রবি নাহি ॥ ২১২ ॥

যতদিন মানুষের হৃদয়ে হরিভক্তি-যোগ দ্বারা হরির প্রভাবরূপ তপন উদয় না হয়—ততদিন তাহাদের হৃদয় মমতারূপ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে—এবং সেই অন্ধকার রূপ রজনীতে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি পেচকগণ সাদানন্দ মনে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকে।

ঘোর বিপিন মহ দেখি খল, পুছহি পথিক চকাই।
কাহে বসহুঁ বনমাঝ তুম, কহহু মোহি সমুঝাই ॥
খল কহে মোর দেহ কো, লোম বাঘ যব খাই।
স্বাদু জানি তব ভঁখহি সব, জগকে নর সমুদাই ॥
সবকে অনহিত কারণ হম, বসহি ঘোর বনমাহি।
করি নিজ হানি করহি খল, পরকে বুরা সদাহি ॥ ২১৩ ॥

কোন বনমাঝে একজন দুরন্ত খল ব্যক্তিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—মহাশয়! আপনি এই নিবিড় ব্যাঘ্র সঙ্কুল বনে একাকী অবস্থান করিতেছেন কেন? তখন সেই খল ব্যক্তি বলিল—আমার স্বভাব অত্যন্ত ক্রুর—সর্ব্বদা পরের মন্দ চেষ্টা করি—সেইজন্য নিবিড় বনমধ্যে দাঁড়াইয়া ব্যাঘ্রের মুখে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি, কারণ তাহা হইলে বাঘ নরমাংসের আস্বাদ পাইয়া সমস্ত মানুষকে ভক্ষণ করিবে। ইহাতে পথিক বুঝিল—যে খলেরা নিজের অনিষ্ট করিয়াও পরকে জব্দ করিতে চেষ্টা করে।

যাহা সুমতি তাঁহা জানিয়ে সম্পত্তি আপুহি আই।

যাহা কুমতি তাহা জানিয়ে, বিপত্তি হোত সদাই ॥ ২১৪

যেখানে সুমতি—সেখানে ধন সম্পত্তি আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—আর যেখানে কুমতি থাকে—সেখানে অনবরত বিপৎপাতই হইয়া থাকে।

যাকো মান গুমান হয়, মানীমানে সোই।

মানহীন জন মানকো কা, জানে প্রভু কোই ॥

শিবধৃত মস্তক চন্দ্রমা, গ্রাসে রাহু অজ্ঞান।

নীচ নীচতা গহত হয়, লঘু গুরুতা নহি ভান ॥ ২১৫ ॥

যাহার মান আছে—সেই মানীর মান বুঝে—যাহার তাহা নাই—সে কেমন করিয়া বুঝিবে? মহাদেব চন্দ্রকে কপালে ধারণ করেন—কিন্তু রাহু তাহাকে গ্রাস করে। রাহু অসুর জাতি,—তাহার নিজের কোন মান নাই—সেইজন্য সে কাহারও মান রাখিতে জানে না, চন্দ্রের মান সে কি জানিবে?

যাই নিকট পহি চানিতরু, ছাঁহ শমন সব শোচ।

মাঁগত অভিমত পাত ফল, রাউরঙ্ক ভল পোচ ॥ ২১৬ ॥

সাধুগণের কাছে গেলে রাজারও যেমন আদর, দীন দরিদ্রেরও তেমনি আদর; তাঁহারা কাহাকেও ভিন্নভাবে দেখেন না, যেমন বৃক্ষ সকলকেই সমানভাবে আদর করে—ফল-ছায়া প্রদান করে—কাহাকেও ভিন্নভাবে ভাবে না।

গ্রহ গ্রাসিত পুনি বাতবশ তেহি পুনি বীছি সার।

তাহি পিয়ায়ে বারুণী কহহু কৌন উপচার ॥ ২১৭ ॥

যে লোক গ্রহদোষ দূষিত অথবা পাগল এবং বৃশ্চিক দংশনে কাতর হইয়াছে; তাহাকে পুনর্ব্বার মদ খাওয়াইলে ফল কি?

এই সংসার মদমত্ত জীবগণের পক্ষে রাজ্য, ধন বিদ্যাদি এবং মদ্যপান করা কি অনিষ্টকর নহে? এসকলই বিষম অনিষ্টকর।

কারণতে কারজ কঠিন বিদিত বিশ্ব হই সোরে।

কুলিশ অস্থিতে উপলতে লোহ করাল কঠোরে॥ ২১৮ ॥

কারণ অপেক্ষা কার্য্য কঠিন—ইহা সকলেই জানে। যেমন বজ্রের কারণ অস্থি, বজ্র অস্থির কার্য্য কিন্তু এই বজ্র অস্থি অপেক্ষা কত কঠিন, আর প্রস্তর লৌহের কারণ, লৌহ তাহার কার্য্য—ইহা প্রস্তর অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন। এই বিশ্বসংসার ভগবানের কার্য্য এবং তিনিই ইহার কারণ হইলেও—ঈশ্বর হইতে এই সংসার বড় কঠিন—ইহার হাত এড়ান বড় সহজ কথা নহে।

রোগী শরীর মে ভোগ বহুবাদী করিকে জান।

বিনু হরিভক্তি যোগজপ বাদী কিয়ে নুষ্ঠান॥ ২১৯ ॥

যেমন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দেহে নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ কেবল কষ্টের কারণ, সেইরূপ মানব হৃদয় ভক্তি-বিহীন হইলে যোগ-যাগ জপ-তপ কিছুই সুফলদায়ক নহে—তাহাতে কেবল কষ্টই লাভ হয়—ইষ্টসিদ্ধি হয় না।

বাদী বসন বিনু ভূষণ বিদিত সকল সংসার।

বাদী বিরতি বিনু মানিয়ে নির্গুণ ব্রহ্ম বিচার॥ ২২০ ॥

কাপড় পরিধান না করিয়া যেমন বহুমূল্য অলঙ্কার পরিধান করিলে তাহার কোন শোভা হয় না, বরং অশোভাই হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে মন অভিনিবিষ্ট হইলে—আশ্রম ধর্ম্মে মন আর তত মজিতে চায় না—কিন্তু বৈরাগ্য না জন্মিলে বিষয়-বাসনা বলবতী থাকে—সুতরাং স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সে সময় ব্রহ্ম বস্তুর অন্বেষণ করিলে—তাহার দ্বারা নরকের দ্বারা মুক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না।

ধনী হোয় দাতা নহি তপন করে অতিরঙ্ক।

শিলা বান্ধি পর ডারিয়ে উদধি বীচ নিঃশঙ্ক ॥ ২২১ ॥

যে ব্যক্তি ধনবান হইয়া দানশীল না হয়—যক্ষের মত কেবল ধন রক্ষা করে, আর যে ব্যক্তি গরীব হইয়াও সংসার সুখে সুখী না হইয়া অশেষ যন্ত্রণাভোগ করে, অথচ তাহা পাইবার জন্য তপস্যা করে না—ইহাদের দুইজনকেই গলায় পাথর বাঁধিয়া সাগরে ডুবাইয়া দেওয়া উচিত। ইহার অর্থ এই যে কৃপণ ধনীর এবং তপস্যা বিহীন দরিদ্র-জীবন কোনও কাজের নহে।

ইচ্ছাচারী কুটিল অতি কলহ কারিণী যোই।

সোতির শোচনীয় অতি পতি বঞ্চক যো হোই ॥ ২২২ ॥

যে স্ত্রীলোক স্বামী সোহাগ অবহেলা করিয়া পরের সহিত আসক্তা এবং কুটিলা ও কলহপ্রিয়া হয়—সে নারী সমাজে অতীব নিন্দনীয়া হইয়া থাকে; তাহার কারণ স্ত্রীজাতি কখনই স্বাধীন হইতে পারে না, বাল্যে পিতামাতার অধীনা, যৌবনে স্বামীর অধীনা এবং বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন হইয়া তাহাদের থাকিতেই হইবে।

দ্বিজ অপমানী শূদ্রগণ জ্ঞান গুমানী যোই।

শোচনীয় যো সর্ব্বদা মুখর মান প্রিয় হোই ॥ ২২৩ ॥

শূদ্র হইয়া যে ব্রাহ্মণের অপমান করে—সে জ্ঞানী, গুণী এবং মানী হইলেও সর্ব্বদা নিন্দনীয়।

নীতি হীন নৃপ শোচিয়ে প্রজাপাল মতীহীন।

বেদ বিহীন দ্বিজ শোচিয়ে কুমতি কু কারজ লীন ॥ ২২৪ ॥

যে রাজা রাজনীতি জানেন না এবং প্রজা পালনে অক্ষম হইয়া কেবল কুবুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করেন—তিনি লোক সমাজে যেমন

অতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদজ্ঞানহীন—কুকার্য্যে রত ব্রাহ্মণগণও সমাজে হেয় হইয়া থাকেন।

শোচিয়ে গৃহী যো মোহবশ করে ধর্ম্মপথ ত্যাগ।
শোচিয়ে যোতি প্রপঞ্চরত বিগত বিবেক বিরাগ॥ ২২৫ ॥

সংসারীর সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করা উচিত কিন্তু যে তাহা না করে—অজ্ঞানবশত যে তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া—কেবল বৃথা কাজে মত্ত থাকে। সে সকলের নিকট নিন্দনীয় হইয়া থাকে। কারণ কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং স্বধর্ম্মাচরণ না করিলে গৃহীকে অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। আর সন্ন্যাসী সকল সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া—সন্ন্যাসী হইয়া যদি তাহার আশ্রোমোচিত কার্য্য না করিয়া পুনরায় সংসারের কাজে মত্ত হয়—সে সন্ন্যাসীও নিন্দনীয়। কারণ সে ইতোনষ্ট ততো ভ্রষ্ট হইয়া কাহারও নিকট আদর পায় না—পরকাল নষ্ট করে এবং ভ্রষ্টাচারী হইয়া অবশেষে সে নরক যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে।

মেরা মুজকো কুছ নহি, যো কুছ হৈং সো তোর।
তোরা তুজকো সোঁপতা, ক্যা লাগে হৈ মোর॥ ২২৬ ॥

হে দীনবন্ধো! এ জগতে আমার কিছুই নাই—এই চরাচরে যাহা কিছু বিদ্যমান—এ সমস্তই তোমার—তোমারই দ্রব্য তোমাকে প্রদান করিব—ইহাতে আমার কষ্ট কি প্রভু!

সাহিব তুম ন বিসারিয়ে লাখ লোগ মিলি জাঁহি।
হম্‌সে তুম্‌কো বহু হৈ তুমসে হামকো নাহি॥ ২২৭ ॥

হে ভক্তাধীন—হে জগন্নাথ প্রভু! তুমি এ দাসকে ভুলিও না, ঠাকুর! তোমার অনেক ভক্ত আছে—কোটী কোটী ব্যক্তি তোমাকে ডাকিতেছে—তোমার চারিদিকে কত ভক্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু হে অনাথতারণ! তোমা ব্যতীত আমার যে আর কেহ নাই—আমি

যে আর তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না। অতএব আমাকে ভুলো না দয়াময়!

প্রকৃতি মিলে মন মিলত হৈ, অন্‌মিলতে ন মিলায়।
দুধ দহীতে জমত হৈ, কাঁজীতে ফট যায়॥ ২২৮॥

উভয়ের সমান স্বভাব হইলেই মিলন সংঘটন হয়—নতুবা হয় না—যেমন দধীর সহিত দুধ দিলে তাহা মিলিয়া দধী হইয়া যায়, কিন্তু কাঁজির সহিত মিলাইলে মিলে না—কাটীয়া ছানা হইয়া যায়।

উত্তম বিত্থা লিজিয়ে যত্তপি নীচ পৈ হোয়।
পরো অপায়ন ঠৌরমে, কংচন তজতন কোয়॥ ২২৯॥

উত্তম শিক্ষালাভ নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও করা উচিত—কেননা সোণা অপবিত্র স্থলে পতিত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা ভাল নহে।

সজ্জন কৌ দুখহ দিয়ে, দুরজন পুরে আশ।
জৈসে চন্দন কোঁ ঘিসে, সুন্দর দেত সুবাস॥ ২৩০॥

সজ্জনকে কষ্ট দিয়া দুর্জ্জন ব্যক্তি আপনাদের সুখের আশা পূর্ণ করিয়া থাকে, যেমন চন্দন কাষ্টকে ঘর্ষণ করিয়া লোকে সুন্দর সুবাস গ্রহণ করে।

খুদনতো ধরণী সহে, কাঠ সহে বনরায়।
কুবচন তো সাধু সহে, ঔ তেঁ সহো ন যায়॥ ২৩১॥

পৃথিবী যেমন খনন কষ্টসহ্য করে, ছেদনকষ্ট যেমন বনরাজী সহ্য করে; সেইরূপ কু-বচন সাধুব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ সহ্য করিতে পারে না।

ঐসী বাণী বলিয়ে, মনকা আপা খোয়।
ঔরস কো শীতল করে, আপৌ শীতল হোয়॥ ২৩২॥

যেরূপ সুন্দর বাক্য দ্বারা নিজের এবং পরের হৃদয় সুশীতল করা যায়, অতএব মনের মালিন্য বিসর্জ্জন দিয়া ঐরূপ বাক্য প্রয়োগে ধন্য হইবে।

যো তুকুঁ কাঁটা বুয়ে, তাকি যোই তু ফুল।
তো কোঁ ফুলকে ফুল হৈ, তাকোঁ হৈ তিরশূল ॥ ২৩৩ ॥

তোমার জন্য যে কণ্টক বপন করিবে, তুমি তাহার প্রতি ফুলের মত ব্যবহার করিবে; তাহা হইলে কণ্টক বপনকারীর পক্ষে তোমার ঐ ব্যবহার ত্রিশূল স্বরূপ বোধ হইবে।

সাঁচ বরাবর তপ নহী হৈ, ঝুট বরোবর পাপ।
জাকো হিরদৈ সাঁচ হৈ, তাকো হিরদৈ আপ ॥ ২৩৪ ॥

সত্যের মতন তপস্যা আর অসত্যের মত পাপ আর নাই; যাহার হৃদয়ে সত্য বর্ত্তমান আছে, তাহার হৃদয়ে ভগবানের আসন পাতা রহিয়াছে জানিবে।

জহঁ দয়া, তহঁ ধর্ম্মহৈ, লোভ জাহাঁ হৈ পাপ।
জাহাঁ ক্রোধ তাহাঁ কলি হৈ, জাহাঁ ছমা তহাঁ আপ্ ॥ ২৩৫ ॥

যেখানে দয়া সেইখানে ধর্ম্ম বিরাজিত, যেথানে লোভ সেই-খানে পাপের আসন বিস্তৃত; সেখানে ক্রোধ সেইখানেই নাশ অবশ্যম্ভাবী আর যেখানে ক্ষমা, সেইখানেই ভগবান সদা সর্ব্বদা বিরাজ করেন।

যাহ ঘটী চিন্তা সই মনুয়াঁ তে তরন্নাই।
জিন্‌কো কছু ন চাহিয়ে, সো সহন পতি সাই ॥ ২৩৬ ॥

মানুষ ইচ্ছার অধীন হইয়া পরাধীন ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু এই পৃথিবীতে যাহারা কোন ইচ্ছার বশবর্ত্তী না হইয়া থাকে, তাহাদের জীবনই ধন্য।

গুরু বিচারা ক্যা করে যো হিরদা ভরা কঠোর।
নৌনেজে পানী চড়ে তউ ন ভেজে কোর ॥ ২৩৭ ॥

যেমন নয়টা বাঁশের উচ্চতার মত জল উঠিলেও পুকুরের পাড়

ভিজে না, সেইরূপ যাহাদের হৃদয় অতিশয় কঠোর—গুরুর শত শত উপদেশ বাক্যেও তাহাতে নম্রতা আনয়ন করিতে পারে না—অর্থাৎ সে হৃদয়ে কিছুতেই জ্ঞানের উদয় হয় না।

জিন্ খোজা তিন পাইয়াঁ, গহরে পানী পৈঠ।
হৌঁবেরী ঢ়ঁড়ন লই রহো কিনারে বৈঠ॥ ২৩৮॥

গভীর জলাশয়ে ডুবিয়া যে রত্ন অন্বেষণ করে, সেই ব্যক্তিই রত্নলাভ করে, যেখানে সেখানে খুঁজিলে তাহা পাইবে কি প্রকারে! যে ব্যক্তি কায়মনে সাধনা করিয়া থাকে, সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। যে সাধনা করে না, সে প্রাপ্ত হইতে পারে না।

সুখ দুঃখ এক সমানা হৈ, হরখ শোকে নাহি ব্যাপ।
পর উপকার নিহ কামতা, উপজে ছোইন তাপ॥ ২৩৯॥

সুখ ও দুঃখ একই জিনিষ জানিবে—শোক সকল সময়ে থাকে না। জগতে যত প্রকার কার্য্য আছে, তাহাতে সময়ে সময়ে সুখ ও দুঃখ উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল পরোপকার কার্য্যে কখন দুঃখ উপস্থিত হয় না—ইহা চিরকালই সুখদায়ক।

সাঁচে সাপ ন লাগই, সাঁচে কাল ন খাই।
সাঁচে কো সাঁচা মিলে, সাঁচে মাহি সমাই॥ ২৪০॥

সত্যে কখন অভিশাপ লাগে না, সত্য কখন নষ্ট হয়না, সত্যের বদলে সত্যই লাভ হয় এবং সত্য সত্যেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কলিকা ব্রাহ্মণ মস্‌করা, তাহি ন দীজে দান।
কুটর্ব সহিত নরকে চলা নাথ লিয়ে জিজমান॥ ২৪১॥

কলির ব্রাহ্মণ অতিশয় পাপী—ইহাদিগকে কখনও দান করিবে না; যাহারা এই কলির ব্রাহ্মণকে দান করে—সেই ব্রাহ্মণ তাহাদের লইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে।

কাল করে সো আজ কর, আজ কর সো আব্।
পলমেঁ পরলে হোয় গো, বহুরি করে গো কব্।। ২৪২ ॥

যে কাজ কাল করিবার জন্য আছে—তাহা আজই সম্পন্ন করিবে—আর যাহা আজ সম্পন্ন করবার আছে, তাহা এখনি সম্পন্ন করিবে। কারণ সংসারে কালের কটাক্ষ মাত্রেই বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে—এইজন্য শুভকার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিবে?

নারী স্বভাব সত্য করি কহহীঁ, অবগুণ আট সদাউ রহই।
সাহস অনীত চপলতা মায়া ভয়, অবিবেক অশোচ সদাই।। ২৪৩ ॥

গ্রন্থকারগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে নারীর চরিত্রে সাহস, অনীতি, চাপল্য, স্নেহ, ভয়, অবিবেকিতা, অশুচি এবং নিষ্ঠুরতা এই আটটী খারাপ গুণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে।

ফুলে ফলেন বেঁত যদ্যপি, সুধাবর্ষহিঁ জলদ।
মুরখ হৃদয় নাচেত যো, গুরু মিলহি বিরিঞ্চি সম।। ২৪৪ ॥

মেঘ সকল সুধাবৃষ্টি বর্ষণ করিলেও যেমন বেতগাছের ফল ও ফুল হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মার মত গুরুর উপদেশ বাক্যেও অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয় হয় না।

কাটোপে বদরী ফলে কোটী যতন কোউ সীচ।
বিনয় ন মানে নীচ কভু ভয় বিনু নরে ন নীচ ॥ ২৪৫ ॥

কুলগাছকে খুব যত্ন করিয়া জলসেচন করিলে এবং তাহার শাখাদি কর্ত্তন না করিয়া বিশেষ যত্ন করিলেও যেমন তাহার ফল ভাল হয় না এবং গাছ ক্রমশঃ ফলহীন হইয়া যায়—অতএব এই বৃক্ষকে বেশী যত্ন না করিয়া কেবল শাখাদি কর্ত্তন করিলে—বেশী ফল পাওয়া যায় এবং বৃক্ষও খুব সতেজ হয়। সেইরূপ নীচ জাতিকে বেশী অনুনয়-বিনয় করিয়া কোন কাজ করিতে বলিলে, তাহার দ্বারা কাজ

পাওয়া যায় না—তাহাকে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করিতে বলিলেই সহজে তাহার নিকট হইতে কার্য্যোদ্ধার করিয়া লওয়া যায়।

বিনা সাধন হরি দেও হয়, পুরুষারথ সো চারি।
যো শরণাগত হোত হয়, হরিপদ নেহকবারি ॥ ২৪৬ ॥

যে ব্যক্তির শ্রীহরির পদকমলে একান্ত ভক্তি ও অনুরাগ থাকে—ভগবান হরি তাহাকে বিনা আরাধনাতেই পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহারা ভগবানের একান্ত ভক্ত, শ্রমসাধ্য সাধনা ব্যতীরেকেই তাহারা ঐ সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম অর্থ অরু কাম-মোক্ষ পুরুষারথ চারি কহি।
যো চাহে পদনির্ব্বাণ সাধন যাকো বহুত হই ॥
যো জন হরিপদ ভজত হয়, ছাড়ি সকল জঞ্জাল।
সো সাধন নাহি চাহিয়ে, প্রভু হয় পরম দয়াল ॥ ২৪৭ ॥

ভক্তকে ভগবানের অদেয় কিছু নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ পাওয়া বড়ই শ্রমসাধ্য কিন্তু যে হরির চরণ কমলে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাতে সমস্ত ভারাপর্ণ করিয়াছে; সংসারের সকল জঞ্জাল জাল দূরে ফেলিয়া কেবল তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছে। তাহাকে আর কোন সাধন-অনুষ্ঠান করিতে হয় না, দয়াময় নিজগুণে তাঁহার ভক্তকে ঐ সকল পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন।

বিনু গুরু হোই কি জ্ঞান, জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিনু।
গাওহিঁ পুরাণ বেদ সুখ কি, লহহিঁ ভরি ভক্তি বিনু ॥ ২৪৮ ॥

সাধক তুলসীদাস গোস্বামী বলেন—বিরাগ, জ্ঞান এবং দয়া ভিন্ন অতি উত্তম গতিলাভ হয় না। সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপে, আত্মীয় কুটুম্ব ভরচিন্তনে এবং কায়িক ও মানসীক সুখাদিতে বৈরাগ্য না জন্মিলে, তাহার পর গুরুদেবের কৃপালাভ না করিলে জ্ঞানলাভ হয়

না। অর্থাৎ প্রথমতঃ নিজে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে করিতে বৈরাগ্যভাব আসিয়া পড়িবে—এইভাব হইলেই ঐহিক-পারত্রিক সকল বিষয়েই মানব ইচ্ছাশূন্য হইয়া পড়িবে। কেশহীন ব্যক্তি ভয়ানক রৌদ্র তাপে তাপিত হইয়া যেমন শীতল বারিপানের আশায় বিব্রত হয়—সেইরূপ সংসার-আতপক্লিষ্ট ব্যক্তি ভব-সমুদ্র পার হইবার জন্য যখন গুরুর শরণাপন্ন হয়—যখন তাঁহার উপদেশে হৃদয়ে অচলা ভক্তির উদয় হয়, তখন শ্রীহরি তাহাকে অবশ্যই কৃপা করেন। গুরু ছাড়া জ্ঞানলাভ হয় না এবং হরিভক্তি ছাড়া আর কিছুতেই পরমানন্দ লাভের আশা নাই।

কবহু দিবসমহ নিবিড়তম, কবহুক প্রগট পতঙ্গ।
উপজে বিনশে জ্ঞানজিমি, পাই সুসঙ্গ কুসঙ্গ ॥ ২৪৯ ॥

যেমন বর্ষাকালে এক এক দিন অতিশয় মেঘ হইয়া চারিদিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, আবার এক এক সময় সূর্য্যদেব প্রকাশ পাইলে যেমন সেই মেঘ সকল অপসারিত হয়, সেইরূপ সাধুসঙ্গ হইলে লোকের জ্ঞানোদয় হয় এবং অসাধু লোকের সঙ্গ হইলে মানুষ জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

কবহু প্রবল চল মারুত যহঁ তহঁ মেঘবিনাহী।
জিমিক পূত কুল উপজে সম্পতি ধর্ম্মনাশহী ॥ ২৫০ ॥

প্রবল বায়ু সন্তাড়িত হইয়া যেমন বর্ষাকালের মেঘ সকল স্থানান্তরিত হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বংশে কুপুত্র জন্মিলেও তাহার দ্বারা সঞ্চিত অর্থত নাশ হয়ই, অধিকন্তু বংশের ধর্ম্মও উহার দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়।

বিবিধ জন্তু-সঙ্কুল মহী ভ্রামত হয় সমুদাই।
বাঢ়ত প্রজা যশ নগরমে ধর্ম্মরাজকো পাই ॥ ২৫১ ॥

বর্ষাকালে পৃথিবী যেমন নানাবিধ জীব জন্তু অর্থাৎ ভেক, মীন, সর্প, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজার রাজত্ব ও প্রজাগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

উষর ভূমিহ দেবগণ যদ্যপি বর্ষহিঁ যাম।
উপজত নহি কামাদি যশসন্তনকে মন॥
সাধন বলতে বিগত হোয়, জাতবাসনা সদাহি।
তৃণ নহিয়মত সো ভূমিপর, যদ্যপি কৃষক সুজন॥ ২৫২॥

উষর ভূমিতে অতিশয় বৃষ্টিপাত হইলে কৃষকগণ তাহাতে যত্নপূর্ব্বক বীজ বপন করিয়াও যেমন শস্যাদি উৎপন্ন করিতে পারে না, এমন কি একটী তৃণও যেমন তাহাতে জন্মায় না—সেইরূপ সাধু ব্যক্তির উষর ক্ষেত্রসম হৃদয়ে অতিশয় চেষ্টা করিলেও কামাদি মোহ জন্মায় না; সাধনবলে তাহারা ঐ সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়া থাকেন।

কষীনিরাওহিঁ ধান্য তৃণ যো হয় চতুর কৃষাণ।
জিমি বুধ জ্ঞানবন্তমহ তজহিঁ মোহমদ মান॥ ২৫৩॥

চতুর কৃষক বর্ষাকালে ধান্য ক্ষেত্র হইতে ঘাস-তৃণ প্রভৃতি আগাছা সকল তুলিয়া ফেলিয়া দিলে যেমন তাহারা আর জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানী মহাত্মারা দেহরূপ ক্ষেত্র হইতে লোভ, মদ, মোহ প্রভৃতি আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া দেন?

মহাবৃষ্টি চলি ফুটি কেয়ারী।
জিমি স্বতন্ত্র হোয় বিগরহিঁ নারী॥ ২৫৪॥

বর্ষাকালে প্রবল জলবর্ষণ হইলে যেমন ক্ষেত্রের আলিসমূহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া জলরাশি যথেচ্ছ প্রবাহিত হয়—সেইরূপ স্ত্রীজাতি স্বাধীনা হইলে, তাহারা নিজগৃহ, কুলমান, বিসর্জ্জন দিয়া যথা ইচ্ছা

তথা প্রস্থান করে। এইজন্য শাস্ত্র স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অর্কজ বাস পতি বিনু ভয়েউ।
জিমি সুরাজ্য খল উদ্যম গয়েউ ॥
খোজত পন্থ মিলে নহি ধূরি।
করে ক্রোধ জিমি ধর্ম্মহি দুরি ॥ ২৫৫ ॥

বর্ষা সমাগমে যেমন আকন্দ ও যবাশ নামক বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে দস্যু তস্করাদির উপদ্রব থাকে না অর্থাৎ তাহারা প্রজাগণের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করে না। এইসময় যেমন পথের ধূলা সমস্তও নষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ ক্রোধিত ব্যক্তির হৃদয়ের সমস্ত ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্রোধের উদয় হইলে ধর্ম্ম আর তথায় অবস্থান করিতে পারে না।

হরিত ভূমি তৃণ সঙ্কুল সমুঝপরে নহি পন্থ।
জিমি পাষণ্ড বিবাদতে লুপ্ত ভয়ে সদগ্রন্থ ॥ ২৫৬ ॥

যেমন পথ সকল বর্ষাসময়ে নবতৃণ বিমণ্ডিত হইয়া লোক লোচনের অদৃশ্য হয়, সেইরূপ পাষণ্ডগণের বিবাদদ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি নষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

বুঁদ আঘাত সহত গিরি কয়সে।
খলকে বচন সন্ত সহে জয়সে ॥
ক্ষুদ্র নদী ভরি চলি উতরাই।
জয়সে থোরে ধন খল বওরাই ॥ ২৫৭ ॥

পর্ব্বতে অতিরিক্ত বর্ষা বারিবর্ষণ হইলে তাহারা যেমন সেই কষ্ট অবাধে সহ্য করে, সাধু ব্যক্তিরাও খলের কু ব্যবহার সেইরূপ সহ্য করিয়া থাকেন। বর্ষাবারিতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহ ভরিয়া বেগে

প্রবাহিত হয়—সেইরূপ নিধর্নীর সামান্যমাত্র ধন হইলেই সে অহংকারে মত্ত হয়। বেঙের আধুলি প্রাপ্তির মত সে রাজ হস্তীকেও পদাঘাত করিতে যায়।

দামিনী দমকি রহে ঘনমাহী।
খলকি প্রীতি যথা থির নাহি॥
বরখহিঁ জলদ ভূমি নিরবায়ে।
যথা লওহি বুধ বিদ্যা পায়ে॥ ২৬৮॥

বর্ষাকালে মেঘের কোলে সৌদামিনী প্রকাশিত হইয়া যেমন তৎক্ষণাৎ তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়—ক্ষণিক স্থির থাকিতে পারে না। সেইরূপ খলের সহিত প্রীতি বন্ধন বেশীদিন থাকে না। আর বর্ষাকালে মেঘমালা ভূমির সন্নিহিত হইয়া অর্থাৎ নত হইয়া বর্ষণ করে—পণ্ডিত ব্যক্তি তেমনি বিদ্যালাভ করিয়া নত হয়।

রাকা রজনী ভক্তি তব রামনাম সোই সোম।
অপর নাম উডুগণ বিমল বসহঁ ভক্ত উরু ব্যোম॥ ২৬৯॥

কবিবর তুলসীদাস রূপকচ্ছলে পূর্ণিমার নিশাকে রামনাম মাহাত্ম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নারদ বলিয়াছিলেন—পূর্ণিমার রজনীই ভগবানের ভক্তি, উহাতে যে রামনাম তাহাই পূর্ণচন্দ্র, আর অপর রামের বিভূতি সকল তারাদল এবং ভক্ত কূলের হৃদয়ই আকাশ স্বরূপ। এইরূপ পূর্ণিমার রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় স্বরূপ ভগবানের নাম ভক্তজনের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকুক।

তাত তিন অতি প্রবল খল, কাম ক্রোধ অরু লোভ।
মুনি বিজ্ঞান ধাম মন করহিঁ নিমিষিমহ ক্ষোভ॥
লোভকে ইচ্ছা দম্ভ বল, কামকে কেবল নারী।
ক্রোধকে পরুখবচন বল মুনিবর কহহি বিচারি॥ ২৭০॥

কাম ক্রোধ ও লোভ এই সকল মানবের পরম শত্রু; কেননা ইহারা অতি বড় জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও তিলোকের মধ্যে চঞ্চল করিতে পারে। ইচ্ছা ও দাম্ভিকতাই লোভের বল—কেননা লোভ থাকিলেই মানবের মনে নানাপ্রকার ইচ্ছা প্রবল হয়—সেই ইচ্ছা পুরণের জন্য দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। কামের বল—বিষয়াদি ভোগ ও রমণী-লাভের আশা, ক্রোধের বল পুরুষ বচন—অর্থাৎ ক্রোধ হইতেই পুরুষ বচন প্রকাশ পায়।

বচন কর্ম্ম মন মোর গতি ভজন করে নিষ্কাম।
তিনকে হৃদয় কমল সহঁ করোঁ সদা বিশ্রাম॥ ২৭১ ॥

অগতির গতি ভগবান রামচন্দ্র বলিতেছেন—যে ব্যক্তি কায়মনবাক্যে আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, আমি ব্যতীত যে আর কিছুই জানে না, যে কেবল নিষ্কাম ভাবে কেবল আমারই উপাসনা করে—আমি সেই মহাত্মার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিশ্রাম সুখানুভব করি।

মনক্রম বচন নেম করি, ভজন করত অতি প্রীত।
তবে বাড়ত হরিভক্তি দৃঢ়, উপজত প্রেম পুণীত॥
পুলক দেহ তব হোত হয় হরিগুণ গাওত গান।
গদগদ হিয়া তব হোত হয় বহুত নীর নিদান॥
তব হরিভক্তি সো জানিয়ে হোত কৃতারথ নেম।
এহি বিধি যাকো হোত হয়—উর অন্তর দৃঢ় প্রেম॥ ২৭২ ॥

নিয়মাধীন হইয়া মনে প্রাণে ভগবানের আরাধনা করিতে,করিতে ভক্তির দৃঢ়তা জন্মিয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার হইয়া সাধকের হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত ও গদগদ ভাষে হরি গুণগান করিতে করিতে নয়নে বারিধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সাধক তখন তদ্গতচিত্ত হইয়া আপনাহারা হয়—এইরূপ অবস্থা হইলে সেই

সাধক প্রকৃত হরিভক্ত এবং এই জগতীতলে তাহার জন্মই সার্থক হইয়াছে।

সবৈ সহায়ক সবলকে, কোহি ন নিবল সহায়।

পবন জগায়ত আগ কো, দীপহিঁ দেত বুঝায় ॥ ২৭৩ ॥

প্রবল পবন যেমন অগ্নিকে প্রজ্জলিত করিয়া দীপকে নিভাইয়া দেয়, সেইরূপ এ জগতে সকলেই বলবানের সহায় হইয়া থাকে, দুর্ব্বলের কেহ সহায় হয় না।

ডরে ন কাহু দুষ্ট সোঁ জাহি প্রেমকাকী বন।

ভৌর ন ছাড়ে কেতকী তীখে কণ্টক জান ॥ ২৭৪ ॥

যাহার হৃদয়ে প্রেমবহ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে, সে আর কাহাকেও ভয় করে না। যেমন কেতকী পুষ্পে তীক্ষ্ণ কণ্ঠক থাকিলেও ভ্রমর তাহাতে দৃকপাত করে না।

পণ্ডিত জনকো শ্রম মরম জানত যে অতি ধীর।

কবুহঁ বাঁ কন জানহী তন প্রসূতিকা পীর ॥ ২৭৫ ॥

বন্ধ্যা নারী যেমন প্রসব বেদনা বুঝিতে পারে না, সেইরূপ পণ্ডিতের পরিশ্রমের মর্ম্ম পণ্ডিত ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না।

সহজ রসীলে হোয়সে করৈ অহিত পর হেত।

জৈসে পীড়িত কীজিয়ে ইখ তউরস দেত ॥ ২৭৬ ॥

ইক্ষু দণ্ডকে নিষ্পিড়ন করিলেও সে যেমন সুমিষ্ট রসদানে বিরত হয় না। সেইরূপ সাধু ব্যক্তিকে কষ্ট দিলেও তিনি কাহারও অহিত সাধন করেন না।

সুধরী বিগরৈ বেগহি বিগরী ফির সুধরেন।

দুধ ফটে কাঁজী পরৈ সো ফির দুধ বনৈন ॥ ২৭৭

ভাল লোক মন্দ হইলে বা ভাল দ্রব্য খারাপ হইলে যেমন

আর তাহা ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকে না ; সেইরূপ দুগ্ধ মধ্যে কাঁজী পড়িলে পুনরায় আর তাহাকে দুধ করা যায় না।

কোঁ কীজৈ ঐ সৌ যতন জাঁতে কাজ ন হোয়।
পরবত পৈখোদৈ কুয়া কৈসে নিকসৈ তোয় ॥ ২৭৮ ॥

যত্ন করিলে অসিদ্ধ থাকে, জগতে এরূপ কোন কাজ নাই ; নিরন্তর খনন করিলে পর্ব্বত হইতেও জলধারা প্রবাহিত হয়।

কারজ ধীরে হোতু হৈ কাহে হোত অধীর।
সময় পায় তরবর করৈ কেতক সীচোঁ নীর ॥ ২৭৯ ॥

বৃক্ষে যতই জল সেচন কর—উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হইলে যেমন তাহা হইতে ফলের আশা করা যায় না, সেইরূপ অধীর হইয়া যত কর্ম্মই কর না কেন—তাহা হইতে ফললাভ হইবে না, এইজন্য ধীরভাবে কার্য্য করাই বিধেয়।

দোখহিঁকোঁ উমহৈ গহৈ গুণন গহৈ খললোক।
পিয়ৈ রুধির পয় না পিয়ৈ লগী পয়োধর জোক ॥ ২৮০ ॥

পিযুষ পুরিত মাতৃস্তন্যে জলৌকা বসিলে সে যেমন রক্ত ব্যতীত দুগ্ধ পান করে না, সেইরূপ মন্দ ব্যক্তিরা গুণবানের গুণের ভাগ না দেখিয়া কেবল দোষের ভাগই দেখিয়া থাকে।

সাঁচ ঝুট নিরনয় করৈ নীতি নিপুন যো হোয়।
রাজহংস বিনুকো করৈ স্থীরনীরকো দোয় ॥ ২৮১ ॥

জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলীয় ভাগ পরিত্যাগ করত দুগ্ধ গ্রহণ করিতে যেমন রাজহংস ব্যতীত কেহ পারে না, সেইরূপ নীতি-বিশারদ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ সত্য-মিথ্যা নিরূপণে সমর্থ হয় না।

নিপট অবুধ সমুঝৈ কহা পুনজন বচন বিলাশ।
কবহুঁ ভেক ন জানহী অমল কমলকী বাস ॥ ২৮২ ॥

নির্ম্মল কমলের গুণাগুণ যেমন ভেকেরা বুঝিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তি পণ্ডিতের গুণ বুঝিতে পারে না।

মূঢ় তহাঁহী মানিয়ে জহাঁ ন পণ্ডিত হোয়।
দীপক কী রবিকে উদৈ বাত ন বুঝে কোয়॥ ২৮৩॥

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন প্রদীপের শোভা হয়—সেইরূপ পণ্ডিতের অভাবে মূঢ় ব্যক্তির শোভা হইয়া থাকে।

মূরখ গুণ সমুঝে নহী তৌ ন গুণীমে চুক।
কহা ভয়ৌ দিনকো বিভৌ দেখীজৌ ন উলুক॥ ২৮৪॥

গুণবানের গুণ মূর্খে বুঝিতে পারেনা বলিয়া কি তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয়? সূর্য্যের আলোকে পেচকেরা দেখিতে পায় না, তজ্জন্য দিবাকরের কোন দোষ হইতে পারে না।

অরিকে করমেঁ দী জিয়ৈ অবসর কৌ অধিকার।
জো জো দ্রব্য লুটায়হৈ তোঁ তোঁ যশ বিস্তার॥ ২৮৫॥

সময়ে সময়ে শত্রুর হস্তেও দ্রব্যাদির কর্তৃত্বভার প্রদান করিবে, কেননা, শত্রু যে পরিমাণে ঐ সকল বস্তু অপরকে দান করিবে—তোমার কীর্ত্তিও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া পড়িবে।

জানবুঝ অজুগত করৈ তাসো কহা বসায়।
জগত হী সোবত রহৈ তোকোঁ কহা জগায়॥ ২৮৬॥

যে ব্যক্তি বুঝিয়াও বুঝে না—তাহাকে বুঝান যারপর নাই কঠিন; জাগিয়া ঘুমাইলে কে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারে?

জাহিমিলে সুখ হোতুহৈ তিহিঁ বিছুরে দুঃখ হোয়।
সুর উদৈ ফুলৈ কমল তা কিন সকুচৈ সোয়॥ ২৮৭॥

যাহার সহবাসে বিমল সুখের উদয় হয়—তাহার বিরহেও তদ্রূপ মহাদুঃখ পাইতে হয়। সূর্য্য উদিত হইলে কমল

বিকশিত হয়—আবার তাঁহার অস্তগমনে মহা বিরহে মুদিত হইয়া থাকে।

কারজ তাহী কৌ সরৈ করৈ যো সময় বিচার।

কবহুঁ ন হারে খেল জেউ খেলৈ দার বিচার ॥ ২৮৮ ॥

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কাজ আরম্ভ করিলে তাহাতে কৃতকার্য্যতা নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। যিনি ভাল বিবেচনা করিয়া খেলা আরম্ভ করেন—তাহাকে কখন পরাভূত হইতে হয় না।

কোউ দূর ন কর সকৈ উলটে বিধিকে অংক।

উদনি পিতা তউ চন্দকৌ ধোয়ন শোক্যা কলংক ॥ ২৮৯ ॥

ভাগ্যফল দূর করিতে বা তাহার অন্যথা করিতে কেহই পারে না, যেমন সাগর চন্দ্রের পিতা হইয়া, তাঁহার অগাধ বারিরাশি থাকিতেও চন্দ্রের কলঙ্ক বিধৌত করিতে পারেন নাই।

বীর পরাক্রম না করে তাসো ডরত ন কোয়ে।

বালক হুঁ কো চিত্র কেউ বাঘ খিলোঁ না হোয়া ॥ ২৯০ ॥

বালকগণ যেমন কাঠের বাঘ্র লইয়া খেলা করে—কোন ভয় করে না, সেইরূপ বলিষ্ঠ ব্যক্তি যদি বল প্রকাশ না করে—তাহা হইলে তাহার সহিত খেলা করিতে কেহ ভয় পায় না।

নৃপ প্রতাপ যে দেশমেঁ রহৈ দুষ্ট নহি কোয়।

প্রগটৈ তেজ দিনেশ কৌ তহঁা তিমির নহি হোয় ॥ ২৯১ ॥

সূর্য্যের আলোক প্রকাশিত হইলে যেমন সেখানে আর অন্ধকার থাকিতে পারে না—সেইরূপ প্রতাপশালী রাজা যে দেশে বাস করেন—তথায় দুষ্ট লোক কদাচ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না।

বিনা কহেহুঁ সৎপুরুষ পরকো পুরে আশ।

কৌন কহত হৈ সুর কোঁ ঘর ঘর করত প্রকাশ ॥ ২৯২ ॥

সূর্য্যদেবকে ঘরে ঘরে আলো দান করিতে যেমন কেহ বলিয়া দেয় না—সেইরূপ সাধুগণকে পরের আশা পূর্ণ করিতে বলিয়া দিতে হয় না।

সজ্জন বচায়ৈ কষ্ট তেঁ রহৈ নিরন্তর সাথ।
নৈন সহাই জোঁ পলকে দেহু সহাই হাত ॥ ২৯৩ ॥

হস্ত যেমন শরীরকে রক্ষা করে—চক্ষুর পাতা যেমন চক্ষুকে সতত রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি সতত সাধুগণের সঙ্গে থাকে—সাধুগণ তাহার সকল কষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন।

সজ্জন চিত কবহঁ ন ধরত দুরজন জনকে বোল।
পাহন মারে আম কেউ তউ ফল দেত অমোল ॥ ২৯৪ ॥

সজ্জন ব্যক্তি সহস্র কষ্ট পাইলেও কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হয় না; আম্র বৃক্ষের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যেমন অনিষ্টকারীকে সুমধুর ফলদানে তৃপ্ত করে। সাধু ব্যক্তিও তদ্রূপ শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ করেন না।

যা দুনিয়ামে আইকে ছাড় দেহ তু ঐঠ।
লেনা হৈ সো লেহলে উঠী জাত হৈঁ পৈঠ ॥ ২৯৫ ॥

দুনিয়ায় আসিয়া আসক্তি বিসর্জ্জন দিয়া যাহা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা সত্বর গ্রহণ কর—কারণ সময় গত হইলে আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

শোয়ান ক্রিয়াকো সঙ্গমে রহত ঘড়ী আরুঝায়।
জগপ্রাণী তাঁকো হাঁসে আপনা কাজ বিহায় ॥ ২৯৬ ॥

কুক্কুর কুক্কুরী কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়ে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়—জগতের লোক—তাহা দেখিয়া হাস্য করিয়া থাকে, কিন্তু আপনার বিষয় তাহারা একবার মাত্রও ভাবিয়া দেখে না।

বুঁদ সমানা সমুদ্রমে যো মানে সকুচোয়।

সমুদ্র সমানা বুঁদমে বুঝে বিরলা কোয় ॥ ২৯৭ ॥

বিন্দুমাত্র জল সাগরে মিশিয়া যাইতে পারে—কিন্তু বিন্দুমাত্র জলে বৃহৎ সাগর মিশিয়া যাইবে—এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে ?

নহি মে সব হুয়া ফিন নহি হোয় যায়।

নহি হোয়ে রহ দাদু সাহেব সে লওয়ায় ॥ ২৯৮ ॥

"নাই" হইতেই অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম হইতেই সকল হইয়াছে—আবার তাহাতেই পুনরায় সমস্ত লয় হইবে—অতএব তুমি নাই হইয়া অর্থাৎ নিষ্কাম থাকিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ধন জনের অহঙ্কারে মত্ত না হইয়া ঈশ্বর প্রণিধান কর—ইহাই তাৎপর্য্য।

বুরা জো দেখনমেঁ চলা বুরা ন দীসে কোয়।

জো দিল খোঁজে আপনা তো মুঝসা বুরান কোয় ॥ ২৯৯ ॥

কোন ব্যক্তি একজন খারাপ লোকের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কাহাকেও মন্দ দেখিতে পাইল না ; তারপর সেইব্যক্তি নিজের বিষয় চিন্তা করিয়া এবং নিজের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিল—তাহার মত খারাপ লোক আর কেহ নাই।

খুদ নতো ধরতী সহে কাট সহে বনবরায়।

কুবচন তো সাধু সহে ঔর্তে সমো ন যায় ॥ ৩০০ ॥

পৃথিবী খনন সহ্য করে, বনরাজিন ছেদন সহ্য করে—আর সাধু ব্যক্তি কুবচন সহ্য করে—তাহা ছাড়া আর কেহ এসকল সহ্য করিতে পারে না।

জাহীতেঁ কছু পাইয়ে করিয়ৈ তাকো আস্।

রীতে সরোবর পৈ গয়ে কৈসে বুঝত পিয়াস ॥ ৩০১ ॥

যাহার কাছে কিছু পাওয়া যায়, লোকে তাহার কাছেই কিছু পাইবার আশা করিয়া গমন করে। নতুবা পিপাসাতুর ব্যক্তি কি কখন শুষ্ক সরোবরের নিকট পিপাসা নিবারণের জন্য গমন করে?

চোকী পৈ নিকী লগে কহিয়ে সউমঁ বিচার।
সবকে মন হর্ষিত করে জো বিবাহমে গার॥ ৩০২॥

যেমন বিবাহ সময়ের গালাগালিও প্রাণে আনন্দ দানে সমর্থ হয়—সেইরূপ সময় বিশেষে মন্দ কথাও মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

নীকী পৈ চোকী লগে বিন্ ঔসর কো বাৎ।
জৈসে বরনত যুদ্ধমেঁ রসা সংভার ন সুহাত॥ ৩০৩॥

যুদ্ধে গমনোদ্যত যুবা পুরুষের পক্ষে যেমন সুন্দরী রমণীর সুখপ্রদ নহে। সেইরূপ সত্যবাক্যও সময় বুঝিয়া বলিতে না পারিলে মিষ্ট লাগে না।

বালু জৈসী করকরী উজ্জ্বল জৈসী ধূপ।
ঐসী মাবী কুচ্ছ নহী জৈসী মাবী চুপ॥ ৩০৪॥

করকরী দ্রব্যের মধ্যে যেমন বালুকা আর উজ্জ্বল বস্তুর মধ্যে যেমন রৌদ্র, তদ্রূপ এজগতে চুপ করিয়া থাকার তুল্য সুমিষ্ট দ্রব্য আর কিছুই নাই।

পোথি পড়ি পড়ি জগমুয়া পণ্ডিত ভয়া ন কোয়।
একৈ আচ্ছড় প্রেমকা পড়ে সো পণ্ডিত হোয়॥ ৩০৫॥

আজীবন পুস্তক পাঠে পাণ্ডিত্য জন্মিল না কিন্তু যিনি প্রেমের সহিত পুস্তক পাঠ করেন—তিনিই পণ্ডিত হইয়া থাকেন। মনোযোগ না দিলে কোন কাজেই সাফল্যলাভ হয়না—ইহাই তাৎপর্য্য।

চলন্ চলন্ সব্ কোই কহে পহুঁছে বিরমা কোই।
এক কনক অরুকামিনী দুর্লভ ঘাটী দোই॥ ৩০৬॥

ঈশ্বরের কাছে যাইতে সকলেই ইচ্ছা করে। কিন্তু কামিনীকাঞ্চন রূপ দুইটী ঘাটীর দ্বারপালকে লঙ্ঘন করিয়া খুব কম ব্যক্তিই তাহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারে। অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি শূন্য না হইলে ঈশ্বরলাভ সম্ভব হইতে পারে না।

মাটী কহে কুম্ভারকোঁ তু ক্যা রুধে মোহি।
একদিন ঐসা হোইগা মে রুধোগে তোহি॥ ৩০৭॥

মাটী কুম্ভকারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—যে হে কুম্ভকার! তুমি আমাকে যেমন এইপ্রকার চটকাইতেছ—আমিও তোমাকে একদিন ঐরকম করিয়া চটকাইব। অর্থাৎ একদিন তোমাকেও আমার আশ্রয় লইতে হইবে—তোমার দেহও আমাতে এইরূপ একদিন ওতপ্রোত হইবে।

দুরবলকো ন সতাইয়ে জাকো মোটী হ্যায়।
মুই খালকো শ্বাস লোঁসার ভস্ম হো যায়॥ ৩০৮॥

যে ব্যক্তি বিনা সহায়ে কষ্ট পাইয়া "হায় আমার কি হইল" বলিয়া কাঁদে, যেরূপ হীনবল ব্যক্তিকে কখন কষ্ট দেওয়া উচিত নয়—কেননা কর্ম্মকারের জাঁতার নিশ্বাসে কঠিন লৌহ পর্য্যন্ত যখন গলিয়া যায়—তখন তোমার মত কঠিন যে একদিন দুর্ব্বলের দ্বারা প্রপীড়িত না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

চলি পুতরি লোন্‌কী আসমুদ্রকো লেন।
আপ্ আপো ভই পল্‌ট কাহেকো বয়েন॥ ৩০৯॥

একটী লবণের পুতুল সাগর মাপিতে গিয়া আপনি জল হইয়া গেল, সুতরাং সে আর তাহার গভীরতা মাপিবে কেমন করিয়া? ইহার অর্থ এই, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করে—সে আর কেমন করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিয়া লোকসমাজে

ঈশ্বরের রূপ-গুণাদির উপদেশ প্রদান করিবে? ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, সাধক ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানবান হইলে, সে আর ভাষার দ্বারা স্বমুখে সেই অবাঙ মনসগোচর ভগবানের বিষয় বলিতে পারে না—তখন সে তন্ময় হইয়া কেবল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

দ্বার ধনীকো পরিরহে ধকা ধনীকা খাই।
কবুঁ ধনী নিয়াজহী যো দার ছাড়ি না যাই ॥ ৩১০ ॥

সহস্র সহস্র ধাক্কা খাইয়াও ধনীর দ্বারে পড়িয়া থাকিবে; যদি এই প্রকারে অহরহঃ পড়িয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে কোন না কোনদিন তিনি বাহির হইলে, সাক্ষাতে তোমার আশা মিটিবে।

দেহ ঘরকো ডাডহৈ সব্ কাইঁকোঁ হোয়।
জ্ঞানী ভূগ্তে জ্ঞানসে মুরখ ভূগতে রোয় ॥ ৩১১ ॥

জ্ঞানী-অজ্ঞানী সমস্ত লোকই সংসারে জন্মিয়া থাকে, এবং কষ্টভোগ করে কিন্তু তাহার মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি বিপদে অধৈর্য্য বা কষ্টে মুহ্যমান না হইয়া তাহা ভোগ করেন, আর মূর্খ ব্যক্তি তাহাকে অসহ্য বোধে কেবল রোদন করিয়া তাহা সহ্য করিয়া থাকে।

মালা ফেরত যুগ গয়া পায়া ন মনকা ফের।
করকা মনকা ছাড়িকে মনকা মনকা ফের ॥ ৩১২ ॥

মালা ফেরাইয়া যুগযুগান্তর গত করিলে—তথাপি তোমার মনের মলিনতা দূর করিতে পারিলে না; অতএব মালা ঘুরান ছাড়িয়া যাহাতে মনের মালিন্য দূর হয়—যাহাতে হিংসা দ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া সরলতা অবলম্বন করিতে পার—হে মানব! তাহার চেষ্টা কর।

বকরী পাতী খাত হৈ তাকো কাড়ো খাল।
যো বকরীকো খাতহৈ তিন্‌কো কোন্ হাওয়াল ॥ ৩১৩ ॥

ছাগাদি পশু পাতালতা খাইয়া জীবন ধারণ করে, তুমি সেই

ছাগাদি বধ করিয়া তাহার চামড়া ব্যবহার কর। বল দেখি, যে ব্যক্তি সেই ছাগাদির মাংস ভোজন করে, তাহার কীদৃশ অবস্থা হওয়া উচিত ?

মালী আয়ত দেখি কৈ কলিয়াঁ করো পুকার।
ফুলে ফুলে চুলি লিয়ে কালি হামারো বার ॥ ৩১৪ ॥

একটী বাগানে মালীকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া কুসুমের আধ-ফোটা কলিকারা এই বলিয়া রোদন আরম্ভ করিল যে, হায়! আজি মালী বিকসিত কুসুম চয়ন করিতেছে, আগামী কল্য সে আমাদিগকেও চয়ন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানবগণ সম্বন্ধে মৃত্যুও এইরূপ কৃতান্ত কেশে ধরিয়া বসিয়া আছে।

দুখমে সুমিরন্ সব করে সুখমে করে ন কোয়।
সুখমে যো সুমিরন্ করে তো দুখ কাহে কোঁ হোয় ॥ ৩১৫ ॥

মানবগণ দুঃখের দশা ঘটিলে নিরন্তর নিজ নিজ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু সুখের অবস্থা হইলে ভ্রমেও কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না, যদি সুখের দশা ঘটিলে মানব নিজ অদৃষ্ট-চক্রের কথা মনে রাখে, তাহা হইলে কি সংসারে কখনও দুঃখ উপস্থিত হয় ?

একহি সাধে সব সাধে সব সাধে সব যায়।
জোতু সীচে মূলকো ফুলে ফলে অঘায় ॥ ৩১৬ ॥

এই সংসারে একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করিলে ধরনীস্থ সমস্ত বিষয়েরই সাধনা করা হয়। যে ব্যক্তি একেবারে নানা বিষয়ের সাধনায় নিরত হন, তাঁহার সকল সাধনাই ধ্বংস হয়, অর্থাৎ যিনি তরুমূলে সেচনে রত, তিনি কেবল ঐ তরুর ফল ফুল প্রভৃতি ভোগ করিতেই সক্ষম হয়েন।

বৈরাগ্য নাম হ্যাঁয় ত্যাগকা পাঁচ পঁচিশো মাহি।

জবলগ্ সংশয় সর্প হ্যায় তব্‌লগ্ ত্যাগী নাহি ॥ ৩১৭ ॥

সম্পূর্ণ ত্যাগকেই বৈরাগ্য কহে। পঞ্চতত্ত্ব বা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ও জীবের যতক্ষণ অভিমান থাকে, ততক্ষণ তাহা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে বা পঞ্চকোষ মধ্যে যতক্ষণ অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ তাহা বৈরাগ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। যেমন গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত সর্পকে মৃত্তিকাদি দ্বারা বদ্ধ করিলে কোন ফল হয় না, সর্প একদিন না একদিন বাহির হইয়া তোমাকে দংশন করিলেও করিতে পারে, সেইরূপ সংশয়রূপী সর্প যতক্ষণ তোমার অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিবে, ততক্ষণ তোমার কল্যাণের আশা নাই সুতরাং সংশয় বিনষ্ট না হইলে হৃদয়ে পূর্ণ বৈরাগ্য আসিতে পারে না।

বৈরাগ্য নাম হ্যাঁয় ত্যাগ কা পাঁচ পঁচিশো সঙ্গ।

উপরকী কাঞ্চলি ত্যজি অন্তর বিষয় ভবঙ্গ ॥ ৩১৮ ॥

কেবল পঞ্চতত্ত্ব আদিতে অভিমান ত্যাগের নামই যে বৈরাগ্য, তাহা নহে, অহং জ্ঞান অর্থাৎ আমার ঘর, আমার বিষয় ইত্যাদি বুদ্ধি যতদিন মন হইতে নির্ম্মূল না হইবে ততদিন প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিবে না। সর্প মধ্যে মধ্যে আপনার খোলস ত্যাগ করিলেও সে যেমন হলাহল পরিত্যাগ করে না, সেই-রূপ জীবহৃদয়ে আমার আমার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধ যতদিন থাকিবে ততদিন প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হইবে না।

অশন বসন সব ত্যজ্ গয়ে ত্যজ গয়ে গাম্ গরেহ্।

মাহে সংশয় শূল হ্যায় দুলভ ত্যজনা যেহ্ ॥ ৩১৯ ॥

বৈরাগ্যের বশীভূত হইয়া অশন, বসন, শয়ন এমন কি গ্রাম ও আপনার গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিলেই যে প্রকৃত

বৈরাগ্য হয়, তাহা নহে। সংশয়রূপী শূল বেদনাকে, অশান্ত হৃদয় হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে পূর্ণ বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় না; কারণ, আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি ভাব হৃদয় হইতে দূর করা অতিশয় কঠিন।

বাজ কুহি গতী জ্ঞানকী গগন গরজ গর্জ্জন্ত।
পুটে শূন্য আকাশ্‌তে সংশয় সর্প ভাচ্ছন্ত॥ ৩২০॥

পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হইলে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন বাজপক্ষী ও কুহী (সর্পভোজী পক্ষী বিশেষ) আকাশে উড্ডীন হইয়া কলরব করিতে করিতে অপর কোন ক্ষুদ্র পক্ষী বা সর্পকে আক্রমণ ও ভোজন করে, সেইরূপ বৈরাগ্য সঞ্চার হইবামাত্র জ্ঞান তৎক্ষণাৎ সংশয়রূপ সর্পকে উদরস্থ করে।

জ্ঞান ধ্যান দো সার হ্যায় তীজে তত্ত্ব অনুপ।
চৌথে মন লাগা রহে সো ভুপন সির ভূপ॥ ৩২১॥

প্রকৃত বিচার করিয়া আত্মবোধ এবং আত্মচিত্তের অভিনিবেশ এই দুইটী প্রধান, জীব ও ব্রহ্মে অভেদজ্ঞান করিয়া আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করা বড় কঠিন, কারণ, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যায় না। যে চিনির আস্বাদ জানে না, সে যেমন তাহা কাহাকেও বুঝাইতে পারে না, সেইরূপ যাহার আত্মতত্ত্ব বোধ হয় নাই, সে কদাচ আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারে না, এবং যাহার মন তন্ময় হইয়া গিয়াছে, তিনি রাজার অপেক্ষাও প্রধান।

কেহ কেহ এ শ্লোকের এরূপও অর্থ করেন—যখন সকল বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলে, যে অবস্থায় বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়, তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে, আর যে অবস্থায় মনের চেতনা দূর হইয়া আত্মাতে বিলীন

হয়; তাহাকে সুষুপ্তাবস্থা বলে, এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাঁহার চিত্ত তুর্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—তিনিই শ্রেষ্ঠ; তিনিই মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে ত্রিলোকের রাজ্যৈশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ধারণা হইয়াছে।

কাশী করবত্ লেত্ হ্যায় আন্ কাটাওয়ে শীস্।

বন বন ভট্‌কা খাওত হ্যায় পাবত ন জগদীশ ॥ ৩২২ ॥

ঈশ্বরকে পাইবার জন্য লোকে কত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করে। কেহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য কাশীতে মৃত্যুর আশা করিয়া থাকে, কেহ বা আপনার প্রাণ দেবতার সমক্ষে বলি দেয়, কেহ বা দেশ বিদেশের গভীর অরণ্যে গমন করিয়া ঈশ্বরাধনায় নিযুক্ত হয়, কিন্তু উহাতে ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায় না; মৃগ যেমন আপনার নাভির সৌগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বনের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার নিজ শরীর মধ্যস্থ নাভির সৌগন্ধ বলিয়া বুঝিতে পারে না, সেইরূপ ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যস্থ, ইহা একেবারে ভুলিয়া দেশ বিদেশে বা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলে কোন ফল পাওয়া যায় না।

রাম বামদিশি জানুকী লক্ষণ দাহিনী ওর।

ধ্যান সকল কল্যাণময়, সুরতরু তুলসী তোর ॥ ৩২৩ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—হে মন! তুমি শ্রীরামের বামদিকে মা জানকী এবং দক্ষিণে ঠাকুর লক্ষণ বিরাজিত রহিয়াছেন—এইরূপ ধ্যান করিলে তোমার সকল মঙ্গল ও কামনা সাধিত হইবে।

পয় আহার ফল খাই, যো রাম নাম ষট্‌মাস।

সকল সুমঙ্গল সিদ্ধি, সব করতল তুলসীদাস ॥ ৩২৪ ॥

হে তুলসীদাস! যদি তুমি ছয়মাস কাল জলপান ও ফল ভোজন করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ করিতে পার—তাহা হইলে তুমি সর্ব্বমঙ্গল এবং সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

হিয় নিগু'ণ নয়নন সগুণ, রসনা রাম সুনাম।

মনহু পুরট সংপুট লসত, তুলসী ললিত ললাম ॥ ৩২৫ ॥

হে তুলসীদাস! যদি তুমি নিগু'ণ রামচন্দ্রকে মনমন্দিরে বসাইয়া ধ্যান কর, সগুণরূপে তাঁহাকে নয়নে দর্শন কর এবং অহরহঃ রসনায় তাঁহার নাম জপ কর, তাহা হইলে সেই ললিত ললাম রামচন্দ্র তোমার হৃদয়-মন্দিরে চির অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

সগুণ ধ্যান রুচি সরস, নহি নিগু'ণ মনতে দুরি।

তুলসী সুমিরহু রামকো নাম সজীবন মুরি॥ ৩২৬ ॥

হে তুলসীদাস! সগুণরূপে ভগবানকে ধ্যান করিলে, তাঁহার প্রতি তোমার সরস রুচি হইবে, এবং নিগুণভাবে ধ্যান করিতেও কখন বিরত হইও না—মৃত্যুঞ্জয় রামনাম এইরূপে স্মরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

রাম নামকো অঙ্ক হৈ সব সাধন হৈ শূন।

অঙ্ক গয়ে কছু হাত নহি, অঙ্ক রহে দশগুণ॥ ৩২৭ ॥

সব সাধনা শূন্যময় হইলেও রামনাম তাহার অঙ্কস্বরূপ; যেমন অঙ্ক শেষ হইলে হাতে কিছুই থাকেনা—কেবল শূন্য পড়িয়া থাকে। কিন্তু অঙ্ক থাকিলে দশগুণ হয়—তেমনি অঙ্কস্বরূপ যে রামনাম, তাহা ছাড়িয়া ভজন-সাধন করিলে—তাহা কোন কাজেরই হয় না।

রামনাম জপি জোহজন ভয়ে সুকৃত সুখশালী।

তুলসী ইহাঁ যো আলসী গয়ো আজু কি কালী॥ ৩২৮ ॥

ভগবান রামচন্দ্রের নাম জপ করিলে লোকে সুকৃতিশালী এবং সুখভোগী হয়—হে তুলসীদাস! এমন রামনাম জপে ঔদাস্য প্রকাশ করিলে তোমার ইহকালও নাই—পরকালও নাই; অর্থাৎ যোরত একুল ওকুল দুকুল নষ্ট হইল।

কাশী বিধি বসি তনু ত্যজৈ হঠত ন ত্যজৈ প্রয়াগ।

তুলসী যো ফল সো সুলভ, রামনাম-অনুরাগ ॥ ৩২৯ ॥

সাধককবি তুলসীদাস বলিতেছেন—কাশীবাস কিম্বা সেইখানে ও প্রয়াগে দেহত্যাগ করিলে যেরূপ সদ্গতি হয়—এক রামনামের বলে সেই ফল সহজে লাভ করিতে পারা যায়।

হম লখু হমহিঁ হমার লখু হম হমারকে বিচ।

তুলসী অল্খহি কা লখহি রাম-নাম জপ নীচ ॥ ৩৩০ ॥

আমি আপনার হৃদয়মধ্যে আপনাকেই দেখিয়া থাকি; যিনি দৃশ্যবস্তু নহেন—তাঁহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব, এই হেতু হে নীচ তুলসীদাস! তুমি অতি দীনভাবে আত্মাস্বরূপ আত্মারামকে জপ করিবে।

রামনাম অবলম্বন বিনু পরমারথ কি আশ।

বর্ষত বারিদ বুঁদগহি চাহত চঢ়ন আকাশ ॥ ৩৩১ ॥

বর্ষাকালে মেঘের বারিধারা অবলম্বন করত আকাশে উঠিবার চেষ্টা করার ন্যায় রামনাম ব্যতীত পরমার্থলাভের আশা করা বৃথা।

তুলসী হঠি হঠি কহত, নিত চিত সন হিত কর মান।

লাভ রাম সমিরণ বড়ী, বড়ী বিসারে হান ॥ ৩৩২ ॥

হে তুলসীদাস! আমি তোমাকে নিত্য নিয়মিত যে উপদেশ প্রদান করি, তাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া হৃদয়ে স্থানদান করিও—এবং ইহা নিশ্চয় জানিও, রাম স্মরণই পরমলাভ এবং তাঁহাকে বিস্মরণ হওয়াই পরম অমঙ্গলজনক।

বিগরী জনম অনেককি সুধরৈ অবহি আজু।

হোহি রামকি নাম জপু তুলসী ত্যজি কুসমাজু ॥ ৩৩৩ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল রামনাম

জপ কর—এই পতিতপাবন রামনামের গুণে অনেক ব্যর্থ জীবন সার্থক হইয়াছে।

বর্ষাঋতু রঘুপতি ভগতি তুলসীশালি সুদাস।
রাম-নাম বরবরণ জগ সাবন ভাদো মাস ॥ ৩৩৪ ॥

হে তুলসীদাস! ভগবান রঘুপতি বর্ষাঋতুর মত এবং শালী ধানের মত! এ জগতে রামনামই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের মত সুজল বর্ষণ করিয়া থাকে।

রামনাম নরকেশরী, কনককশিপু কলিকাল।
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি পালহিঁদল সুরসাল ॥ ৩৩৫ ॥

নৃসিংহ অবতারস্বরূপ এই রামনাম এবং হিরণ্যকশিপু স্বরূপ এই ঘোর কলিকাল; রসময় সাধকবৃন্দ তাহাতে প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তস্বরূপ হইয়াছেন।

যথা ভূমিবস বীজ মে নখত নিবাস আকাশ।
রামনাম সব ধরমময় জানত তুলসীদাস ॥ ৩৩৬ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি নিশ্চয় জানিও, পৃথিবী যেমন সমস্ত বীজ ধারণ করেন এবং আকাশ যেমন নক্ষত্রসমূহের বাসস্থান—রামনামও তেমনি সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান—ইহা সাধুজন সম্পাদ্য।

লঙ্ক বিভীষণ রাজ কপিপতি মারুত খগমীচ।
লহী রামসো নাম রতি চাহত তুলসী নীচ ॥ ৩৩৭ ॥

লঙ্কাধিপতি ভীষণ রাবণরাজা কপিরাজ হনুমান এবং জটায়ুপক্ষী মরণ সময়ে যেমন রামের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, নীচ তুলসীদাসও তদ্রূপ রামনামে ভক্তি-প্রীতি স্থাপন করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করিতেছেন

হরণ অমঙ্গল অঘ অখিল, করণ সকল কল্যাণ।
রামনাম নিত কহত হয়, গাওত বেদ পুরাণ ॥ ৩৩৮ ॥

সকল অমঙ্গলনাশক, সর্ব্বসন্তাপ সংহারক, সর্ব্ব কল্যাণপ্রদ রামনাম দেবাদিদেব মহাদেব নিত্য জপ করিয়া থাকেন এবং বেদ ও পুরাণে তাঁহারই মঙ্গলগাথা গ্রথিত হইয়াছে।

জল থল নভগতি অমিত অতি অজগজ জীব অনেক।
তুলসী তোঁহি সে দীনকো রামনাম গত এক ॥ ৩৩৯ ॥

এই চরাচর জগৎ জলচর, স্থলচর, ক্ষেচর প্রভৃতি বহুসংখ্যক জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; তুলসীদাসের মত দীনহীনের তাহার মধ্যে এক-মাত্র রামনামই ভরসাস্থল।

রসনা সাপিনী বদনবিল, যে ন পজহিঁ হরিনাম।
তুলসী প্রেম ন রামসোঁ, তাহি বিধাতা বাম ॥ ৩৪০ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—রামনামে প্রেম যাহার নাই—বিধাতা তার প্রতি প্রসন্ন হন না, যে হরিনাম জপ না করে—তাহার জিহ্বা সর্পের মত এবং মুখবিবর তাহার গর্ত্তের মত অনুমিত হয়।

হিয় ফাটহুঁ ফুটহুঁ নয়নজরও তে তন কেহি কাম।
দ্রবহি শ্রবহুঁ পুলকহিঁ নহিঁ তুলসী সুমিরত রাম ॥ ৩৪১ ॥

যে দেহ রামনাম স্মরণ এবং শ্রবণ করত প্রেমাশ্রুপুলকে পুলকিত না হয়—তাহা হইলে সে দেহের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; সেই দেহ পুড়িয়া ছাই হউক, চক্ষু অন্ধ হউক, এবং হৃদয় বিদীর্ণ হউক—ভক্ত-চূড়ামণী তুলসীদাসের ইহা মনের বাসনা।

হৃদয় সো কুশিল-সমান, যো ন দ্রবহি হরিগুণ শুনত।
করে ন রাম গুণগান, জীহসো দাদুর জীহসম ॥ ৩৪২ ॥

হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া যাহার হৃদয় গলিয়া না যায়, তাহা বজ্রের সমান কঠিন। আর যে জিহ্বা রাম গুণগান না করে, তাহা ভেক-জিহ্বাসদৃশ অলস।

তুলসী রামহি আপুতে সেবককি রুচি মিঠ।
সীতাপতি সে সাহিব হি, কৈসে দীজৈ পীঠ॥ ৩৪৩॥

তুলসীদাস বলিতেছেন, রাম নিজেই সেবকের পক্ষে অতি রুচিকর মিষ্টান্ন-স্বরূপ। অতএব এরূপ সীতাপতি প্রভু রামচন্দ্রের প্রতি (ভক্তবৃন্দ) কিরূপে বিরূপ হইবে? অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন না হইয়া কেমন করিয়া থাকিবে?

প্রভু তরু তর কপি ডার পর সোঁ। কিয়ো আপু সমান।
তুলসী কহুঁন রাম সোঁ সাহিব শীল নিধান॥ ৩৪৪॥

তুলসীদাস বলিতেছেন,—প্রভু রামচন্দ্রের মত দয়াময় আর কেহ নাই। তিনি স্বয়ং তরুতলবাসী হইয়াও বৃক্ষারূঢ় বানরকে আত্মসম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।

রাম সনেহি রামগতি রামচরণ রতি জাহি।
তুলসী ফল জগজন্ম কো দিয়ো বিধাতা তাহি॥ ৩৪৫॥

তুলসীদাস বলিতেছেন, রামের প্রতি যাঁহার মতি গতি এবং রাম চরণে যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, ভগবান তাহার নরজন্ম সার্থক করিয়াছেন।

আপু আপনেতে অধিক জেহি প্রিয় সীতারাম।
তেহি কো পগকি পানহী তুলসী তনকী চাম॥ ৩৪৬॥

যিনি আপনার অপেক্ষা রামসীতাকে অধিক প্রিয়জন মনে করেন, তুলসীদাস বলেন, তাঁহার পায়ের জুতাকে আমি আমার অঙ্গের চর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করি।

স্বারথ পরমারথ রহিত সীতারাম সনেহ।
তুলসী সোফল চারি, কো ফল হমার মত এহ॥ ৩৪৭॥

ভগবানের প্রতি স্বার্থ ও পরমার্থহীন যে স্নেহ, গোঁসাইজী বলিতে-

ছেন—আমার মতে তাহার ফল (ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ) চতুর্ব্বর্গ সদৃশ হইয়া থাকে।

যে জন রূখে বিষয় রস চিক্‌নে রাম সনেহ।
তুলসীতে প্রিয় রামকো কানন বসহিঁ কি গেহ ॥ ৩৪৮ ॥

তুলসীদাস কহিতেছেন,—যিনি বিষয় রসে না মজিয়া কেবল রাম-রসে বিগলিত হইয়াছেন, তিনি রামের পরম প্রিয়পাত্র। তাঁহার গৃহবাস আর কানন বাস উভয়ই সমান।

যথালাভ সন্তোষ সুখ রঘুবর চরণ সনেহ।
তুলসী জোঁ মন মূঢ় সোঁ জস্‌ কানন তস্‌ গেহ ॥ ৩৪৯ ॥

হে মূঢ়মতি তুলসীদাস! জগতে সামান্য লাভে সন্তোষ ও সুখ বোধ করিয়া শ্রীরামচরণে স্নেহ প্রদর্শন কর, এরূপ করিলে তোমার গৃহবাসই বা কি আর বনবাসই বা কি সমস্ত এক বলিয়া অনুমান হইবে।

তুলসী জো পৈ রাম সোঁ নাহিন সহজ সনেহ।
মূঢ় মূঢ়ায়ো বাদিহী ভাঁড় ভয়ো ত্যজি গেহ ॥ ৩৫০ ॥

হে তুলসীদাস! শ্রীরামের প্রতি যাহার একান্ত স্নেহ-মমতা নাই, সে সন্ন্যাসী হইলেও তাহাকে বৃথা মস্তক মুণ্ডনকারী ভণ্ড গৃহত্যাগী বলিয়া বিবেচনা করিও।

তুলসী শ্রীরঘুবর ত্যজি করৈ ভরোসা আওর।
সুখ সম্পত্তিকী কা চলী নরক হুঁ নাহি ঠৌর ॥ ৩৫১ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—যিনি রামের ভরসা ত্যাগ করিয়া অন্যের আশায় আশান্বিত হন, তাহার সুখ সম্পত্তির আশা বৃথা, নরকেও তাহার স্থান হইবে না।

তুলসী পরিহরি হরহরিহি পাঁথর পূজহিঁ ভূত।
অন্তযাজী হতহি হোঙ্গে জোঁও গণিকা পুত ॥ ৩৫২ ॥

হে তুলসীদাস! যে মূঢ়মতি হরিহরকে পরিত্যাগ করত পাথর ও ভূতগণের পূজা করে, সে পরিণামে বেশ্যাপুত্রের মত নিন্দার পাত্র হয়।

সবৈঁ সীতারাম নহিঁ ভজে ন শঙ্কর গৌরী।

জন্ম গবাঁয়ো বাদিহী রটত পরাহি পৌরী॥ ৩৫৩॥

যে মানব ইহজন্মে সীতারাম বা হরগৌরীর সেবা-অর্চ্চনা না করিয়া কেবল পরের প্রংশসা করিয়া কটাইল, সে নরাধমের মানবজন্ম বিফল হইল, বুঝিতে হইবে।

তুলসী হরি অপমানতে হোই অকাজ সমাজ।

রাজ করত রজ মিল গয়ে সদল সকুল কুরুরাজ॥ ৩৫৪॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—হরির অপমান জনক যে কার্য্য তাহা অতীব কুকার্য্যরূপে গণিত হইয়া থাকে। এইজন্য কুরুকুলপতি দুর্য্যোধন, রাজা হইয়াও সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাম দুরি মায়া বাড়তি ঘটতি জান মনমাহিঁ।

দুরি হোতি বরি দুরি দেখি শিরিপরি গমতরচ্ছাহিঁ॥ ৩৫৫॥

যেমন সূর্য্য দূরে থাকিলে নিজের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, মাথার উপর থাকিলে আর ছায়া দেখা যায় না, সেইরূপ রাম দূরে থাকিলে মায়ামোহে অভিভূত হইতে হয়, কাছে থাকিলে আর মায়া থাকে না।

সাহিব সীতানাথ সোঁ জব ঘটি হৈ অনুরাগ।

লসি তুতবাহঁ ভালতে ভভরি ভাগি হৈ ভাগ॥ ৩৫৬॥

যে দিন হইতে দয়াময় রামসীতার প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মিবে, হে তুলসীদাস! সেইদিন হইতেই তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন জানিবে।

করি হো কমলনাথ ত্যজি যবহিঁ দুসরি আশ।

জঁহা তঁহা দুখ পাই হেউ তবহি তুলসীদাস॥ ৩৫৭॥

হে তুলসীদাস! রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া যখনই তুমি পরের

আশা করিবে—সেই সময় হইতে তোমার সেখানে সেখানে দুঃখ-লাভ অনিবার্য্য।

জঙ্গল যুড়ে না লকড়ী সায়ের যুড়ে না নীর।

পড়ৈ উপাস কুবের ঘর জয় বিপক্ষ রঘুবীর।। ৩৫৮ ।

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিরূপ হইলে কুবের গৃহেও অন্ন পাওয়া যায় না বনে কাট আর সরোবরে জল মেলাও দুষ্কর।

বর্ষাকো গোবর ভয়ো কীচ হৈকো করৈ প্রীতি।

তুলসী তু অনুভবহি অব রাম বিমুখ কি রীতি।। ৩৫৯ ।।

বর্ষাকালের কর্দ্দম ও গোময়কে যেমন কেহ আদর করে না, হে তুলসীদাস! রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিহীন ব্যক্তির ও কিরূপ দুর্দ্দশা হয়—তাহা তুমি বুঝিয়া দেখ।

প্রেম কামতরু পরিহরত সেবত কলিতরু ঠুঠ।

স্বারাথ পরমারথ চাহত সকল মনোরথ ঝুট।। ৩৬০ ।।

ভগবানের পাদপদ্মরূপ প্রেম কল্পতরু ছাড়িয়া যাহারা স্বার্থ ও পরমার্থ প্রার্থনায় কলিকালরূপ বৃক্ষের শুষ্ক বৃক্ষের সেবা করে—অর্থাৎ যাহারা প্রেমময় রামনাম সাধন না করিয়া কলিকালের অভিঘ্নীত বিষয় সুখে প্রমত্ত হয়—তাহাদের কোন মনোবাসনাই সিদ্ধ হয় না।

নিজ দূষণ গুণ রামকে সমুঝে তুলসীদাস।

হোয় ভলো কলিকালহুঁ উভয় লোক অনায়াস।। ৩৬১ ।।

তুলসীদাস বলিতেছেন—নিজের দোষ ও রামচন্দ্রের গুণের বিষয় প্রণিধান করিতে পারিলে, এই কলিকালেও জীব ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়।

কৈতো হি লাগৈ রাম প্রিয় কৈতু প্রভু প্রিয় হোহি।

দ্বৈ মহঁ রুচৈ জে সুগম সো কী বৈ তুলসী তোঁহি।। ৩৬২ ।।

হে সাধু তুলসীদাস! রামকে তুমিই প্রিয় জ্ঞান কর বা তিনিই তোমাকে প্রিয় জ্ঞান করুন—এই দুইটীর মধ্যে যেটী সহজ—তুমি তাহারই উপায় উদ্ভাবন কর:

তুলসী দ্বৈ মহঁ এক হি খেল ছাড়ি ছল খেলু।
কৈ করু মমতা রাম সো কৈ মমতা পর হেলু ॥ ৩৬৩ ॥

হয় রামের প্রতি, না হয় সংসারের প্রতি, এই দুইয়ের মধ্যে একটীর প্রতি হে তুলসি! তুমি ছল-কপটতা ছাড়িয়া আকৃষ্ট হও।

হৈ তুলসীকে একগুণ অব গুণনিধি কহৈঁ লোগ।
ভলো ভরোসো রাওরো রামরীঝি বে যোগ ॥ ৩৬৪ ॥

হে তুলসীদাস! তোমাকে সকলে অগুণের সমুদ্র বলিয়া থাকে কিন্তু শ্রীরামের প্রতি তোমার উত্তম ভরসাই কেবল একটীমাত্র গুণ উহার দ্বারাই তুমি তাঁহার প্রসন্নতা লাভে সমর্থ হইবে।

সত্য বচন মানস বিমল কপট রহিত করতুতি।
তুলসী রঘুবর সেবকহি সকে ন কলিযুগ ধূতি ॥ ৩৬৫ ॥

হে তুলসীদাস! ভগবান রামচন্দ্রের সেবকগণ বিমলচিত্ত এবং কপটতা রহিত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে কলিকলুষ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

তুলসী সুখ জো রাম সো দুঃখী সো নিজ করতুতি।
করম বচন মন ঠিক জেহি তেহি ন সকৈ কলিধুতি ॥ ৩৬৬ ॥

শ্রীরাম হইতেই সুখলাভ হয়—অভিমান পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বকৃত কর্ম্মফলেই দুঃখভোগ করিয়া থাকে, হে তুলসী! যাহার মন, কাজ ও কথা ঠিক, ধূর্ত্ত কলি হইতে তাহার ভয় কোথায়?

নাতো নাতে রামকে রাম সনে সনেহু।
তুলসী মাঙ্গত জেরি, কর জন্ম জন্ম বুধি দেহু ॥ ৩৬৭ ॥

তুলসীদাস যোড়হস্তে ভগবানের কাছে এই ভিক্ষা করিতেছেন যে হে প্রভো! আমাকে জন্ম জন্ম এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করুন—যাহাতে আমি তোমাতেই আমার সকল ভক্তি-প্রীতি এবং সকল সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া ধন্য হই।

সব সাধনকো এক ফল জেহি জানই সোই জান।
জো তৌঁ মন মন্দির বসহি রাম ধরি ধনুবান ॥ ৩৬৮ ॥

সকলেই জানেন যে সকল সাধনার ফল একইপ্রকার, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সাধকের হৃদয়-মন্দিরে ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া বসিয়া আছেন।

জো জগদীশতৌ অতিভলো জো মহীশ তৌ ভাগ।
তুলসী চাহত জন্মভরি রামচরণ অনুরাগ ॥ ৩৬৯ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—যিনি জগৎ শাসন করেন—তাঁহার অতি সৌভাগ্য বলিতে হইবে, পৃথিবীর রাজা বড় বটে কিন্তু আমার মন যেন আজীবন রামচরণের সেবানুরক্ত থাকে—আমার ইহাই কেবল প্রার্থনীয় বিষয়।

হিত সো হিত রতি রাম সো রিপু সো বৈরতি হোউ।
উদাসীন সব সো সরস তুলসী সহজ স্বভাউ ॥ ৩৭০ ॥

হে তুলসীদাস! শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রতিমতি রাখা, হিতকারীর হিত সাধন করা, বৈরীর সহিত উদাসীন ভাব দেখানই যথার্থ সহজ ও সরল স্বভাব হইতেছে।

তুলসী মমতা রাম সো সমতা সব সংসার।
রাগন রোষন দোষ দুখ দান ভয়ে ভব ভার ॥ ৩৭১ ॥

হে তুলসীদাস! রামের প্রতি মমতা জন্মিলেই সংসারে সমতা লাভ হইয়া থাকে। সংসারভাব—রোষ ও দুঃখ এবং দোষ সকল তাহার কাছে দাসরূপে নত হইয়া পড়ে।

রাম হি উর কর সোঁ মমতা প্রীত প্রতীত।
তুলসী নিরুপধি রামকো ভয়ে হারিহু জীত ॥ ৩৭২ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি ভগবান রামচন্দ্রকে মনে মনে ভজনা কর, তাহা হইলে তাহার প্রতি সাতিশয় ভালবাসা জন্মিলে আর তোমাকে কোন বিষয়ে পরাজিত হইতে হইবে না, তখন জয়লক্ষ্মী তোমার অঙ্কশায়িনী হইবেন।

তুলসী রাম কৃপাল সোকহি সুনাহু গুণদোষ।
হোয় দুবরী দীনতা পরম পীন সন্তোষ ॥ ৩৭৩ ॥

হে সাধক কবি তুলসীদাস! ভগবান রামচন্দ্র পরম দয়ালু, তাঁহাকে তোমার দোষগুণ শ্রবণ করাও, ইহাতে তোমার সমস্ত দুঃখদৈন্য দূরীভূত হইয়া প্রাণে অপার আনন্দলাভ হইবে ॥ ৩৭৪ ॥

কর মঠ কঠ মলিয়া কহে জ্ঞানী জ্ঞান বিহীন।
তুলসী ত্রিপথ বিহায় গো রাম দুয়ারে দীন ॥ ৩৭৪ ॥

তুলসী বলিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি করাঙ্গুলির দ্বারা কাঠের মালা জপ করত নিজেকে পরম জ্ঞানী বলিয়া ধারণা করে কিন্তু তাহারাই আবার ত্রিপথ হারাইয়া ভগবানের কাছে আপনাকে দীন ভিখারী বলিয়া সাব্যস্থ করিয়া থাকে।

. কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহকে ধরি।
তিন মহঁ অতি দারুণ দুখদ মায়া রূপী নারী ॥ ৩৭৫ ॥

কাম ক্রোধ লোভাদি মদই বল আর প্রবল মোহই বল—সকলের অপেক্ষা মায়ারূপিণী স্ত্রীজাতিই সাতিশয় সন্তাপদায়িনী।

তুলসী দেবলা দেবকী লাগে লাখ করোরি।
কাক অভাগে হগি ভর্যো মহিমা ভৈকিয়োরী ॥ ৩৭৬ ॥

সাধককবি তুলসীদাস বলিতেছেন—দেবতার মন্দির নির্ম্মাণার্থ

লক্ষ বা কোটি টাকা ব্যয় হয় কিন্তু সেই মন্দির উপরে হতভাগ্য কাক সকল বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করে, ভগবানের এ কোন মহিমা বল দেখি?

ভলো কহে বিন জানি হুঁ বিন্থু জানে অপবাদ।
তে নর গাডুর জানি জিয় কবিয়ন হর্ষ বিষাদ ॥ ৩৭৭ ॥

না জানিয়া শুনিয়া যে লোক কাহার সুখ্যাতি বা অখ্যাতি প্রচার করে, সুখ-দুঃখে তাহার জীবন জর্জ্জরিত হয়।

পরসুখ সম্পত্তি দেখি সুখ জরহিঁ যে জড়বিন্থু আগি।
তুলসী তিন কো ভাগ্‌তে চলৈ ভলা হি ভাগি ॥ ৩৭৮ ॥

পরের সুখ দেখিয়া যে ব্যক্তি দুঃখপ্রকাশ করে—সে নিতান্ত অপদার্থ, বিনা আগুনে সে পুড়িয়া মরে এবং তাহার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হয়।

তন্থু গুণ ধন মহিমা ধরম তেঁহি বিন্থু যো অভিমান।
তুলসী জিয়ত বিড়ম্বনা পরিণাম হি গত জান ॥ ৩৭৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি আপনাদের দেহের, ধনের, গুণের এবং ধর্ম্মের অভিমান করিয়া থাকে। হে তুলসীদাস! তাহাদের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছু নয়! পরিণাম ফল তাহাদের কিছুতেই ভাল হয় না।

শাশু শ্বশুর গুরু মাতু পিতু প্রভু ভয়ো চাহৈঁ সব কোই।
হেনো দুজী আউরকো সুজন সরাহিয় সোই ॥ ৩৮০ ॥

শ্বশুর শাশুড়ী, গুরু, পিতা ও মাতা ইঁহারা সকলেই প্রভু পদবাচ্য হইতে চাহেন কিন্তু যিনি অপর পক্ষে অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ে পথ দেখাইবার জন্য প্রভুত্ব করিতে পারেন—তিনিই পরমাত্মীয় এবং গৌরবের পাত্র

উত্তম মধ্যম নীচ গতি পাহন শিকতা পানি।
প্রীতি পরীক্ষা তিহুঁনি কো বৈর ব্যতিক্রম জানি ॥ ৩৮১ ॥

শিলা, বালী ও জলরেখার ন্যায় উত্তম, মধ্যম ও অধম মানবের আনন্দদায়ক কিন্তু উহার বিপরীত ভাব বৈরতা আনয়ন করিয়া থাকে।

পুণ্য প্রীতিপতি প্রাপতি পরমারথ পথ পাঁচ।
লখাঁহু সুজন পরিহর হিঁখল শুনহু শিখাবন সাঁচ ॥ ৩৮২ ॥

পুণ্য, প্রীতি, পতি, প্রাপ্তি ও পরমার্থ এই পাঁচটী পথকে দেখিয়া, তাহা অবলম্বন করিবার জন্য ভাল লোকে খলের সঙ্গ ত্যাগ করত সত্য শিক্ষালাভে যত্নবান হয়।

নীচ নিরাদর উচকে আদর সুখদ বিশাল।
কদলী বদলী বিটপগতি পেখহু পনস রসাল ॥ ৩৮৩ ॥

ভাল লোকের আদর এবং খারাপ লোকের অনাদর আনন্দপ্রদ, যেমন আম-কাঁঠাল ছাড়িয়া ফুল ও কদলীর আদর কেহ করে না।

তুলসী আপনে আচরণ ভলো ন লাগত কাসু।
তহিঁ নরসাত জো খাত নিত লহ শুনহু কো বাসু ॥ ৩৮৪ ॥

হে তুলসীদাস! জাতীয় আচার-ব্যবহার কাহার না ভাল লাগিয়া থাকে? নিত্য মিষ্ট রস ভক্ষণে অভ্যস্ত ব্যক্তি কি কাহার কথা শুনিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হয়?

বুধ সোঁ বিবেকী বিমলমতি জেহিকে রোষ ন রাগ।
সুহৃত সবাহত সাধু জেহি তুলসী তাকে ভাগ ॥ ৩৮৫ ॥

হে তুলসীদাস! পণ্ডিত অপেক্ষা নির্ম্মলচিত্ত, বিবেকশালী ব্যক্তিই প্রধান, কারণ তাহার কোনপ্রকার রাগ-দ্বেষ নাই আর হৃদয়বান প্রশংসনীয় সাধুগণ অতীব সৌভাগ্যশালী।

আপু আপু কহঁ সবভলো আপন কহঁ কোই কোই।
তুলসী সব কহঁ জো ভলো সুজন সরাহিয় সোই ॥ ৩৮৬ ॥

হে তুলসি! আপন আপন বিষয়কে সকলেই ভাল বলিয়া থাকে কিন্তু যাহা সকলের পক্ষে ভাল—সেই প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

তুলসী ভলো সুসঙ্গতে পোচ কুসঙ্গতি হোই।
নাউকি নীর তীর আসনাহ বিলোকহু লোই॥ ৩৮৭ ।

হে সাধু তুলসী! সৎসঙ্গে লোকে সৎ হয় এবং অসৎসঙ্গে লোকে অসৎ হইয়া থাকে—নৌকার শোভা নীরেই হইয়া থাকে—তীরে নহে।

গুণ সঙ্গতি গুরু হোই সো লঘু সঙ্গতি লঘু নাম।
চার পদারথ সে গনৈ নরক দ্বারহুঁ কাম॥ ৩৮৮॥

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস—গুণীর সঙ্গে থাকিলে শ্রেষ্ঠত্ব ও চতুর্ব্বর্গলাভ হইয়া থাকে এবং নীচ লোকের সঙ্গে থাকিলে নীচত্ব ও নরকভোগ হইয়া থাকে—সে বিষয় সন্দেহ নাই।

নাম ললিত লীলা ললিত ললিতরূপ রঘুনাথ।
ললিতবসন ললিতভূষণ ললিতানুজ শিশু-সাথ॥ ৩৮৯॥

ললিত ললামরূপধারী রঘুনাথ, ললিত বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া আপনার ললিত অনুজ ক্ষুদ্র ভ্রাতাগণের সহিত লীলাখেলায় মত্ত হইয়াছিলেন।

রাম ভরত লক্ষ্মণ ললিত শত্রুশমন শুভ নাম।
সুমিরত দশরথ সুতন সব পুরহিঁ সব মনোকাম॥ ৩৯০॥

রাজা দশরথের রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও ললিত ললাম শত্রুঘ্ন এই চারিটী পুত্রের নাম স্মরণ কর—তাহা হইলে হে তুলসি! তোমার মনের সকল বাসনা সিদ্ধ হইবে।

নিজ ইচ্ছা প্রভু অবতরইঁ সুর গো দ্বিজহিত লাগি।
সগুণ উপাসক সঙ্গ তৈঁ রহে মোক্ষ সব ত্যাগী॥ ৩৯১॥

ভগবান রামচন্দ্র গো-ব্রাহ্মণ এবং দেবগণের মঙ্গল সাধনার্থ

স্ব-ইচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সেই সময় তাঁহার সগুণ উপাসকগণ মোক্ষলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া ছিলেন।

বাধক সব সবকে ভয়ে সাধক ভয়ে ন কোই।
তুলসী রাম কৃপালতে ভলী হোয় সো হোই ॥ ৩৯২ ॥

ভগবান রামচন্দ্রের কৃপাবলেই লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে নতুবা হে তুলসীদাস! জগতে সকলেই সকলের বাধক হইয়াছে—সাধক কেহই নাই। অর্থাৎ ভাল কাজে বাধা দিবার লোক অনেক, উৎসাহ দিবার কেহ নাই।

শঙ্কর প্রিয় মম দ্রোহী শিবদ্রোহী মম দাস।
তে নর করহিঁ কল্পতরি ঘোর নরক মহঁ বাস ॥ ৩৯৩ ॥

ভগবান বলিয়াছেন—শিবের সেবক যদি আমার বিপক্ষ হয় এবং আমার সেবক যদি শিবের বিপক্ষ হয়—তাহারা তাহাকে চারযুগ নরকে পচিয়া মরিতে হয়।

বিগল বিগল সুখসঙ্গ দুখ জিয়ন মরণ সোই রীতি।
রহেতে রাখে রামকে গয়েতে উচিত অনীতি ॥ ৩৯৪ ॥

সুখ-দুঃখ যেমন পর্য্যায়ক্রমে জীবকে ভোগ করিতে হয়—জীবন মরণও তদ্রূপ ভোগ হইয়া থাকে। ভগবান যদি রক্ষা করেন—তবে জীব এ জগতে জীবিত থাকে—নতুবা সে আচারবিহীন হইয়া মৃত্যুর অঙ্কশায়ী হইয়া পড়ে।

কৃশধন সখহীন দেবদুঃখ মুয় হেন মাঙ্গব নীচ।
তুলসী সজ্জনকী রহনি পাবক পানি বীচ ॥ ৩৯৫ ॥

ধনের অভাব, বন্ধু-বান্ধবের অভাব এবং দৈবকর্তৃক দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও কখন নীচজনের নিকট প্রার্থনা

করিবে না। সজ্জনগণ জল ও অগ্নির মত বাস করেন—অর্থাৎ তাহারা চির পবিত্র—চাহিতে হইলে তাঁহাদের নিকটই প্রার্থনা করিবে।

নীচ নীচাই নহি তাজে সজ্জনহুকে সঙ্গ।

তুলসী চন্দন বিটপি বসি বিনবিষ ভয়ে ন ভুজঙ্গ॥ ৩৯৬॥

চন্দন বনে বাস করিলেও যেমন সর্প কখন বিষহীন হয় না—সেইরূপ হে তুলসি! নীচলোকে সজ্জনসঙ্গ করিলেও কখন নীচত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে না।

ভলো ভলাই পৈ লহৈঁ লহৈঁ নীচাই নীচ।

সুধা সরাহী অমরতা গরল সরাহী মীচ॥ ৩৯৭॥

ভাললোকে ভাল পথ এবং খারাপ লোক খারাপ পথই অবলম্বন করে, যেমন দেবগণ অমৃতের এবং অসুরগণ মদের প্রশংসা করিয়া থাকে।

মিথ্যা মাহুর সজ্জনহি খলহি গরলসম সাঁচ।

তুলসী ছুবত পরায় জ্যঁও পারদ পাবক আঁচ॥ ৩৯৮॥

সজ্জনের নিকট মিথ্যা বিষবৎ এবং সত্য খলের নিকট গরল-তুল্য—হে তুলসীদাস! যেমন আগুণের উত্তাপ লাগিবামাত্র পারদ গলিয়া ভস্মসাৎ হয়। অর্থাৎ সজ্জন মিথ্যা চায় না, খল সত্য চায় না।

সন্তসঙ্গ অববর্গকর কামী ভবকর পন্থ।

কহহিঁ সাধু কবি কোবিদ শ্রুতি পুরাণ সব গ্রন্থ॥ ৩৯৯॥

পণ্ডিত, সাধু, কবি এবং বেদ পুরাণাদি গ্রন্থসমূহ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—সাধুসঙ্গ মোক্ষমূলক এবং কামীজন সঙ্গ সকল বন্ধনের হেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সুকৃত ন সুকৃতি পরিহরৈ কপট ন কপটী নীচ।

মরত সিখাবন সাদিযো গীধরাজ মারীচ॥ ৪০০॥

সুকৃতিশালী ব্যক্তি কখন সুকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে না;

এবং নীচজন কখন কপটতা ছাড়িতে সক্ষম হয় না। যেমন পক্ষীরাজ জটায়ু পক্ষী হইয়াও আপনার সাধুতা এবং মারীচ নিশাচর হইয়াও আপনার কপটতা বিশেষভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন।

পিয়হি সুমন-রস অলি বিটপ কাটি কীর ফল খাত।

তুলসী তরুজীবি যুগল সুমতি কুমতি কি বাত ॥ ৪০১ ॥

তুলসীদাস গোঁসাই বলেন—ভ্রমর ও শুক উভয়ে তরুজীবি হইলেও ভ্রমর পুষ্প হইতে মধুপান করে আর শুক বুদ্ধিদোষে শাখা কাটিয়া তাহার ফল ভক্ষণ করে।

অবসর কৌড়ী জো চূকৈ বহুরি দিয়ৈকা লাখ।

দুইজন চন্দ্রা দেখিয়ে উদয় কহ ভরি পাখ ॥ ৪০২ ॥

সময়ে কাণাকড়ি দ্বারা যে কাজ হয়—অসময়ে লক্ষ টাকাতেও সে কাজ হয় না। দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখিলেই যখন পুণ্য হয়—তখন একপক্ষ ভরিয়া চাঁদ দেখিলে আরও কত পুণ্য হয়—তাহা কে বলিতে পারে।

তুলসী জগজীবন অহিত কতহুঁ কোউ হিতজানি।

শোষক ভানু কৃশানু মহি পবন এক ঘনদানি ॥ ৪০৩ ॥

হে তুলসীদাস! কেহ কেহ মনুষ্য জীবনকে ভাল এবং কেহ কেহ মন্দ বলিয়া বিবেচনা করেন, যেমন সূর্য্য এবং অগ্নি পৃথিবীর রসশোষণ করেন —আর পবন ও মেঘ তাহাতে বারিবর্ষণ করিয়া তাহাকে সরস করে।

জলচর থলচর গগনচর দেব দনুজ নর নাগ।

উত্তম অধম মধ্যম খল দশগুণ বড়ত বিভাগ ॥ ৪০৪ ॥

জলচর, ভূচর, খেচর এবং দেব, মানব, দানব ও নাগগণের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম, অধম ও খলস্বভাব অনেক জীব রহিয়াছে। দেখিতে গেলে উত্তম মধ্যমাদি বিভাগ না বাড়িয়া কেবল মন্দেরভাগই দশগুণ বৃদ্ধি হইতেছে।

হৃদয় কপট বরবেশ ধর বচন কহৈ গড়ি ছোলি।
অবকে লোগ ময়ূর জ্যোঁ ক্যোঁ মিলিয়ে মনখোলি॥ ৪০৫॥

এ যুগের লোক সকল ময়ূরের ন্যায় সুন্দর রমণীয় বেশ ধরিয়া কপটহৃদয়ে কত ভাল কথা কয় কিন্তু প্রাণ খুলিয়া কাহার সহিত সরল ভাবে কথা কহিতে বা মিশিতে পারে না।

চরণ চোঁচ লোচন রঙ্গো চলি মরালী চাল।
ছির নীর বিবরণ সমৈ বক উঘরত ভেহি কাল॥ ৪০৬॥

বকের বর্ণ, চালচলন, পদ, চঞ্চু, চক্ষু সমস্তই হাঁসের মত দেখা যায় কিন্তু জলমিশ্রিত দুগ্ধপানের সময়ই তাহার কুতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

লোভে ইচ্ছা দম্ভ বল, কামকে কেবল নারী।
ক্রোধকে পরুষ বচন বল, মুনিবর কহহি বিচারী॥ ৪০৭॥

মুণিগণ বিচার করিয়া বলিয়াছেন—লোভের বল ইচ্ছা ও অহঙ্কার এবং কামের বল নারী এবং ক্রোধের বল কঠোর বচন।

জাঁয় কহব করতুতি বিনু জায় যোগ বিনু ক্ষেম।
তুলসী জাই উপায় সব বিনা রামপদ প্রেম॥ ৪০৮॥

হে তুলসীদাস! রামপদে প্রেমভক্তি ভিন্ন যোগ যাগ, স্তব স্তুতি যাহাই কর—কোন উপায়ই সিদ্ধিলাভ হয় না।

লোগ মগ্ন তু সব যোগ যোঁ যোগ জমা বিনু ক্ষেম।
ত্যোঁ তুলসীকে ভবগত্তু রাম প্রেম বিনু নেম॥ ৪০৯॥

লোকে যোগধর্ম্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন—ঐ যোগধর্ম্ম মুক্তি বিনা কখনও সিদ্ধ হয় না কিন্তু তুলসীদাসের ভবের সম্বল রাম-প্রেমের কোন নিয়ম নাই। অর্থাৎ রাম প্রেম লাভ করিতে হইলে যোগ-যাগের মত বাধাবাধি নিয়ম করিতে হয় না—কেবল ভক্তি সহকারে সাধনা করিলেই হইল।

তুলসী রাম জোঁ আদরো খাঠো খরো খরোই।

দীপক কাজর শিরে ধরো ধরো সুধ বোধ রাই ॥ ৪১০ ॥

হে তুলসি। কাজলের টিপ্ যেমন শিরোধার্য্য, তেমনি ভাল করেই হউক—আর মন্দ করেই হউক—রামচন্দ্রকে আদর করিতে পারিলে তিনি উজ্জ্বল দীপের মত হন—অর্থাৎ হেলায়-অশ্রদ্ধায় ভগবানের নাম করিলেও সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়।

তন বিচিত্র কায়র বচন অহি আহার মন ঘোর।

তুলসী হরি ভয়ে পক্ষধর তাতে কহ সব মোর ॥ ৪১১ ॥

গোঁসাই তুলসীদাস বলিয়াছেন—নানা বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত ময়ূর কঠোর ভাবী এবং সর্পাহারী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুচ্ছ আপন মাথার চূড়ায় ধারণ করেন। যতই মন্দ হউক না কেন ভগবানের নিকট ভক্তের আদর এইরূপ।

ঘর ঘর মাংগে টুকপুনি ভূপতি পূজে পায়।

হে তুলসী সব রাম বিনে তু অব রাম সহায় ॥ ৪১২ ॥

হে তুলসীদাস! শ্রীরামচন্দ্রজী যাহার সহায় সম্বল—সে কৌপীন পরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইলেও রাজা-মহারাজা তাঁহার পদ পূজা করিয়া ধন্য হইবে।

তুলসী রাম সুদীঠতে নিবল হোত বলবান।

বালি বৈর সুগ্রীবকে কহা কিয়ো হনুমান ॥ ৪১৩ ॥

হে তুলসীদাস। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যাহার ভক্তি আছে—সে দুর্ব্বল হইলেও বলবান। যেমন মহাবলী বালিরাজ রামসখা সুগ্রীবের শত্রু হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হনুমান অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া অসম সাহসিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

তুলসী রামহি তে অধিক রামভক্ত জিয় জান।

ঋনিয়াঁ রাজা রাম সো ধন ভয়ে হনুমান॥ ৪১৪॥

হে তুলসীদাস! ভক্তজন ভগবান হইতে বড়। রামভক্তি, অভাব-গ্রস্ত ঋণী ব্যক্তিকেও রাজা করিতে পারেন—সেইজন্য বনের বানর হনুমান রামভক্তি বলে শ্রীরামচন্দ্র হইতেও বড় হইয়াছেন।

কিয়ো সো সেবকধর্ম্ম কপি প্রভু কৃতজ্ঞ জিয়জান।

জোরি হাত ঠাঢ়ে ভয়ে বরদায়ক বরদান॥ ৪১৫॥

বানররাজ হনুমানের রামের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দাস্য ভাবের তুলনা নাই। তিনি বরদাতা প্রভু রামচন্দ্রের কাছে সতত করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকেন।

ভক্ত হেত ভগবান প্রভু রাম ধরো তন্ ভূপ।

কিয় চরিত্র পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ॥ ৪১৬॥

ভক্তের জন্য ভগবান রামচন্দ্রের অবতার গ্রহণ, তিনি রাজার দেহ ধারণ করত ঠিক মানবের মত অতি পবিত্র আদর্শ চরিত্র লইয়া মানবের আচরণীয় কার্য্য সকল সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় কন্দ ভানুকুল কেতু।

চরিত করত নর অনু হরত সংসৃত সাগর সেতু॥ ৪১৭॥

প্রাতঃস্মরণীয় সূর্য্যবংশাবতংশ বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ ভগবান রামচন্দ্র নর-কলেবর ধারণ করিয়া সাগর বন্ধন করত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।

বাল বিভূষণ বসন বর ধূরি ধূসরিত অঙ্গ।

বালকেলি রঘুবর করত বালবন্ধু সব সঙ্গ॥ ৪১৮॥

ভগবান রামচন্দ্র ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ হইয়া বাল্যকালের বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক বাল্যবন্ধুগণের সহিত বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন।

অনুদিন অবধর ধাবনে নিত নব মঙ্গল মোদ।

মুদিত মাতু পিতু লোগ লখি রঘুবর বাল বিনোদ ॥ ৪১৯ ॥

প্রতিদিন বালবিনোদ রঘুনাথ রামচন্দ্র নূতন নূতন মঙ্গলময় লীলাখেলার অবতারণা করিতেন—তাহা দেখিয়া পিতামাতা ও অন্যান্য লোক সকল প্রফুল্লিত হইতেন।

কৌশল্যা কল্যাণময় মূরতি করত প্রণাম।

সকল সুমঙ্গল কাজ শুভ কৃপা করহিঁ সীয় রাম ॥ ৪২০ ॥

কল্যাণময়ী কৌশল্যা মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলে, কৃপা নিধান সীতারাম সকলের সকল প্রকার মঙ্গল ও আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।

সুমিরি সুমিত্রা নাম জপ জ্যোতির সেহিঁ সুনেম।

সুবর্ণ লষণ রিপুদমন সে পাওহিঁ পতিপদ প্রেম ॥ ৪২১ ॥

দেবী সুমিত্রার নাম স্মরণপূর্ব্বক নিয়মিত জপ করিলে নারী-জাতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিও রিপুদমন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং পতিপদে প্রেম-ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সীতা চরণ প্রণাম কর সুমিরি সুনাম সুনেম।

সোতিয় হোহি পতি দেবতা প্রাণনাথ প্রিয় প্রেম ॥ ৪২২ ॥

যে স্ত্রী সীতার চরণে প্রণাম করিয়া নিয়মিত তাহার পবিত্র নাম স্মরণ করে, তিনি স্বামীর অতীব আনন্দদায়িনী হন এবং তাঁহার স্বামী দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বসি কু-সঙ্গ গহ সুজনতা তাকী আশা নিরাশ।

তীরথহুকো নাম ভো গয়া মাহকে পাস ॥ ৪২৩ ॥

কু-সংসর্গে ভ্রমণ করিলে সুজনেরও সকল সৌজন্য নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার আশা ভরসা সমস্ত নষ্ট হয়, গয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান যেমন গয়া নামে অভিহীত হয়, দুর্জ্জনের নিকটে থাকিলে সেও দুর্জ্জন হইয়া থাকে।

রাম কৃপা তুলসী সুলভ গঙ্গ সুসঙ্গ সমান।

যোজন পরে যোজন মিলৈ কিজৈ আপু সমান ॥ ৪২৪ ॥

হে তুলসীদাস! শ্রীরামচন্দ্রের কৃপালাভ করা অতি সহজ, গঙ্গা ও সাধুসঙ্গের সমান সহজ সাধ্য। যোজন হইতে যোজন দূরে থাকিলেও ভগবান ভক্তকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দেন ও আপনার করিয়া লয়েন।

করু বিচার চলু সুপথ ভল আদি মধ্য পরিণাম।

উল্‌টে জপে যে রাম রাল সিধে রাজা রাম ॥ ৪২৫ ॥

বাল্য যৌবন ও বৃদ্ধ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া সৎপথে বিচরণ করিতে অভ্যাস কর। যে ব্যক্তি উল্টাভাবে অর্থাৎ মরা মরা করিয়া রামনাম জপ করে সে সোজাভাবেও রাজা রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে পারে—যেরূপ বাল্মীকি মুনি করিয়াছিলেন।

হোই ভালেকে অনভলো হোয় দানিকে সুম।

হোই কুপুত সুপুতকে জ্যাও পাবককে ধুম ॥ ৪২৬ ॥

অগ্নি হইতে যেরূপ ধুম বহির্গত হয়, তেমনি সৎলোক হইতেও মন্দ এবং দাতা হইতেও কৃপণতা দোষ বাহির হইয়া পড়ে—যেমন সুপুত্র হইতে কুপুত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়।

যো যো যেহি যে হি রস মগন তঁই সোঁ মুনি মানি।

রস গুণ দোষ বিচারিও রসিক রীতি পহিঁ চানী ॥ ৪২৭ ॥

যিনি যে রসে নিমগ্ন আছেন, তিনি সেই রসই ভালবাসেন—এইজন্য সুরসিক জনের নিয়মানুসারে রসের ভালমন্দ বিচার করা উচিত।

বিরুচি পরখিয়হ সুজন জনরাখি পরখিয়হি মন্দ।

বাড়বানল শোষত উদধি হর্ষ বড়াবত চন্দ ॥ ৪২৮ ॥

বাড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিল শোষণ করিয়া থাকে এবং চন্দ্র যেমন

তাহার হর্ষবর্দ্ধন করে; সেইরূপ দুর্জ্জন লোক পরের দোষ এবং সজ্জন লোক অপরের গুণ বিচার করিয়া থাকেন।

প্রভু সম্মুখে ভয় নীচনর নিপট ভয়ে বিকরাল।
রবিরুখ লখি দর্পণ ফটিক উগিলত জ্বালা জাল ॥ ৪২৯ ॥

রৌদ্রতাপে যেমন দর্পণ এবং স্ফটিকমণি কখন কখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তেমিনি প্রভু রামচন্দ্রের সম্মুখে নীচলোক ভয়ে জড়সড় হইয়া বিকট-মূর্ত্তি ধারণ করে।

প্রভু সমীপগত সুজন হোত সুখদ সো বিচারি।
লবণ জলধি জীবন জলদ বারত সুধা সম বারি ॥ ৪৩০ ॥

সুজনগণ ভগবানের মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিলে অতিশয় সুখবোধ করে, আর মেঘসকল লবণ সমুদ্র হইতে বারি গ্রহণ করত সুধা-বারি বরিষণ করিয়া থাকে।

নীচ নীরা বঁহি নীরস তরু তুলসি নীচহি রূখ।
পেষিত পয়দ সমান সব বিষ পিয়ুস কি সুখ ॥ ৪৩১ ॥

কবি তুলসীদাস কহেন—নীচজন কেবল শুষ্ক তরুতে উত্তপ্তবারি প্রদান করে, কিন্তু জলদ সকল শীতল জলদানে কি বিষবৃক্ষ কি পিযুষবৃক্ষ সকলকেই পোষণ করিয়া থাকে।

বরষি বিশ্ব হর্ষিত করত হরত তাপ অঘ পিয়াস।
তুলসী দোষণ জলদ কো জো জল জারৈজ বাস ॥ ৪৩২ ॥

গোঁসাই তুলসীদাস বলেন—মেঘ সকলকে কেমন করিয়া দোষী করিতে পারা যায়, যখন তাহারা বারিবর্ষণ করিয়া বিশ্ববাসীর আনন্দোৎপাদন, পাপতাপ দূর এবং পিপাসা নষ্ট করিতেছে।

লাভ সময় কো পালিয়ো হানি সময়কি চূক।
সদা বিচারহিঁ চারুমতি সুদিন কুদিন দিন দুক ॥ ৪৩৩ ॥

সময়ের সদ্ব্যবহার করাই পরমলাভ এবং অপব্যবহার করাই অত্যন্ত হানিজনক, এইজন্য বুদ্ধিমান জনগণ সুদিন কুদিন বিচার করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিবেন।

সিন্ধু তরণ কপি গিরিহরণ কাজ সাহস্থিত দোউ।
তুলসী সময় হি সম বড় বুঝত কহুঁ কোউ কোউ ॥ ৪৩৪ ॥

হে তুলসীদাস! সময় সকলের অপেক্ষা বড়—ইহা সকলে বুঝুক আর নাই বুঝুক, কেহ কেহ ইহা বুঝিয়াছে, এইজন্য সময় বুঝিয়া হনুমান সাগর লঙ্ঘন ও গন্ধমাদন গিরি আনিয়াছিলেন।

তুলসী মীঠী অমীতে সঙ্গী মিলৈ জো মীচু।
সুধা সুধাকর সময় বিন্ধ কালকূটতে মিচু ॥ ৪৩৫ ॥

হে তুলসীদাস! অসময়ে সুমিষ্ট অমৃত হইতেও মৃত্যু হইতে পারে এবং সুধাকর চন্দ্র হইতে কালকূট বিষ উৎপন্ন হইতে পারে।

তুলসী অসময়কো সখা ধীরজ ধর্ম্ম বিবেক।
সাহিত সাহস সত্যব্রত রাম ভরোসো এক ॥ ৪৩৬ ॥

হে কবি তুলসীদাস! অসময় অর্থাৎ বিপদকাল সমুপস্থিত হইলে বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে ধৈর্য্য ধারণ ও ধর্ম্মাবলম্বন করিবে—কারণ উহাই অসময়ে বন্ধুস্বরূপ এবং সেইকালে অতীব সাহসের সহিত সত্যব্রত ধারণ করত একমাত্র প্রভু রামের প্রতি আশা-ভরসা স্থাপন করিয়া থাকিবে।

সাহের তে সেবক বড়ো জো নিজধর্ম্ম সুজান।
রাম বাঁধি উতরে উদধি নাঙ্ঘী গয়ো হনুমান ॥ ৪৩৭ ॥

স্বধর্ম্ম পরায়ণ সাধককে প্রভু রামচন্দ্র হইতেও বড় বলিয়া ধারণা করিতে হইবে—যেহেতু রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়া সাগর পার হইয়াছিলেন আর হনুমান ভক্তিবলে লম্ফ প্রদান করিয়া সিন্ধুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

তুলসী নিজ করতুতি বিন মুক্ত জানো জব কোই।

গয়ো অজামিল লোক হরিনাম সকে। নহি ধেয়ই ॥ ৪৩৮ ॥

হে তুলসীদাস! লোক যত ধর্ম্ম করুক, নিজ সুকৃতি ভিন্ন কেহই মুক্ত হইতে পারে না। দেখ, অজামিল নিজ সুকৃতিবলে মৃত্যুসময়ে হরিনাম করিয়া মোক্ষপাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বড়ো গহেক্তে হোত বড় জোঁত বামন কর দণ্ড।

শ্রীপ্রভুকে সঙ্গ সোঁ। বড়ী গয়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ॥ ৪৩৯ ॥

মহতের সঙ্গে মহত্ব লাভ অনিবার্য্য, যেমন বামনদেব বলিরাজার দণ্ড বিধান করিলেও তিনি তাঁহার সঙ্গলাভ জনিত পুণ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহৎ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দম্ভ সহিত কলিধর্ম্ম সব ছল সমেত ব্যবহার।

স্বারথ সহিত সনেহ সব রুচি অনুহরত আচার ॥ ৪৪০ ॥

কলির লোক অতীব দাম্ভিকতার সহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; ব্যবহারে ছলনা করিয়া থাকে, পবিত্র প্রণয়ে স্বার্থের পরাকাষ্ঠা দেখায় এবং যাহার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করে—শাস্ত্রের শাসন আর তত কেহ গ্রাহ্য করে না।

চোর চতুর বটপার ভট প্রভুপ্রিয় ভরু হা ভণ্ড।

সর্ব্বভক্ষক পরমার্থী কলি সুপন্থ পাষণ্ড। ৪৪১ ॥

কলিযুগে সকল সম্প্রদায়ের লোক দুর্বৃত্ত হইয়া পড়িবে, শাস্ত্র ব্যবসায়ী তত্ত্বজ্ঞানী মানবগণ সর্ব্বভুক হইবে, চৌরগণ চতুর হইবে, যোদ্ধাগণ বাটপাড় হইবে, আর প্রভুভক্তগণ অতিশয় ভণ্ড হইয়া পড়িবে।

অশুভ বেশভূষণ ধরেঁ ভক্ষ অভক্ষ জে খাহি।

তে যোগী সে সিদ্ধ নরপূজিত কলিযুগ মাহি ॥ ৪৪২ ॥

এই কলিযুগে যাহারা খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিবে না এবং

ইচ্ছামত পোষাকপরিচ্ছদন পরিধান করিবে—তাহারাই যোগ-সিদ্ধ এবং নরপূজিত বলিয়া সম্মানিত হইবে।

জে অপকারী চার তিনকর গৌরব মানতেই।
মন বচ কর্ম্ম লবায় তে বক্তা কলিকাল মই ॥ ৪৪৩ ॥

পরের মন্দকারী জনগণই কলিকালে সম্মানাস্পদ হইবে; এবং কায়মনে মিথ্যাকথা বলিয়া যে দিগন্ত কাঁপাইতে পারিবে—সেই পরমবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবে।

ব্রহ্মজ্ঞান বিনু নারীনর কহহিঁ ন দুসরি বাত।
কৌড়ী লগিতে মোহবশ করহিঁ বিপ্রগুরু ঘাত ॥ ৪৪৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান সুদুর্লভ কিন্তু এই কলিকালে সামান্য স্ত্রীপুরুষেও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিবে। এ-কালের মনুষ্য সকল অর্থলোভ ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা প্রভৃতি করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

বাদহিঁ শূদ্র দ্বিজনসম হমতুমতে কছু ঘাটি।
জাঁনহি ব্রহ্ম সো বিপ্রবর আঁখি দিখাবহি ভাটি ॥ ৪৪৫ ॥

কলিকালে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিবে—"আমি তোমাদের চেয়ে নীচ কিসে" যে ব্রহ্মকে জানে—সেই ব্রাহ্মণ তোমরা তাঁহাকে জান কি? ইত্যাদি অস্পর্দ্ধা সূচক কথায় অপমান করিবে।

শ্রুতিসম্মত হরিভক্তি পথ সংযুত বিরতি বিবেক।
তেহিঁ পরিহরহিঁ বিমোহবশ কল্পহিঁপন্থ অনেক ॥ ৪৪৬ ॥

শ্রুতিসম্মত উদ্ধারের পথই বিবেক বৈরাগ্যযুক্ত হরিভক্তি; কিন্তু এই কলিকালের লোকে ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া অনেক কাল্পনিকপন্থা আবিষ্কার করিতেছে।

সর্ব্ব ধর্ম্ম বিপরীত কলিকল্পিত কোটী কুপন্থ।
পূণ্য পরায়পহারবন দূর পুরাণ শুভ গ্রন্থ ॥ ৪৪৭ ॥

ধর্ম্ম সকল বিপরীতভাব ধারণ করিয়া এই কলিকালে কোটী কোটী কল্পিত কু-ভাবে পরিচালিত হইবে; পুণ্যময় পৌরাণিক গ্রন্থ সকল অগ্রাহ্য করিয়া সকলে দূরে ফেলিয়া দিবে।

তুলসী পাবনকো সময় ধরিকো কলন মৌন।
অবতৈ দাদুর বোলিহৈঁ হমৈ পুঁছিহৈঁ কৌন ॥ ৪৪৮ ॥

তুলসীদাস গোঁসাই বলিতেছেন—কলিতে ধার্ম্মিকের আদর থাকিবে না; সে কেমন না—বর্ষাকালে ভেক সকল সমস্বরে কলরব করিলে যেমন কোকিলগণ নীরব হইয়া থাকে—তাহারা ভাবে এখন তাহাদের স্বর সকলেই অগ্রাহ্য করিবে। এ যুগে ধার্ম্মিকের ভাবও তেমন।

কুপথ কুতর্ক কুবাণী কলি কপট দম্ভ পাষণ্ড।
দহন রাম গুণগ্রাম জিমিই ধন অনল প্রচণ্ড ॥ ৪৪৯ ॥

কুতর্ক, কুপথ, পরনিন্দা, দম্ভিকতা প্রভৃতি কলির জীবের অঙ্গাভরণ হইবে; রাম গুণগানরূপ অনলে উহা ভস্মীভূত হইলে আবার পবিত্রতা লাভ হইবে—যেমন আগুণে ধনরাশি দগ্ধ হইয়া মানুষের পবিত্রতা আনয়ন করে।

কলি পাষণ্ড প্রচার, প্রবল পাপ পামর পতিত।
তুলসী উভৈ অধার রামনাম সুরসরি সলিল ॥ ৪৫০ ॥

কলিতে পাষণ্ড জনগণের মত প্রবলরূপে প্রচারিত হইবে এবং পাপ-মতি জনগণ সর্ব্বদা পাপে মগ্ন হইয়া থাকিবে। হে তুলসীদাস! তুমি এই সকল নানাকল্পে রামনাম সুরনদীর জল পান করিয়া ধন্য হও।

রামচন্দ্র মুখচন্দ্রমা চিত চকোর জব হোই।
রাম কাজ সবকাম শুভ সময় সুহাবন সোই ॥ ৪৫১ ॥

তুলসীদাস বলেন—ভগবান রামচন্দ্রের শ্রীমুখচন্দ্রমার সুধাপানে

যাহার চিত্ত-চকোর সদাই প্রমত্ত হইয়া থাকে; তাহার যাবতীয় কাজকর্ম্মই মঙ্গলময় সন্তোষদায়ক হইয়া থাকে।

বীজ রামগুণগণ নয়ন জল অঙ্কুর পুলকালি।

সুকৃতি সুলভ সুখেত বর বিলসত তুলসী শালি ॥ ৪৫২ ॥

গোঁসাই কবি তুলসীদাস বলেন—সুকৃতিরূপ উর্ব্বর ভূমিতে রামনাম স্বরূপ বীজ বপন করতঃ নয়নের জল ছড়াইলে, তাহা হইতে পুলকরূপ অঙ্কুর উদ্গম হইয়া সাধককে অভীষ্ট ফলদানে সন্তুষ্ট করে।

তুলসী সহিত সনেহ নিত সুমিরহু সীতারাম।

সগুণ সুমঙ্গল শুভ সদা আদি মধ্য পরিণাম ॥ ৪৫৩ ॥

বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধকালে সতত—হে তুলসীদাস! তুমি সর্ব্ব শুভময় ও সুমঙ্গলপ্রদ সীতারামকে ভক্তি-প্রীতির সহিত প্রত্যহ হৃদয়মধ্যে ধারণা করিবে।

পুরুষারথ স্বারথ সকল পরমারথ পরিণাম।

সুলভ সিদ্ধি সব সাহিবী সুমিরত সীতারাম ॥ ৪৫৪ ॥

ভগবান রাম ও সীতাকে স্মরণ করিলে পরকালে সকলপ্রকার স্বার্থ, পুরুষার্থ, পরমার্থ এবং নানাপ্রকার সিদ্ধি অতি সহজে করতলগত করিতে পারা যায়।

কা ভাষা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাঁচ।

কাম জো আবৈ কামরী কালৈ করৈ কুমাচ ॥ ৪৫৫ ॥

যাহার যে ভাষা, সেই ভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক, ভগবানের প্রতি সত্য প্রেম স্থাপন করা আবশ্যক; আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ পালন করিবে, কারণ কাল কি হইবে—তাহা ত কেহ বলিতে পারে না। রাবণ রামচন্দ্রকে ইহাই উপদেশ দিয়াছিলেন।

পরমানন্দ কৃপায়তন মন পরিপূরণ কাম।

প্রেম ভক্তি অনপাবনী হমহি দেহু শ্রীরাম ॥ ৪৫৬ ॥

হে দয়াল রামচন্দ্র! তুমি কৃপাময় পরমানন্দ স্বরূপ এবং ভক্তগণের অভীষ্ট ফলদাতা, ঠাকুর! আমার মত পতিত জনকে তুমি প্রেমভক্তি দানে ধন্য কর।

বারিভয়ে ঘৃত হোয় বরু সিকতাতে বরু তেল।

বিনু হরিভজন ন ভব তরৈ চহ্ সিদ্ধান্ত অপেল ॥ ৪৫৭ ॥

বারি হইতে বরং ঘৃত উৎপন্ন হওয়া সম্ভব এবং বালুকা হইতে বরং তৈলের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে শ্রীহরির ভজন বিনা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আর কোন উপায় নাই।

জো চেতন কহঁ জড় করৈঁ জড়ৈ কর হিঁ চেতন।

অস্ সমর্থ রঘুনাথ কহি ভজহিঁ জীব তে ধন্য ॥ ৪৫৮ ॥

যিনি অচেতনকে চৈতন্যময় এবং চৈতন্যময়কে অচৈতন্য করিতে পারেন—সেই সর্ব্বশক্তিময় পরম পুরুষ ভগবান রামচন্দ্রকে যাঁহারা ভজনা করেন—এ জগতে তাঁহারাই ধন্য।

শ্রীরঘুবীর প্রতাপেতে সিন্ধু পরে পাষাণ।

তে মতিমন্দ যো রাম ত্যজি ভজহিঁ যায় প্রভু আন ॥ ৪৫৯ ॥

রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের প্রবল প্রতাপে সমুদ্রও পাষাণ গলে ধারণ করিয়াছিল—এমন রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া যাহারা অন্য দেবতার ভজনা করিতে যায়—তাহারা যে অতীব মন্দমতি, তাহার আর সন্দেহ কি?

বলকল ভূষণ ফল অশন বিন শয্যা দ্রুম প্রীতি।

তেহি সময় লঙ্কা দহি হই রঘুবীরকি রীতি ॥ ৪৬০ ॥

বলিহারী যাই ভগবান রামচন্দ্রের ইচ্ছায়, যখন তিনি বল্কল পরিধান করিয়া, বনের ফলমূল আহার করিয়া, বিনা শয্যায় তরুমূলে আন-

নের সহিত বাস করিতেন—সেই সময় তিনি সোণার লঙ্কা পুড়াইয়া ছারখার করিয়াছিলেন।

কৃপণ দেই পাই ন পরো বিনু সাধন সিধি হোয়।

সীতাপতি সম্মুখ সমুঝি সো কিজৈ শুভ সোই ।। ৪৬১ ।।

কৃপণ যেমন পরকে একপয়সা দেয় না, সেইরূপ বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ ভাবিয়া যে কাজ করা যায়—তাহাতেই শুভ লাভ হইয়া থাকে।

শিলা সো তিয় ভই গিরি তরে মৃতক জিয়ে জগজন।

রাম অনুগ্রহ সগুণ শুভ সুলভ সকল কল্যাণ ॥ ৪৬২ ॥

যে রামচন্দ্রের অনুপম অনুকম্পায় পাষাণ মানবী হয়—জলে শীলা ভাসে এবং মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবনলাভ করে; সেই রামচন্দ্রের কৃপা হইলে যে মানুষ অনায়াসে মঙ্গল এবং কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়—তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কি আছে?

অতুলিত মহিমা বেদ কি তুলসী কিয়ে বিচার।

যো নিন্দত নিন্দিত ভয়ে বিদিত বুদ্ধ অবতার ॥ ৪৬৩ ॥

ভগবৎ মুখনিঃসৃত বেদের মহিমা অতুলনীয়—হে তুলসীদাস! যিনি অহরহঃ বেদের নিন্দা করেন, তিনি নিজেই নিন্দিত হইয়া থাকেন—যেমন বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন।

অনহিত ভয় পরিহিত কিয়ে, পর অনহিত হিত হানি।

তুলসী চারু বিচারু ভল, করিয় কাজ শুনি জানি ॥ ৪৬৪ ॥

পরের ভাল করিলে আপনার মন্দ হইবে, এবং পরের মন্দ করিলে আপনার ভাল হইবে, মনে করিয়া হে তুলসীদাস! তুমি নিজের হিতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিশেষ বিচার পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া কার্য্য করিও। আপনার মন্দ করিয়াও পরের ভাল করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

অর্ব্ব খর্ব্ব লো লাছমি উদয় অস্ত লো রাজ।

তুলসী যো নিজ মরণ হ্যায় আওয়ে কেহি্ কাজ ॥ ৪৬৫ ॥

অসংখ্য ধন থাকিলে এবং উদয়াস্ত পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকার লাভকারী রাজারই বা সুখ কোথায়? এইজন্য গোস্বামী তুলসীদাস বলিতেছেন—যখন জন্মাইলে মৃত্যু সুনিশ্চত, তখন রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের কোন আবশ্যকই নাই।

প্রেম বরাবর যোগ নহি, প্রেম বরাবর জ্ঞান।

প্রেম ভক্তিহীন সাধবা সবহি্ থোখা ধ্যান ॥ ৪৬৬ ॥

প্রেমের তুল্য যোগ এবং প্রেমের তুল্য জ্ঞান আর নাই; যে সকল সাধু প্রেমভক্তি বিহীন হইয়াছে—তাহাদের ধ্যান জ্ঞান কোন কাজেরই নয়।

হায় হায় পত্তি কব মিলিয়েঁ ছাত্ত ফাটি যায়।

য্যায়সা দিন কব হোগা দর্শন কঁরু অথায় ॥ ৪৬৭ ॥

পতির সহিত আমার মিলন কবে হবে—এমন শুভদিনের আর বিলম্ব কত—সে শুভদিন আসিলে আমি তাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া প্রাণে শান্তিলাভ করিব; এক্ষণে তাহার অদর্শনে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে।

আজ্ঞাকারী পিউকি রহেল পিয়াকে সঙ্গ।

তনমন সে সেবা করে আওর ন দুজা রঙ্গ ॥ ৪৬৮ ॥

সকল ভাবনা ছাড়িয়া সর্ব্বদা পিয়ার আজ্ঞাধীন হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করত কায়মনে তাহার সেবায় নিযুক্ত হও, তাহা হইলে যে তোমার জীবন সার্থক হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

পহিলে বুরা কমায় কর বাঁধি বিষ কি পোট।

কোটী করম পলমে কাঁটে যব আওয়ে গুরুকি ওট ॥ ৪৬৯ ॥

প্রথমে অজস্র অপকর্ম্ম করিয়া পাপে ভরা বাঁধিলেও পরে যদি শ্রীগুরুর পদাশ্রয়ে আশ্রয় লওয়া যায়—তাহা হইলে কোটী কোটী কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

সুখ সম্পত্তি পরবার ধন সুন্দর বরনারী।
সুপনে ইচ্ছা না উঠে গুর আন্ তুম্হারী ।। ৪৭০ ।।

হে গুরু! তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন আমার মনে যেন আর কোন বাসনা না জাগে, আমি স্বপনেও যেন সুখ, সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন এবং সুন্দরী স্ত্রীর আকাঙ্খা না করি।

ফুলমাহি যেঁও বাস, কাটমে অগ্নি ছিপানী।
খোদ বিন নাহি মিলে ধরতী মে পানি ।। ৪৭১ ।।

ফুলের মধ্যে যেমন গন্ধ এবং কাঠের মধ্যে যেমন আগুণ লুকান রহিয়াছে; ভগবান তেমনি মানবদেহের মণিকোটায় বিরাজ কচ্ছেন, মাটী না খুঁড়িলে যেমন জল পাওয়া যায় না—সেইরূপ ভজন-সাধন বিনা তাঁহার দর্শন অসম্ভব।

দিনা চারকা খেল হ্যায় ঝুঠা জগৎ-পসার।
যিন বিচারপতি না লখা বুড়ে ভৌজল ধার ।। ৪৭২ ।।

এ জগতের সকলই অসার—জীব সকল দুই চারিদিনের জন্য এখানে আসিয়া খেলা করে। যাহারা বিবেক বৈরাগ্যলাভ করিয়া প্রিয়তম পতি-দর্শনের বাসনা না করে তাহারা নিশ্চয়ই এই সংসারসাগরে ডুবিয়া যায়।

ভক্তি দান গুরু দিজিয়ে দেবন কি দেবা।
জনম পায় না বিসরা করিহু পদসেবা ।। ৪৭৩ ।।

হে দেবের দেব শ্রীগুরু! তুমি দয়া করিয়া আমাকে ভক্তি-ধন প্রদান কর। আমাকে যদিও পুনর্ব্বার এই ধরাতলে জন্ম লইতে হয়—তথাপি যেন তোমার পাদপদ্ম বিস্মৃত না হই।

তীরথ বরত মাঁহি না কঁরু দেবন পূজা।
মনসা বাচা কর্ম্মণা মেরে আউর না দূজা ॥ ৪৭৪ ॥

তীর্থভ্রমণ, বার-ব্রত বা অন্য কোন দেবতার পূজায় যেন আমার মন না যায়—আমি যেন কায়মনে তোমার সেবা করিতে পারি—হে প্রভু! আমাকে সেই বরদান করুন।

সোণা কাই নাহি লাগে, লোহা ঘুণ নাহি খায়।
বুরা ভালা যো গুরু ভগত করহুঁ নর্ক না যায় ॥ ৪৭৫ ॥

সোণায় যেমন দাগ লাগে না, লোহায় যেমন কখন ঘুণ ধরে না—সেইরূপ গুরুভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি যেমনি হউক—তাহার কখন নরক হয় না।

কোইত তনমন দুঃখী কেহু বিত উদাস।
এক এক দুখ সবনকো সুখী সন্তকা দাস ॥ ৪৭৬ ॥

জগতে সকলের একটী না একটী দুঃখ আছে—কেহ রোগে, কেহ শোকে নানাপ্রকার মনঃকষ্ট ভোগ করে কিন্তু যিনি সৎ সাধুর দাস—তিনি নিরন্তরই সুখী—কারণ তিনি নিজের চিত্তকে বশে আনিয়াছেন।

পতিকো ওর নিহারিয়ে আওরন সে ক্যা কাম।
সভি দেবতা ছোড় কর জপিয়ে গুরুকা নাম ॥ ৪৭৭ ॥

পতির প্রতি কেবল চাহিয়ে থাক—অন্য দেবতার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই; সকল দেবতা ছাড়িয়া গুরুদেবের নাম জপিলেই সকল সিদ্ধিলাভ হইবে।

ইন্দ্রিন কে বশ মনরহে মনকে বশ রহে বুধ।
কহ ধ্যান কায়সে লাগে যাঁহা য়্যায়সা বিরুধ ॥ ৪৭৮ ॥

ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মন, মনের বশীভূত আবার বুদ্ধি যখন পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধভাব—তখন ধ্যান ধারণা কিরূপে সম্ভব হয়।

মোহমদ দুখরূপ হ্যায় তাকো মাব নিকার।
প্রীত জগৎ কি ছোড় দে সব হোয় নিরবায়।। ৪৭৯ ।।

মোহ আর মদ দুঃখস্বরূপ—ইহাকে সংহার করিতে হইবে—অর্থাৎ মায়ামোহের অতীত হইয়া সংসার-সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিলে, তোমার উদ্ধারের আর কোন ভাবনা থাকিবে না।

হাতী ঘোড়া ধনঘনা চন্দ্রমুখী বহু নার।
নাম বিনা যমলোক মে পাওত দুখ অপার।। ৪৮০ ।।

হাতী, ঘোড়া, ধন, ঐশ্বর্য্য এবং চন্দ্রমুখী বহু রমণী থাকিলে পরিণামে কোন উপকার হয় না; যমদ্বারে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ভগবানের নাম সাধনা ভিন্ন কোন উপায় নাই?

ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভায়া গলে লাপেটে সুত।
ভাও ভক্তি কা মরম না জানে য্যায়সে জঙ্গলী ভূত। ৪৮১ ।।

গলায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া আস্ফালন করিলে কি হইবে—যদি তোমার ভগবানে প্রীতি-ভক্তি না থাকে—তবে ত তুমি বনের ভূত ভিন্ন আর কিছু নও।

যাকো রাখে সাইয়াঁ মার ন শক্কে কোয়।
বালন বাঁকা কর সকে যো জগ বৈরী হোয়।। ৪৮২ ।।

গুরু যাহাকে রক্ষা করেন—তাহাকে কে মারিতে পারে। শ্রী গুরু সহায় হইলে জগৎ শুদ্ধ লোক বিপক্ষ হইলেও কেহ তাহার একগাছী কেশও স্পর্শ করিতে পারে না।

পড়ি পড়ি কেসব জগ মুত্যা, পণ্ডিত ভয়া ন কোয়।
চাই অক্ষর প্রেমকা পড়ে সো পণ্ডিত হোয়। ৪৮৩ ।

জগতের লোক আজীবন লেখাপড়া করিয়া মরিতেছে—তথাপি একজনও পণ্ডিত হইতে পারিতেছে না—কিন্তু প্রেমের আড়াই

অক্ষর যিনি পড়িয়াছেন—প্রেম কি পদার্থ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনি যথার্থ পণ্ডিত পদবাচ্য হইয়াছেন।

জ্যো তিরিয়া পীহর বসে সুরত রহে পিউ মাহি।

য্যায়সে জন জগ মেরহে গুরু কো ভুলি নহি ॥ ৪৮৪ ॥

স্ত্রী যেমন বাপেরবাড়ী গমন করিলেও মনতার পতিরনিকট পড়িয়া থাকে যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়া ক্ষণকাল গুরুর স্মরণ করে, সেইব্যক্তি পরমভক্ত।

সুধা সাধু সুর তরু সুমন সুফল সুহাব নিবাত।

তুলসি সীতা পতি ভগতি সগুণ সুমঙ্গল সাত ॥ ৪৮৫ ॥

হে তুলসীদাস! সুধা, সাধু, সুর, তরু, সুমন, সুফল ও সুমধুর কথা এই সাতটী হইতেও সীতানাথ রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভালবাসা অশেষ মঙ্গলের নিদান জানিবে।

বিনু সত সঙ্গ হরিকথা ত্যাহি বিনু মোহন ভাগ।

মোহ গয়ে বিনু রামপদ হোয়ে দৃঢ় অনুরাগ ॥ ৪৮৬ ॥

সৎসঙ্গ ব্যতীত হরিকথা পাওয়া যায় না—আর হরিকথা ব্যতীত মোহও যায় না, মোহ না ভাঙ্গিলে হরিপদে সুদৃঢ় অনুরাগ হয় না।

বিনু বিশ্বাসৈ ভক্তি নহি, ত্যাহি বিনু দ্রবহি রাম।

রাম কৃপা বিনু সপন্যহু জীবন নহ বিশ্রাম ॥ ৪৮৭ ॥

বিনা বিশ্বাসে ভক্তি পাওয়া যায় না—এবং ভক্তি না হইলে রামচন্দ্রের কৃপালাভ করা অসম্ভব, ভগবান রামচন্দ্রের কৃপা বিনা জীবনে স্বপ্নেও সুখের আশা করা বৃথা।

অস বিচারী মন ধীর, ত্যজি কুতর্ক সংশয় সকল।

ভজহু রাম রঘুবীর, করুণাকর সুন্দর সুখদ ॥ ৪৮৮ ॥

হে ধীর মন! তুমি সকলপ্রকার যুক্তি তর্ক ত্যাগ করিয়া করুণাময় সুন্দর সুখদাতা রঘুবীর রামচন্দ্রের ভজনা কর।

ভাব বশ্য ভগবান্ সুখ নিদান করুণা ভবন।
ত্যজি:মমতা মদমান ভজিয় সদা সীতারমণ ॥ ৪৮৯ ॥

মায়া মমতা এবং গর্ব্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া হে মন! তুমি করুণা সাগর—সুখের নিদান ভগবান সীতাপতি রামচন্দ্রকে নিরন্তর ভজনা কর।

কহহিঁ বিমল মত সন্ত, বেদ পুরাণ বিচারি সব।
দ্রবৈ জানকী কান্ত ছুটৈ সংসার দুঃখ তব্ ॥ ৪৯০ ॥

বেদপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া সাধুবর্গ এই বিমল মত প্রদান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ভগবান জানকীকান্তে প্রেমদানে আর্দ্র হইবে—তাহারাই ভবদুঃখ দূর হইবে।

বিনু গুরু হোইন জ্ঞান, জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিনু।
গাবহিঁ বেদপুরাণ সুখ কি লভিয় হরিভক্তি বিনু ॥ ৪৯১ ॥

বিনা গুরুর উপদেশে জ্ঞানলাভ হয় না—এবং বিবেক বৈরাগ্য বিনা ও জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে। আর বেদপুরাণে বর্ণিত হরিভক্তি বিনা কখনও সুখলাভের সম্ভাবনা নাই।

রামচন্দ্রকে ভজন বিনু যো চহ পদ নির্ব্বাণ।
জ্ঞানবন্ত অপি সো নর পশু বিন পছু বিখান ॥ ৪৯২ ॥

রামচন্দ্রের ভজন বিনা যে লোক নির্ব্বাণ পদ প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তি লাঙ্গুল ও শৃঙ্গহীন পশুর মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

সোই সাধ শুনি সমুঝি কর রামভক্তি থিরতাই।
লড়ি কাই কো পৈরিবো তুলসী বিসরণ যাই ॥ ৪৯৩ ॥

যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া রামপদে ভক্তি অচলা রাখেন—তিনিই সাধু—আর যাহারা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে তাহারা নিতান্তই বালক।

সবৈ কহাবত্ত রামকে সবহি রামকী আশ।

রাম কহঁে জ্যহি আপনো ত্যহি তজু তুলসীদাস ॥ ৪৯৪ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি রামকে আপনার প্রাণের সকল কথা ব্যক্ত কর, সকল সময়ে তাঁহারই আশা কর, তুমি তাঁহাকে যেরূপ ভাবে দেখিবে—তিনিও তোমাকে সেরূপভাবে দেখিবেন।

জ্যহি শরীর রতি রাম সোঁ সেই আদরে সুজন।

রুদ্র দেহ ত্যজ নেহ বশ বানর ভৈ হনুমান ॥ ৪৯৫ ॥

যে শরীরে রামচন্দ্রের প্রতি রতির উদয় হয়—সেই শরীরই আদরনীয় জানিবে, কারণ শিব রুদ্রদেহ পরিত্যাগ করিয়া আদরের সহিত হনুমান দেহ ধরিয়াছিলেন।

জান রাম সেবা সরস সমুঝি করব অনুমান।

গুরু যাতে সেবক ভয়ে, হরতে ভয়ে হনুমান ॥ ৪৯৬ ॥

রামচন্দ্রের সেবা পরম রসময় ভগবান শঙ্কর তাই বুঝিয়া শুঝিয়া হনুমান রূপ ধারণ করিয়া তাহার সেবক হইয়াছিলেন।

রাবণ রিপুকে দাস সোঁ কায়র করহি কুচল।

খর দূষণ মারীচ জ্যোঁ নীচ জাহিঁসে কাল ॥ ৪৯৭ ॥

রাবণ রিপুর তন্ত্র অতি ভীরু এবং কুকর্ম্মাসক্ত আর খরদূষণ ও মারীচ তাহারই অনুরূপ এইজন্য ইহারা সকলেই কালকবলে কবলিত হইয়াছে।

পুণ্য পাপ যশ অযশকে ভাজনঃভারী ভূরী।

শঙ্কট তুলসীদাসকো রাম করহি সব দূরী ॥ ৪৯৮ ॥

যশ অযশ ও পাপ পুণ্যের অধিকারী অনেকেই হইয়া থাকে, দাস তুলসীদাসকে রাম এই সকল বিপদ হইতে দূরে রক্ষা করুন।

খেলত বালক ব্যাল সহ মেলত পাবক হাথ।

তুলসী শিশু পিতু মাতু জ্যোঁ রাখত সিয় রঘুবর নাথ ॥ ৪৯৯ ॥

বালকগণ খেলা করিবার সময় সর্পের মুখে এবং আগুণে হাত দিতে যাইলে তার পিতামাতা যেমন তাহাকে বাধা প্রদান করে। হে সাধু তুলসি! সীতারামও তেমনি তাহার অনুগত ভক্তগণকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

তুলসি দিন ভল সব কহ ভলো চোর কহ রাত।
নিশি বাসরতা কহং ভলো মানৈ রামহি তাত ॥ ৫০০ ॥

হে তুলসি, চোর রাতকে ভাল বলে এবং ভাল লোকে দিনকেই ভাল বলে, কিন্তু রামভক্ত গণের পক্ষে দিন রাত উভয়ই সমান।

সেবাশীল সনেহ বশ সুখদ সুযোগ বিয়োগ।
তুলসি তে সব রাম সোঁ সুখদ সুযোগ বিয়োগ ॥ ৫০১ ॥

হে তুলসীদাস! সংযোগ বিয়োগের কর্ত্তা সুখদাতা প্রভু রামচন্দ্র সেবাশীল ব্যক্তিগণের সেবায় বশীভূত হইয়া থাকেন। এবং সকল-প্রকার সংযোগ বিয়োগে সুখদান করিয়া থাকেন।

সুধে মন সুধে বচন সুধী সব করতুতি।
তুলসী সুধী সকল বিধি রঘুবর প্রেম প্রসূতি ॥ ৫০২ ॥

হে তুলসিদাস! হৃদয়ে রামচন্দ্রের প্রেম উদয় হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়—বাক্যশুদ্ধ হয়—এবং তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল শুদ্ধ হইয়া থাকে।

বচন ভেষ তে জো বনৈ সো বিগরৈ পরিণাম।
তুলসি মনতে জো বনৈ বনীবনাই রাম ॥ ৫০৩ ॥

হে তুলসীদাস! কথার বশে যে কাজ হয়—তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না—কিন্তু মনবশে যে কাজ হয় এবং তাহা যদি রাম ভক্তি যুক্ত হয়—তাহা হইলে সে কার্য্য চিরস্থায়ী হইয়া পড়ে।

কহঁা বিভীষণ লৈ মিল্যো কহঁা সিযো রঘুনাথ।
তুলসী ইহজানে বিনা মূঢ় মিজি হৈঁ হাথ ॥ ৫০৪ ॥

হে তুলসীদাস! ভগবান রামচন্দ্র নারায়ণ হইয়া রাক্ষস বিভীষণের সহিত সখ্যতা করিয়াছিলেন বলিয়া মূঢ় লোক শ্রীরামচন্দ্রকে দোষ দেয়—তাহারা ভগবানের মহিমা কি বুঝিবে?

বালি বলি বলশালিদলন সখা কীনহঁ কপিরাজ।
তুলসি রাম কৃপালকো বিরল গরীব নিবাজ॥ ৫০৫॥

বলবান বালীরাজ এবং বলিদমন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। দেখ হে তুলসীদাস! দয়াময় শ্রীরামের মত ভক্তবৎসল আর কে আছে?

সুখ জীবন সবকো চৈহত সুখ জীবন হরিহাথ।
তুলসি দাতা মাংগ ন্সো লখিয়ত অবুধ অনাথ॥ ৫০৬॥

জগতে আসিয়া সুখে কালযাপন করিব—ইহা সকলেই আশা করে—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, অবোধ অনাথ লোক দাতা দেখিয়া প্রার্থনা করে না ইহাই দুঃখ।

বৈরি বন্ধু নিশিচর অধম ত্যজো ন অরুরঙ্ক।
ঝুঠে অথ সিয় পরিহরী তুলসি ভই কলঙ্ক॥ ৫০৭॥

ভগবান রামচন্দ্র বৈরী বন্ধু নিশাচর অধম ও দুঃখী কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই—সকলের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কেবল তুলসী! প্রজাদের মিথ্যাকথা শুনিয়া স্বীয় পত্নী সীতাকে ত্যাগ করিয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সভা সভাসদ নিরখি পট পকরি উঠায়ে হাথ।
তুলসি কিয়ে ইশারহো বনমালী যদুনাথ॥ ৫০৮॥

দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের জন্য ভগবান যদুপতি, বনমালী শ্রীকৃষ্ণ বসনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সভাসদবর্গ তাহা দেখিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল।

ত্রাহি দীন কহি দ্রৌপদী তুলসি রাজ সমাজ।

প্রথমে বড়ে পটচিত বিকল চহত চকিত নিজ কাজ ॥ ৫০৯ ॥

রাজন্যবর্গের সম্মুখে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে গিয়া দুর্য্যোধন নিজের কার্য্যের জন্য জন সমাজে বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন, দীনবন্ধু ভগবানও বস্ত্র বাড়াইয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন।

মরে জিআয়ে ভাল অবধি বিপ্রকো পুত।

সমিরহু তুলসী সিহি তু জাকো মারু ত দূত ॥ ৫১০ ॥

হে তুলসীদাস! পবননন্দন মারুতী যাহার দূত, তিনি অবোধ বিপ্র-সন্তান ও ভল্লুকাদি মৃত বানরগণের প্রাণদান করিয়াছিলেন—তুমি সেই শ্রীরামচন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করিতে থাক।

কাল করম গুণ দোষ জগজীবিত হারে হাথ।

তুলসি রঘুবর রাবরো জান জানকীনাথ ॥ ৫১১ ॥

কাল, কর্ম্ম, গুণ, দোষ এবং জীব ও জগৎ যে সীতাপতি রামচন্দ্রের করতলগত হে তুলসীদাস! তুমি তাঁহাকে জ্ঞাত হও।

মোসম দীন নহি দয়াবন্ত নহি সমান রঘুবীর।

অসবিচারী রঘুবংশমণি হরহু বিষম ভবভীর ॥ ৫১২ ॥

হে ভগবান রামচন্দ্র! আমারা দরিদ্র আর কেহ নাই এবং তোমার তুল্য দয়াবানও কেহ নাই—ইহা বিচার করিয়া হে প্রভু! তুমি জীবের বিষম ভবভয় নিবারণ কর।

ভব ভুজঙ্গ তুলসি নকুল ডংসত জ্ঞান হরি লেত।

চিত্রকুট এক ঔষধী চিতবত হোত সচেত ॥ ৫১৩ ॥

হে তুলসীদাস! ভবরূপ সর্পের দংশনে তোমার জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে; এইজন্য চিত্রকূটবাসী নকুলস্বরূপ রামচন্দ্রের চরণামৃত রূপ মহৌষধী পান করিয়া তুমি চেতনালাভ কর।

রামরাজ রাজত সকল ধরম নিরত নরনারী।
রাগন রোষন দোষ দুঃখ সুলভ পদারথ চারি ॥ ৫১৪ ॥

রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বে স্ত্রীপুরুষ সকলেই ধর্ম্মকর্ম্মে আসক্ত ছিল। রাগ, দ্বেষ, দোষ, দুঃখ, তাহার রাজ্যে স্থান পাইত না এবং চতুর্ব্বর্গ তথায় সুলভ ছিল।

হৌঁহুঁ কহাবত সব কহত রাম সহত উপহাস।
সাহব সীতারাম সোঁ সেবক তুলসীদাস ॥ ৫১৫ ॥

আমি আমি সকলেই বলে কিন্তু এই আমিত্ব অতিশয় উপহাসাস্পদ, ভগবান রামচন্দ্র তাহা সহ্য করেন। ফলে তুলসীদাস তাঁহার দাসানুদাস এবং রামচন্দ্র তার প্রভু।

রামপদ সন্তোষ সুখ ঘর বন সকল সুপাস।
সুরতরু সুরধেনু সবহি অভিমত ভোগ-বিলাস ॥ ৫১৬ ॥

ঘরে বা বনে রামরাজ্যের সকল প্রজাই সন্তোষ—সুখে বাস করিতেন এবং কল্পতরু বা কামধেনুর আশ্রয়ে থাকার মত ভোগ-বিলাসে মত্ত হইতেন। তাহার কারণ রামচন্দ্রের পদে মন থাকিলে আর কোন অভাব থাকে না।

রামচরিত রাকেশকর সরস সুখদ সব কাহু।
সজ্জন কুমুদ চকোরচিত হিত বিশেষ বড় নাহু ॥ ৫১৭ ॥

শ্রীরামচন্দ্র মহাপ্রভুর পবিত্র চরিত্ররূপ পূর্ণ শশধর সকল জীবকেই অমৃতোপম সুখ-সম্পদ প্রদান করিয়া থাকে। এইজন্য কুমুদ সদৃশ সাধু ব্যক্তির চিত্তচকোর সর্ব্বদা উক্ত অমৃত পানে বিভোর হইয়া থাকেন।

খেতি বণিজবিদ্যা সেবা শিল্প সো কাজ।
তুলসি সুরতরু সরিস সব সুফল রামকে রাজ ॥ ৫১৮ ॥

হে তুলসীদাস! রামরাজ্যে কৃষি, বাণিজ্য, সেবা ও শিল্পবিত্যাদি কল্পতরু ন্যায় সুখদ সুফলপ্রসূ ছিল।

রঘুপতি কীরতি কাহিনী কোঁ্যা কহৈঁ তুলসীদাস।

শরদ প্রকাশ অকাশ ছবি চারু মলিনতা ভাস ॥ ৫১৯ ॥

হে তুলসি! রঘুপতি রামচন্দ্রের কীর্ত্তিকাহিনী কি প্রকাশ করিব। শারদীয়া রজনীর সুন্দর আকাশ—শোভাও তাহার কাছে মলিন হইয়া যায়।

প্রভু গুণ ভূষণ বসনবিশদ বিশেষ সুদেশ।

রাম সুকীরতি কামিনী তুলসি করবত কেশ ॥ ৫২০ ॥

হে তুলসি! প্রভু রামচন্দ্রে সৎকীর্ত্তিরূপ রমণীর রমণীয় কেশ শোভা বর্ণনাতীত; তাঁহার গুণাবলী ও বসন-ভূষণের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে এমন সাধ্য কার আছে?

কলিযুগ সমযুগ আন্ নহিঁ জো নরকর বিশ্বাস।

গাই রাম গুণগান বিমল ভবতর বিনহি প্রয়াস ॥ ৫২১ ॥

কলিযুগের সমান যুগ আর নাই। এই যুগে বিশ্বাসী মানবগণ বিমল রাম গুণগান করিয়া অবহেলায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে।

প্রকট চারিপদ ধর্ম্মকে কলিমহ্ একপ্রধান।

জেনকেন বিধি দীন্হহু দান করৈ কল্যাণ ॥ ৫২২ ॥

ধর্ম্মের চারিপদের মধ্যে কলিতে একটীই প্রধানরূপে বর্ত্তমান। যে কোন প্রকারে জীবগণ দান করিতে পারিলেই এই যুগে মঙ্গল সাধন হইয়া থাকে।

শরণাগত কহঁ জে ত্যজহিঁ নিজ অনহিত অনুমানি।

তে নর পামর পাপময় তিন্হে বিলোকত হানি ॥ ৫২৩ ॥

আপনার অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া যে লোক শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করে—সেই পামরজনের মুখদর্শন করিলেও পাপ হয়।

সহজ অপাবনী নারী পতি সেবত শুভগতি লহৈ।

যশ গাওত শ্রুতি চারি অজহুঁ তুলসীকা হরিহি প্রিয়।। ৫২৪ ।।

রমণীজাতি স্বভাবতঃই অপবিত্রা, কেবল পতিসেবা ফলে তাঁহারা শুভগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—চতুর্ব্বেদ সেইজন্য এরূপ পতিব্রতা রমণীর সুযশ ঘোষণা করেন কিন্তু তুলসীদাসের মন হরিকেই প্রিয় বলিয়া ঘোষণা করেন।

অনুচিত উচিত বিচার ত্যজিয়ে পালহিঁ পিতু বৈন।

তে ভাজন সুখ সঙ্গকে বসহি অমরপতি ঐন।। ৫২৫ ।।

অনুচিত বা উচিত বিচার না করিয়া যে পুত্র পিতার আদেশ প্রতিপালন করেন—তিনি ইহ জীবনে অশেষ সুখ ও যশ লাভ করিয়া অন্তে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গবাস করিতে অধিকারী হন।

আসন ছোড়ো সাথ জব তাদিনহি তুণ কোই।

তুলসি অম্বুজ অম্বুবিন তরণি তাসু রিপু হোই।। ৫২৬ ।।

হে তুলসীদাস! স্থানচ্যুত হইলেই মান সম্ভ্রম নষ্ট এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে যেমন পদ্ম যতক্ষণ জলে থাকে ততক্ষণ সূর্য্য তাপে শুকায় না, জলভ্রষ্ট হইয়া জমিতে পড়িলেই উত্তাপে শুখাইয়া যায়।

তুলসিদান জো দেত হৈঁ জলমে হাত উঠায়।

প্রতিগ্রাহী জীবৈ নহিঁ দাতা নরকৈ যায়।। ৫২৭ ।।

হে তুলসিদাস! যে লোক জলে হাত দিয়া দান করে সে নীরয়গামী হয়—সঙ্গে সঙ্গে গৃহীতাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

প্রভু সমীপ ছোটে বড়ে নিবল হোত বলবান।

তুলসি প্রকট বিলোকিয়ে কর অঙ্গুলি অনুমান।। ৫২৮ ।।

হে তুলসীদস! প্রভু রামচন্দ্রের কাছে হাতের ছোট বড় পাঁচ অঙ্গুলির মত দুর্ব্বল সেবক ও বলশালী হইয়া থাকে।

মালী ভানু কিসান সম নীতি নিপুণ নরপাল।
প্রজা ভাগবশ হোঁহিগে কবহুঁ কবহুঁ কলিকাল ॥ ৫২৯ ॥

এই কলিযুগের প্রজা সকল অদৃষ্টক্রমে কখন কখন মালী, ভানু ও কৃষাণতুল্য নীতি কুশল নরপাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কারণ সে কারজ কঠিন হোই দোষ নহি মোর।
কুলীশ অস্থিতে উপলতে লোহ করাল কঠোর।' ৫৩০ ॥

কারণ অপেক্ষা কাজ খুব কঠিন! দধীচি মুনির হাড় বজ্র নির্ম্মিত হইলেও তাহার কার্য্য ভয়ানক জ্বলন্ত লোহ অপেক্ষাও ভীষণ।

ব্যালহুতে বিকরাল বড় ব্যালফেন জিয়জান।
ওহকে খায়ে মরতহৈঁ উহ খায়ে বিনু প্রাণ ॥ ৫৩১ ॥

সর্পের অপেক্ষা তাহার বিষ বড় ভয়ানক সর্পের দংশনে বরং জীবনের আশা করা যায় কিন্তু বিষ খাইলে প্রাণনাশ নিশ্চয়।

বহু মুখ বহু রুচি বচন বহু বহু আচার ব্যবহার।
ইনকো ভলো মনাইবো ইহ অজ্ঞান অপার ॥ ৫৩২ ॥

যে লোক বহুরুচি বহু প্রকার বচন প্রয়োগ করে এবং বহু-প্রকার আচার ব্যবহার সম্পন্ন—সেই ঘোর অজ্ঞানী ব্যক্তির হিতের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত।

জো শুনি সমুঝি অনীতিরত জাগতরহৈঁজু সোই।
উপদেশ বীজ গাইবো তুলসি উচিত ন হোই ॥ ৫৩৩ ॥

হে তুলসীদাস যে ব্যক্তি জাগিয়া ঘুমায় এবং জানিয়া শুনিয়া কুনীতি পরায়ণ হয় তাহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

ফুলৈ ফরৈ ন বেত যদপি সুধা বর্ষাহি জলদ।
মুরখ হৃদয় ন চেত জো গুরু মিলৈ বিরিঞ্চিত শিব ॥ ৫৩৪ ॥

জলদ সকল সুধা বর্ষণ করিলেও যেমন ক্ষেত্রে ন ফুও ফল

হয় না সেইরূপ মূর্খকে ব্রহ্মা কিম্বা স্বয়ং শিব আসিয়া গুরু হইলেও তাহার চৈতন্য হয় না।

দীরঘ রোগী দারিদী কটু বচ লোলুপ লোগ।
তুলসি প্রাণ সমানতে হোই নিরদার যোগ ॥ ৫৩৫ ॥

হে তুলসিদাস! চিররোগী, দরিদ্র, কটুভাষী এবং লোভী ব্যক্তি কদাচ ভাল নয়। হে তুলসি! কিন্তু আদর বিহীন যোগ প্রাণবৎ প্রিয়।

টুটহি নিজ রুচি কাজ করি রূটহিঁ কাজ বিগারী।
তীয তনয় সেবক সখা মনকে কণ্টক চারি ॥ ৫৩৬ ॥

পুত্র, কলত্র, সেবক ও সখা এই চারিজন মনে কর কণ্টকস্বরূপ ইহারা সকল প্রকার কাজ নষ্ট করিয়া দেয় ও রুচির পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়।

নারী নগর ভোজন সচিব সেবক সখা অগার।
সরস পরিহরে রঙ্গরস নিরস বিষাদ বিকার ।। ৫৩৭ ।।

রমণী, নগর, ভোজন, সচিব, সেবক, সখা ও ঘর প্রভৃতির রঙ্গরস সকল ত্যাগ করিয়া রসিকজন বিষাদ ও বিকার গ্রস্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য সখা সেবক সচিব সুতি য সিখাবন সাঁচ।
শুনি সমঝুহু পুনি পরিহরহু পরম নিরঞ্জন পাঁচ ।। ৫৩৮ ।।

শিষ্য, সখা, সেবক, সচিব এবং সৎপত্নী এই পঞ্চজন সত্য শিক্ষা পাইলেও জানিয়া শুনিয়া পুনরায় পরম নিরঞ্জনকে অবজ্ঞা করে।

বড়ি প্রতীত গঠি বন্ধতে বড়ো যোগতে ক্ষেম।
বড়ো সুসেবক সাঁইতে বড়ো নেমতে প্রেম ।। ৫৩৯ ।।

যোগ অপেক্ষা ক্ষেম বড়, প্রভু অপেক্ষা সুসেবক বড়, এবং নিয়ম হইতে প্রেম শ্রেষ্ঠ।

চারু বিচারু চলু পরিহরি বাদ বিবাদ।
সুকৃত সীব স্বারথ অবধি পরমাথ মর্য্যাদ ।। ৫৪০ ।।

বাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর ধর্ম্মপথ অবলম্বন করা উচিত। আর স্বার্থ হইতে পরমার্থ তত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

গড়ি বন্ধতে পর তোতি বড়ি জেহি সবকো সব কাজ।

কহব সমুঝব বহুত গাড়ে বড়ত আনাজ ॥ ৫৪১ ॥

প্রতীতি দৃঢ়বিশ্বাস অপেক্ষা বড়, যাহার দ্বারা সকলের সকল কর্ম্ম সিদ্ধি হয়। এ বিষয় বলিয়া কহিয়া বুঝাইবার কিছু নাই।

সমগথকো উনরাম সেঁ। স্বীয় হরণ অপরাধু।

সময় হিসাবে কাজ সব সময় সরাহ হিঁ সাধু ॥ ৫৪২ ॥

সকল কাজ সময়ে সংসাধিত হয়। সময়ে সাধু অসাধু হয়—এবং অসাধু সাধু হয়। আর সময় পাইয়াই রাবণ রামের সীতাহরণ করিয়াছিল।

ছিদ্যোন তরুণী কটাক্ষশর করেওন কঠিন সনেহু।

তুলসি তিনকী দেহকী জগত কবচ করি লেহু ॥ ৫৪৩ ॥

হে তুলসীদাস! তরুণী যুবতীর কটাক্ষবাণ যাহার চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না, তাহার দেহকে এ জগতের কবচ স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত।

সহজ সুহৃদ গুরু স্বামী শিখ জো ন করৈ শিরমাণি।

যো পছতায় ঘায় ভর অবহিঁ হোই হিত হানি ॥ ৫৪৪ ॥

সহজ বন্ধু, স্বামীও গুরুকে যে শিষ্য অবনত মস্তকে মান্য না করে—তাহার অমঙ্গল হইয়া থাকে, এবং তাহাকে পাপে অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়।

হিতপর বঢ়ে বিরোধ যব অনহিত পর অনুরাগ।

রাম বিমুখ বিধি বামগতি সগুণ অঘায় অভাগ ॥ ৫৪৫ ॥

বিধি যাহার প্রতি বাম এবং রামচন্দ্র বিমুখ হন—সেই ব্যক্তি

হিতকর কাজ করে না, বরং অমঙ্গল কার্য্যে অনুরাগী হইয়া পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়।

সভা দুযোধন কি শকুনি সুমতি সরাহন যোগ।
দ্রোণ বিদুর ভীষ্ম হরিহি কহে প্রপঞ্চী লোগ॥ ৫৪৬॥

যে দুর্য্যোধনের সভাতে শকুনি সুমতি বলিয়া মান্য প্রাপ্ত হয়—সে সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রবঞ্চক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে—ইহার আর বিচিত্র কি?

রাজ করত বিনু কাজহি করৈ কুচালি কুসাজ।
তুলসি তে দশস্কন্ধ জ্যোঁ জেহৈঁ সহিত সমাজ॥ ৫৪৭॥

ধর্ম্মসঙ্গত রাজকার্য্য সম্পাদন করাই রাজার উচিত এবং তাহাই রাজধর্ম্ম; যে রাজা তাহা না করিয়া কদাচারী এবং কুবেশধারী হন, তাঁহাকে দশস্কন্ধ রাবণের মত সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয়।

দেশ-কাল করতা করম বচন বিচার বিহীন।
তে সুরতরু তরদারিদী সুরসরী তীর মলিন॥ ৫৪৮॥

দেশ-কাল-পাত্র-কর্ম্ম-বিচারবিহীন ব্যক্তি যদি কল্পতরুমূলে বাস করে—তাহা হইলে সে দরিদ্র এবং স্বর্গের মন্দাকিনী তটে অবস্থিতি করিলে সে পবিত্র হইতে পারে না।

বচন বিচার আচার তনমন কর তব ছলছুতি।
তুলসি ক্যোঁও সুখ পাইয়ে অন্তর্য্যামিহি ধৃতি॥ ৫৪৯॥

ভগবান সকলের অন্তরে বাস করিয়া সকলের মনের ভাব অবগত হইতেছেন। যাহারা কায়মনোবাক্যে আচার-বিচারে চতুরতা ও বঞ্চনা করে—তাহারা কখনও সুখের আশা করিতে পারেনা।

কপট সারসূচী সহস বাঁধি বচন পররাস।
কিযোদুরা উচহৈঁ চাতুরী সো শঠ তুলসীদাস॥ ৫৫০॥

যাহারা কপটাচারী, পরদেশবাসী এবং সকলের নিকট প্রতারণা করিয়া থাকে—হে তুলসীদাস! তাহারা অতিশয় শঠ জানিবে।

রচন বেশ কোঁ্যা জানিয়ে মনমলিন নরনারী।

সূর্পনখা, মৃগ, পুতনা, দশমুখ প্রমুখ বিচারী ॥ ৫৫১ ॥

কেবল বাক্য ও পোষাক পারিপাট্যে মলিন-মন বিশিষ্ট লোককে জানা যায় না; সূর্পনখা, মায়ামৃগ, ও পুতনা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল।

পরদোহী পরদার রত পরধন পর অপরাধ।

তেন নর পামর পাপময় দেহ ধরে মনুজাদ ॥ ৫৫২ ॥

মনুষ্যের মধ্যে পরদ্রোহী, পরদার রত, পরধনহরণকারী এবং অত্যাচারী পামরগণ অত্যন্ত অধম।

জাসু ভয়োসে সোইয়ে রাখি গোদপরশীষ।

তুলসি তাসু কুচালতে রখবারী জগদীশ ॥ ৫৫৩ ॥

যাহার আশা-ভরসা করিয়া থাকা যায়—সে লোক যদি অন্যায় আচরণ করে—তবে ভগবান তাঁহাকে সে অন্যায় হইতে উদ্ধার করেন।

সহবাসী কা চোগিলহি পুরজন পাকপ্রবীণ।

কালক্ষেপকেহি মিলকরহিঁ তুলসি খগমৃগ মীণ ॥ ৫৫৪ ॥

প্রবীণ-পবিত্র-চরিত্র পুরজনবর্গ যখন প্রতিবাসীর নিন্দা করিয়া একত্র বাসে অরাজী হয়—তখন জলচর, খেচর, বনচর জন্তুগণ কেমন করিয়া একত্র বাস করিবে?

পেরত কোলহু মলিতীল তিলি সনেহো জানি।

দেখি প্রীতিকি রীতি হই অবদেখি বরসানি ॥ ৫৫৫ ॥

তিলের মধ্যে স্নেহরূপ তৈল আছে জানিয়া তৈলিক তাহাকে পেষণ করে, কিন্তু স্নেহের কেমন গুণ যে তাহাকে অত্যধিক পীড়ন করিলেও সে স্নেহদান অর্থাৎ তৈল প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে না।

বিবুধ কাজ বামন বলিহি ছলো ভলো জিয়জানি।

প্রভু তাত জিবংশভে তদপি মনকী গইন গ্লানি ॥ ৫৫৬॥

কশ্যপনন্দন বামনদেব বলিরাজাকে ছলনা করিয়া তাঁহার মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন কিন্তু ভক্তকে ছলনা করিয়া তাহার নিজ অন্তঃকরণের গ্লানি দূর করিতে পারেন নাই।

ভলো ভলেসে ছলকিয়ে জন্মকনোড়ো হোই।

শ্রীপতি শির তুলসী লসতি বলি-বামন গতি সোই ॥ ৫৫৭ ॥

ভগবানের ছলনাও সময়ে জীবের মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। যেমন ভগবান ছলনা করিয়া বলিরাজের মস্তকে পদপ্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

বিম্নু প্রপঞ্চ ছলভীখভলি লহিয়ন কিয়ে কলেশ।

বামন বলি সোঁ ছলকিয়ো দিও উচিত উপদেশ ॥ ৫৫৮ ॥

শারীরিক ক্লেশ এবং ছলনা-চাতুরী ভিন্ন ভিক্ষালাভ হয়না বলিয়া ভগবান বলিরাজের নিকট বামনরূপে ছলনার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন।

অমরদানি যাচক মরহি মরি মরি ফিরি ফিরি লেঁহি।

তুলসি যাচক পাতকী দাতহি দূষণ দেহি ॥ ৫৫৯ ॥

হে তুলসীদাস! দানশীল ব্যক্তি অমরত্বলাভ করে কিন্তু অতি বড় পাতকী, দাতার অপমানকারী যাচক পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া চিরকাল ভিক্ষা করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

মাখী কাক উলূক বক দাদুরসে ভয়ে লোগ।

ভলেতে শুক পিক মোরসে কো উন প্রেমপথ যোগ ॥ ৫৬০ ॥

অসৎ মনুষ্যগণ, মাছি, কাক, পেচক, বক ও ভেকের মত: এবং সৎলোকগণ শুক, কোকিল ও ময়ূরের মত—এইজন্য কেনা তাহাদিগকে আদর করিবে?

মাত্মমীতসোঁ সুখচহৈ সোনছুয়ে ছল ছাঁহ।
শশী ত্রিশঙ্কুকেকই গতি লখি তুলসী মনমাঁহ॥ ৫৬১॥

মান্ত মিত্র হইতে সুখের আশা করা যায় কিন্তু সুখ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। চন্দ্রেরও ত্রিশঙ্কুর গতিবিধি দেখিয়া ভক্তকবি তুলসীদাস সাতিশয় দুঃখ অনুভব করিয়াছেন।

কৈ লঘু কৈ বড় মীতভল সন সনেহ দুখ সোই।
তুলসি জঁও ঘৃত মধু সরিস মিলে মহাবিষ হোই॥ ৫৬২॥

ধনী ও দরিদ্রলোক বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে দরিদ্রেরই কষ্টের একশেষ হয়—হে তুলসী! যেমন ঘৃত মধু ও সুরা একত্র মিলিতহইলে মহা বিষের উৎপত্তি হয়, ধনী দরিদ্রের মিলনেও তদ্রূপ হয় জানিবে।

কুদিনহি তুসোহিত সুদিনহিত অনহিত কিন হোই।
শশীছবি হররবি সদনতউ মিত্র কহত সব কোই॥ ৫৬৩॥

ভাল মন্দ সুদিন কুদিন কেমন করিয়া উল্লেখ করা যায়। যেমন সর্ব্বদা সূর্য্যদেব চন্দ্রের শোভা হরণ করিলেও, সকলে তাহাকে তাঁহার বন্ধু বলিয়া স্থির করেন।

তুলসি জপ তপনেম ব্রত সব সবহীতে হোই।
লহৈ বড়াই দেবতা ইষ্টদেব জব হোই॥ ৫৬৪॥

জপ তপ ব্রতনিয়ম সকলের দ্বারা সমাহিত হইতে পারে কিন্তু হে তুলসীদাস! অভীষ্টদেব যাঁহার সহায় হন তাহার তুল্য আর ভাগ্যবান কে আছে?

সুলভ প্রীতি প্রীতমসবৈ কহত করত সবকৈ।
তুলসীমীন পুনীতর্ত ত্রিভুবন বড়েন কোই॥ ৫৬৫॥

যেব্যক্তি যতই আনন্দ উপভোগ করুন মৎসেরে মত সহজ এবং সুলভ প্রীতিভোগ আর কাহার হয় না। হে তুলসীদাস!

দেখ, জল তাহাদের জীবন, জল তাহাদের গৃহ—মৎস্য সকলকে জল হইতে তুলিলেই মৃত হইয়া থাকে।

তুলসি মিটৈন মরি মিটেহু সাঁচো সহজ সনেহু।
মোর শিখাবন মুরহুঁ গজরত্তপলুহতমেহু ॥ ৫৬৬ ॥

যথার্থ ভালবাসা সহজে কেহ ভুলিতে পারে না—হে তুলসি, দেখ মেঘসকল গগনে ভীষণ গর্জ্জন করিলেও ময়ূরসকল পুলকিতচিত্তে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে থাকে।

মকর উরগদাদুর কমট জলজীবন জলগেহ।
তুলসি একৈ মীনকে হৈ সাঁচিলো সনেহ ॥ ৫৬৭ ॥

মকর, সর্প, ভেক ও কূর্ম্ম সকলের জলই জীবন, জলই গৃহ হইলেও মৎস্যের ন্যায় জলের প্রতি ভালবাসা আর কাহার নাই। কারণ জল ব্যতীত মকর, সর্প, ভেক প্রভৃতি জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু মৎস্য একদণ্ডই বারিহীন হইয়া থাকিতে পারে না।

দেউ আপনে হাথজল মীনহি মহুরঘোরি।
তুলসি জিয় জো বারি বিনু তৌ তু দেহি করিখোরি ॥ ৫৬৮ ॥

মৎস্য জলবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না বটে জলই তাহাদের জীবন কিন্তু তাহাকে তীরে তুলিয়া জল সেচন করিলে তাহার তাহাতে জীবন রক্ষা হয় না।

আপু ব্যাধকো রূপধরি কুহৌ কুরঙ্গ হিরাগু।
তুলসি জো মৃগ মনমুরৈ পরৈ প্রেমদ দাগু ॥ ৫৬৯ ॥

প্রভু আপনি ব্যাধরূপ ধারণ করত মৃগ সকলের প্রতি রোষ প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু তুলসী! তুমি মৃগবেশ ধারণ করিয়া এই সময় তাঁহার প্রেম-পদাঙ্ক ধরিয়া গমন কর তাহা হইলে আর কোনও ভাবনা থাকিবে না।

এক অঙ্গ জো সনেহতা নিশিদিন চাতৃক নেহ।

তুলসী জাসোঁ হিতলগৈ বহি অগারজো দেহ ॥ ৫৭০ ॥

হে তুলসী! দিবানিশি কেবল প্রেম সেবাই চাতক পাখীর কুলধর্ম্ম। সে নিজের শরীর নষ্ট করিয়াও প্রেমের সেবা করিয়া থাকে।

অন জল সীচৈরূখকি ছায়া তৈবরু ঘাম।

তুলসি চাতিক বহুত হৈ ইহ প্রবীণকো কাম ॥ ৫৭১ ॥

হে তুলসি! চাতককে অন্য জল দিলেও তাহার ভাল লাগে না; সে কেবল স্বাতীনক্ষত্রের জলপান করিতেই ভালবাসে—ইহা ভিন্ন তাহার প্রীতির উদ্রেক হয় না।

আলবাল মুকাহল নিহিয় সনেহ তরুমূল।

হোড় হেতু চিত চাতকহি স্বাতি সলিল অনুকূল ॥ ৫৭২ ॥

চাতক পাখীর ভালবাসারূপ-তরুমূলে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়িলেই তাহা অতি সুখদায়ক হইয়া থাকে।

শুনহে তুলসীদাস পিয়াস পপীহহি প্রেমকো।

পরিহরি চারি উমাস জো অচবৈজল স্বাতিকো ॥ ৫৭৩ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি পিপাসাতুর পাপিয়ার প্রেমের বার্ত্তা শ্রবণ কর। তাহারা চারিমাস ধরিয়া পিপাসায় কাতর থাকিবে সেও ভাল, তথাপি স্বাতী ভিন্ন অন্য জল পান করিবে না।

জিয়ত ননাহি নারি, চাতক ঘন ত্যজি দুসরহি।

সরসরিহুঁ কি বারি, মরত মাঙ্গেউ অরধজল ॥ ৫৭৪ ॥

চাতক পাখী স্ত্রীজাতি স্বরূপ, তাহারা জলধররূপী প্রিয় পতিকে ত্যাগ করিয়া আর কাহারও কৃপাভিক্ষা কখন করে না।

তুলসি চাতিক দেত শিখ সুতহি বারহিবার।

তাতন তর্পন কিজিয়ে বিনা বারিধর ধার ॥ ৫৭৫ ॥

হে তুলসীদাস! চাতক পক্ষী অহরহ কেবল মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে—কারণ মেঘের জল ভিন্ন তাহারা জীবিত থাকিতে পারে না।

জীব চরাচর জহঁ লগে হৈ সবকো হিত মেহ।

তুলসি চাতক মন বর্য্যো মনসো সহজ সনেহ॥ ৫৭৬॥

হে তুলসীদাস! মেঘের দ্বারা বারিবর্ষণ হইয়া এই বিশ্ব-সংসারে উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু মেঘের প্রতি চাতকের সরল ভালবাসা আর কাহার হয় না।

ব্যাপী রহউ সংসার মহঁ মায়া প্রকট প্রচণ্ড।

সেনাপতি কামাদি ভট কপট দম্ভ পাষণ্ড॥ ৫৭৭॥

মহামায়ার সৈন্যবল দ্বারা এই জগত সংসার সমাচ্ছন্ন। সেনাপতি কামদেব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, কপটতা, দম্ভ প্রভৃতি সেনা লইয়া সতত পরিভ্রমণ করিতেছে।

গঁরজ আপনি সবনকো গরজ করত উর আনি।

তুলসি চাতক চতুর ভোয়া চকজনি সুদানি॥ ৫৭৮॥

হে তুলসি! মেঘ তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া ভয় দেখাইলেও চাতক একান্তমনে তাহারই শরণাপন্ন হইয়া থাকে।

হোন ইন চাতিক পাতকী জারন দানিন মূঢ়।

তুলসি গতি প্রহ্লাদকি সমুঝি প্রেমপথ গূঢ়॥ ৫৭৯॥

হে তুলসীদাস! প্রেমের পথ অতি কঠিন ও দুর্গম বলিয়া বিবেচনা করিবে—সহজে ইহা পাইবার নয়—প্রেমদাতা ভগবানের প্রেমদান প্রহ্লাদের প্রতি কেমন হইয়াছিল এবং চাতকের প্রতি কেমন হইয়া থাকে—তাহা বুঝ।

প্রেমন পরখিয় পুরুষমন পয়দ সিখাবন এহ।

জগ কহৈ চাতক পাতকী উসর বরষৈ সেহ॥ ৫৮০॥

চাতকের প্রণয় পরীক্ষা করিবার জন্য পুরুষরূপী পয়োধরগণ শিলাবৃষ্টি বর্ষণাদি দ্বারা জগতকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

বাসাবেশ বোলনি চলনি মানস মঞ্জুমরাল।

তুলসি চাতক প্রেমকি কীরতি বিশদ বিশাল ॥ ৫৮১ ॥

বেশভূষা ও গতি বিধিতে হংসের শোভা অতি রমণীয়, কিন্তু হে তুলসীদাস! চাতকের প্রেম যশ তুল্য শোভা তাহাদের নাই।

নহিঁ যাচত জলসংগৃহী শীষ না হমহিলেই।

ঐসে মানিহি মাঙ্গনে হিকো বারিদ বিনদেই ॥ ৫৮২ ॥

জলদের মত দানশীল জগতে আর কেহ নাই। সে একবিন্দু জল চাহিতে না চাহিতেই চাতকে অজস্র বারি প্রদান করিয়া থাকে।

তীনি লোক তিহুঁ কালমে চাতকহিকে সাথ।

তুলসি জান দানতা সুণী দুসরে নাথ ॥ ৫৮৩ ॥

এই তিন লোকে তিনকালের মধ্যে চাতক পাখীর মত দীন দরিদ্র আর কেহ নাই, হে তুলসি, দেখ, তাহার এক মেঘ ব্যতীত অন্য কোন সখা দেখিয়াছ কি?

সাধন সাংসাত সব সহত সবহিঁ সুখদ ফল লাহু।

তুলসি চাতক জলধিকী রীতি বুঝি বুধ কাহু ॥ ৫৮৪ ॥

হে তুলসি! সুখজনক সাধনার ফল পাইতে সাধকগণ, সকলই সহ্য করে কিন্তু চাতক ও সাগরের রীতি কোন্ সুধীব্যক্তি বুঝিবে?

চাতক জীবন দায়কহি জীবন সময় সরীতি।

তুলসি অলখ নলখি পরৈ চাতক প্রীতি প্রতীতি ॥ ৫৮৫ ॥

চাতক পক্ষীর ভালবাসার ব্যাপার অতি বৈচিত্রময়। হে তুলসীদাস! সে আপনার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য কেবল মেঘের প্রতি মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছে।

ভোলত বিপুলবিহঙ্গবন বিয়ত পোষরিণকরি।

সুযশধবল চাতক নবল তুঁহি ভুবন দশচারি ॥ ৫৮৬ ॥

পৃথিবীতে মেঘের বর্ষিত বারি কোন্ পক্ষী পান না করিয়া থাকে, কিন্তু মেঘের প্রতি চাতক পাখীর স্নেহ যেমন ভুবন বিদিত, তেমন কি আর কাহার আছে?

বটত রটত রসনালটী তৃষ শুখিগই অঙ্গ।

তুলসি চাতক প্রেমকো নিত নূতন রুচিরঙ্গ ॥ ৫৮৭ ॥

হে তুলসীদাস! মেঘের কাছে প্রার্থনা করিতে করিতে চাতক পাখীর জিহ্বা জড়িত এবং পিপাসায় দেহ শুখাইয়া গেল, তথাপি তাহার ভালবাসার রুচি নিত্য নবভাব ধারণ করিল।

উপলবরষি গরজত তরজি ডারত কুলিশ কঠোর।

চিতৌ কি চাতক মেঘ ত্যজি কবহুঁ দুসরী ওর ॥ ৫৮৮ ॥

বিষম গর্জ্জনে মেঘসকল কঠোর বজ্রাঘাত এবং শিলাবৃষ্টি করিলেও চাতকের মন মেঘের প্রতি ভালবাসা ছাড়িয়া অন্য কাহারও প্রতি আসক্ত হয় না।

জ্ঞানী তাপস শূর কবি কোবিদ গুণ আগার।

কেহিকে লোভ বিড়ম্বনা কিন্‌হন যহি সংসার ॥ ৫৮৯ ॥

জ্ঞানী, তাপস, বীর, কবি ও পণ্ডিত সকল গুণের আগার হইলেও সময়ে সময়ে সংসার মোহে মুগ্ধ হইয়া লোভের বশে সাতিশয় বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে।

করতন সমুঝত ঝুঁট গুণ শুনত হোতমতিরঙ্ক।

পারদ প্রকট প্রপঞ্চময় সিদ্ধিহিনাউ কলঙ্ক ॥ ৫৯০ ॥

মানবদেহের স্থিরতা নাই—ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই নম্রভাব ধারণ করিয়া থাকে। এমত অবস্থায়

তাঁহারা যদি সাধনার দ্বারা সুসিদ্ধ হইতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের কলঙ্কের কালিমা ভোগ করিতে হয়।

সোই সেঁবরটে সুবা বেবত সদা বসন্ত।
তুলসি মহিমা মোহ্‌কি শুনত সরাহ্‌ত সন্ত॥ ৫৯১॥

হে তুলসীদাস! মোহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, মোহমত্ত লোক সকল অহরহঃ বসন্ত সমাগম সুখের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে, তবে যাহারা সাধনায় চিত্ত স্থির করিয়াছে—তাহাদের নিকট মোহের প্রভুত্ব খাটে না।

তুলসী অদ্ভুত দেবতা আশা দেবী নাম।
সেয়ে শোক সমর্পই বিমুখ ভয়ে অভিরাম॥ ৫৯২॥

হে তুলসীদাস! আশাদেবী নামে এক অদ্ভুত দেবতা আছেন, তিনি প্রথমে সর্ব্বস্ব দান করিয়া শেষে বিমুখ হইয়া জীবকে একেবারে শোকসাগরে ডুবাইয়া দেন।

দিয়ে পীঠি পাছে লগৈ সম্মুখ হো তপরায়।
তুলসি সম্পতি ছাঁহ্‌ জ্যোঁও লখি দিন বৈঠি গবাঁয়॥ ৫৯৩॥

প্রদীপ জ্বালিলে যেমন তাহার সম্মুখে আলোক কিন্তু পশ্চাতে অন্ধকার থাকিয়া যায়—হে তুলসীদাস! ধন সম্পত্তিও তেমনি প্রথমে খুব ভাল কিন্তু পরে নিতান্ত দুঃখদায়ক।

কহবে কহঁ রসনা রচী শুনবে কহঁ কিয় কান।
ধরি কেচিত হিত সহিত শুনি পরমারথ হি সুজান॥ ৫৯৪॥

পরমার্থতত্ত্ব রসযুক্ত কথা কাহার রসনা হইতে নির্গত হইবে আর কাহারই কর্ণ তাহা শুনিবে। অর্থাৎ ভগবৎ বিষয়ের আলোচনা সহজে কেহ করে না—এবং শুনিতেও কেহ সহজে চায় না।

তুলসি দেখত অনুভবত শুনত ন সমুঝত নীচ।
চপরি চপেটে দেতনিত কেশগহে করমীচ ॥ ৫২৫ ॥

হে তুলসীদাস! নীচলোক কখনও দেখে না, অনুভব করেনা বা বুঝে না যে মৃত্যু নিত্য তাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

জীব শিব সম সুখ মগন সপনে কছু করতুতি।
জাগত দীন মলিন সোই বিকল বিষাদ বিভূতি ॥ ৫২৬ ॥

জীব মায়ামত্ত হইয়া স্বপ্নে যেমন সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে কিন্তু জাগ্রত হইয়া মায়াযুক্ত হইলেই তাহার সেই স্বপ্ন ঘোর বিষম বিষাদে পরিণত হয়। অর্থাৎ মায়ামুক্ত অবস্থায় জীব সুখী আর মায়াযুক্ত অবস্থায় জীব দুঃখভোগ করে—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

সুখসাগর সুখনীদবশ সপনে সব করতার।
মায়া মায়ানাথ কি কো জগজানন হার ॥ ৫২৭ ॥

মায়া সাগরের পারে কাহার যাইবার ক্ষমতা নাই; জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন—যে সংসারের যাবতীয় সুখ সম্পদ স্বপ্ন ঘোরের মত অস্থায়ী।

ক্যহিমগ প্রবিশত জাতিকেহি জ্যাও দপর্ণসেঁ ছাই।
তুলসিজ্যাও জগজীব গতি করী জীহঁকে নাহু ॥ ৫২৮ ॥

দর্পণে পতিত ছায়া যেমন ক্ষণকাল অবস্থিতি করে, করীগণের স্নান যেমন কোন কাজের নয়—অল্পসময়ে আবার ধূলা ধূসরিত হয়। হে তুলসীদাস! এই জগত প্রপঞ্চের জীবগতিও তেমনি ক্ষণভঙ্গুর জানিবে।

প্রেম সরাপর পঞ্চরূপ উপজো অধিক উপাধি।
তুলসি ভলো সুবেদই যোগী বাঁধিয়ে ব্যাধ ॥ ৫২৯ ॥

হে তুলসীদাস! প্রেম সরাপের উপর মায়া প্রপঞ্চ বিষম ক